# কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

( দ্বিতীয় খণ্ড )

কাজী আবদুল ওদুদ

ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

# নিবেদন

'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৩৬৯ সালের গোড়ার দিকে আর তখন এই আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে পরের বৎসর এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে। ঠিক পরের বৎসরে না হলেও ১৩৭১ সালের মধ্যে এটি বেরিয়ে না যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

বইখানির সেই প্রত্যাশিত গতি প্রথম বাধা পেল এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশকের তরফ থেকে—তিনি বল্লেন আর একখানি মোটা বই এত শীগ্‌গির ছাপতে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাঁকে বলা হলো বইখানি দুই খণ্ডে সমাপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড সময়ে না বেরোলে তাতে পাঠকদের আগ্রহে ভাটা পড়বে। কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন হলো না। অগত্যা বইখানি বার করবার অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো। তাতে ১৩৭৩ সালের মধ্যে বইখানি বেরিয়ে যাওয়ার ভাল সম্ভাবনাই ছিল। কিন্তু বৃথা। এর জন্ম লগ্নে কোনো দুষ্ট গ্রহ ছিল কিনা জানি না কিন্তু এটি প্রকাশিত হতে পারলো ১৩৭৬ সালের আশ্বিনে, বহু চেষ্টা ক'রেও তার আগে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নি। এর মধ্যে কয়েকবার এর পাণ্ডুলিপি আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্য বিধাতা প্রসন্ন হলেন, বইখানি বন্ধুদের হাতে দিতে পারলাম।

বইখানি বন্ধুদের হাতে দিতে পারলাম—এটি ঠিক বিনয় বাক্য নয়, এর বড়ো সৌভাগ্যের কথা আমরা—কবি গুরুর দীন অনুরাগীরা—ভাবতে পারি না, কেন না তাতে অনুরাগ স্বধর্ম ভ্রষ্ট হয়।

কবিগুরুর মানস ও সাহিত্যের দুস্তর বিচিত্র পথে যে ক্লান্তিহীন পরিক্রমা করতে পেরেছি—সেই সঞ্জীবনী অভিজ্ঞতা—এই জন্য এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রকাশক মহোদয়কেও আজ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেন না অনেকটা তাঁর আগ্রহে এই শ্রমসাধ্য ব্যাপারে হাত দিয়েছিলাম।

৮বি, তারক দত্ত রোড
কলিকাতা-১৯

কাজী আবদুল ওদুদ

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলার জাগরণ

কবিগুরু গ্যেটে

শাশ্বত বঙ্গ

শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর

হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম

পবিত্র কোরআন ( পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ )

# সূচীপত্র

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|

| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|



———

# "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

## চিরকুমার সভা

আমরা জেনেছি, নৈবেদ্য রচনাকালে কবি লিখেছিলেন, 'চিরকুমার সভা'র মতো হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা আর 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র মতো জটিল হৃদয়াবেগের কাহিনীও—আপাতদৃষ্টিতে নৈবেদ্যের সঙ্গে এ-সব রচনার যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যোগ আছে। সেই যোগ এইখানে যে এই রচনাগুলোও গভীরভাবে জীবনধর্মী। জীবনের জটিল ও দূরপ্রসারী সমস্যা-গুলো সম্বন্ধে পূর্ণতর অবধান রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ।

'চিরকুমার সভা' সম্বন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে :

> 'চিরকুমার সভা' উপন্যাস আকারে ভারতী পত্রে... ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর 'রঙ্গচিত্র' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে ১৩১৪ সালে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়।......
>
> গ্রন্থখানির কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া এবং নূতন-লিখিত অংশ যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বা ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে একখানি নাটক রচনা করেন, অনেকগুলি নূতন গানও ইহাতে যোগ করেন। নাটকটি চিরকুমার সভা নামে ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এর চরিত্রগুলো সম্পর্কে কবি বলেন :

> চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা, কতক রাজনারাণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার (সরলা দেবীর) অংশ অনেকটা আছে বটে কিন্তু কোনো রিয়াল মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-রকম প্রতীয়মান সে-রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপর-বিরোধী ভাবে না দেখে উপায় পাইনে—কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং

কাব্যে যদিচ কোনো কোনো রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে—কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোরই নয়।৫

সাহিত্যিক সৃষ্টি সম্পর্কে কথাগুলো খুব মনে রাখবার মতো। "ঘটে যা তা সব সত্য নহে" ইত্যাদি বাক্য স্মরণীয়।

কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টি চিরকুমার সভার মুখ্য ব্যাপার নয়, এর মুখ্য ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির সৃষ্টি। এর রসিকদাদা কিন্তু বেশ একটি চরিত্র। পরে সে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে দাদাঠাকুরের মূর্তি গ্রহণ করেছে। চিরকুমার সভায় তার কথাগুলো খুব উপভোগ্য হয়েছে। অনেক সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক কবি তার মুখে দিয়েছেন। উদ্ভট কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সংস্কৃত কাব্য সাধারণত গুরুগম্ভীর, কিন্তু সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক তার হাল্কা অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চালের জন্য বিখ্যাত। মনে হয়, সংস্কৃত উদ্ভট সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ নিবিড় ছিল।

'চিরকুমার সভা'র গম্ভীর দিক সম্পর্কে প্রভাতবাবু বলেছেন:

চিরকৌমার্যকে কবি পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শরূপে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে চিরকুমার জীবন অস্বাভাবিক ও অসামাজিক। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে তাঁহার নূতন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠনের আয়োজনে ব্রতী। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর জন্য একটি নবীন চেতনা দেখা দিয়াছিল। আমাদের মনে হয়, এই প্রহসন রচনার সময় সন্ন্যাসের নূতন আন্দোলনকে বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে লেখকের মনে ছিল।

চিরকুমার সভা আজো একটি জনপ্রিয় প্রহসন। তার একটি বড় কারণ এর সুরুচি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে হাস্য সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়—Wit ও Humour. Wit বুদ্ধিদীপ্ত চাপা হাসি, কিন্তু Humour অদ্ভুতত্ব-নির্দেশক উচ্চ হাসি। Wit শাণিত, তার আঘাতও সাধারণত তীক্ষ্ণ; কিন্তু Humour মোটের উপর আঘাত-অনিচ্ছু দিল-খোলা হাসি। রবীন্দ্রনাথের হাস্য সাধারণত wit-ধর্মী। তবে তাঁর wit এখানে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ততটা হয়নি যতটা হয়েছে কৌতুকপ্রবণ। চিরকুমার-সভা-কে বিদ্রূপাত্মক না ভাবাই ভাল, কেননা, বিদ্রূপ যতটা এতে আছে তা খুব হাল্কা ধরনের।

# নষ্টনীড়

বাংলা ১৩০৮ সাল বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে এই বৎসরে যথাক্রমে বঙ্গদর্শনে ও ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'নষ্টনীড়' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি বইকে বলা যেতে পারে বাংলার কথা-সাহিত্যে যুগান্তরসূচক। সাহিত্যে যাকে বাস্তবতা বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তার উল্লেখযোগ্য পরিচয় আছে। কিন্তু নবমানবতা বলতে মানুষের দুর্বলতার প্রতি অনেকখানি প্রশ্রয়শীল যে জীবনদর্শন বোঝায় বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আমল দিতে চান নি। তাই নরনারীর যে-সব প্রবণতাকে সমাজধর্ম-বিগর্হিত জ্ঞান করা হয় সে-সব সম্বন্ধে তাঁর উপন্যাসে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করাই তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এমন আচরণকে যে প্রশ্রয় দিয়েছেন তা বলা যায় না; তবে সমবেদনা দিয়ে এই সব তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন—মানবজীবনে এই সব বেদনাকর ব্যাপারের স্থান অনেকখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। এই স্বীকৃতি নতুন ব্যাপার—নতুন জীবনদর্শনসূচক।

নষ্টনীড়কে প্রথমে উপন্যাস বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে এটির স্থান হয়েছে গল্পগুচ্ছে। ছোটো গল্পের তুলনায় এর আকার অবশ্য দীর্ঘ। কিন্তু চারুলতা ও ভূপতির দাম্পত্য জীবনের পরিণতি এতে যেমন সূক্ষ্ম রূপ-রেখায় আঁকা হয়েছে, মনে হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই কবি এটিকে তাঁর গল্পগুচ্ছে স্থান দিয়েছেন।

চারুলতার জীবনে পরিণতি যা ঘটলো আপাতদৃষ্টিতে তা কিছু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কেন না, তার সঙ্গে তার দেবর অমলের সম্বন্ধ যে দেবর-ভাজের স্নেহের আবদারের সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু নয় অমল সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল, আর সেজন্য চারুলতার স্নেহ সম্বন্ধে ভিন্ন ধরনের কিছুর সম্ভাবনা আশঙ্কা করেই সে ভয়ে নিজেকে চারুলতার সংস্রব থেকে সরিয়ে নিলে। চারুর মনেও অমলের প্রতি তার স্নেহ-সমাদর সম্বন্ধে আর কোনো সম্ভাবনার কথা জাগে নি। এরূপ ক্ষেত্রে পরে অমলের প্রতি তার আকর্ষণের আবেগকে সংযত করতে পারাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল; কেন না, সে বিবাহিতা, আর স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন। কিন্তু মনে হয় কবি এই গল্পে একটি বিশেষ সমস্যার দিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশ করতে

চেয়েছেন, সেটি হচ্ছে—দাম্পত্য কর্তব্য সম্বন্ধে ভূপতির সম্পূর্ণ চেতনাহীনতা যার ফল অবাঞ্ছিত ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে সমূহ বঞ্চনা পেয়ে ভূপতি যখন স্ত্রীর আদর-যত্নের ছায়ায় আশ্রয় নিতে ছুটে এলো তখন তার সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

……ভূপতি মনে মনে কহিল, "যাক, কাগজটা গেল, ভালোই হইল। মুক্তিলাভ করিলাম।" সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল।…… বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল, স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কিনা তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

কিন্তু সমস্যার দিকে কবির দৃষ্টি যতই পড়ুক তাঁর বড় পরিচয় এই যে তিনি দরদী, ঘটনাচক্রে অথবা অদৃষ্টের পরিহাসে চারুর স্বামীর সমাদর-বঞ্চিত নবীন জীবনে দেবর অমলকে ঘিরে অনেকটা চারুর মনের অজ্ঞাতসারে তার অন্তরতম স্নেহ-প্রীতি-সমাদর যেভাবে বেড়ে উঠলো তার আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে সে যে কি করবে ভেবে পেলে না, আর তার সম্পূর্ণ অজানিতভাবে তার কর্ম ও অনুরাগ-বঞ্চিত দাম্পত্য জীবনে (তার জীবনের এই অভাবাত্মক দিকের কথা কবি উল্লেখ করেছেন) ঘোর ব্যর্থতা নেমে এলো। তার স্বামী ভূপতির আর তার গৃহনীড় যে নষ্ট বিধ্বস্ত হয়ে গেল তার মূলে একদিকে তার স্বামীর দাম্পত্য জীবনের করণীয় সম্বন্ধে একান্ত অনবধানতা, অন্যদিকে তার (চারুলতার) ক্ষেত্রে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস—অন্য কথায়, জীবনের অজানিত ও অসংশয়িত গতি-পরিণতি।

গল্পটির পরিণাম বেদনা-গভীর হয়েছে চারুর জীবনে অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাসের ফলে। কাহিনীর এমন বেদনাকর পরিণতি, বিশেষ করে ঘটনার পারম্পর্যের সামনে মানুষের এমন অসহায়তা, কবি কমই এঁকেছেন।

এই দিক দিয়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজিডি—গ্রীক ট্র্যাজিডির ধরনের।

# চোখের বালি

চোখের বালি প্রথম নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে, সে-কথা বলা হয়েছে। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের শেষে। পরবর্তী কালে এর ভূমিকায় কবি লেখেন :

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা দুরূহ।......বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না।......কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্দ্ব যেখানেই ঘটেছে সেখানে প্রায় আমি জয়লাভ করতে পারি নি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রস সম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে।......এর পূর্বে মহাকায় গল্প-সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোট গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয় তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায় নি। তার পরে ঐ পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ।......বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর একদিকে এনেছিল গল্পে এমন কি কাব্যেও

মানব-চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্প অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তারপরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে, যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংবৃত হয়ে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

এই ভূমিকায় কবি তাঁর নৈবেদ্যের পরের সাহিত্যিক যুগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন—পরে আমরা তার বিস্তারিত পরিচয় পাব। আপাতত লক্ষণীয় এই দুইটি বিষয়: নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের উপরে প্রথম যুগের বঙ্গদর্শনের ঐতিহ্যের প্রভাব, আর নতুন যুগে কবির নতুন সাহিত্যিক চেতনা। এই নতুন সাহিত্যিক চেতনার দিক দিয়েই চোখের বালি খুব বিশিষ্ট। জীবনের ও সমাজের যা-সবকে মন্দ ভাবা হয় কবি সে-সব ভালো বলতে চান নি, কিন্তু তিনি পুরোপুরি সচেতন যে সংসারে ভালো আর মন্দ জড়াজড়ি করেই আছে, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সোজাসুজি কিছুকে ভালো আর কিছুকে মন্দ বলে রায় দিতে যাওয়া জীবনের দিকে যাদের দৃষ্টি আছে তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এতে প্রধান চরিত্র বিনোদিনী—অন্তত, তার চরিত্র ও তাকে ঘিরে ঘটনার আবর্তন সব চাইতে লক্ষণীয় হয়েছে। কবি প্রথমে এই লেখাটির নামও দিয়েছিলেন 'বিনোদিনী'। বিনোদিনী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্মনিপুণা, কিন্তু অল্পবয়সে বিধবা। তার অল্পদিনের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে স্মরণযোগ্য কিছুই তার মনে নেই। তার সুবিকশিত যৌবনকান্তি সবার চোখে পড়ে, আর সে-বিষয়ে সে সচেতন। পল্লীগ্রামে অতি ছোটো সংসারের সাধারণ কাজ-কর্ম করে তার দিন কাটে, আর নাটক-নভেল সে মন দিয়েই পড়ে।

এই বিনোদিনীর আগমন হল মহিমদের সংসারে। মহিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত—বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে বিদ্যার্থী। তার সম্পন্ন সংসারে আছেন মাতা রাজলক্ষ্মী—তাঁর স্নেহের ছায়ার বাইরে মহিমের জীবন যে কাটতে পারে আজও সে-কথা তিনি মনে স্থান দিতে পারেন না। সম্প্রতি মহিমের বিবাহ হয়েছে, অথবা বলা ভাল, মহিম খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অনেকটা বালিকা-

বয়সী আশাকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে যেতে উঠতে চাচ্ছে। কিন্তু মাতা রাজলক্ষ্মী তার এই দাম্পত্য লীলার প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাইতে পারছেন না—তাঁর সেই অপ্রসন্নতা সরলা আশার প্রতি আর আশার মাসিমা নির্বিরোধ ও ধর্মকর্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার প্রতি ( ইনি রাজলক্ষ্মীর বিধবা জা ) কারণে অকারণে মুখর হয়ে ওঠে। এই সংসারে বিনোদিনীর আগমন ঘটল রাজলক্ষ্মীর আগ্রহে তাঁর ভক্ত ও সেবিকারূপে। বিনোদিনীর পরলোকগত স্বামী ছিল রাজলক্ষ্মীর গ্রাম-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র।

বিনোদিনী তার গতানুগতিক গ্রাম্য জীবনে প্রথম একটা চমক অনুভব করলে বিহারীর কাছে লেখা মহেন্দ্রের একখানি চিঠি পড়ে—বিহারী মহেন্দ্রের আবাল্য বন্ধু—রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, এঁদের সবারই খুব অনুগত; সে এসেছিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর জন্মভূমি বারাসতে, সেইখানেই বাস করতো বিনোদিনী। মহেন্দ্র বিহারীর কাছে লেখা তার চিঠিতে "আশার কথা ......রঙ্গে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল" হয়ে লিখেছিল। কবি লিখেছেন :

> চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুক-রস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।
>
> মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলি পাক খাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু বিনোদিনীর প্রেম-বঞ্চিত নবীন জীবনের শূন্যতা ও দাহই কবি আঁকেন নি, তার অন্তরে শায়িত রয়েছে যে প্রেমময়ী সেবাপরায়ণা কল্যাণী নারী, তার চরিত্র-চিত্রে সেটিও তিনি যত্নে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এইখানে 'বিষবৃক্ষে'র হীরার সঙ্গে তার পার্থক্য—হীরার চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বঞ্চিত জীবনের দুঃখ, দাহ ও প্রতিহিংসা ভিন্ন আর কিছু তেমন প্রত্যক্ষ করেন নি।

বিনোদিনীকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল নতুন বিবাহিত জীবনে মহিমের উদ্দাম ভাবাবেগ আর মহিমদের সংসারের স্বচ্ছলতা। সহজেই তার মনে হয়েছিল এমন সংসারে তার মতো রূপ-যৌবনবতীর স্থানলাভ না হয়ে সেখানে যে স্থান হয়েছে বুদ্ধি-বিবেচনায় প্রায় বালিকা আশার ( এক সময়ে মহিমের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহের কথা হয়েছিল ), এটি তার চোখে ভাগ্যের বিড়ম্বনা

ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আশা সহজেই তার খুব ভক্ত হয়ে পড়ল। তাতে আশার প্রতি একই সঙ্গে বিনোদিনীর মনে দেখা দিল ঈর্ষা আর করুণা।

কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে ছিল যে প্রেম ও কল্যাণময়ী নারী তার প্রভাব তার জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠল বিহারীর মতো সচ্চরিত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্নেহময় যুবকের সংস্পর্শে এসে। বিহারী প্রথমে বিনোদিনীর চালচলন সন্দেহের চোখে দেখেছিল, সে-সন্দেহ সে ব্যক্তও করেছিল; কিন্তু অচিরে তার চোখে পড়ল বিনোদিনীর চরিত্রের শ্রদ্ধেয় দিকটি, আর সেই দিকটির প্রতি বিহারী অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করলে। এরই ফলে বিনোদিনীর জীবনে ঘটলো এক বড় রকমের পরিবর্তন। এর পরও মহেন্দ্রের সঙ্গে ব্যবহারে তার অন্তরের বঞ্চিত দিকটাকে মাঝে মাঝে বেশ সক্রিয় হতে আমরা দেখি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-দিকটাকে বিনোদিনী পুরোপুরি সংযত করতে পারলে বিহারীর প্রতি তার প্রেম ও শ্রদ্ধার সহায়তায়। সুন্দরী বিধবা বিনোদিনীর জীবনে এই যে প্রেমে বঞ্চিত হওয়ার দাহ আর অকৃত্রিম প্রেম-নিবেদনের আনন্দ চিত্রিত হল এটি হল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নতুন ব্যাপার। কিন্তু কবি যে এই দুঃসাহসিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারলেন খানিকটা দূর পর্যন্ত, তার বেশি নয়, তাও আমরা দেখব।

চোখের বালিতে বিনোদিনীর পরে যে চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে মহেন্দ্র। সে সম্পন্ন সংসারের সন্তান, মায়ের একান্ত প্রশ্রয়ে লালিত; তাই নিজের ইচ্ছাকে সংযত করার কথা সে কখনো ভাবে নি। কিন্তু তার এই প্রবল খেয়ালীপনার সঙ্গে তাতে রয়েছে যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি; আর অন্তরের দিক দিয়ে সে নীচ নয় আদৌ। তার চরিত্রে এমন বিচিত্র দোষ ও গুণের সংমিশ্রণ যে ঘটেছে, তার ফলে তার আচরণ তার উপরে একান্ত নির্ভরশীল স্ত্রী, তার মাতা, আবাল্যবন্ধু বিহারী, সবারই জন্য যথেষ্ট দুঃখের কারণ হল—তবু সে ঘৃণার পাত্র হল না কারো। (খেয়ালী লোকদের ঘৃণা করা কঠিন।) শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী সম্পর্কে তার আচরণের অবাঞ্ছিততা সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন হল, আর কারো প্রতি অন্তরে ক্ষোভ না রেখে তার সংসার-জীবনে ফিরে এল। মহেন্দ্রের মতো খেয়ালীপনা রয়েছে অনেকটা তার মাতা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রেও। বৃদ্ধ বয়সেও নিজের দিকটা ভিন্ন আর কোনো দিকের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে কঠিন; তাই অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাঁর বিধবা জা অতিশয় নির্বিরোধ-প্রকৃতির অন্নপূর্ণাকে, তাঁর পুত্রবধূ আশাকে, কঠিন কথায় বিঁধতে তাঁর সঙ্কোচ হয় না। তাঁর নববধূ আশা

যে তাঁর পুত্রের সমাদরের পাত্রী হল এতে সহজেই তিনি ঈর্ষান্বিতা হলেন— তাঁর সেই ঈর্ষার ফলে বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ অনেকটা প্রশ্রয় পেল। কিন্তু এমন সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর অন্তরটি সত্যই স্নেহময়, তাই তাঁর উপরে খুব অসন্তুষ্ট আমরা হতে পারি না। অনেকখানি দায়িত্ববোধহীন কিন্তু সাধু-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ধনী ঘরের মহিলাদের তিনি প্রতিনিধিস্থানীয়া।

মহেন্দ্রের নববধূ আশা বয়সে প্রায় বালিকা—বুদ্ধি-বিবেচনায় সে বালিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু তার ভিতরে যে অকৃত্রিম সরলতা রয়েছে—আর তার মনটি স্নেহে ভরপুর—এর ফলে যথেষ্ট দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করেও তার জীবন সুপরিণতির পথে দাঁড়াল—তার ভাগ্য প্রসন্ন হল। আশার মতো চরিত্র আঁকায় কবির বেশ আনন্দ। তাকে আমরা কিছু ভিন্ন বেশে দেখব 'চোখের বালি'র অল্প কিছুদিন পরে লেখা 'নৌকাডুবি'র কমলায়। আশার সরলতা ও প্রেমপূর্ণ প্রকৃতি মহেন্দ্রের অনেকটা সহজভাবে সাংসারিক জীবনে ফিরে আসার সহায় হল। এই দিক দিয়ে আশার চারিত্রশক্তিকে কবি যথেষ্ট অর্থপূর্ণ করে এঁকেছেন।

মহেন্দ্রের আবাল্য বন্ধু বিহারীর চরিত্র কবি যত্নেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে তার চরিত্র, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, এ-সবের পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলার দিকে তিনি যথেষ্ট মন দিয়েছেন। কিন্তু বিহারীর স্নেহপ্রবণতা আমাদের চোখে পড়লেও তার চরিত্রে বিচারশীলতার যে উল্লেখযোগ্য দিকটি রয়েছে সেটি কেমন করে যেন আমাদের মনের উপরে তেমন দাগ কাটতে পারে না। এর পরে আমরা দেখব বিহারীর তুল্য চরিত্র 'গোরা'র বিনয় বিহারীর তুলনায় অনেকাংশে সুঅঙ্কিত ও প্রাণসমৃদ্ধ হয়েছে। বিহারীকে কবি যথেষ্ট মহদাশয় করে এঁকেছেন; কিন্তু মহত্ত্বকে সহজ ও জীবন্ত করা কঠিন কাজ, সেই কঠিন কাজে কবির বিশেষ সাফল্য আমরা এর পরে 'গোরা'তেই দেখব। বিহারীর কথা ও আচরণের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ যেন দেখা দেয় নি। তাকে সংসারে অনেকখানি নির্লিপ্ত করে আঁকা হয়েছে। কিন্তু সে নির্লিপ্ততা কেমন করে যেন যথেষ্ট মানবিক যথেষ্ট স্বাভাবিক হয় নি।

বিহারী তার প্রতি বিনোদিনীর অকপট শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পেয়ে প্রস্তাব করলে সে তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ যত প্রবলই হোক, এই প্রস্তাবে বিনোদিনী সম্মত হল না। এ সম্পর্কে তার উক্তি এই :

পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ-জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে-শিক্ষা যদি ভুলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম! কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না......ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমি দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি তুমি প্রসন্ন হও, তুমি সুখী হও।

বিনোদিনীর উক্তির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের সাবিত্রীর উক্তির মিল লক্ষণীয়। চোখের বালি ও চোখের বালির পরের নৌকাডুবি শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আমরা জেনেছি—আরো জানব—যে, এইকালে অর্থাৎ নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময় কবি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছিলেন। বিধবা কিন্তু নব-অনুরাগিণী বিনোদিনীর এই উক্তি কবির সেই মনোভাবের অনুযায়ী হয়েছে। কিন্তু বিনোদিনীকে তিনি যে-রূপে আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন, তার এই পরিণতি তার সেই চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়েছে কি হয় নি—এই আমাদের ধারণা। জনমতের সামনে, বা জনসাধারণের সংস্কারের সামনে কবিকে অনেকটা পিছু হঠতে হয়েছে, এই মনে হয়।

কিন্তু বিনোদিনীর অন্তরের বেদনার সত্য কবি যতখানি উদ্ঘাটিত করতে পারলেন তারও ফল আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে কম হয় নি। যুগধর্ম এখানে কুণ্ঠিতভাবে উপস্থিত হয়েও শেষ পর্যন্ত দেশের মনের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নির্বিরোধ ও পরমস্নেহবতী অন্নপূর্ণাও চোখের বালির একটি মহদাশয় চরিত্র। কবি তাঁর বঞ্চিত জীবনে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন একটি সহজ কিন্তু গভীর ঈশ্বরনির্ভরতা। এর পরে কবির অনেক লেখাতেই গভীর ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় আমরা পাব।

আমাদের ধারণা, গোটের বিখ্যাত উপন্যাস Elective Affinities-এর (স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলীর) কিছু প্রভাব কবির এই 'চোখের বালি'র উপরে পড়েছে।

স্বয়ংবৃত্ত সম্পর্কাবলীর এডুয়ার্ড চরিত্রের সঙ্গে চোখের বালির মহেন্দ্র চরিত্রের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এডুয়ার্ডের মতোই মহেন্দ্রের ভাবাবেগ দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে ওঠে, মনের গতির রাশ টানতে সে জানে না। উক্ত উপন্যাসের কাপ্তেনের সঙ্গে বিহারী চরিত্রের অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়—কাপ্তেনের মতোই বিহারী ধীর স্থির আর সবকর্মে দক্ষ। স্বয়ংবৃত্ত সম্পর্কাবলীর 'ওটিলী' চরিত্রের সঙ্গে সরলা আশারও কিছুটা মিল রয়েছে। স্বয়ংবৃত্ত সম্পর্কাবলী য়ুরোপীয় সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, চোখের বালিও তেমনি আমাদের সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।* তবে চোখের বালির চেয়ে স্বয়ংবৃত্ত সম্পর্কাবলী আরও সুপরিণত সৃষ্টি।†

## বঙ্গদর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীতে বলা হয়েছে :

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বৎসর, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, ১২৭৯ সালে, বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশ করেন।......চারি বৎসর অপূর্ব কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করেন।.....নানা কারণে ১২৮৩ সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ ছিল, ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হয়।.....১২৮৪ হইতে ১২৮৯ পর্যন্ত চলিয়া বঙ্গদর্শন পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপর ১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে ঐ পত্রিকার ভার অর্পণ করেন; তখন চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সম্পাদন-কার্যের প্রধান সহায়। ১২৯০ সালে চারিটি সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথ বসুর পশুপতি-সম্বাদ নামে একটি রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে বঙ্কিম অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং মাঘ সংখ্যার পর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীশচন্দ্র ইহার দুই বৎসর পরে সাব-ডেপুটির পদ পাইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। আঠারো বৎসর পর

* এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

† কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শ্রীশচন্দ্র বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া নিবেদনে লিখিলেন: (১৩০৮ বৈশাখ) বঙ্গদর্শন পুনর্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল, ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম।......সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অনিচ্ছুক হয়ে এই সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ভার গ্রহণ করার পরে এর পরিচালনায় কোনো শৈথিল্য তিনি দেখান নি; বরং এক নতুন আগ্রহ তিনি অনুভব করেন, ভারতীয় জীবনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁর নতুন চিন্তা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করবার এমন একটি বড় সুযোগ পেয়ে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর সেই সব লেখার সঙ্গে পরে আমাদের পরিচয় হবে।

১৩০৮ সালেই অগ্রহায়ণ মাসে কোনো এক তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের পত্তন হয়—পত্তন হয় সামান্য কয়েকটি ছাত্র ও অল্প কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে। এর পূর্বে কবি সপরিবারে শিলাইদহে বাস করছিলেন এবং সেখানে কয়েকজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে তাঁর পুত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ১৩০৮ সালের গোড়ার দিকে কবি শিলাইদহের বাস উঠিয়ে কলকাতায় আসেন। এইকালে কবিপত্নীকে লেখা একখানি পত্রে আমরা পাচ্ছি:

নির্জনতায় তোমাদের পীড়া দেয় কেন তা আমি বেশ সহজেই বুঝতে পারছি—আমার এই ভাব সম্ভোগের অংশ তোমাদের যদি দিতে পারতুম তা হলে আমি ভারি খুসি হতুম, কিন্তু এ জিনিস কাউকে দান করা যায় না। ......কিন্তু কি করি বল, কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে—সেইজন্যে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করতে থাকি—সকলের মনের সঙ্গে ক্ষমা করে বিরোধ ত্যাগ করে অন্তঃকরণের শান্তি রক্ষা করে চলতে পারি নে। তা ছাড়া সেখানে রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—সকলেই কিরকম উড়ু উড়ু করতে থাকে। কাজেই তোমাদের এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভালো জায়গা বেছে নিতে হয়ত পারব, কিন্তু কোনোকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না।

শান্তিনিকেতনের পত্তন হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। এর পঁচিশ বৎসর পরে একটি ট্রাষ্ট ডীড করে মহর্ষি এটি উৎসর্গ করেন। মহর্ষির পৌত্র বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনি এটিকে গড়তে চেয়েছিলেন 'ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী'র কেন্দ্ররূপে। কিন্তু তিনি ১৩০৬ সালে অকালে পরলোক গমন করেন। প্রভাতবাবু বলেছেন, "এই ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ পাই না।" প্রমাণ না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেন না, রবীন্দ্রনাথ এইকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রসারের কথা ভাবছিলেন না, ভাবছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের কথা—স্বদেশ, স্বদেশের ইতিহাস, এ-সবের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত হবার কথা। ১৩০৯ সালের ২৭ কার্ত্তিকের একটি পত্রে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনি এই নির্দেশ দেন :

> ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই। স্বদেশ দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমন কি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা খর্ব করিতে না শেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনার সূচনায় দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে কবি কত বেশি ঝুঁকেছিলেন তার একটি কৌতুকাবহ পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্র-জীবনীকারের এই ছোটো বিবৃতিতে :

> শান্তিনিকেতনের পরিচালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই মাসের মধ্যেই দেখা দিল। আপত্তি বাধিল কবির অনুমোদিত, ব্যাখ্যাত, আদর্শীকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম লইয়া। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া; তিনি একে কায়স্থ ( মতান্তরে সদ্‌গোপ ), তার উপর ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কিনা এই লইয়া

সমস্যার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বাবুকে (তিনি তখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার) লিখিতেছেন, "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু-সমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্রেরা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক-দিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" কিন্তু কবির মনের দ্বিধা যায় না, তাই লিখিলেন যে অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই?......ভোজনশালায় পংক্তি বিচার করিয়া স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদ করিয়া সকলে আহারে বসিতেন।

ব্রাহ্ম ভাবধারা সম্পর্কে কবির মনোভাব সম্বন্ধে পরে আমরা আরও বিস্তৃত পরিচয় পাব।

কিন্তু এই সব সাময়িক প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ও বাদ-প্রতিবাদের চাইতে অনেক বড় ব্যাপার—'তপোবনে'র যে গভীর স্বপ্নে কবির চিত্ত এইকালে বিভোর হয়েছিল সেইটি। এর কয়েক বৎসর পরে লেখা একটি পত্রে কবির সেই স্বপ্ন পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়:

মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী বালক বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে, যাহা রাজা ও সমাজের সকল প্রকার বন্ধন-পীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত,—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক

......আমাদের তপোবনবাসীদের—জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা এখানকার নিভৃত শান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহন-কার্য সারিয়া কুটির-প্রাঙ্গণে, গৃহকার্যে শুচিস্নাতকল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি......মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলে-নিয়ামে'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া, প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬)

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনায় কবি বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ব্রহ্মবান্ধব নৈবেদ্যের একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা তাঁর ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশ করেন—সেই সমালোচনা কবিকে বিশেষ আনন্দ দান করে।*

ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীতে অনেক কথা বলা হয়েছে তবে ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে যান অল্পদিনেই। তিনি প্রকৃতিতে কবির চাইতে অনেক স্বতন্ত্র ছিলেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় পরে যেভাবে রূপান্তরিত হয়, কবির চিন্তাতেও যেভাবে পরিবর্তন ঘটে, সে-সবেরই সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

## স্মরণ

শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন বাস করার পর কবিপত্নী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় খুব অল্পদিন তাঁর সেবা ও যত্ন লাভ করতে পেরেছিল। কিন্তু সেই স্বল্পকালও স্মরণীয় হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে তখন ছাত্র-সংখ্যা ছিল খুব কম, কিন্তু তারা তাঁর কাছ থেকে মায়ের

* দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা

সমাদর পেত। শোনা যায়, বিদ্যালয়ের এই সংকটাপন্ন সময়ে নিজের গহনা [illegible] কবিকে তিনি সাহায্য করেছিলেন।

১৩০৯ সালের আষাঢ় মাসে চিকিৎসার জন্য কবিপত্নীকে কলকাতায় আনা হয়, আর সেই বৎসরে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। এই সময়ে কবির বয়স ৪২ বৎসর চলছিল। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁদের দুই কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল বেশ অল্পবয়সে।

পত্নীর অকালমৃত্যুতে কবি গভীরভাবে শোকাহত হন। কিন্তু এইকালে ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁর জীবনের এক বড় সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল; তাই এই গভীর শোকের প্রকাশ তাঁর স্মরণ কাব্যে যা হয়েছে তা খুব সংযত। কিন্তু সেই সংযত রূপেও মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বেদনা উঁকি দিয়েছে :

> মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
> নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ-মন্দিরে
> নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
> ঘুচেছে মরণস্নানে। অপরূপ নব রূপখানি
> লভিয়াছ এ বিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হতে।
> স্মিতস্নিগ্ধমুগ্ধমুখে এ চিত্তের নিভৃত আলোতে
> নির্বাক্ দাঁড়ালে আসি। মরণের সিংহদ্বার দিয়া
> সংসার হইতে তুমি অন্তরে পশিলে আসি, প্রিয়া।
> আজি বাজে নাই বাদ্য, ঘটে নাই জনতা উৎসব,
> জ্বলে নাই দীপমালা; আজিকার আনন্দ গৌরব
> প্রশান্ত গভীর স্তব্ধ বাক্যহারা অশ্রুনিমগন।
> আজিকার এই বার্তা জানে নি শোনে নি কোনো জন।
> আমার অন্তর শুধু জ্বেলেছে প্রদীপ একখানি,—
> আমার সংগীত শুধু একা গাঁথে মিলনের বাণী।

অথবা :

> জ্বালো ওগো জ্বালো ওগো সন্ধ্যাদীপ জ্বালো।
> হৃদয়ের একপ্রান্তে ওইটুকু আলো
> স্বহস্তে জাগায়ে রাখো। তাহারি পশ্চাতে
> আপনি বসিয়া থাকো আসন্ন এ রাতে
> যতনে বাঁধিয়া বেণী সাজি রক্তাম্বরে
> আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাড়িবার তরে

জীবনের জাল হতে। বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি, নানা দিক হতে
নানা দর্প নানা চেষ্টা সন্ধ্যার আলোতে
এক গৃহে ফিরে যদি নাহি রাখে স্থির
একটি প্রেমের পায়ে শ্রান্ত নতশির।

যিনি ছিলেন কবির অন্তঃপুরের লক্ষ্মী, বাইরের জগতে প্রায় অপরিচিতা, কবির দৃষ্টিতে ও বাণীতে তিনি আজ কি বিচিত্র রূপ ধরে প্রকাশ পেতে চাচ্ছেন সে-কথা ব্যক্ত হয়েছে স্মরণের অনেকগুলো কবিতায়—সেগুলির একটি এই:

হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর
সরস্বতী রূপ আজি ধরেছ মধুর
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল দলে
মানস-সরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমায়।
চিত্তের সৌন্দর্য তব বাধা নাহি পায়—
সে আজি বিশ্বের মাঝে মিশিছে পুলকে
সকল আনন্দে আর সকল আলোকে
সকল মঙ্গল সাথে। তোমার কঙ্কণ
কোমল কল্যাণপ্রভা করেছে অর্পণ
সকল সতীর করে। স্নেহাতুর হিয়া
নিখিল নারীর চিত্তে গিয়েছে গলিয়া
সেই বিশ্বমূর্তি তব আমারি অন্তরে
লক্ষ্মী-সরস্বতী-রূপে পূর্ণ রূপ ধরে।

বোঝা যাচ্ছে, শোক-কাব্য হিসাবে স্মরণ যথেষ্ট মূল্যবান। কবি খুব নিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না তা আমরা জেনেছি। কিন্তু তাঁর অন্তরটি ছিল স্নেহে প্রেমে ভরপুর। তাঁর সেই অপূর্ব অন্তরের ছোঁওয়ায় তাঁর সৃষ্টি সর্বক্ষেত্রেই চিত্তগ্রাহী হয়েছে। তাঁর অন্তরের গভীর স্নেহ-প্রেম দৈনন্দিন জীবনে তেমন প্রকাশ পেত না বলেই তাঁর রচনায় তার প্রকাশ এত হৃদ্য হয়েছে মনে হয়।

# শিশু

রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালে—প্রকাশ করেন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' বর্ধিত আকারে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায়। গভীর শোক-দুঃখের সময়েও কবি কতটা আত্মস্থ থাকতে পারতেন তাঁর কাব্যের এই সংস্করণ প্রকাশ তার একটি প্রমাণ। পত্নীর মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে মোহিতচন্দ্র সেনকে তিনি লেখেন: গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।*

কাব্য-গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণে একটি বড় বিশেষত্ব ছিল—এতে রচনার বা গ্রন্থ-প্রকাশের অনুক্রম অনুসরণ করা হয় নি, এতে কবিতাগুলি ভাবানুসঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হয়েছিল, আর সেই বিভিন্ন বিভাগের সূচনায় ছিল এক-একটি প্রবেশক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুকাব্য' প্রথম এই গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয়। 'শিশু-কাব্য' সম্বন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে:

> রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর পরলোকগমনের পরে, তিনি পীড়িতা মধ্যমা কন্যা রেণুকা ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকে লইয়া আলমোড়া গিয়াছিলেন। 'শিশু'র অনেকগুলি কবিতা মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের পরিতোষের জন্য তথায় রচনা করেন। এইগুলির সহিত পূর্বরচিত শিশু-বিষয়ক ও 'নদী' ইত্যাদি অন্যান্য কবিতা যোগ করিয়া শিশু প্রকাশিত হয়।

এই সংস্করণে শিশু বিভাগে কবির যে-সব পুরাতন কবিতা স্থান পেয়েছিল সেগুলির একটি তালিকা রবীন্দ্র-জীবনীতে দেওয়া হয়েছে। সে-সবের অনেক-গুলো প্রচলিত শিশুকাব্যে স্থান পায় নি।

রবীন্দ্রনাথের শিশুকবিতা তাঁর প্রতিভার এক অপূর্ব দান—শুধু বাংলার সমঝদারেরা নন, জগতের বিভিন্ন দেশের সমঝদারেরা এই সব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। শিশুর বিচিত্র সাধ-স্বপ্নের এমন চিত্রণ আর কোনো কবির রচনায় দেখা যায় নি—এইই মোটের উপর তাঁদের রায় দাঁড়িয়েছে।

শিশুর কবিতাগুলির মধ্যে খোকার কথাই বলা হয়েছে, খুকীর কথা এতে স্থান পায় নি এমন অভিযোগ করেছিলেন মোহিতচন্দ্র সেনের পত্নী সুশীলা দেবী।

* দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ।

তার উত্তরে কবি যা বলেন তাতে তাঁর শিশু-কবিতাগুলো বোঝবার পক্ষে অনেক সহায়তা হয়েছে। তাঁর উক্তিটি এই :

> আমার এই কবিতাগুলো সবই খোকার নামে—তার একটি প্রধান কারণ এই, যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুঁকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের প্রতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল—খুকীর চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে—খোকা এবং খোকার মা'র মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্র) তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল, সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।

কবির নিজের বাল্যস্মৃতি, আর বিশেষ করে তাঁর সদ্যপরলোকগতা পত্নীর কাছে তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রের স্নেহ-সমাদর লাভের বেদনাভরা স্মৃতি যে তাঁর শিশু-কবিতা রচনায় বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল এই তথ্য মূল্যবান। তবে এ-সব বোঝা তেমন কঠিন নয়। কিন্তু এ-সবের আড়ালে আর একটি ব্যাপারও ছিল, সেটি কিছু গোপন, সেটি হচ্ছে কবির এইকালের নিবিড় ভগবৎপ্রেমের ভাবটি। আমাদের দেশে প্রাচীন বৈষ্ণবকাব্যে ভগবানকে যেমন দেখা হয়েছে প্রভুরূপে, সখারূপে, কান্তরূপে, তেমনি দেখা হয়েছে সন্তানরূপে—বালগোপালের প্রতি মাতা যশোদার অপরিসীম স্নেহে সেই ভাব মূর্ত হয়েছে। সেই দিব্য বাৎসল্যের ভাবটির ছোঁওয়াও রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতায় লেগেছে। আর তাতেই শিশু-কাব্যখানির মূল্যও বেড়েছে।

'ছোঁওয়া' বলছি বৈষ্ণব-কবিদের সঙ্গে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। ভক্ত বৈষ্ণব-কবি অনেকটা সহজভাবে বাল-গোপালে প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবানের রূপ—বালকরূপে ভগবানের লীলা—কেন না নরদেহে ভগবানের লীলায় তাঁর সহজ প্রত্যয়। কিন্তু আমাদের কবি একালের ভাবুক, প্রাচীন বৈষ্ণব-কবির সেই সহজ প্রত্যয় তাঁতে নেই (থাকা সম্ভবপর নয় বলেই মনে হয়); তাই তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্ত হয়েছে শুধু বালকরূপে ভগবানের লীলাই নয়, বালকের অফুরন্ত কৌতূহলে,

বালকের প্রতি মাতার ও পিতার আপনভোলা প্রেমে জীবনের অশে
রহস্যময়তাও।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা বালগোপালের প্রাচীন ভক্তদের ভাবের প্রতি ধ্বনি যে নয়, মানবচিত্তের রহস্যময়তা তাতে যে নতুন ভাষা পেয়েছে— এর মূল্য অপরিসীম। এইজন্যই একালের সাহিত্যে এটি একটি বিশিষ্ট দান কিন্তু কতকটা এইজন্যই আমাদের দেশের কোনো কোনো ভাবুক কবির এই অপূর্ব সৃষ্টির প্রতি বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

শিশু-মনের বিচিত্র গতি, বিচিত্র প্রশ্ন, অজটিল অথচ পরম মনোহর ভাব পেয়েছে এই কবিতাগুলোয়। সমস্ত শিশু-কাব্যখানির ভিতরে একটি তাজা চিরনবীন রহস্যের সংস্পর্শে চিরচঞ্চল প্রাণ ঝলমল করছে।*

যে দিব্য বাৎসল্যের কথা আমরা বলেছি তা এতে প্রকাশ পেয়েছে কথনো কথনো, যেমন 'কেন মধুর' কবিতাটিতে :

যখন নবনী দিই লোলুপ করে
হাতে মুখে মেখে চুকে বেড়াও ঘরে
তখন বুঝিতে পারি, স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারি কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে।

লোলুপ কথাটি লক্ষণীয়। এই লোভ মনোহর। জগৎপিতা আমাদের জন্য স্বাদু নদীবারি আর মধুরসে ভারি ফলের ব্যবস্থা করে কত খুশি হয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি খোকা কী লোভীর মতো পিতামাতার দেওয়া ননী খেয়ে বেড়াচ্ছে। অথবা 'চাতুরী' কবিতাটিতে :

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের পরে
ভিখারিটির মতো।
এমন দশা সাধে ?
দীনের মত করিয়া ভান,
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ
তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে।

---

* এই মন্তব্যটি আমার রবীন্দ্রকাব্যপাঠ-এ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্য বলে কয়েকখানি সমালোচনা-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

খোকা সে ছিল বাঁধন-বাধা-হারা
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ
ঘুমায় শুকতারা।
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চাহে অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়া-ফাঁদে।

"মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা মায়ের মায়া-ফাঁদে" কথাটি নৈবেদ্যের "মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া" কথাটির তুলনায় বেশি চিত্তগ্রাহী হয়েছে।

মায়ের চোখে শিশুর খেলাধুলা, দুরন্তপনা, অপরিসীম মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে এর কতকগুলো কবিতায়, সেই মাধুর্যের মধ্যেও দিব্য বাৎসল্য আছে। এমন একটি কবিতার দুইটি স্তবক এই :

বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল।
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্।
লিখতে গিয়ে হাতে-মুখে
মেখেছ সব কালি ?
নোংরা বলে তাই দিয়েছে গালি ?
ছি ছি উচিত একি।
পূর্ণশশী মাখে মসী—
নোংরা বলুক দেখি॥
বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষীছাড়া ছেলে ?
ছি ছি কেমনধারা।
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষীছাড়া॥

আর শিশুর অনেকগুলো কবিতা অতুলনীয় ছড়া। শিশুর বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা আমরা করলাম না, তার কারণ এর অজস্র লঘুপক্ষ ভাবের অপরিসীম বর্ণবৈচিত্র্য রসিক পাঠকের অতন্দ্রিত রসবোধেরই একান্ত অপেক্ষা রাখে।

যেমন তাঁর ছোট গল্পে, তেমনি তাঁর গানে, তেমনি তাঁর শিশু-কবিতায় কবি অপূর্ব শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেই চাতুর্য যে চাতুর্য বলে মনে হয় না তাতেই তার প্রকৃষ্টতার বিশেষ পরিচয়। কবির এমন শিল্প-দক্ষতার মূলে অবশ্য তাঁর অনুভূতির অকৃত্রিমতা ও গভীরতা। কবি জীবনে বহু সময়ে বহু চিন্তা ও মতবাদের তাড়না ভোগ করেছিলেন, কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন একটি আশ্চর্য সহজ মানুষ।

## উৎসর্গ

আমরা জেনেছি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' রচনার বা গ্রন্থ-প্রকাশের অনুক্রম অনুসারে সাজানো হয় নি, সাজানো হয়েছিল ভাবানুষঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিভাগে ( যেমন, যাত্রা, হৃদয়-অরণ্য, নিষ্ক্রমণ, বিশ্ব, সোনার তরী, লোকালয়, নারী, কল্পনা, লীলা, কৌতুক, যৌবনস্বপ্ন প্রেম, কবিকথা, প্রকৃতিগাথা, হতভাগ্য, সংকল্প, স্বদেশ, রূপক, কাহিনী, কথা, কণিকা, মরণ, নৈবেদ্য, জীবন-দেবতা, স্মরণ, শিশু, গান, নাট্য ), আর সেই বিভিন্ন বিভাগের সূচনায় দেওয়া হয়েছিল এক একটি প্রবেশক কবিতা। এই সংস্করণ পরে আর প্রচলিত ছিল না, কবির বিভিন্ন কবিতা-গ্রন্থ পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেই মুদ্রিত হতে থাকে। তখন যে-সব কবিতা কাব্য-গ্রন্থাবলীতেই প্রকাশিত হয়েছিল, কোনো স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয় নি, সেগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয় 'উৎসর্গ' নাম দিয়ে। চারুবাবু বলেছেন, উৎসর্গের কবিতাগুলো ১৩০৮ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে রচিত।

কোনো কোনো সমালোচক 'উৎসর্গে'র কবিতাগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পান নি, যেমন টমসন্ সাহেব বলেছেন :

It has no unity, no connecting thread of thought or emotion. All the poet has ever been induced to say is that it has a lot of the *Jivan Devata* about it. কিন্তু a lot of the *Jivan Devata*,

অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে জীবন-দেবতার ভাব, যদি এতে থেকে থাকে তবে সেইটিকেই তো বলা যেতে পারে এর ঐক্যসূত্র। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলো আসলে তাঁর বিভিন্ন কবিতার সংগ্রহ। তাই সেই কবিতাগুলো রচনাকালে যে ভাব বা যে যে ভাব অথবা মানসিক প্রবণতা তাঁতে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল সেই-সবেই তো তাঁর বিভিন্ন সময়ের কাব্যের মুখ্য পরিচয়। আর শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, কবিদের প্রায় সবার সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য: বিশেষ বিশেষ ভাবমুহূর্ত তাঁদের রচনায় মুক্তাবিন্দুর মতো উজ্জ্বল ও নিটোল রূপ পায়—তাঁদের কাব্যের সংগ্রহ বা সমগ্রতা সেই সব মুক্তাবিন্দু দিয়ে গাঁথা মালা অথবা সাজানো পেটিকা। অবশ্য সেই গাঁথা মালার বা পেটিকারও একটি বিশেষ মূল্য আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র মুক্তাগুলি যে বিশেষ মূল্যবান এ-কথা আমরা কখনো ভুলতে পারি না। এমন কি মুক্তার মালা বা পেটিকা যদি কালে নষ্ট হয়ে যায় তবু সেই স্বতন্ত্র মুক্তাগুলির মূল্য হ্রাস পায় না। কবির, বিশেষ করে গীতিকবির প্রতিভার পরিচয়স্থল মুখ্যত তাঁর বিভিন্ন কবিতা—কবিতা-সংগ্রহ তেমন নয়, এটি মোটের উপর একটি স্বীকৃত সত্য।

কবির নৈবেদ্যকে কেউ কেউ বলেছেন idea-প্রধান কাব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'উৎসর্গ'কে বলা যেতে পারে তাঁর একটি idea-প্রধান কাব্য। এইকালে কবি অনেকটা সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর এতদিনের কাব্যসাধনার উপরে—বুঝতে চেয়েছিলেন তার অর্থ বা প্রবণতা। মুখ্যত সেই সজাগ দৃষ্টির ফল তাঁর উৎসর্গের কবিতাগুলো। কিন্তু idea-প্রধান হয়েও এর অনেক কবিতা কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ, কেন না, idea সমৃদ্ধ রূপও পেয়েছে সে-সবে।

'উৎসর্গ' কবিতা-সংগ্রহের ১ নম্বর কবিতাটি কাব্য-গ্রন্থাবলীর 'রূপক' বিভাগের কবিতা ছিল।

এতে যে ছোটো ভোরের পাখির চিত্র দেওয়া হয়েছে সেই পাখি কিসের রূপক? বলা যেতে পারে—মানুষের নতুন নতুন চেতনার রূপক—মানুষের প্রতিভায়, কবি ও ভাবুকের চিত্তের নতুন নতুন উন্মেষে, সেই নতুন চেতনার পরিচয়:

এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।

তুমি ডাকো, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।

মানব-চিত্তের নব নব উন্মেষ মানুষের সমাজে প্রথম প্রথম অস্বীকৃতি, এমন কি লাঞ্ছনা পেয়েছে। কিন্তু সেই সব নব-চেতনা নিজের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করে নি।

২ নম্বর কবিতাটি 'যাত্রা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা ছিল। কবি প্রথম যখন কবিতা রচনায় মেতেছিলেন তখন তাঁর চোখের সামনে ছিল 'তিমির রাত,' কোনো অনুকূলতা কোনো দিকে ছিল না, কবি শুধু তাঁর জীবন-দেবতার কি যে ইঙ্গিত অনুভব করেছিলেন তাও বলবার সাধ্য তাঁর নেই। কিন্তু সেই গূঢ় গোপন ইঙ্গিত তাঁকে যাত্রার দুঃসাহস যুগিয়েছিল। সেই দুঃসাহসই নানা দুঃখ-ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে তাঁকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জীবন-দেবতা সম্বন্ধে কবির বক্তব্যের সঙ্গে আমরা এর পূর্বে চিত্রায় পরিচিত হয়েছি। এইকালে মোহিতচন্দ্র সেনকে কবি লেখেন :

......আমাদের প্রত্যেকের জীবন-দেবতা বিশ্বদেবতার সহিত আমাদের মিলনসাধনের চেষ্টা করিতেছে......আমার মধ্যে আমার এই চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই আমার কবিতায় নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'কল্পনা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। কবির বক্তব্য—কল্পনা মুখ্যত স্বপ্নের ব্যাপার, সংসারের ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কবিতাটিতে 'কল্পনা' বলতে কবি প্রধানত তাঁর জীবন-দেবতার রূপ এঁকেছেন যিনি একান্তভাবে তাঁরই দেবতা—তাঁকে বিশেষ বেদনা চেতনা দিয়ে গড়ে সার্থক করেছেন :

সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে

চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে।

৪ নম্বর কবিতাটি ছিল 'লীলা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। 'ক্ষণিকা'র আলোচনায় এটি আমরা ব্যবহার করেছি।

৫ নম্বর কবিতাটি ছিল 'কৌতুক' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। 'কৌতুক' অনেকটা 'লীলা'রই সমজাতীয়। কবির জীবন-দেবতা কবির জীবনে যে-সব দুঃখ-বিপত্তি এনে দিয়েছেন, কবি অনুভব করেছেন সে-সব তাঁকে নিয়ে জীবন-দেবতার কৌতুক—আসলে জীবন-দেবতার প্রেমের দৃষ্টিপাত থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হন নি।

৬ নম্বর কবিতাটি 'সোনার তরী' বিভাগের প্রবেশক কবিতা ছিল। বলা বাহুল্য, কবির কাব্য-গ্রন্থাবলীর এই বিভাগ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্য থেকে পৃথক্।

যে জীবন-দেবতা কবির কাব্যের 'সোনার তরী' বেয়ে নিয়ে চলেছেন কবি তাঁর অপরূপ রূপ আঁকতে চেয়েছেন; তাঁর কাব্যে সেই জীবন-দেবতার পরিচয় দিতে কবি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ যে তাঁর হয়েছে এ-বিষয়ে তিনি সংশয়মুক্ত নন—

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?

কবি তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বলছেন: জীবন-দেবতার পরিচয় দেবার ব্যর্থ চেষ্টা তিনি আর করবেন না, বরং সেই জীবন-দেবতা কবিকে যেমন খুশি চালনা করুন, জীবন-দেবতার প্রেরণা তিনি যদি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন তবে তার অতিরিক্ত কিছু তিনি আর কামনা করেন না—

কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।*

এটি কবির একটি প্রধান কবিতা। জীবন-দেবতার idea—ভাবনা—এতে যা ব্যক্ত হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি রূপ পেয়েছে জীবন-দেবতার প্রেরণার অপূর্বতা—কবির জীবনে জীবন-দেবতার লীলা। জীবন-দেবতায় আর বিশ্ব-দেবতায় অনেকটা মাখামাখি হয়েছে এই কবিতায়:

তোমায় জানি না চিনি না এ-কথা বলো তো
কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও
খনে খনে যাও ছলি।
জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণশশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে।

৭ নম্বর কবিতাটি ছিল 'যৌবনস্বপ্ন' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। কবির অপূর্ব নব-যৌবনের কথা যুবক প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন তা আমরা 'ছবি ও গান'-এর আলোচনাকালে আংশিক উদ্ধৃত করেছি। এর প্রথম স্তবকে সেই নব-যৌবনের মত্ততার ভাবটি প্রধানত ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয় বা শেষ স্তবকটিতে কবি যে ভাব প্রকাশ করেছেন তা শুধু যৌবনের কথা নয়, ত জীবনের কথাও। "যাহা চাই তাহা

* হাফিজের দুটি চরণ এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:
ঐ প্যাঁচানো অলকগুচ্ছ থেকে
হাফিজের কখনো মুক্তি না ঘটুক।
কেননা তোমার ফাঁদে যারা বন্দী তারাই মুক্ত॥

ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না" এটি শুধু যৌবনের চিত্র নয়, জীবনের চিত্রও। 'সোনার তরী'র 'পরশ-পাথর' কবিতাটিতে এমন চিত্র খানিকটা আঁকা হয়েছে।

৮ নম্বর কবিতাটি ছিল 'বিশ্ব' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। যা সুদূর—অনায়ত্ত—তা কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে; আবার যা কাছের, যা চারপাশে আছে তাও কবিকে কম মুগ্ধ করে না। এই কবিতায় সুদূর ও অনায়ত্তের আকর্ষণের কথাই কবি বলেছেন। কবি জানেন পাখির মতো উড়ে যাবার ডানা তাঁর নেই, তাঁর চারপাশের সব-কিছুর আকর্ষণে তাঁর সামনে চলার পথ অনেকটা রুদ্ধ, কিন্তু সে-সব সত্ত্বেও যা সুদূর যা দুর্লভ তার আকর্ষণ তাঁর জন্য দুর্বার:

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাসরি।

এটি কবির একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

৯ নম্বর কবিতাটি ছিল 'হৃদয়-অরণ্য' বিভাগে প্রবেশক কবিতা। আমরা দেখেছি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র যুগে কবির মনে কেমন একটি ব্যাপক বিষাদ ও অস্বস্তির ভাব জেগেছিল, সেই 'হৃদয়-অরণ্যে'র জটিল বন্ধন থেকে কবির নিষ্ক্রমণ ঘটে 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র যুগে। 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র 'পুনর্মিলন' কবিতার এক জায়গায় আছে:

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাইকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

এই কবিতাটিতে কবির সেই অপ্রকাশের বেদনা রূপায়িত হয়েছে। সেদিন অবশ্য সেই বেদনাই তাঁর জন্য প্রধান সত্য ছিল। কিন্তু পরে কবি উপলব্ধি করেন যে এই অপ্রকাশের বেদনা সাময়িক, এর অবসান ঘটবে, অপ্রকাশ প্রকাশে সার্থক হবে এই বিশ্ববিধান।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে কবি লিখেছিলেন:

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা, এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহে এই তাৎপর্য।

আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানা প্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম--ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়ার অবসান হইবে......

১০ নম্বর কবিতাটি ছিল রূপক বিভাগের। রূপকটি বড় হৃদয়গ্রাহী। মানুষের অন্তরাত্মাকে আঁকা হয়েছে বিরহিণী নারী রূপে—তার মন আর কিছুতেই খুশি হয় না, খুশি হয় কেবল তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে। মানুষের অন্তরাত্মার জন্য প্রিয়তম হচ্ছেন ভগবান, অন্য কথায়, যা সংকীর্ণ নয়, যা নশ্বর নয়, যা ভূমা, যা মহৎ, তাই। ধনরত্ন, সুখসমৃদ্ধি, প্রতাপ, এ-সব মানুষকে ভোলাতে পারে অল্পকালের জন্য, তার অন্তরাত্মার সত্যকার তৃপ্তিসাধন এ-সবের দ্বারা হয় না। কিন্তু মানুষ তার জীবনে শুধু অতৃপ্তিই প্রকাশ করে চলে—কিসে যে তার তৃপ্তি তা সে বুঝিয়ে বলতে পারে না।

১১ নম্বর কবিতাটিও ছিল রূপক বিভাগের। কবি সহজভাবে অন্তরে সে প্রেরণা লাভ করেছেন (কিসের প্রেরণা? কার প্রেরণা? বলা যাক, অপরূপের—পরম মনোহরের) তাই তাঁকে গভীর আনন্দ দিয়েছে। সেই আনন্দ পণ্ডিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে চান না, কেন না পণ্ডিত যে সত্যকে জানে তার প্রমাণ নেই। বরং বিশ্বজগতের মধ্যে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ রয়েছে, যে অনির্বচনীয়তা রয়েছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে কবি তাঁর অন্তরে পাওয়া প্রেরণার কথা বুঝতে চেষ্টা করবেন। তাঁর অন্তরে যে প্রেরণা এসেছে, তাঁর সমস্ত সত্তা তাতে পুলকিত হয়েছে, এই তাঁর জন্য মহা-লাভ। বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলে তাঁর অন্তরের সেই উপলব্ধি তিনি ক্ষুণ্ণ করবেন :

বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা,
রব অবোধসম।
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি।
রয়েছে যাহা নিশি দিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি

খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি.
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না-বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

কোনো গুরু নয়, কোনো শাস্ত্রের বাণী নয়, শুধু অন্তরে লব্ধ প্রেরণার উপরে এতখানি নির্ভরতা আধ্যাত্মিক সাধনায় বা জীবন-সাধনায় এ অনেকখানি নতুন ব্যাপার। অবশ্য উপনিষদের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা সুবিদিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের সহজ আনন্দ-রূপ আর তাঁর অন্তরের সন্ধানপ্রবণতা কবির জন্য বেশি সত্য ছিল।

১২ নম্বর কবিতাটি ছিল 'কণিকা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা—ভাব ও রূপের অপূর্ব সম্মিলনে এটি একটি পরম হৃদ্য কবিতা হয়েছে। যা বড়ো, ক্ষুদ্র তার দিকে বিস্ময় ও নৈরাশ্যভরা দৃষ্টিতে তাকায়, কেন না, সে যে বড়োকে কখনো লাভ করতে পারবে তা সে ভাবতে পারে না। কিন্তু বড়োর বড়ত্বের একটা পরিচয় এই যে, সে ক্ষুদ্রের বুকে প্রতিফলিত হতে পারে, আর এমনি করে ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বের দুঃখ ঘোচাতে পারে :

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।"

১৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'জীবন-দেবতা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। জীবন-দেবতা বলতে কবি বুঝেছেন সেই শক্তি যার প্রভাবে যুগ-যুগান্তরের বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়ে কবির বিশিষ্ট সত্তাটি অভিব্যক্ত হয়েছে। সেকালের জন্মান্তরবাদ, একালের অভিব্যক্তিবাদ, এই দুয়েরই দ্বারা তাঁর কবি-কল্পনা সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবন-দেবতা যে ঠিক বিশ্বদেবতা নন সে-কথা কবি বলেছেন। জীবন-দেবতার ভাবে কবির বিশিষ্ট সত্তার কথা বেশি ঠাঁই পেয়েছে। সত্তার

বিশিষ্ট রূপ কবির জন্য মহামূল্য। কবি শুধু একের তত্ত্বে খুশি নন, বিচিত্র রূপময় বহুর দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। কবি আরো বলেছেন, চির-নূতন গড়ে উঠছে চির-পুরাতনের প্রভাবে :

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

১৪ নম্বর কবিতাটি ছিল 'বিশ্ব' বিভাগের কবিতা। এটি স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রে প্রথম বৎসরে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ( বৈশাখ ১৩০৮ )। এর প্রধান ভাবটি সংক্ষেপে এই : মানুষ জগতে এমনভাবে চলে যেন সে এখানে প্রবাসী—এর লোকজন অনেকেই তার আপনার জন নয়, বিরাট বিশ্বজগতের সঙ্গেও যেন তার কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই। কিন্তু আসলে বিশ্বজগতের সবাই—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেশ-দেশান্তরের মানুষ, জগতের পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, স্থল, জল, এদের সবার সঙ্গে মানুষের পরম আত্মীয়তা রয়েছে—সেই আত্মীয়তার কথা না বুঝে সে আনন্দহীন।

'বসুন্ধরা' কবিতায়ও কবি এই নিবিড় বিশ্বাত্মীয়তা অনুভব করেছেন। তার সঙ্গে এই প্রবাসী কবিতায় আরো অনুভব করেছেন বিশ্বজগতে ভগবানের মঙ্গলময় পরিচালনা। সেই পরিচালনার জন্য এই সংসারের জীবন কবির কাছে এত সুন্দর, সুসমঞ্জস ও সার্থক যে একে পরিত্যাগ করে শাস্ত্রবর্ণিত কোনোরূপ পরিত্রাণের কথা তিনি ভাবতে পারেন না :

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কী চাস ?
মোর তরে জল দু-হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরণী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পায়ে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী।

বৈষ্ণব-মতেও এই ধরনের চিন্তা রয়েছে।

১৫ নম্বর কবিতাটি ছিল 'প্রেম' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। জগতে কিছুই স্থির নয়, সব ঘূর্ণিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে—কিন্তু এ-সবের মধ্যে প্রেম, প্রেয়সী নারীর মাধুর্য, অচঞ্চল মহিমা বিকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে—কবির এই বক্তব্য :

কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।

কবি পঞ্চভূতে বলেছেন :

যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা।

১৬ নম্বর কবিতাটি ছিল 'স্বদেশ' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। আমরা নৈবেদ্যে দেখেছি, একালের য়ুরোপের যে মহাপরাক্রান্ত কিন্তু আসলে হিংস্র ও লুব্ধ সভ্যতা তার দিক থেকে কবি চোখ ফিরিয়েছেন—তা যে ভারতের আদর্শস্থল হতে পারে না সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তাঁর ধারণা

হয়েছে, মানুষের প্রকৃত আশ্রয়স্থল যে ভগবান, তাঁর নিখিলপ্লাবী আনন্দ আলোক—

হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধুতীরে
বহু ধৈর্যে নম্র স্তব্ধ দুঃখের তিমিরে,
সর্বরিক্ত অশ্রুসিক্ত দৈন্যের দীক্ষায়
দীর্ঘকাল—ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায়......

এই প্রবেশক কবিতাটিতেও সেই ধরনের কথা কবি বলেছেন। ভারতের অনাগত মহিমার এই রূপ তাঁর চোখে পড়েছে :

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার
ভেদি বণিকের ধনঝংকার
মহাকাশতলে উঠে ওংকার
কোনো বাধা নাহি মানি।

১৭ নম্বর কবিতাটি ছিল 'রূপক' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। এটি কবির একটি অতি প্রসিদ্ধ কবিতা। সমস্ত জগতের মধ্যে প্রলয়ে সৃজনে ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা চলেছে—এই সত্য কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত সাধক দাদুরও একটি অনুরূপ কবিতা আছে :

বাস কহে হম্ ফুল-কো পাঁউ,
ফুল কহে হম্ বাস।
ভাব্ কহে হম্ সত্ কো পাঁউ,
সত্ কহে হম্ ভাব॥
রূপ কহে হম্ ভাব কো পাঁউ,
ভাব কহে হম্ রূপ।
আপস্ মে দউ পূজন চাহে—
পূজা অগাধ অনূপ॥
সুবাস বলে আমি ফুলকে চাই,
ফুল বলে আমি সুবাসকে চাই,

ভাষা বলে আমি সত্যকে চাই,

সত্য বলে আমি ভাষা চাই ॥

রূপ বলে আমি ভাবকে চাই,

ভাব বলে আমি রূপকে চাই।

দুজনেই আপন আপন ভাবে পূজা করতে চায়—

সেই পূজা অগাধ অনুপম ॥

দাদুর কবিতার শেষ দুটি ছত্র ভাবে ও রূপে তুলনাহীন।

১৮ নম্বর কবিতাটি ছিল 'প্রকৃতিগাথা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। লোকালয়ের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ শুধু বাঁশি বাজাবার—বাঁশি বাজিয়ে আপন আপন কর্মে রত লোকদের অন্তরে অল্পক্ষণের জন্য হলেও জগতে কত আনন্দ ও সৌন্দর্য আছে সে সম্বন্ধে সচেতন করবার। কবি তাই বিশ্বদেবতাকে বলছেন :

হে রাজন্, তুমি আমারে

রেখো চিরদিন বিরামবিহীন

তোমার সিংহ-দুয়ারে।

যারা কিছু নাহি কহে যায়,

সুখদুখভার বহে যায়,

তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে

দাঁড়াবে পথের মাঝারে

তোমার সিংহ-দুয়ারে।

'সোনার তরী'র পুরস্কার কবিতাটিতেও কবি এই কথা বলেছেন।

২০ নম্বর কবিতাটি ছিল 'কবিকথা' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতায় কবি চেয়েছিলেন বিশ্বের রাজ-রাজেশ্বরীর মালঞ্চের মালাকর হতে, আর কিছু হতে নয়। এই কবিতাটিতেও কবি অনুরূপ ভারই নিতে চাচ্ছেন। তার সঙ্গে শুধু এই কথাটি যোগ করেছেন যে তাঁর বীণার তারে প্রভু নিজ হাতে একটি স্বর্ণতন্ত্রী বেঁধে দিন :

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,

লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,

পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,

অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।

তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝংকার দিব কত কী ছন্দ
যত গান গাব, তব বাঁধা-তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্ত্র।

কবির যৌবনের কবিতার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কালের কবিতা মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় তাঁর সৌন্দর্য-পূজা অব্যাহত রয়েছে—শুধু তাতে আর একটি উদার গম্ভীর সুর লেগেছে।

২১ ও ২২ নম্বর কবিতা ছিল 'কবিকথা' বিভাগের অন্তর্গত। ২১ নম্বর কবিতাটি খুব প্রসিদ্ধ। কবির ভিতরে যে দুইটি সত্তা রয়েছে—একটি তাঁর প্রতিদিনের দুর্বল ও বিক্ষুব্ধ মানবিক সত্তা, অপরটি তাঁর কল্পনাসমৃদ্ধ নব-নব সৃষ্টি-কুশল অ-সাধারণ সত্তা—এই দুইয়ের কথাই কবি এতে হৃদয়গ্রাহী করে বলেছেন। কবিতাটির শেষ স্তবকটি এই :

যে আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের তরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

২২ নম্বর কবিতাটি চিন্তার দিক দিয়ে খুব স্মরণীয়। কবি এক ব্রহ্মের কথা উদাত্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু কবিরূপে তিনি শুধু একেকে নিয়ে সন্তুষ্ট নন—বহুর বিচিত্র রূপে তিনি মুগ্ধ। সেই কথাটিই এই কবিতায় তাঁর মুখ্য কথা হয়েছে :

"আছি আর আছে"
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।" করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।

একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে
যে আদি গোপন তত্ত্ব—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কবির দৃষ্টির পার্থক্য লক্ষণীয়। গ্যেটের একটি কবিতায় আছে :

কেউ পড়তে পারে না নাস্তিতে,
অনন্ত বাস করে প্রত্যেকের মধ্যে।
ধন্য হও তাই সত্তায়।
সত্তা চিরন্তন, নির্ধারিত ধারা
রক্ষা করে তার চির-জীবন্ত সম্পদ,
তাতেই বিশ্বের মহিমময় রূপায়ণ।*

কবি রূপের প্রেমিক—তত্ত্বের চাইতে রূপের মূল্য তাঁর কাছে বেশি।

২৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'প্রকৃতি-গাথা' বিভাগের। নৈবেদ্যে কবি বলেন, তরুণ বয়সে তিনি প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যে একান্ত বিভোর ছিলেন; কিন্তু সে বিভোরতা তাঁর কেটে গেছে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ডাক তাঁর কাছে এসে পৌঁছেচে—সেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের যোগ্য তাঁকে হতে হবে। এই কবিতাটিতে তিনি বলেছেন, জীবনের শেষের দিকে নানা কর্ম-কোলাহল তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছিল, তার ফলে তাঁর মনটি ছিল শূন্য। কিন্তু তাঁর শূন্য মনের কাছে বিশ্বপ্রকৃতিরই ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব বার্তা এলো। সেই বার্তায় তিনি বুঝলেন, কর্মকোলাহল তাঁর জীবনে যতই দেখা দিক, আসলে তিনি একা—যার বার্তা তাঁর কাছে এসেছে তার দেখা না পেলে তিনি একাই থাকবেন, তাঁর জীবন ব্যর্থ হবে। এই বার্তা বয়ে-আনা দূতকে কবিতাটির শেষ স্তবকে তিনি বলেছেন :

ওগো দূর দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কী দিব উত্তর ?

---

*কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩।

অশ্রু আসে দু-নয়নে,
নির্বাক্ অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর।

কবির জীবনে যে ভক্তির ভাব এসেছে (এসেছে কোনো অলৌকিক পন্থায় নয়, প্রকৃতিরই ভিতর দিয়ে—অন্তত এই কবির ধারণা), কবি বুঝছেন তার সার্থকতা না ঘটলে তাঁর জীবন স্বাদহীন ও আনন্দহীন হবে।

এর পরের ছয়টি সনেট হচ্ছে হিমালয় সম্বন্ধে—এগুলোতে হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি এবং স্নিগ্ধ কল্যাণ-মূর্তি দুইই কবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন। বিরাট শিলাপুঞ্জ আর তাকে ঘিরে নির্ঝরিণী আর শ্যামলিমার লীলা এ-সবে তিনি প্রতিফলিত দেখেছেন ভব-ভবানীর প্রেমলীলা—

নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালবাসিলেন নির্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশে? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।

কবির অল্পদিন পূর্বের গার্হস্থ্য-জীবনের আনন্দ তাঁর মনে পড়ছে কি?

৩০ নম্বর সনেটটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন। এর শেষ অংশটি এই—

হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
'উত্তিষ্ঠত নিবোধত'। ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে,
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আর বার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

এই সাতটি কবিতাই ছিল 'স্বদেশ' বিভাগের অন্তর্গত।

কিন্তু লোভহীন দ্বন্দ্বহীন ও শুদ্ধ শান্ত হয়ে গুরুর বেদীতে বসবার সাধনা আজও ভারতে দেখা দেয়নি, আজও ভারত—এবং প্রাচ্যজগৎ—জীবনের

প্রায় সর্বক্ষেত্রে য়ুরোপের ও আমেরিকার অনেকটা অসার্থক অনুকরণ করে চলেছে।

৩১ নম্বর কবিতাটি ছিল 'রূপক' বিভাগের। এক ঘোর দুর্যোগের রূপ এতে আঁকা হয়েছে—সেই দুর্যোগ-রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ের লালিমা খাঁচার পাখিদের খাঁচার লোহার শলাকায় এসে লাগেনি। এই ঘোর দুর্যোগের অন্ধকারে বসে খাঁচার পাখিরা পরম দরদী বিশ্বেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে:

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

অকালে পত্নীকে হারিয়ে কবি কত গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন তার পরিচয় এতে আছে। আনন্দ ও আলোকের প্রার্থনা কবির জন্য কত বড় সত্য প্রার্থনা ছিল তারও পরিচয় এতে আছে।

৩২ নম্বর কবিতাটি ছিল 'নারী' বিভাগের। নারীর সেবিকা রূপের মহিমা-কীর্তন এতে কবি করেছেন:

রাজমহিমারে,
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই তো মহিমা তব সেই তো গরিমা,
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

৩৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'প্রকৃতি-গাথা' বিভাগের। পার্বত্য অঞ্চলে ঝড়ের

মেঘের আয়োজন দেখে কবির চিত্তে যে উদ্দাম আনন্দ জেগেছে তারই কথা এতে বলা হয়েছে।

৩৪ নম্বর কবিতা ছিল 'কবি-কথা' বিভাগের। গ্রামে বাসের সুখস্মৃতির কথা কবি এতে বলেছেন।

৩৫ নম্বর কবিতাটি ছিল 'প্রকৃতি-গাথা' বিভাগের। কবির সৃষ্টি-কুশল কল্পনা অতীতের, অজানার কত মনোহর ছবি এঁকে চলেছে, আর কবির মন সেই সব ছবির জগতে 'অপূর্ব ধন তরে' কেমন করে বাঁধা পড়েছে সেই সব কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে। রোমান্টিকতা বলতে কবি বুঝেছেন বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলার দিক, অবিরাম গতি-চাঞ্চল্যের উপর আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব-সম্পাতের দিক—কবির সেই রোমান্টিক প্রবণতার বিশেষ পরিচয়স্থল এই কবিতাটি :

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরানো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্মরিত তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ।
শৈলতলে চরায় ধেনু রাখাল শিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়ে লিখা চৈত্র-মাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব ধন তরে।

৩৬ নম্বর কবিতাটিও ছিল 'প্রকৃতি-গাথা' বিভাগের। এটিও কবির রোমান্টিক প্রবণতার পরিচায়ক :

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্য মিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।

আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য 'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

৩৭ নম্বর কবিতাটি ছিল 'নাট্য' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। কবির বক্তব্য—জীবন-নাট্যের অর্থ বোঝা যায় যদি আসক্তি ত্যাগ করে অনাসক্ত দৃষ্টিতে সেই নাট্যের দিকে তাকানো যায়:

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাট-বেদীতে।
নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে না বুঝিবি—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

কিন্তু পুরোপুরি অনাসক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে কি সম্ভবপর? অন্তত, কবি অনেক সময়ে তীব্র অস্বস্তি ভোগ করেছেন। মহাভারতে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো ধৈর্যহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

তবে চেষ্টা করলে মানুষ অনেক পরিমাণে অনাসক্ত হতে পারে, আর তার ফলে জীবনে অনেকটা শান্তি ও সার্থকতা লাভ করতে পারে। এই কবিতাটি idea-প্রধান।

৩৮ নম্বর কবিতা ছিল 'মরণ' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। এটি সুপ্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে অনেক প্রাচীন ভক্ত-কবি মরণকে এই দৃষ্টিতে দেখেছেন। নৈবেদ্যেও কবি বলেছেন :

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

কিন্তু মানুষ যতই সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করুক মৃত্যুর সামনে তারা যে বেদনা ও অসহায়তা বোধ করে তাও চিরকালের সত্য। এ-কথা কবির রচনায়ও ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতায়ও কবির তত্ত্বচিন্তার প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

৩৯ নম্বর কবিতা ছিল 'সংকল্প' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে বলছেন, জীবন-দেবতা তাঁর তরুণ বয়সে যেদিন দেখা দিয়েছিল সেদিন তার হাতে ছিল বাঁশি, অধরে ছিল অবাক্ হাসি, আর সেদিন ফাল্গুন মেতে উঠেছিল মদবিহ্বল শোভায়।

কিন্তু তার পর কবির চোখে ঘুম এলো, সেদিনকার সভাও ভেঙে গেল।

আজ ঝরঝর বাদলে পথে লোক নেই, কবি তাঁর দ্বার রুদ্ধ করেছেন; কিন্তু তিনি দেখছেন তাঁর সেই জীবন-দেবতা অন্য মূর্তিতে আজ তাঁর সামনে হাজির—সে মূর্তি রুক্ষ তাপসের মূর্তি :

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস মূরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলধারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।
বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস মূরতি ধরিয়া।

কবি তাঁর জীবন-দেবতার এই মূর্তির সামনে পূর্ণভাবে প্রণত হচ্ছেন এই প্রার্থনা জানিয়ে :

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা,
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে।

এর পরে কোনো কোনো প্রবন্ধেও কবির এই চিন্তার পরিচয় আমরা পাব। একালের সুখান্বেষী জীবন নয়, প্রাচীন ভারতের তপস্যাদীপ্ত ও ত্যাগপূত জীবন কবিকে মুগ্ধ করেছে। তার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব সমর্পণের তাগিদ কবি অনুভব করছেন। এই তাগিদ কবির মধ্যজীবনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪০ নম্বর কবিতা ছিল 'সোনার তরী' বিভাগের কবিতা। কবি তাঁর নবীন যৌবনে কাব্য-লক্ষ্মীর হাতে মন্ত্রপূত রাখির রাঙা সুতো বেঁধে দিয়েছিলেন—অর্থাৎ কাব্যলক্ষ্মীকে সত্যই জীবনে বরণ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মী দীর্ঘকাল তাঁর সামনে ছিলেন না। কবির আরও ফুল উপহার নেবার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন নি। কেন যে এমন ত্বরা করে তিনি চলে গেলেন তা কবি জানেন না। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর নূপুরের ধ্বনি আজো কবির কানে বাজছে।

কবি বলছেন, কাব্যলক্ষ্মী তাঁর অনেক গীতি গান উপহার নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার পরেও তাঁর এমন গানের কলি ফুটেছে কাব্যলক্ষ্মীর পূজাই যার বিশেষ কাম্য ছিল। কিন্তু সেটি আর কাব্যলক্ষ্মীকে দেওয়া সম্ভবপর হয়নি :

মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

আমরা পূর্বেও দেখেছি, কবির ধারণা হয়েছে কবির গীতলক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেও দেখেছি, পরেও দেখব, গীতলক্ষ্মীর প্রসাদ তাঁর উপর চিরদিন তুল্যভাবে বর্ষিত না হলেও তা থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হন নি।

৪১ নম্বর কবিতাটি ছিল 'হতভাগ্য' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। কবির পত্নীশোক এতে রূপ পেয়েছে। সেই দারুণ শোকের দিনে কবি অনুভব করেছেন সব দিক দিয়েই তিনি কত অসহায়। কেবল নিজের বল সম্বল করে এই দারুণ দিনে কবি দাঁড়াতে চাচ্ছেন।

আমাদের দেশের ভক্তরা সাধারণত নিজের বলের কথা বলেন না। সব অবস্থাতেই ভগবান তাঁদের একমাত্র ভরসাস্থল। কিন্তু কবি চরম দুর্দিনে নিজের বলের উপরে নির্ভর করার কথা বার বার বলেছেন—বোধ হয় তার কারণ নিজের বলেই তিনি ভগবানের বল উপলব্ধি করেন। নৈবেদ্যে তিনি বলেছেন:

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

ভক্তির ভাব কবির অন্তরে প্রবল, কিন্তু প্রবলতর তাঁর মধ্যে জ্ঞান; বিশেষভাবে একালের লোক তিনি।

৪২ নম্বর কবিতাও ছিল 'হতভাগ্য' বিভাগের। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সবাই দেবালয়ে পূজা সেরে প্রসাদী ফুল নিয়ে ঘুমের আয়োজন করছে, কিন্তু হতভাগ্য পথিক এই সময়েও নানা বোঝা নিয়ে পথে চলেছে। সেই পথের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না, কোন্ প্রান্তরের শেষে, কোন্ দূর দেশে পথিকের রাত প্রভাত হবে, পথশ্রান্ত পথিক তাও জানে না। এই পথিককে কবি বলেছেন বিদেশী—পরিবেশ থেকে কোনো আনুকূল্য সে পাচ্ছে না বোধ হয় সেইজন্য।

বলা বাহুল্য এটিও শোকাহত কবির চিত্র।

৪৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'নারী' বিভাগের প্রবেশক কবিতা। নারীর জীবনের বিভিন্ন কাল আর সেই সব কালে পুরুষ তার কাছ থেকে যে সহায়তা পায় সেই সবের কথা কবি বলেছেন।

যৌবনে জীবন-যুদ্ধের শেষে পুরুষ নারীকে পায় সুন্দরী তরুণী রূপে, যার সৌন্দর্যে পুরুষের জীবন ও জীবনের আয়োজন সুন্দর ও সার্থক হয়। তারপর গৃহিণীরূপে নারী পুরুষের গৃহ আলোকিত করে—

স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।

এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।

প্রৌঢকালে যখন পুরুষের শক্তি হ্রাস পায়, সংসারে সে অনেকখানি অনাদৃত হয় প্রবাসীর মতো, তখনও নারী আনন্দময়ী গৃহিণীরূপে পুরুষের জীবনকে সুধাময় করে। তারপর পুরুষের সংসার থেকে বিদায় নেবার কাল আসে, সেদিন নারীর সজল কাতর দৃষ্টি পরলোকযাত্রী পুরুষের পথে করুণাবৃষ্টি করে। আর মৃত্যুর পরে পুরুষের আত্মা তৃপ্ত হয় সাধ্বী তাপসী নারীর হাত থেকে তর্পণবারি লাভ করে। সব অবস্থায় নারীর প্রীতি ও মাধুর্য পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

৪৪ নম্বর কবিতাটি ছিল 'রূপক' বিভাগের। এর রূপকটি বোঝা কিছু কঠিন। মনে হয় জীবন ও মৃত্যুর সম্বন্ধের কথা কবি এখানে বলেছেন। সন্ন্যাসী মৃত্যুর প্রতীক। যে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলেমিশে পরম আনন্দে আমরা দিন কাটাই তাকে মৃত্যু যখন আমাদের মধ্যে থেকে নিয়ে যায়, তখন আমরা ভেবে পাইনে অভ্যস্ত জীবনের বাইরে গিয়ে আমাদের সেই প্রিয়জনের দিন কেমন করে কাটবে। তার পর আমরা স্বপ্নে যেন দেখি নতুন পরিবেশে আমাদের সেই প্রিয়জনের দিন আমাদেরই মতো না হলেও ভালোই কেটে যাচ্ছে। আমরা ব্যস্ত হয়ে বলি, আমাদের সঙ্গ না পেয়ে তোমার দিন কেমন করে কাটছে? তার মুখে যেন শুনি, আমরা তার চারপাশে না থাকলেও তার হৃদয়মূলে আছি।

মৃত্যুও আমাদের প্রিয়জনদের থেকে আমাদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, আমাদের অন্তরের যোগ থেকেই যায়, মনে হয় এই-ই কবি বলতে চেয়েছেন। তাঁর পরলোকগত পত্নীর সঙ্গে তাঁর এমন যোগের কথা কবি কখনো কখনো বলেছেন।

৪৫ নম্বর কবিতাটি ছিল 'মরণ' বিভাগের। এটি খুব প্রসিদ্ধ। এটি লেখা হয় কবি-প্রিয়ার পরলোকগমনের কিছু পূর্বে,—১৩০৯ সালে বঙ্গদর্শনে ভাদ্রের সংখ্যায় এটি বেরিয়েছিল।

মৃত্যুকে কবি বহুদিন ধরেই দেখে আসছেন জীবনের পরিপূর্ণতার একটি রূপ হিসাবে। এই কবিতায় মৃত্যুর সেই পরিপূর্ণতার রূপ খুব জমকালো করে আঁকা হয়েছে। খ্যাপা মহাদেব যখন গৌরীকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন তখন যেমন গৌরী মর্মে মর্মে পুলকিত হয়েছিলেন, আর তাঁর মাতা শিরে করাঘাত করে কেঁদেছিলেন, আর পিতা প্রমাদ গণেছিলেন, কবির চোখে

মৃত্যু জীবনের জন্য তেমনি গম্ভীর, তেমনি মহিমময়, তেমনি পরম সার্থক এক ব্যাপার :

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ।
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

কবির হৃদয়াবেগ এতে কিছু উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—হয়তো পত্নীর আশঙ্কিত মৃত্যুর পটভূমিকায় এটি রচিত বলে।*

এর ৪৬ সংখ্যক কবিতাও ছিল 'মরণ' বিভাগের। এটি উৎসর্গের শেষ কবিতা। এতে মৃত্যুর কথা তেমন বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে নব নব জন্মে কবি যেন ভগবানের শরণ নিয়ে, তাঁর গুণগান করে, প্রেম ও সেবার পথে চলতে পারেন :

কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

ভক্ত বৈষ্ণবও মুক্তি চান নি, চেয়েছেন জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-প্রীতি। বাউল-কবিও মানব-হৃদয়-কমল সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ,
এই কমলের মাঝে আছে রস এক বিশেষ,
উড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পার না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা—মুক্তি কোথাও নাই।

---

* কেউ কেউ বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি কবির শ্রদ্ধা এতে ব্যক্ত হয়েছে—স্বামিজী লোকান্তরিত হন এই সময়ে। কিন্তু স্বামিজীর মৃত্যু তো মৃত্যুর 'চুপি চুপি কথা কওয়া' ছিল না—মৃত্যু তাঁকে গৌরবেই নিয়ে গিয়েছিল।

## সংযোজন

এর পর উৎসর্গের 'সংযোজনে'র কবিতাগুলো। এইগুলোর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থাবলীতে বেরিয়েছিল, কয়েকটি বেরিয়েছিল 'সাময়িক পত্র' ইত্যাদিতে। এগুলো প্রথমে উৎসর্গ কাব্যের অন্তর্গত ছিল না।

'সংযোজনে'র প্রথম কবিতাটি 'যাত্রা' বিভাগের। সাগর-স্নানের উদ্দেশ্যে অনেকে যাত্রা করে বেরিয়েছিল—কতজন তার সংখ্যা নেই, নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে তারা চলেছে, অন্তরে এই আশা নিয়ে যে একদিন তাদের সাগর-স্নান সমাধা হবে—এই চিত্র এতে আঁকা হয়েছে।

২ নম্বর কবিতাটি সাময়িক পত্রাদি থেকে সংগৃহীত। কবি বলতে চেয়েছেন, মনের কথা আমরা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারি না; গান গেয়ে যদি বলতে যাই তাও হয়ে ওঠে উচ্ছ্বাস; কেবল যদি সমবেদনা দিয়ে বুঝতে চাই তবেই আমরা একে অন্যের কথা বুঝতে পারি:

> কথায় কিছু না যায় বলা,
> গান সেও উন্মত্ত উতলা।
> তুমি যদি মোর সুরে
> নিজ কথা দাও পুরে
> গীতি মোর হবে না বিফলা।

৩ নম্বর কবিতাটি ছিল 'সোনার তরী' বিভাগের। মনে হয়, এতে কবির বক্তব্য এই:

> জীবন-তরীর কর্ণধার অর্থাৎ মানবজীবন-বিধাতা নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের মানব-জন্মে এনে হাজির করেছেন; সেখানে আমরা দেখছি মানুষ জীবনের বিচিত্র কাজে কেমন ছুটোছুটি করে ফিরছে, তারা আনন্দে আছে; কিন্তু এখানে থেকেও স্বর্ণভার যা সংগ্রহ করবার তা সংগ্রহ করে কর্ণধার আমাদের জীবন-তরী অন্য লোকের দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরের অবস্থার দিকে ফিরিয়েছেন; সেই পরলোকের সম্বন্ধেও আমাদের কিছু জানতে কৌতূহল হয়। কিন্তু জীবন-তরীর কর্ণধার সেখানেও তাঁর তরী বেঁধে রাখবেন না, সেখানেও তাঁর যা সংগ্রহ করবার তা সংগ্রহ করে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি কোন্ অজানা রাজপুরের দিকে চলেছেন।

বিচিত্র জন্ম ও লোক-লোকান্তরের ভিতর দিয়ে মানুষের এমন অগ্রগতির কথা কবি অন্যান্য কবিতায়ও বলেছেন।

গ্যেটের লেখায়ও এমন ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

৪ নম্বর কবিতাটিও ( এটি সনেট ) 'সাময়িক পত্রিকা' থেকে সংগৃহীত। নৈবেদ্যের "নির্জন-শয়ন মাঝে কালি রাত্রিবেলা" শীর্ষক সনেটের সঙ্গে ও নৈবেদ্যের সেই জাতীয় অন্যান্য সনেটের সঙ্গে পঠনীয়। কবি দেখছেন, নানা বিলাস-আবেশ, প্রবৃত্তির বশ্যতা, নানা ব্যর্থ কাজ, এ-সবের মধ্যে দিয়েও ভগবান কেমন করে তাঁকে তাঁর দিকে টেনে নিয়েছেন। নৈবেদ্যে কবি বলেছেন, ভগবানের হাতে কাল অন্তহীন। তাই মানুষকে এমন প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন।

৫ নম্বর কবিতাটি নৈবেদ্যের "কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে" শীর্ষক সনেটটির সঙ্গে পঠনীয়।

৬ ও ৭ নম্বর সনেটও ছিল 'নৈবেদ্য' বিভাগের। ৬ নম্বর সনেটটিতে কবি বলেছেন, শুধু ভগবৎ-বিষয়ক গানই যে ভগবানের গান তা নয়, তিনি দেখছেন সব গানই ভগবানের গান :

> স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব,
> সখাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব
> প্রিয়সনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা,
> জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,
> সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
> আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।

৭ নম্বর সনেটটি খুব লক্ষণীয়। একজন বৃদ্ধ কবিকে বলেছিলেন :

> তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা।
> কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
> কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
> ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।

তাঁকে কবি এই উত্তর দেন :

> আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
> যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
> ধ্বনিত মানব-প্রাণ, আমার বীণায়
> দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
> সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।

আমরা দেখব কবি বার বার এ-কথা বলেছেন। তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মনোভাবের অনেকটা মিল আছে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। বৈষ্ণব প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান।

বলা যেতে পারে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব চিন্তা আর একালের মানবিকতা মুখ্যত এই দুয়ের এক অপূর্ব যোগ ঘটেছে কবির চিন্তায়।

৮, ৯ ও ১০ সংখ্যক সনেট 'সাময়িক পত্রিকাদি' থেকে সংগৃহীত।

৮ নম্বর সনেটে দেখা যাচ্ছে শোকের প্রভাব থেকে কবি যে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছেন না, সেজন্য তিনি গভীর অস্বস্তিবোধ করছেন—আনন্দ যেন তাঁর জন্য প্রাণবায়ু।

৯ নম্বর সনেটটি পদ্মা সম্বন্ধে। পদ্মাকে কবি বলেছেন রাক্ষসী প্রেয়সী, সেই সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে পদ্মা—

অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,—<br>
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্ধ রজনীর<br>
বাসরঘরের মতো নিষুপ্ত নির্জন ;—

করাল মৃত্যুর অন্তরে আছে যে প্রশান্তি তার কথা কবির মনে পড়ছে।

১০ নম্বর সনেটে কবি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন : বসন্ত তো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সেই বসন্ত যে পুষ্প ও কিশলয়-ভার নিয়ে আসে, যে তপ্ত রৌদ্রের সুরা আমাদের উপহার দেয়, সেই ক্ষণস্থায়ী বসন্তের দিনে আমাদের প্রিয়ার কেশে বেশে যে শোভা-সৌন্দর্য জাগে, সে সব তো ক্ষণস্থায়ী নয় ; ওহে কবি, বসন্তের সেই সম্পদ কি অক্ষয় সংগীতে গেঁথে রাখ নাই।

কবিতা সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় উক্তি এটি। শ্রেষ্ঠ কবিতা তাই যাতে ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের অপূর্ব সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে।

১১ নম্বর সনেটে জন-সমুদ্রকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন : জন-সমুদ্র চিরকাল আন্দোলিত হচ্ছে, সেখানে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, এ-সব চিরদিন ফেনায়িত হয়ে উঠছে :

ওগো দাও দাও<br>
কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও।

কবির ধারণা হয়েছে জনসমুদ্রের . অন্তরলক্ষ্মী যেদিন অমৃতের পাত্র হাতে উঠবেন ও বরমাল্য নিয়ে ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন সেদিন মহামন্থনরূপ এই ক্রন্দন থামবে। অর্থাৎ জনগণের কাম্য হওয়া চাই আত্মসুখ নয়—যা সত্য যা সুন্দর যা মহৎ তাই।

১২ ও ১৩ নম্বর কবিতা ছিল 'স্বদেশ' বিভাগের। দুটিই সুপরিচিত।

উৎসর্গের কবিতাগুলোকে আমরা বলেছি idea-প্রধান। কিন্তু আমরা দেখলাম এর অনেক কবিতায় idea কত সমৃদ্ধ রূপ পেয়েছে। উৎসর্গ কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংগ্রহ।

কবির স্বদেশ-প্রেম যে সহজেই যুক্ত হয়েছিল তাঁর ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে, অন্য কথায়, জীবন সম্বন্ধে মহৎ ও বৃহৎ দায়িত্ববোধের সঙ্গে, এজন্য তাঁর অনেক স্বদেশ-সঙ্গীত সাময়িকতার বন্ধন কাটিয়ে শাশ্বত মূল্য লাভ করতে পেয়েছে।

## আত্মশক্তি

আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১২ সালে। আর দুটিরই সব লেখা বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল।

এই দুই গ্রন্থেই কবির মুখ্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে হিন্দুত্বের বা হিন্দু-সমাজের বা ভারতবর্ষীয় জীবনের পুনর্গঠন। কবি যে বহু দিক দিয়ে বিষয়টির কথা ভেবেছিলেন তা আমরা দেখব।

আত্মশক্তির প্রথম লেখাটি 'নেশন কী'। ফরাসী ভাবুক রেনাঁ নেশন-তত্ত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন কবির ভাষায় সংক্ষেপে তা এই :

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুটি জিনিষ এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিষ বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে—সর্ব-সাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি, পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত-ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগ-স্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমানকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা, এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প, ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল।......

মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেক-গুলো সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্ত হৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চরিত্র সৃজন করে, তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্রচিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে, ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনাঁর কথাগুলোকে কবি বলেছেন সারগর্ভ। সেই সারগর্ভ কথার আলোকে তিনি পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর দেশের সমাজ-জীবন।

'নেশন কী'র পরের লেখাটি হচ্ছে 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। প্রথমে এর নাম ছিল 'হিন্দুত্ব'। এতে কবি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষীয় সমাজের বা হিন্দু-সমাজের গঠনের মূলে কি কি শক্তি কাজ করছে।

প্রথমেই কবি লক্ষ্য করেছেন :

নানা যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই তাহাদের আর কোনো প্রভেদ চোখে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা কে জিত, সে-কথা ভুলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার—নেশনকে বিচ্ছেদবিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে। যেখানে দুপক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেখানে সকল প্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ—সেখানে একত্রে থাকিলে মিশিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভুলিবার উপায় নাই।

......হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত, মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার,—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারে নানা প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে।

এর পরে কবি মন্তব্য করেছেন :

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের

যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে—পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোখ বুজিয়া ফল ভোগ করিতেছে তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে—অখণ্ড কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ কি তেমন সজীব? এ সম্পর্কে কবির উক্তি এই:

আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

এই সংকটে কি আমাদের করণীয়? এ-সম্বন্ধে কবির বক্তব্য এই:

যে সময় হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর—ব্রাহ্মণ, সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্বল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন—তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান শিক্ষা-সাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সমুন্নত রাখিবার জন্য সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেষ্টভাবে কাজ করিত। তখনকার নিয়ম তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার কালের হিসাবে নিরর্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবৎরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া (যদি) সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম, ইহাতেই আমাদের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত

কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবসমাজের কেন্দ্রস্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রহ্মের মধ্যে মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা ইহাই হিন্দুত্ব।

আমরা পরে দেখব, কবি তাঁর এই চিন্তা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবির চিন্তায় ব্রহ্ম যে অবাঙ্‌মনসগোচরই নয়, বরং অনেকখানি মানবিক—মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রকৃতিতে যার প্রকাশ—তার পরিচয় আমরা নৈবেদ্যে পেয়েছি, পরে আরও পাবো।

এর পরের প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'—১৩১১ সালে লেখা। এটি খুব বিখ্যাত। এর ঐতিহাসিক মূল্যও সুপ্রচুর। স্বাধীনতা লাভের পরে গ্রামোদ্যোগের দিকে দেশের মনোযোগ কিছু আকৃষ্ট হয়েছে। সেই গ্রমোদ্যোগের মন্ত্র প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল কবির এই রচনাটিতে। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে :

আজকাল আমরা গ্রামসংস্কার বা পল্লীগঠনের কথা শুনি, তাহার সূত্রপাত যে এখানেই, সে কথা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে কর্মপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুমেলার আদর্শে অনুপ্রেরিত। তাঁহার শৈশবে যে আদর্শ গুণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকেরা সে যুগে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়কালে দেশের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ জমিদারিতে পর্যন্ত ইহার পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কাজ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা এই সময়ে মুদ্রিত হয়। (২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫)

স্বদেশী সমাজের সেই খসড়া রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর কিছুটা ছিল এই :

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোন প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙ্গালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন, এবং আড়ম্বরের উদ্দেশে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাংলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশী চালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজনির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশী দোকান হইতে আমাদের ব্যবহারদ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোনো কথা বলিব না। (২য় খণ্ড, ১১৭-২০)

স্বদেশী সমাজে কবি যে আত্মনির্ভরতা সাধনার কথা যথেষ্ট জোর দিয়ে বলেন, তার মূলে ছিল দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা :

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ-পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

ইংরেজ রাজত্বে দেশের লোক, বিশেষ করে দেশের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজ শাসকদের উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল—তাতেই কবির আপত্তি। কবির মতে য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি, কিন্তু হিন্দু বা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার মূলে সমাজ। "সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।"

কবির এই মূল চিন্তা সক্রিয় দেখতে পাওয়া যাবে এই যুগে তাঁর সব সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ভিতরে।

কবির কথার সমালোচনাস্বরূপ বলা যেতে পারে : সেকালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা অধিকার যথেষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু একালের সব দেশেই রাষ্ট্রের অধিকার অনেক প্রসারিত হয়েছে, আর 'রাষ্ট্রে'র তুলনায় 'সমাজে'র অধিকার সর্বত্রই অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তবে কবির মতের সমর্থনে এই বলা যায় যে, যে সময়ে তিনি আমাদের সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে বলেছিলেন ও এইভাবে বহুল পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হয়ে জাতির আত্মাকে বিদেশী প্রভাবের অবাঞ্ছিত পরিণতি থেকে রক্ষা করতে বলেছিলেন, সেদিনে তাঁর এই সব নির্দেশের সাফল্যমণ্ডিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য, দেশ সে সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেনি। একালে রাষ্ট্র যে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছে, জনগণের জন্য তার দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধানও হ্রাস পেয়ে চলেছে, কবির বিখ্যাত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে সে-বিষয়ে আমরা কবিকে পুরোপুরি সচেতন দেখব।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট লেখাটি মোটের উপর কবির একটি দুর্বল রচনা। ব্রাহ্মরা যেভাবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের পরিবর্তন চাচ্ছিলেন তাকে কবি সমর্থন করেন নি। এক্ষেত্রে কবিকে জ্ঞান করা যেতে পারে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের শিষ্য—এমন কি অনেকটা ভূদেবের মতেরও অনুবর্তী। সেজন্য কবি বিশেষভাবে ভরসা করছিলেন হিন্দু-সমাজেরই যুগোপযোগী সুবিকাশের উপরে। হিন্দু-সমাজের প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এই যুগে নিজেদের খুব বলশালী জ্ঞান করেছিলেন। তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলাইচাঁদ গোস্বামী কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন : কবি যেখানে নতুন নতুন যাত্রা কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করেছেন সেখানে নতুন কথাটার তাৎপর্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নয় কেন? আর সমুদ্রযাত্রা কবি সমর্থন করেন কি না; যদি করেন তবে হিন্দুধর্মানুগত আচার-পালনের বিধি রাখতে হবে কি না। এই সব অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে (অল্পকালেই এমন সব প্রশ্ন অদ্ভুত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে) কবি বলেন :

> পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ আমি এ-কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজ-গঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে।

কবি সনাতনীদের উপরে অনেকখানি নির্ভরশীল হয়েছিলেন। কতকটা সেই কারণে তাঁকে এখানে হেগেলীয় থিসিস্-এ্যান্‌টিথিসিস্-সিন্‌থিসিস্ চিন্তা-ধারার অনুবর্তী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একালের চিন্তাশীলেরা অনেক-খানি নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, শুধু কালের পরিবর্তন থেকে মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করতে পারে না—মানুষের জন্য সমূহ প্রয়োজন তার ইচ্ছাশক্তির ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধন। কবিও যে সে-বিষয়ে অনেক পরিমাণে সচেতন হয়েছিলেন নৈবেদ্যে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। পরে আরও পাব।

এর পরের প্রবন্ধ 'সফলতার সদুপায়'। স্বদেশী আন্দোলনের পরে ইংরেজদের প্রবল প্রতিকূলতার ফলে দেশের কর্মীদের মধ্যে যে অনেকটা দিশাহারা ভাব দেখা দিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দাঁড় করান। খুব শান্তভাবে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেন ইংরেজের ইম্পীরিয়াল ঔদ্ধত্য, ভারতে ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন, সর্বোপরি দেশের লোকদের নিজেদের চেষ্টায় দেশের সর্বক্ষেত্রের শ্রী-সম্পদ গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজনের কথা। কবির কিছু কিছু উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি:

> আমাদিগকে এ-কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থ-ভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু পরদিনেই আর নহে।......
>
> এ-কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্র সম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।
>
> ......দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে

জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।...... দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে একস্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশী সংসদ গঠিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে এক দিনেই হইবে, কথাটা পড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারিদিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না।......কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন সকল খাঁটি লোক, শক্ত লোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে এক জন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে এক দিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে।......এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আরম্ভ করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার।

......হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি ইহাকে অপরাজিত চিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা,

সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আহ্বান করা—এই মহৎ সৃষ্টিকার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এজন্য আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না।

কবির জীবনী থেকে জানা যায়, নিজের জমিদারীতে তিনি গ্রামোদ্যোগ পুরোপুরিই আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কর্মীদের উপরে সরকারী নিগ্রহ নেমে আসে ও তার ফলে তাঁর আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত থাকে। পরে শ্রীনিকেতনে নতুন রকমের গ্রামোদ্যোগ তিনি আরম্ভ করেন।

এর পরের প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি কবি এই ভাষণ দেন। সূচনায় কবি অবতারণা করেছেন, বাংলা দেশে প্রথম যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁরা কেমন করে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হয়েছিলেন—তাঁদের সমস্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধা কেমন করে আকর্ষণ করেছিল য়ুরোপীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কি য়ুরোপীয় ধর্মও। সেই উৎকট অবস্থার পরিবর্তন যে দেশে হয়েছে কবি আনন্দের সঙ্গে তা লক্ষ্য করেছেন।

ডিরোজিও-পন্থীদের ও কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের প্রতি কবি এখানে কটাক্ষ করেছেন। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের খৃষ্টধর্ম-বিমুখতা কবি পরে কাটিয়ে ওঠেন, কিন্তু ডিরোজিও-পন্থীদের প্রতি চিরদিনই তিনি কিছু পরিমাণে বিমুখ ছিলেন বলা যায়। ডিরোজিও-পন্থীরা একালে দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা নতুন করে লাভ করেছেন তাঁদের অকপট ও সবল জীবন-জিজ্ঞাসার গুণে। তাঁদের দেওয়া আঘাত যে দেশে শুধু ধ্বংসের কাজই করে নি, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, এ-সব ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিরও সহায় হয়েছিল, আজ তা স্বীকৃত হচ্ছে। কবির বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ এই :

> কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না।
>
> ······বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনা-ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার

অভ্যাস হইলে অন্ত সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

……বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নেই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ-কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দ চরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না—যেখানেই হ'ক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে, তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।

দেশের ভাষার ব্যাকরণ থেকে দেশের লোকেদের মধ্যে নতুন নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি পর্যন্ত সব ব্যাপারেই কবির সুবিকশিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সক্রিয়তা লক্ষণীয়।

এর পরের প্রবন্ধ 'য়ুনিভার্সিটি বিল'। এটি সম্বন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে :

লর্ড কর্জনের আমলে য়ুনিভার্সিটি 'সংস্কার' করিবার জন্ম যে য়ুনিভার্সিটি বিল উপস্থাপিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার প্রসার সংকুচিত ও ব্যয়সাধ্য করা, দেশের প্রতিবাদসত্ত্বেও তাহা পাশ হইবার পর 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

এর সাময়িক মূল্য যে যথেষ্ট ছিল তা না বললেও চলে। এর এই সব কথা শিক্ষা সম্পর্কে চিরদিনই স্মরণীয় :

বিদ্যা জিনিষটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই।......শিক্ষক সেখানে বিদ্যাদানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুত—পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রদ্ধার কণ্টক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিষ মনে গিয়া পৌঁছায়।......হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, যেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়। ......ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোনো জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না—পরের ঘরে জলতোলা এবং কাঠ-কাটার কাজে লাগিতে পারে কিন্তু দ্বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

এমন উচ্চাঙ্গের আত্মসম্মানবোধ আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভূষণ ছিল।

এই প্রবন্ধের এই কথাটি কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে দুর্বল :

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশ বৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিস, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মতো সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুল-পাঠ আমরা পেডলার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—তাহা ইস্কুলে পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধনা।

আমরা পরে 'যাত্রার পূর্বপত্র' লেখাটিতে দেখবো কবি য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উচ্চ মর্যাদা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হয়েছেন।

পরিশিষ্টের শেষ তিনটি লেখার মধ্যে 'দেশীয় রাজ্য' খুব বিশিষ্ট। ১৩১২ সালের আষাঢ়ে আগরতলায় যে ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলন হয় এটি ছিল তাতে সভাপতিরূপে কবির ভাষণ। ত্রিপুরারাজ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ অনেক দিনের। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ত্রিপুরার রাজ-পরিবার থেকে ও ত্রিপুরার সর্বসাধারণের কাছ থেকে কবি যে লাভ করেছিলেন সম্প্রতি-প্রকাশিত

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিসাধনের কথা কবি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ভেবেছিলেন।

এই 'দেশীয় রাজ্য' লেখাটিতেও তাঁর সেই আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এইকালে কবির প্রধান চিন্তা দাঁড়িয়েছিল—ভারতের লোক য়ুরোপের অনুকরণ ত্যাগ করে স্বপ্রতিষ্ঠ হোক। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সেই স্বপ্রতিষ্ঠার কথা কবি ভেবেছিলেন। য়ুরোপীয় জীবনাদর্শ যে মূল্যহীন সে-কথা কবি ভাবেন নি, তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল—ভারতবাসী তাদের স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, কেন না, পরধর্মো ভয়াবহঃ।

এইকালে কবি স্বধর্মসাধনের কথা যে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল। তবু স্বীকার করতে হবে, কবির সেই জোর দেওয়া কিছু মাত্রাতিরিক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জীবনাদর্শ, জীপনযাপন-পদ্ধতি, এ-সব কিছু বিভিন্ন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই বিভিন্নতা অনতিক্রম্য যে নয় ক্রমেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী কালে কবিও যে সে-বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন তা আমরা দেখব তাঁর বহু লেখায়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশের দাবি আর বিশ্বের দাবি এই দুয়েরই সম্বন্ধে প্রখর চেতনা আমাদের মধ্যে চাই। কবির শেষ বয়সের চিন্তায় রয়েছে তারই পরিচয়।

## ভারতবর্ষ

'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রবন্ধ—'নববর্ষ'—১৩০৯ সালে লেখা, অর্থাৎ নৈবেদ্য প্রকাশের অল্পদিন পরেই। সেইকালে য়ুরোপের শক্তিমদমত্ততায় কবির যে গভীর অপ্রত্যয় জন্মেছিল, আর সবলে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ, এই প্রবন্ধটিতে তারই সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হচ্ছে। গভীর প্রত্যয় এর মূলে বলে এই লেখাটি খুব শক্তিশালী।

তবে এর বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে কবি যাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শ বলেছেন এই লেখাটিতে তার দিকে তিনি কিছু বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছেন। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মূল পার্থক্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিসাধনের কথা কবি যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ভেবেছিলেন।

এই 'দেশীয় রাজ্য' লেখাটিতেও তাঁর সেই আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এইকালে কবির প্রধান চিন্তা দাঁড়িয়েছিল—ভারতের লোক য়ুরোপের অনুকরণ ত্যাগ করে স্বপ্রতিষ্ঠ হোক। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সেই স্বপ্রতিষ্ঠার কথা কবি ভেবেছিলেন। য়ুরোপীয় জীবনাদর্শ যে মূল্যহীন সে-কথা কবি ভাবেন নি, তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল—ভারতবাসী তাদের স্বধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, কেন না, পরধর্মো ভয়াবহঃ।

এইকালে কবি স্বধর্ম্মসাধনের কথা যে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল। তবু স্বীকার করতে হবে, কবির সেই জোর দেওয়া কিছু মাত্রাতিরিক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জীবনাদর্শ, জীপনযাপন-পদ্ধতি, এ-সব কিছু বিভিন্ন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই বিভিন্নতা অনতিক্রম্য যে নয় ক্রমেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী কালে কবিও যে সে-বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন তা আমরা দেখব তাঁর বহু লেখায়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশের দাবি আর বিশ্বের দাবি এই দুয়েরই সম্বন্ধে প্রখর চেতনা আমাদের মধ্যে চাই। কবির শেষ বয়সের চিন্তায় রয়েছে তারই পরিচয়।

## ভারতবর্ষ

'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রবন্ধ—'নববর্ষ'—১৩০৯ সালে লেখা, অর্থাৎ নৈবেদ্য প্রকাশের অল্পদিন পরেই। সেইকালে য়ুরোপের শক্তিমদমত্ততায় কবির যে গভীর অপ্রত্যয় জন্মেছিল, আর সবলে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ, এই প্রবন্ধটিতে তারই সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হচ্ছে। গভীর প্রত্যয় এর মূলে বলে এই লেখাটি খুব শক্তিশালী।

তবে এর বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে কবি যাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শ বলেছেন এই লেখাটিতে তার দিকে তিনি কিছু বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছেন। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মূল পার্থক্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া

ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষমাত্র। কিন্তু কবির এই কথা আংশিকভাবেই সত্য, পূর্ণভাবে নয়। 'হওয়া' জীবনে খুব বড়ো ব্যাপার নিঃসন্দেহ, কিন্তু 'হওয়া'র সঙ্গে 'করা'র বিরোধ ঘটলে সেটি হয় বিপজ্জনক। আমাদের দেশে তেমন বিরোধ যে অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে—বড ভাব যে আমাদের জাতীয় জীবনে যোগ্য রূপ পায় নি—কবি এই লেখাটিতে সেই বিষয়ে কিছু অমনোযোগী হয়েছেন।

য়ুরোপের ফ্রীডম্-এর আদর্শ আর ভারতের মুক্তির আদর্শ এই দুইয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের আঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে 'ফ্রীডম্' বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু ; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর, তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় ফ্রীডম কোনোকালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল।

কবি একালের 'ফ্রীডমে'র যে দানবীয় রূপ দেখেছেন তা অতিরঞ্জন নয়। কিন্তু 'ফ্রীডম' কি শুধু একালেই দানবীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে? প্রাচীনকালে আর্য গ্রীক রোমক প্রভৃতি জাতির 'ফ্রীডম'ও কি বহুজনের দাসত্ব ও অবমাননার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না? বলা যায় বহুজনের অসুবিধা আর মুষ্টিমেয়ের সুবিধা এরই উপরে একাল পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তৃত হয়ে এসেছে। এ ব্যবস্থা ভালো নয় এ চেতনা একালে মানুষের মধ্যে প্রবলভাবেই জেগেছে। তাই আশা করা যায় ভবিষ্যতে মানবসাধারণের জীবন উন্নত পর্যায়ের হবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা-বর্জিত যে ব্রহ্মনিষ্ঠা সেটি প্রকৃতই বহুমূল্য নয়। মুসলমান যুগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ-

শাসনের কালে ভারতবর্ষে যে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল তা মূল্যবান নিশ্চয়ই, কিন্তু তা যে আশানুরূপ সুফলপ্রসূ হয় নি, বরং অনেকক্ষেত্রে তা ভাব-বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়েছে, তাও স্বীকার করতে হবে।

বোয়ার যুদ্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতার যে ঘোর স্বার্থপর রূপ প্রকট হয়েছিল, আর তার পরেও ইংরেজ প্রভৃতি জাতি তাদের অধীন জাতিদের প্রতি যেরূপ নির্মমতা দেখাচ্ছিল তার অবাঞ্ছিতত্ব সম্বন্ধে কবির সংশয়মাত্র ছিল না। মনে হয় কবির সেই বিতৃষ্ণা তাঁকে এই যুগে কিছু একদেশদর্শী করেছিল।

নৈবেদ্যে কবির কথাগুলোর কোনো ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু তাঁর এইকালের প্রবন্ধগুলোয় পড়ে; তার কারণ, কাব্য উপলব্ধিনির্ভর আর গদ্যরচনা যুক্তিনির্ভর—কোনোখানে যুক্তি দুর্বল হলেই গদ্যরচনা দুর্বল হয়।

নববর্ষের পরের প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। 'নববর্ষে' কবির যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'ও তাঁর সেই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অথবা বলা যায়, সমস্ত ভারতবর্ষ বইখানিরই এই ভাব। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবির উক্তি এই:

> য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না।

কবির তিরোধানের পরে ভারতবর্ষে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটেছে, সেটি ভারত ব্যবচ্ছেদ। কবির সময় এর সম্ভাবনার কথা ভাবা হয় নি। তাই কবি ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে যতখানি নিঃসন্দেহ ছিলেন একালে সে সম্পর্কে দেশের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট বদলে যেতে বাধ্য। যে ঐক্যের ছবি কবি ভারতীয় জীবনে দেখেছিলেন তা প্রকৃতই ভারতবর্ষের জীবনে ছিল না। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় ঐক্য দেশের জীবনে চাই। এইটি একালের ভারতীয় চিন্তাশীলদের ও কর্মীদের সাধনার বিষয় হয়েছে। কাজেই কবির কথাগুলোকে গ্রহণ করতে হবে, ভারতবর্ষ যা প্রকৃতই ছিল অথবা হয়েছে তার যথাযথ বিবরণরূপে নয়, ভারতবর্ষকে যা হতে হবে তারই বিবৃতিরূপে। কবিকে বলা হয় সত্য-দ্রষ্টা—তার বিশেষ অর্থ এই যে, যে-সত্যকে বাদ দিয়ে আমরা জীবনে যোগ্য-ভাবে চলতে পারি না কবি তার দ্রষ্টা। এই প্রবন্ধটির শেষে দেশের নতুন সার্থক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

> আমাদের বৃহৎ শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে এমন দুই-চারিটি লোক নিশ্চয়ই উঠিবেন, যাঁহারা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিক ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা জীবনযাত্রার উপকরণ সংক্ষিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জন দিয়া, দেশের স্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্‌স্‌পেক্টরের গর্জন ও য়ুনিভার্সিটির তর্জন-বর্জিত সেই সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে, মর্যাদা লাভ করিবে। ইংরেজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতরো জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় রহিয়াছে।

আমাদের দেশ এমন টোল স্থাপনার দিকে যায় নি, যাবে এমন ভরসাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কবির এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কী প্রবল প্রত্যয় নিয়ে তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এর পরের প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ'। এর ভূমিকায় কবি বলেন :

> সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ঘটনাটা এতই লজ্জাকর যে মাসিক পত্রে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। মার খাইয়া মারা উচিত বা ক্রন্দন করা উচিত বা নালিশ করা উচিত, সে-সমস্ত আলোচনা খবরের কাগজে হইয়া গেছে—সে-সকল কথাও আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া যে-সকল গুরুতর চিন্তার বিষয় আমাদের মনে উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত।

বাস্তবিক সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে বহু গুরুতর বিষয়ের অবতারণা কবি এই প্রবন্ধে করেছেন। তাঁর মূল চিন্তা অবশ্য এইটি :

প্রাত্যহিক জীবন-যাপন ও জীবনের চরম লক্ষ্য এ-সব বিষয়ে আমাদের দেশের যা আদর্শ তা পাশ্চাত্ত্য জগতের আদর্শ থেকে পৃথক্‌, সেই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমাদের লক্ষ্যের দিকেই আমাদের চলা উচিত, লোভের বা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে যদি পাশ্চাত্ত্য আদর্শের দিকে আমরা ঝুঁকি তবে আমাদের দশা হবে ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ-এর যা দশা হয় তাই।

কবির প্রবল ধারণা হয়েছিল : ভারতবর্ষের যে সুপ্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, মানুষের জন্য তা উৎকৃষ্ট আদর্শ, কেন না তাতে কর্ম ও কর্ম-বিরতির

এক সুসামঞ্জস্য ঘটেছে, সেই প্রাচীন আদর্শই ভারতবর্ষের জন্য চিরকালের সার্থক আদর্শ—সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ভারত যে য়ুরোপের আদর্শ সার্থক-ভাবে জীবনে অবলম্বন করতে পারবে তা সম্ভবপর নয়।

কবির এই সব উক্তি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ যে মানুষের জন্য একটি মহৎ আদর্শ তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে একালের ভারতবর্ষ সেই পথ অবলম্বন করছে না। কবিও পরে, যেমন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'রাশিয়ার চিঠি', 'কালান্তর' এই সব রচনায় সেই প্রাচীন আদর্শের উপরে জোর তত দেন নি যত দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সর্বসাধারণকে অধিকার দান, জনগণের কর্তৃত্ববোধ, এ-সবের উপরে। কবি পঞ্চভূতে বলেছিলেন:

> জড়ের থেকে পালিয়ে তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধনের চেষ্টা না করে জড়কে ক্রীতদাস করতে পারলে মানুষের একটা বড় রকমের লাভ হয়। স্থায়িরূপে জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হতে হলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।

বোঝা যাচ্ছে তাঁর বঙ্গদর্শনের যুগের পরের চিন্তা সেই পথেই গিয়েছিল। এর পরের প্রবন্ধ 'চীনেম্যানের চিঠি'। এটি সম্বন্ধে প্রভাতবাবু লিখেছেন:

> বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে Letters of John Chinaman নামে একখানি বই পাঠাইয়া দেন। বইখানির গ্রন্থকার ইংরেজ লেখক Lowes Dickinson. গ্রন্থে লেখকের নাম ছিল না এবং বইখানি এমনভাবে লেখা যে লোক সন্দেহ করিতে পারে নাই ইহার লেখক ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথ এই বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করেন। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য বোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু আনন্দ লাভ করিলেন। চীনের সঙ্গে ভারতের চিত্তের মিল দেখিয়া একটা যেন বল পাইয়া তিনি লিখিলেন, "ভারতবর্ষের সভ্যতা এশিয়ার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে ইহাতেও আমাদের বল,......এশিয়ার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে, যাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরন্তন হইবার অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।

কিন্তু 'চীনেম্যানে'র সব উক্তিতে কবি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। চীনেম্যানের আদর্শের অপূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> এই পত্রগুলি পড়িলে প্রাচ্য-সমাজের সাধারণ ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের

পরস্পরের যে ঐক্য তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, এই যে শান্তি ও শৃঙ্খলা, সন্তোষ এবং সংযমের উপরে সমস্ত সমাজকে গড়িয়া তোলা, তাহার চরম সার্থকতার কথা এই চিঠিগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। চীনদেশ সুখী, সন্তুষ্ট, কর্মনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সার্থকতা পায় নাই। অসুখে অসন্তোষে মানুষকে ব্যর্থ করিতে পারে, কিন্তু সুখে সন্তোষে মানুষকে ক্ষুদ্র করে। চীন বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃক্‌পাত করি নাই; নিজের এলাকার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বদ্ধ করিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু এ-কথা যথেষ্ট নহে। এই সংকীর্ণতাটুকুর মধ্যে সরল উৎকর্ষ লাভ করাকেই চরম মনে করিলে হতাশ হইতে হয়। জলধারা যদি সমুদ্রকে চায়, তবে নিজেকে দুই তটের মধ্যে সংহত সংযত করিয়া তাহাকে চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে এক জায়গায় আনিয়া বদ্ধ করিলে চলে না। মুক্তির জন্যই তাহাকে সংযত হইতে হয়, কিন্তু নিজেকে বন্দী করিলে তাহার চরম উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—তাহা হইলে নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুদ্রের অন্তহীন তৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে কবি বলেন ঃ

সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল, তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের ন্যায় দৃশ্যমান—কিন্তু চাকা অত্যন্ত ঘুরিলে যেমন তাহাকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মার অত্যন্ত বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে চতুর্দিকে নানারূপ অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই আমাদের সমাজের কাজ ছিল।

······দুর্গতির দিনে ইহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী স্রোতোধারা 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে
রয়েছে ডোর।

সেইজন্য আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকতার দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতেছে না, আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই

সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য যখন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্য যখন সচেষ্টভাবে উদ্যত হইব, তখনই মুহূর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মুক্ত হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষিরা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন।

বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ কবিকে আকর্ষণ করেছিল শুধু তার প্রাচীনতা ও ভারতীয়ত্বের গুণে নয়, তার ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনাদর্শের গুণে—সেই আদর্শকে কবি জ্ঞান করেছিলেন মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধের আলোচনাকালে এই প্রসঙ্গ আসবে।

এর পরের প্রবন্ধ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা'। সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে ফরাসী মনীষী গিজো-র মতের আলোচনা কবি এতে করেছেন, আর য়ুরোপীয় ও ভারতীয় এই দুই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। কবির মতের সারাংশ এই :

আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।

কবির এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি আমরা পূর্বেও উদ্ধৃত করেছি। য়ুরোপীয় সভ্যতার যে বড়ো বৈশিষ্ট্য কবির চোখে পড়েছে সেটি হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধ। তার সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থবোধ দিন দিন কি পরিণতি লাভ করছে সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মত-বিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।

কবির মতে প্রত্যেক জাতির যেমন আছে একটি জাতিধর্ম, তেমনি আছে জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সেটি মানব-সাধারণের ধর্ম—

আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন

ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ধর্ম হত হলে হনন করে, ধর্ম রক্ষিত হলে রক্ষা করে।

......সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্বচর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন 'জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না।......আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা নিত্যধর্মকে নানাস্থানে খর্ব করিয়াছিল বলিয়াই তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিকৃতির পথেই গেল। য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ য়ুরোপীয় সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-বোধ সম্বন্ধে কবির আশঙ্কাকে সমূলক প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের চাইতেও কবি যেন মহত্তর জ্ঞান করেছেন তার মুক্তি-সাধনা। কবির উক্তি এই :

য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা-মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি। আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্যের আদর্শ এই একটি মন্ত্রেই রহিয়াছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

এই আদর্শ যথার্থভাবে রক্ষা করা ন্যাশন্যাল কর্তব্য অপেক্ষা দুরূহ এবং মহত্তর। এক্ষণে এই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা য়ুরোপকে ঈর্ষা করিতেছি। ইহাকে যদি ঘরে ঘরে সঞ্চারিত করিতে পারি, তবে মউজর বন্দুক ও দমদম বুলেটের সাহায্যে বড়ো হইতে হইবে না, তবে আমরা যথার্থ স্বাধীন হইব, স্বতন্ত্র হইব, আমাদের বিজেতাদের অপেক্ষা ন্যূন হইব না।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ আমরা খানিকটা উপলব্ধি করতে পারি, কিন্তু একালে তা পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়া আমাদের পক্ষে যেন অসম্ভব। স্বাধীনতা-সাধন আর মুক্তি-সাধন এই দুয়ের ভিতরে যে কোনো বিরোধ আছে তা আমরা ভাবতে পারি না। স্বাধীনতা বাদ দিয়ে যে মুক্তিসাধন সম্ভবপর সেটিও আমাদের সন্দেহের বিষয়। পরবর্তী কালে দেখা যায় কবি স্বাধীনতা-সাধনের উপরে যথেষ্ট জোর দিয়েছেন—তাঁর পন্থা অবশ্য কোনোদিন সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লবী ছিল না।

একালে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, যে-সব স্বাধীন দেশ গণতন্ত্রের অনুবর্তী নয়, সে-সব দেশে ব্যক্তির স্বাধীনতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তাই মুক্তির কথা তারা যেন ভাবতে পারে না। তবে এও সত্য যে, ব্যক্তির পর্যাপ্ত স্বাধীনতার জন্য লড়াই সব দেশেই চলেছে—তা বন্ধ হয়ে যায় নি। রাশিয়ায় পাস্তেরনাকের অভ্যুদয় ও উদার মানবিকতার দিকে রাশিয়ার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি তার এক প্রমাণ। একালের মহাপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকে হয় বশে আনতে হবে, না হয় তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে,—মনে হয় এই একালের জীবনের এক অবশ্যপালনীয় শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর পরের 'বারোয়ারী-মঙ্গল' লেখাটিতেও কবি য়ুরোপের আদর্শ ও ভারতের আদর্শ এই দুইয়ের ভিতরকার পার্থক্যের কথা বলেছেন, আর উল্লেখ করেছেন কেমন করে অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা কালে ভারতীয় আদর্শের সমূহ ক্ষতি-সাধন করেছে। এ-সম্বন্ধে কবির একটি স্মরণীয় উক্তি এই :

> দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ। এইজন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন সকল উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ-কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্‌গতির লোভ দ্বারা মঙ্গল কাজ করাইবার চেষ্টা করিলে কেবল কাজই করানো হয়, মঙ্গল করানো হয় না। কারণ মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু কবি ভারতবাসীকে তাদের প্রাচীন মহৎ আদর্শ সম্বন্ধেই সচেতন হতে বলেছেন, এবং এই আশা পোষণ করেছেন যে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শ শেষ পর্যন্ত ভারতে জয়যুক্ত হবে। কবির বক্তব্য এই :

> ইহা নিশ্চয় সত্য যে, আমাদের নূতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্ম্যকে আমাদের চক্ষে নূতন করিয়া সজীব করিয়া দেখাইবে, আমাদের ক্ষণিক বিচ্ছেদের পরেই চিরন্তন আত্মীয়তাকে নবীনতর নিবিড়তার সহিত সমস্ত হৃদয় দিয়া সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিব। চিরসহিষ্ণু ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে তাহার সন্তানদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে, গৃহে আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে, বাহিরে আমাদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না এবং ভিক্ষার অন্নে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।

কিন্তু একালে ভারত তার অতীত আদর্শের দিকে ফিরছে কি? কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো ফিরছে, কিন্তু আসলে য়ুরোপের আদর্শের প্রভাব দিন দিন আমাদের মধ্যে যে প্রবল হচ্ছে তা স্বীকার করতে হবে। যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক প্রসারের ফলে বিশ্বজোড়া একাকারত্ব অনেকক্ষেত্রেই হয়তো ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তবে আমরা যদি সজাগভাবে চলি, গড্ডালিকা-প্রবাহে ভেসে না যাই, তবে সেই একাকারত্বে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হব না আশা করা যায়; কেন না, একালের সভ্যতার যে খুব বড কথা মানুষের ব্যক্তিত্বের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি, তার সঙ্গে প্রাচীন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শের সত্যকার বিরোধ নেই, বরং মিল আছে। তবে য়ুরোপের অনুকরণ অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে অন্ধভাবে করছি এও মিথ্যা নয়। এই সব ক্ষেত্রে কবির সতর্কবাণী নতুন করে স্মরণ করবার আছে।

এর পরের প্রবন্ধ 'অত্যুক্তি'। লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদবী-সম্মানবিতরণী সভায় 'অত্যুক্তি' ( exaggeration or extravagance ) প্রাচ্য-দেশের বিশেষ প্রবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন, এই অত্যুক্তি প্রবন্ধে কবি তার উত্তর দেন। উত্তরকালে কবি এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বলেন :

> ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম।......আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিষটা প্রাচ্য,—পাশ্চাত্ত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে? সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ

স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে-সম্বন্ধ সে হল বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে-সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ পেতেন—সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্ত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারা-ওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয়বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্য হৃদয় অভিভূত হতে পারে এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান।

উদ্ধত হৃদয়লেশহীন ইম্পীরিয়ালিজমকে কবি সবলে আঘাত করেছিলেন এতে—অবশ্য বিদ্বেষবর্জিত হয়ে আর আত্মসম্মানের তাগিদে।

এর পরের প্রবন্ধ 'মন্দির'। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলো দেখে কবি এটি লেখেন। মন্দিরের গায়ে যে-সব ছবি খোদাই করা আছে সেগুলো সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়, দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোটোবড়ো ভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমনভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে অনেক জিনিস চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয় সমস্তই আছে।

মন্দির-গাত্রে এমন সব ছবি আঁকবার তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছেন :

> দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব সচেতন

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, এ-কথা ভুলিয়াছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয় সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে স্বর্ণমণ্ডিত এই নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে, সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

কবির এই আবেদন আজো আবেদনই রয়ে গেছে। শুধু বিজয়া নয়, দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বড় উৎসব জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হওয়া উচিত।

বঙ্গদর্শনের যুগের প্রবন্ধগুলোতে খুব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আমরা এই দেখলাম যে, এই যুগে ভারতীয় জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি কিছু বেশি সচেতন হয়েছেন—তাঁর প্রত্যয়ের নিবিড়তা তাঁর বাণীকে বেশ শক্তিশালী করেছে। কিন্তু পরে আমরা দেখব, কবির সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বদল হয়েছে।

## চারিত্রপূজা

'চারিত্রপূজা' প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। এর 'বিদ্যাসাগর' সম্বন্ধে দুইটি লেখা যথাক্রমে ১৩০২ ও ১৩০৫ সালে লেখা। 'রামমোহন রায়' এরও বহু পূর্বে লেখা—১২৯১ সালে। আর 'মহর্ষি' সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখা হয় ১৩১১ সালে আর তৃতীয়টি লেখা হয় ১৩১৩ সালে। কিন্তু এই লেখাগুলির বিশেষ যোগ 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র লেখাগুলিরই সঙ্গে, কেন না এই লেখাগুলিতেও কবির বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়েছে জাতীয় চেতনার সার্থকতা। কবি অবশ্য অন্ধ জাতীয়তাবাদী কোনো দিনই ছিলেন না। কিন্তু এই যুগে

বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনোকালে নূতন নহে, কোনোকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন করা যেতে পারে: প্রকৃতিতে ভগবানের আনন্দরূপ সহজ, কিন্তু মানুষের প্রাকৃত জীবনে তেমন সহজ কি?

তা ছাড়া বৌদ্ধধর্মে যখন তান্ত্রিক প্রভাব প্রবল হয়েছিল সেইদিনে মন্দিরগুলো নির্মিত, এই কেউ কেউ বলেছেন। হতে পারে সেই তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব এই ছবিগুলোতে প্রকট হয়েছে। সেই বিচারে এই ছবিগুলো মানুষের দৈনন্দিন-জীবনের সহজ আলেখ্য তেমন নয় যেমন বিশেষ তত্ত্বের (অনেক ক্ষেত্রে 'মহাসুখ' তত্ত্বের) প্রকাশক।*

এর পরের প্রবন্ধ 'ধম্মপদং'। এটি চারুচন্দ্র বসু-সম্পাদিত উক্ত নামের পালি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কবির আলোচনা। বইটি সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বক্তব্য এই:

যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। য়ুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ-কথা আমাদিগকে একেবার ভুলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিন অনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দারুণতম লজ্জার কারণ।...এই বৌদ্ধশাস্ত্রের পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হইয়া আছে, এ-কথা মনে করিয়াও কি দেশের জনকয়েক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত হইবে না?

ভারতবর্ষের শেষ প্রবন্ধ 'বিজয়া-সম্মিলন'। এতে কবি দেশের কাছে এই পরম-আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদন করেছিলেন:

---

* ছবিগুলোর মুখের প্রশান্ত ভাব খুব লক্ষণীয়।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অখণ্ড ধন তাহাকে আমরা ঘরে ঘরে খণ্ডিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম; বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, এ-কথা ভুলিয়া-ছিলাম যে, যে-উৎসব আমাদের সমগ্র দেশের উৎসব সেই উৎসবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয় সেই উৎসবের দিনে শরতের অম্লান আলোকে স্বর্ণমণ্ডিত এই নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎসবের দিনে শিশিরধৌত নবধান্যশ্যামলা এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ, বাঙালী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে-কেহ একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বৎসরে বৎসরে আসিয়া বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া গেছে, সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া যায় নাই।

কবির এই আবেদন আজো আবেদনই রয়ে গেছে। শুধু বিজয়া নয়, দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বড় উৎসব জাতীয় উৎসবরূপে পালিত হওয়া উচিত।

বঙ্গদর্শনের যুগের প্রবন্ধগুলোতে খুব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আমরা এই দেখলাম যে, এই যুগে ভারতীয় জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি কিছু বেশি সচেতন হয়েছেন—তাঁর প্রত্যয়ের নিবিড়তা তাঁর বাণীকে বেশ শক্তিশালী করেছে। কিন্তু পরে আমরা দেখব, কবির সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বদল হয়েছে।

## চারিত্রপূজা

'চারিত্রপূজা' প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। এর 'বিদ্যাসাগর' সম্বন্ধে দুইটি লেখা যথাক্রমে ১৩০২ ও ১৩০৫ সালে লেখা। 'রামমোহন রায়' এরও বহু পূর্বে লেখা—১২৯১ সালে। আর 'মহর্ষি' সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখা হয় ১৩১১ সালে আর তৃতীয়টি লেখা হয় ১৩১৩ সালে। কিন্তু এই লেখাগুলির বিশেষ যোগ 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র লেখাগুলিরই সঙ্গে, কেন না এই লেখাগুলিতেও কবির বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়েছে জাতীয় চেতনার সার্থকতা। কবি অবশ্য অন্ধ জাতীয়তাবাদী কোনো দিনই ছিলেন না। কিন্তু এই যুগে

জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর মনোযোগ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, যেমন পরবর্তী কালে বিশেষ করে 'পথের সঞ্চয়ে'র লেখাগুলোর কাল থেকে তাঁর চিন্তার বিষয় হয় বিশ্বের সঙ্গে যোগ।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লেখা-দুটিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মাহাত্ম্য কবির অনুরাগ-সমৃদ্ধ বর্ণন-কৌশলের গুণে অতি হৃদয়গ্রাহী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; কবির এই দুইটি লেখা অসাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এই লেখা দুটিতে কবি একই সঙ্গে তীব্র আঘাত হেনে চলেছেন সাধারণ বাঙালী চরিত্রের নানা ধরনের দুর্বলতার প্রতি, আর পূজা নিবেদন করে চলেছেন বিদ্যাসাগরের লোকোত্তর মনুষ্যত্বের প্রতি। বিদ্যাসাগরের পিতামহের সাহস, অলোভ ও আত্মসম্মানবোধ আর বিদ্যাসাগরের জননীর অতুলনীয় স্বাভাবিক শুভবুদ্ধি ও করুণাও কবির গভীর অনুরাগ আকর্ষণ করেছে।

এর প্রথম লেখাটির একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

......বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ-দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই; তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না, আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা-লাভের চেষ্টা করি না,......এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।

'রামমোহন রায়' লেখাটি কবির চব্বিশ বৎসর বয়সে লেখা। কিন্তু সে তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী। তবে জাতীয়তার উপরে কবি এতে কিছু বেশি জোর দিয়েছেন—ফলে রামমোহনের বড় বৈশিষ্ট্য যে বিশ্ব-চেতনা সেটি কিছু আচ্ছন্ন হয়েছে। এইকালে কবি আদি-ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারী ছিলেন। এই লেখাটি সম্বন্ধে 'বাংলার জাগরণে' আমরা কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'মহর্ষি' সম্বন্ধে লেখাগুলোতে কবি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন মহর্ষির জীবনব্যাপী প্রগাঢ় ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রতি আর ভারতবর্ষের বিশেষ সাধনায় তাঁর আস্থার প্রতি। এ-সম্বন্ধে কবির বক্তব্যের একটি অংশ এই :

......প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, তখনই সে মনুষ্যত্ব লাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দু বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ এবং খৃষ্টান বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ ; তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠ ধন তাহাও সার্বভৌমিক, তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না।

কিন্তু এক জাতির যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাতে অন্যান্য জাতির সত্যকার প্রয়োজন থাকতে পারে। পরে এই কথা কবি বলেছেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে'।

মহর্ষি সম্বন্ধে তৃতীয় লেখাটিতে ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন :

......ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসা নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামি বলিয়া জানে। সেই জন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি লাগিয়া যায়। তখন যে ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আলগা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে জাল কাটানো শক্ত।

ব্রাহ্মসাধনা ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কবির বিশেষ চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব তাঁর শান্তিনিকেতনের 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধে ও 'পরিচয়ে'র 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে।

## স্বদেশ

'স্বদেশ' বর্তমানে তিনটি প্রবন্ধের সমষ্টি—স্থান পেয়েছে রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে। এর অন্যান্য প্রবন্ধ এখন আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

'স্বদেশ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৫ সালে, গদ্য গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ ভাগ রূপে।

এর তিনটি প্রবন্ধ হচ্ছে 'নূতন ও পুরাতন', 'সমাজভেদ' আর 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত'। নূতন ও পুরাতন প্রবন্ধটি য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ। 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' বেরিয়েছিল বঙ্গদর্শনে। নূতন ও পুরাতন লেখাটি মূলত শ্লেষাত্মক—পুরাতন ভারতবর্ষের স্বস্তিপ্রিয়তার দিকে কবি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। স্বস্তি নয়, প্রাণময়তা কবির প্রিয়। ভারতীয় জীবনও একদিন কত প্রাণময় ছিল সে-কথা কবি বলেছেন মহাভারতের উল্লেখ করে। মহাভারত সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয়:

> এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল।.........সে-সমাজ কোনো এক-জন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে-সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্যদিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য-চরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে-সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে-সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয় মন্দয় আলোকে অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল, মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন বূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।

যাকে সহজ সতেজ মানবিক পরিণতি বলা যায়, দেখা যাচ্ছে, কবি এখানে তারই মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন—কোনো 'আদর্শে'র কথা তেমন ভাবছেন না।

সমাজভেদ লেখাটিতে কবির মুখ্য বক্তব্য এই :

> ......সভ্যতার ভিন্নতা আছে,—সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে, তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায়-অবিচার-নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে।.........যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও ধিক্কার দেয়, তাহা হিঁদুয়ানি, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

আমরা ছিন্নপত্রাবলীতে দেখেছি, একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল আমাদের দেশের লোকদের সম্বন্ধে যে এই মর্মের উক্তি করেছিলেন যে এ দেশের লোকে প্রাণের মাহাত্ম্য ( Sanctity of life ) বোঝে না, এজন্য তাদের হাতে জুরির বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়, এতে কবি মর্মাহত হয়েছিলেন। 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' লেখাটিতে কবি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, শিক্ষিত ও পদস্থ য়ুরোপীয়েরা এশিয়া ও আফ্রিকার সাধারণ লোকদের উপরে কী অমানুষিক অত্যাচার করেছে। উপসংহারে কবি বলেছেন :

> আমাদের দেশ বলে, যুদ্ধেও ধর্মরক্ষা করিতে হইবে—নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্মবিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, য়ুরোপে তাহা হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্মকে আমরা অন্তরের ধন করিতে চাহিয়াছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্বল হইয়া থাকি, সেইজন্যই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরবলাভ করিয়াছি, তাহা কখনোই ব্যর্থ হইবে না—একদিন তাহারও দিন আসিবে।

কবির আশা অবশ্য আজও ফলবতী হয়নি। অধিকন্তু গত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় দেশের দুই প্রধান দলই অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের অতি ঘৃণিত পরিচয় দিয়েছিল।

## রাজা প্রজা

'রাজা প্রজা' ও 'সমূহ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। 'রাজা প্রজা'র প্রথম চারটি প্রবন্ধ সাধনায় বেরিয়েছিল ১৩০০ ও ১৩০১ সালের কয়েকটি সংখ্যায়। অবশিষ্টগুলোর বেশির ভাগ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের যুগে। এই দুই গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে যে-সব প্রবন্ধ সেগুলোর প্রায় অর্ধেক সাধনায় ও ভারতীতে বেরিয়েছিল; অবশিষ্টগুলো বেরোয় বঙ্গদর্শনের যুগে বিভিন্ন পত্রিকায়। এই সবগুলো প্রবন্ধই আমরা কবির বঙ্গদর্শনের যুগের অন্তর্গত করে দেখছি।

'রাজা প্রজা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'—প্রথম পঠিত হয়েছিল চৈতন্য লাইব্রেরীতে আহূত একটি সভায়, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি যে লেখাটির খুব প্রশংসা করেছিলেন কবি তার উল্লেখ করেছেন।

প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ আর সযত্নে লিখিত। মাঝে মাঝে অতি উপভোগ্য উপমা এতে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইংরেজ ও বাঙালী দুইয়েরই চরিত্র-চিত্র কৌতুকাবহ হয়েছে—সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে করুণও হয়েছে। এই দুই দলেরই স্বভাবের মধ্যে যে এমন সব ত্রুটি রয়েছে যার জন্য তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা স্থাপন সম্ভবপর হচ্ছে না, কবি সেটি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। এই মানবিক আবেদন—এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর রচনার একটি বিশেষ গুণ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এই: বাঙালী নিজের পায়ে দাঁড়াক—ইংরেজের প্রসন্নতা অর্জনের জন্য লোভাতুর না হয়ে একাগ্র সাধনার দ্বারা নিজেদের চারিত্রশক্তি ও কর্মশক্তি সুবিকশিত করে তুলুক। উপসংহারে কবি বলেছেন:

> শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে,

পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে.........

এর পরের প্রবন্ধ 'রাজনীতির দ্বিধা'। ইংরেজের চরিত্রে যে একদিকে রয়েছে আধুনিক সুসভ্য জাতিসুলভ ন্যায়-অন্যায়বোধ, অপরদিকে রয়েছে তার বলদর্পিতা ও প্রচণ্ড লোভ যার প্রকাশ ঘটেছে তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে —এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের চিত্রটি কবি অশেষ নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। সাম্রাজ্য-বিস্তারে ইংরেজের দস্যুবৃত্তির চিত্র যত দক্ষতার সঙ্গে তিনি এঁকেছেন তারই পাশে তার ন্যায়-অন্যায়বোধের চিত্র অঙ্কনে তেমনি আন্তরিকতার পরিচয় তিনি যে দিয়েছেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় এই যুগেই কবির মানবিকতা ও শিল্পবোধ কতদূর বিকশিত হয়েছিল। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে, তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনই সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনই সে আপনি আপনার শত্রুতাসাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

এর পরের প্রবন্ধ 'অপমানের প্রতিকার'-এ কবি ইংরেজের হাতে এদেশের লোকদের লাঞ্ছনার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, ও সেই সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন :

এক বাঙালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালী যখন তাহা কৌতুহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকারসাধন বাঙালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ-কথা যখন বাঙালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিচিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট 'চাষা বেটা' প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে ;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়।......আমাদের আজন্ম কালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন, তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরেজ ইংরেজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরেজ গবর্মেণ্টের নিকট আমরা

অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারে স্বাভাবিক নিয়ম।

দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বহুকালের সামাজিক অব্যবস্থা আর আত্মার দৈন্যকে কবি আমাদের দেশের লোকদের দুর্গতির সবচাইতে বড়ো কারণ জ্ঞান করেছেন।

এর পরের 'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, দেশে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধের ব্যাপারে শাসকরা কিরূপ ভেদনীতির প্রয়োগ করে চলেছেন যদিও তাঁরা এমন অভিযোগকে সর্বৈব মিথ্যা বলছেন। কবির বক্তব্য: এই সংকটেও দেশের লোকদের চারিত্র-শক্তির উৎকর্ষসাধন তাদের জন্য পথ। কবির উক্তির কিয়দংশ এই:

যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোক উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবেন যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতাজনিত যত দুঃখ-দুর্দশা, কবির নির্দেশিত পন্থায় সে-সবের পূর্ণ প্রতিকার সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজের প্রভুত্বের গর্ব আর বলের দর্প আর দেশের লোকদের নানা ধরনের দুর্বলতা ও দুর্বুদ্ধি সব মিলে দেশের অবস্থা কত শোচনীয় করে তুলতে পারে সেদিন সে-সব কথা কেউ ভাবে নি—কবিও পুরোপুরি ভাবেন নি। তবে কবির নির্দেশ দেশ যদি মানতো তা হলে অনেকটা যে লাভবান হতে পারতো তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি ভারতীতে বেরিয়েছিল ১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। এটি সুবিখ্যাত। সিডিশন্ বিল পাশ হবার পূর্বদিন টাউন হলের জনসভায় কবি এটি পাঠ করেন। রবীন্দ্র-জীবনীতে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।*

কবির প্রধান বক্তব্য এই:

(ক) ইংরেজ প্রবল, ভারতবাসী দুর্বল, কিন্তু ভারতবাসীর ভাষা ইংরেজ

---

* প্রথম খণ্ড, ৪২৩—৪২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জানে না, সেজন্য এই দুর্বল ভারতবাসীও ইংরেজের জন্য ভীতিহ্বল আর এই ভয়ের জন্য ইংরেজের শাসনদণ্ড ভারতীয়দের উপরে সময় সময় মাত্রাতিরিক্তভাবে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে।

(খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ একদিক দিয়ে আরও ভয়াবহ—প্রজার জন্য তো বটেই, রাজার জন্যও তা কম ভয়াবহ নয়।

এই সম্পর্কে কবির স্মরণীয় উক্তি এই :

সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক্‌ নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্য কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারত-ভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিনীনূপুরকেয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবরদস্ত ইংরেজ লেখক বলেন, যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরেজ-শাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

ইংরেজের বলদর্পিতা, লোভ, অবিচার, এ-সব সম্বন্ধে কবি যেমন সচেতন তেমনি সচেতন তিনি, ইংরেজ যে একালের উন্নত জীবনাদর্শের প্রতিনিধি,

অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।......বস্তুতঃ আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে, এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই, কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ-কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ওই জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা।··· ইংরেজ-শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে, একত্র সংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভের পরে সতেরো বৎসর কাল গত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করে নেবার সাধনা আজও ভারতবর্ষের প্রধানতম সাধনা।

প্রতিবাদে সয়ে যাওয়া যে আদৌ মনুষ্যত্ব-অনুমোদিত নয় কবির সে-রকম উক্তির সঙ্গেও আমরা পরিচিত হয়েছি। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদীদের বা বিপ্লবীদের পথ যে দেশের জন্য কল্যাণের পথ নয়, ভারতের যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যের ও একালের বিশেষ পরিস্থিতির এটি যে প্রতিকূল সে-সম্বন্ধেও কবি দ্বিধাহীন। পরেও আমরা দেখব এ-বিষয়ে কবির মতের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বলা বাহুল্য কবির এই মতের জনপ্রিয় হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের ও জগতের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে কবি বার বার এই মত ব্যক্ত করেছেন।

ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এই সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লব-পন্থা যে কম অর্থপূর্ণ হয় নি ঐতিহাসিকদের তা স্বীকার করতে হবে। সেই সঙ্গে কবির সমালোচনাও যে কত অর্থপূর্ণ পরে তাও প্রমাণিত হয়েছে।

মনে হয় এই সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের অভ্যুদয়ের পরে থেকেই কবি জাতীয়তাবাদের অসম্পূর্ণতা ও বিপত্তি সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন।

বহু জাতির সম্প্রদায়ের ও ভাষাভাষীর বাসস্থান এই ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে কবি এই দুইটি প্রবন্ধে যে অপূর্ব সচেতনতার পরিচয় দেন আজও তা অমূল্য। আমরা 'পথ ও পাথেয়' থেকে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করছি :

> ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগ সত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে সুইজারল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে ?
>
> এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধুলা দিতে পারিব না ; বস্তুতঃ জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানা প্রকারে থাকে—যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজারল্যাণ্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্মের

অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।......বস্তুতঃ আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে, এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই, কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ-কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ওই জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা।... ইংরেজ-শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে, একত্র সংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভের পরে সতেরো বৎসর কাল গত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করে নেবার সাধনা আজও ভারতবর্ষের প্রধানতম সাধনা।

'সমূহে'র প্রথম প্রবন্ধ 'দেশনায়ক'। গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে :

স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে যখন দেশে মতানৈক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে (পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় পঠিত, ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ "দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়" রূপে "কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার" করিবার প্রস্তাব করেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য" সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন।

মূল প্রবন্ধটি দীর্ঘ। 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ যেভাবে 'সমূহে' প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সেই মূল প্রবন্ধের অনেক অংশ বর্জিত হয়েছে। সেই বর্জিত অংশগুলো সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থ-পরিচয়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

সমগ্র প্রবন্ধটি কবির অবিচলিত সত্য-দৃষ্টির এক আশ্চর্য পরিচয়স্থল। দেশের প্রকৃত হিত কিসে সেই সংকটকালে শুধু সেইদিকে দৃষ্টি রেখে কবি অনেক অপ্রিয় কথা বলতে সংকুচিত হন নি। কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

> দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

অন্যত্র :

> স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের

কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে-অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে-অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল সমস্ত স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনভাব ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।

অন্যত্র:

নায়কের কর্তব্য চালনা করা—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে, কারণ চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্বমোচন হইয়াছে। কখনোই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি।

"বয়কটে"র দিকে সমস্ত দেশের মন সেদিন প্রবল বেগে ধাবিত হয়েছিল। বয়কট সম্বন্ধে কবির অভিমত আমরা বর্জিত অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি:

আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে "বয়কট" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, এ-কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি—"আমরা য়ুনিভার্সিটিকে বয়কট করিব"। কেন করিব? য়ুনিভার্সিটি যদি ভালো জিনিস হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের

কাহারও নাই। যদি য়ুনিভার্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্ট ফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জন করাকে বয়কট করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ধৈর্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতোই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ—তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে।

বয়কটের একজন বড় সমর্থক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। পরবর্তী কালে কবির চিন্তার কিরূপ কড়া সমালোচনা তিনি করেন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

এর "সভাপতির অভিভাষণ" প্রদত্ত হয় পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ১৯০৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসে 'নরম' দল ও 'গরম' দলের মধ্যে যে-সব অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে ও তার পরে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করা হয় তার বিস্তৃত বিবরণ রবীন্দ্র-জীবনীতে পাওয়া যাবে। আত্মকলহের পথ পরিত্যাগ করে কেমন করে দেশের সত্যকার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা যায়, এই অভিভাষণে সেই কথাই কবি বিস্তারিতভাবে বলেন। এর পূর্বেই কবি তাঁর জমিদারিতে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেছিলেন।* গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধে এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট রচনা। সৌভাগ্যক্রমে গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা আমাদের একালের নেতাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কবির কিছু কিছু উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি:

> সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

---

* দ্রঃ রূপান্তর ও গ্রামসেবা—রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।...... এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এইসকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে।......

পরে যে-বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে-বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে। আমাদের যে-সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না, কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি, ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে।......

দেশের হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান দূর করা সম্পর্কে কবি এই অভিভাষণে যা বলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়:

মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা মুছিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে-লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

বলা বাহুল্য কবি শুধু হিন্দুর কর্তব্যের কথাই বলেন নি, মুসলমানকেও তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কবির আরও কিছু কিছু উক্তি এই:

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে

কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন।

......কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণ রক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।......আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিনশ্যাল কনফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশে সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই। দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসন-চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে।

মিতশ্রমিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে আর যৌথ চাষবাস ও ব্যবসায়াদি সম্পর্কে কবি বলেন :

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক

যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না,—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

এ-সম্পর্কে কবি আরও বলেন ঃ

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়?

বলা বাহুল্য দেশকে গড়ে তোলার জন্য আজো এ-সব চিন্তা বহুমূল্য।

এর পরের প্রবন্ধ 'সদুপায়'—১৩১৫ সালে লেখা। তখন স্বদেশী আন্দোলন ও তার আনুষঙ্গিক বিলাতি পণ্যের বয়কট পুরোপুরি আরম্ভ হয়ে গেছে ও তার ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমানের অবনিবনাও ও বিরোধের সূচনা হয়েছে। এই প্রবন্ধে কবির প্রধান বক্তব্য ঃ শাসকরা দেশ-বিভাগের নামে দেশের সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, আমাদের অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসাবধানতা ও জেদের ফলে সেই অশুভ পরিণতির দিকেই আমরা দেশকে এগিয়ে দিয়েছি। সেই বিষম উত্তেজনার দিনে কবির কথাগুলো দেশের শিক্ষিত সমাজের জন্য আদৌ শ্রুতিসুখকর ছিল না। তা সত্ত্বেও কবি আপন কর্তব্য সম্পাদনে পশ্চাৎপদ হন নি। কবির চিন্তা যে কত সত্যাশ্রয়ী ছিল কাল তা রূঢ়ভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। (ঘরে-বাইরে উপন্যাসেও কবি এই সব অপ্রিয় কথার অবতারণা করেন।)

কেউ কেউ বলতে পারেন, কবি শুধু হিন্দুদের দোষ বড়ো করে দেখেছেন, দেশ সম্বন্ধে মুসলমানদের কি করণীয় আছে সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে বলেন নি। তার উত্তরে বলা যায়, দেশের নেতৃত্ব সেদিন বিশেষভাবে ছিল হিন্দুদের হাতে, তাই তাদের ভুলের কথাই কবি স্পষ্ট করে বলেছিলেন।

দেশের প্রতি মুসলমানদের কর্তব্যের কথাও কবি অবশ্য এর পূর্বে ( সভাপতির অভিভাষণে ) তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তবে তিনি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন নেতৃস্থানে আরূঢ় নতুন-চেতনাসম্পন্ন হিন্দুদের সম্বন্ধেই।

দেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই যে বাস্তবমুখী দৃষ্টি, দেশের অনেক নেতা একে ভেবেছিলেন কবিকল্পনা, আর বয়কটের দ্বারা ইংরেজকে যে ভালো করে জব্দ করা যাবে এইটেকেই ভেবেছিলেন বাস্তব-দৃষ্টি। তাঁদের দৃষ্টিকে ঠিক অবাস্তব বলা যায় না; বয়কটের দ্বারা ইংরেজকে যে কিছু জব্দ করা গিয়েছিল তা মিথ্যা নয়। কিন্তু ইংরেজের প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত দেশের যত বড়ো ক্ষতি হলো সে-দিকটা নেতারা সেদিন ভেবে দেখেন নি, এবং সেজন্য সতর্কতাও অবলম্বন করেন নি। অথচ সে-দিকটার কথা কবি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন।

শুধু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নয়, বাঙালী, বেহারি, উড়িয়া, আসামি, এদের মধ্যেকার যে বিরোধ তার দিকেও কবি সেইদিনে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছিলেন।

পরিশিষ্টের প্রথম তিনটি লেখা 'সার লেপেল গ্রিপিন', 'ইংরেজের আতঙ্ক' ও 'রাজা প্রজা' বেরিয়েছিল সাধনায়, আর 'প্রসঙ্গ-কথা' বেরিয়েছিল ১৩০৫ সালে ভারতীর কয়েক সংখ্যায়। ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালীর প্রতি ইংরেজের অবজ্ঞা ও যথেচ্ছাচার, হিন্দুর দীর্ঘদিনের সমাজগত অব্যবস্থা ও চারিত্রিক দুর্বলতা, ইংরেজ রাজপুরুষদের নানাভাবে এদেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাড়িয়ে তোলবার প্রবণতা, এ-সব এই রচনাগুলোর কবির পক্ষপাতহীন বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় হয়েছে। কিন্তু এ-সবের মধ্যে খুব স্মরণীয় হয়েছে প্রসঙ্গ-কথার এই কথাটি—প্রজাবিদ্রোহ। অর্থাৎ বিচিত্র ধরনের অবজ্ঞা, অত্যাচার, অবিচার, এ-সবের ফলে দুর্বল প্রজারও অন্তরের দেবতাকে অপমান করে ইংরেজ যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে সেই ব্যাপারটি। কবির উক্তির কয়েক ছত্র এই :

> যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড় এবং শুয়র নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কী প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজ সমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নৈতিক বাধা প্রধান করেন না তাঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত। আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এই প্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব।……নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির

কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত-প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন? প্রজাদের সংবাদপত্র, সভাসমিতি, এবং বাগ্মিবর্গ আছে, রুদ্রমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগ্‌রোধ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রজাপতির সভা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সুচির কিন্তু সুনিশ্চিত।

বলা বাহুল্য কবির এ-সব কথা সেদিন অরণ্যে রোদন হয়েছিল। ক্ষমতাগর্ব চিরদিনই অন্ধ।

'প্রসঙ্গ-কথার' দ্বিতীয় লেখাটিতে কবি আর্যসমাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্য উদারতার দিকে প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাহা যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর একটি অভিনব সম্প্রদায়রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।

কবির এই আশা যে ফলবতী হয়েছে তা বলা যায় না। কিন্তু কেন? এই আন্দোলন কিছু পরিমাণে যুক্তিপন্থী হলেও অতীতপন্থী বেশি ছিল, বোধ হয় সেই কারণে। কবি ব্রাহ্মদের কর্মধারা পছন্দ করতে পারছিলেন না। (এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় আমরা পরে পাব।) সেজন্য জাতীয়তাবাদী অথচ সংস্কারপন্থী আর্যসমাজ সম্বন্ধে তিনি বেশি আশান্বিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গ-কথার শেষ লেখাটিতে কবি বলেছেন, কংগ্রেসের তরফ থেকে দেশের সত্যকার জাতি-গঠনের কাজ হবে যদি কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের থালাবহনের মতো বৃথা কাজ ত্যাগ করে দেশে শিল্পবিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয় এ-সব স্থাপনের চেষ্টা করে।

পরিশিষ্টের শেষের কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'বিরোধমূলক

'আদর্শ'টি লেখা ১৩০৮ সালে, অর্থাৎ নৈবেদ্যের যুগে। য়ুরোপের ভয়াবহ জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কবি এই মন্তব্য করেছেন :

নদী তাহার দুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয়-সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আর্দশ, যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥
( অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে,
শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় )।

কবির দৃষ্টির সত্যতা কালে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে গর্ব করে আর আমাদের কি লাভ হবে। আমরাও যে কবির উপলব্ধ সত্যের মর্যাদা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যোগ্যভাবে সচেতন হইনি সে-কথা আমাদের স্মরণ করবার আছে।

এর পরের 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' লেখাটিতেও কবি ব্যথিত হয়ে লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায়ের বিধানকে লঙ্ঘন করে চলেছে।

এর পরের দুইটি প্রবন্ধ 'রাজকুটুম্ব' ও 'ঘুষাঘুষি' বিখ্যাত। ঘুষাঘুষিতে হিন্দুর উৎসাহ নেই কেন সে-সম্বন্ধে কবি এই দুই লেখাতেই অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধান হয় তবে সে-শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।

স্বরাজের প্রতিষ্ঠা অবশ্য দেশে হয়েছে, কিন্তু কী মূল্যে তা আমরা সবাই জানি; আর জাতীয় সংহতিসাধন সম্পর্কে আজও যে অনেক কাজই বাকি সে-সম্বন্ধে দেশে সম্প্রতি নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে। গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে কবির কিছু কিছু উক্তি এই:

তবে করিতে হইবে কী? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো প্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।......

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ"। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে।......

স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা একসময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ

চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের মুক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে,—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব ; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

'যজ্ঞভঙ্গ' ও 'দেশহিত' এই দুটি লেখাতেও কবি জোর দিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধতা ও গঠনধর্মিতার উপরে আর পরস্পর-বিরোধিতা ও ধর্মহীনতা এ-সবের পথ বর্জনের উপরে। কিন্তু পরিশিষ্টের অবশিষ্ট লেখাগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিশিষ্ট হচ্ছে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' লেখাটি। এটি প্রবাসীতে বেরিয়েছিল ১৩১৪ সালে শ্রাবণ সংখ্যায়। এতে কবি সম্মুখীন হয়েছেন এই বড় প্রশ্নের : কোন্‌টি আমাদের প্রধান করণীয়—বয়কট-আদির দ্বারা ইংরেজকে জব্দ করা, না, সাম্প্রদায়িক মিলন সাধন, দেশের উচ্চ-নীচের পার্থক্য দূর করা বা তা সুসহ করে আনা, গঠনমূলক কাজ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। কবির সনির্বন্ধ নিবেদন—উত্তেজনা অত্যুক্তি এ-সবের পথ বর্জন করে তাঁর দেশবাসীরা রত হোন জীবনের সর্বক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজে। কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন ? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে ?.........হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে আমাদের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।.........আমরা বহু শত বৎসর ধরিয়া পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা এক সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। ......আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।—তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে

পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধান হয় তবে সে-শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না।

স্বরাজের প্রতিষ্ঠা অবশ্য দেশে হয়েছে, কিন্তু কী মূল্যে তা আমরা সবাই জানি ; আর জাতীয় সংহতিসাধন সম্পর্কে আজও যে অনেক কাজই বাকি সে-সম্বন্ধে দেশে সম্প্রতি নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে। গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

তবে করিতে হইবে কী ? আর কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাকে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনো প্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।......

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ"। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে।......

স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা একসময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী ? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ

আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ যোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়।

কবি যেদিন তাঁর জাতিকে এই সব কথা বলেছিলেন সেদিনেরই মতো এ-সব আজো বহুমূল্য।

## খেয়া

খেয়া প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালের আষাঢ়ে। ১৩১২ সালের আষাঢ় থেকে ১৩১৩ সালের আষাঢ় পর্যন্ত এক বৎসরকালের রচনা স্থান পেয়েছে এতে। এই কাল ছিল স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার কাল। সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত এইকালে রচিত হয়। সেগুলো 'বাউল' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের কিছু কিছু পরিচয় এর কোনো কোনো কবিতায় থাকলেও সেই আন্দোলনের উত্তেজনার কোনো চিহ্ন এই খেয়ার কবিতা-গুলোতে নেই। তার কারণ, এইকালে কবির ভগবদ্‌ভক্তি খুব নিবিড় হয়ে উঠেছিল। চারপাশের সব আবেগ-উত্তেজনার চাইতে অনেক বেশি প্রবল হয়েছিল তার দাবি। চিত্তের এই অপূর্ব সত্যাভিসারিতা ও প্রশান্তির গুণেই স্বদেশী আন্দোলনের কালে বহু বিষয়ে অত সারগর্ভ নির্দেশ কবি জাতিকে দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য বৃথা হয়েছিল তাঁর সেইসব নির্দেশ-দান।

খেয়াকে আমরা "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" পরিচ্ছেদের অন্তর্গত করে দেখছি। কিন্তু আসলে খেয়া গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া উচিত—"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই"। ভক্তের যে একান্ত নিবিড় পূজার ভাব সেই ভাব এই তিনখানি কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় যে খুব লক্ষণীয় হয়েছে—আলোচনাকালে তা আমরা দেখব। তবে এ-কথাও স্মরণ করবার আছে যে মানুষের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো কবির, জীবন-যন্ত্র এক সুরে বাজার সম্ভাবনা কম।

এই কাব্য কবি উৎসর্গ করেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে। এর পূর্বে 'কথা' কাব্যও তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এইকালে জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার অসাধারণ স্পর্শ-চেতনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। কবি তাঁর এইকালের কবিতাকে বলেন লজ্জাবতী লতা :

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী পেয়েছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

'উৎসর্গ' কাব্যের কবিতাগুলো রচনার অল্পকাল পরেই খেয়ার কবিতাগুলো রচিত। খেয়ার অনেক কবিতায় তাই 'উৎসর্গের' রচনা-ভঙ্গি লক্ষণীয়। অবশ্য উৎসর্গ মোটের উপর বুদ্ধিপ্রধান, আর খেয়া মোটের উপর অনুভূতি-প্রধান।

কবির এইকালের একান্ত ভগবৎমুখিতা বা ভগবানের সংগোপনের পূজার ভাবটি ভাল রূপ পেয়েছে এর উৎসর্গ-পত্রের দ্বিতীয় স্তবকে :

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বাস্তবিক 'ধেয়ান'ই খেয়ার কবিতাগুলোর ও খেয়ার পরের আরো কতকগুলো রচনার মুখ্য ভাব।

খেয়ার প্রথম কবিতাটির নাম 'শেষ খেয়া'। ১৩১২ সালের আষাঢ়ে এটি রচিত, অর্থাৎ খেয়া কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্যে প্রথম লেখা এটি। কবি অনুভব করেছেন তিনি জীবনের পারে এসে পৌঁচেছেন, এখন পর-

পারের দিকেই তাঁকে খেয়া জমাতে হবে, কিন্তু আপন মনের দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন 'ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে' তাঁর অবস্থা তার মতো। এই অবস্থা তাঁর মনে কিছুটা নিরানন্দ ভাব এনে দিয়েছে, কেননা, পরপারের জন্য—বলা যায় পরপারের জীবনের পুরো অভিজ্ঞতার জন্য—তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়েছে।

এর পরের কবিতা 'ঘাটের পথ'। ব্রজগোপিকাদের জলভরার ছবি এতে খানিকটা আঁকা পড়েছে। জলভরায়, অর্থাৎ জীবনের কাজে ব্যাপৃত থেকে, এতদিন কবির কেটেছে, সুদিনে দুর্দিনে সেই জলভরার জন্য যাওয়া-আসার পথে অজানার রহস্যময় ডাক তিনি কতবার শুনেছেন, সেই ডাক তাঁকে আকুল করেছে—

ওগো দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে।

কিন্তু আজ তাঁর জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ নতুন করে কোনো কাজ আরম্ভ করতে হবে এমন উৎসাহ তিনি আর অন্তরে অনুভব করছেন না, তাই যারা আজও জলভরার ব্যাপারে ঘাটের পথ কলহাস্যে মুখরিত করছে তাদের তিনি চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

এর পরের কবিতা 'ঘাটে'। কবি পার-ঘাটায় এসে বসেছেন: তিনি বুঝতে পারছেন ওপারে যাওয়া, অর্থাৎ এই জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হওয়া, সেটি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হলো না। এইরূপ ক্ষেত্রে কবি নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন: তিনি ঘাটে বসে যে-হাওয়ায় তাঁর তরী এতদিন চলতো সেই হাওয়া গায়ে লাগাবেন, আর অন্যদের তরী বাওয়া দেখবেন।—ওপারে পৌঁছতে পারলেন না বলে তাঁর মন বেদনা-কাতর। কিন্তু কবি তাঁর এপারের জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন, তিনি বলছেন:

আমার সেইখানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া॥

অর্থাৎ তাঁর যে সুপরিচিত পার্থিব জীবন এইটিই তাঁর কল্পনার—জীবনের সার্থকতার—ক্ষেত্র।

পরপারের জীবন কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এপারের টানও তাঁর জন্য কমে যায় নি।—বলা যেতে পারে খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের কাল কবির জন্য এই দোটানার কাল।

এর পরের দুটি কবিতা 'শুভক্ষণ' ও 'ত্যাগ' খুব প্রসিদ্ধ—কবিতা হিসাবেও খুব উচ্চাঙ্গের। বলা যেতে পারে এই দুটি কবিতা একটি কবিতারই দুটি অংশ। এর ছবিটি এই: রাজপুত্র মহাসমারোহে রাজপথ দিয়ে চলেছে, তার মহিমময় রূপ কুমারীর হৃদয় উতলা করেছে, কুমারী বেশভূষা করে বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়েছে রাজপুত্রকে দেখবার জন্য, যদিও সে জানে, তাকে চেয়ে দেখবার অবসর রাজপুত্রের হবে না।

রাজপুত্রের জন্য কুমারী যে শুধু বেশবিন্যাস করেছে তাই নয়, তার শ্রেষ্ঠ ধন তার বক্ষের মণিহার সে রাজপুত্রের রথের সামনে ফেলে দিয়েছে, সেই মণিহার রাজপুত্রের রথের চাকায় গুঁড়ো হয়ে গেছে—রাজপুত্রের তা চোখে পড়েনি, তার রথ দূর থেকে দূরান্তে চলে গেছে। কুমারীর মাতা তার এমন নির্বুদ্ধিতা দেখে দুঃখিত ও বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু কুমারী বলছে:

রাজার দুলাল গেল চলি মোর<br>ঘরের সমুখপথে—<br>মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া<br>রহিব বলো কী মতে?

রূপ-কল্পনাটি অপূর্ব, আর এর অর্থও বোঝা যায় সহজেই। যা শ্রেষ্ঠ তা যখন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, সেই শুভক্ষণে সেই শ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। আমাদের সেই দান অনেক সময় বিফলে যায়; আমাদের এমন নির্বুদ্ধিতা দেখে আমাদের হিতৈষীরা রুষ্ট হন: কিন্তু শ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগ না করে আমরা আর কি করতে পারি।

সমসাময়িক কালেরও কিছু পরিচয় এই কবিতা-দুটিতে আছে মনে হয়। এই কবিতা দুটি লেখার কয়েক মাস পরে সেইকালের প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে কবি তাঁর 'রাজা প্রজা'র 'রাজভক্তি' প্রবন্ধটি লেখেন—তাতে রাজভক্তির দিকে ভারতবর্ষের লোকের সহজ প্রবণতার কথা তিনি বলেছেন। এমন রাজভক্তি উদ্রেক করবার জন্যই রাজপুত্রকে

ভারতবর্ষে আনবার কথা ভাবা হয়েছিল; কিন্তু কবি দেখছিলেন রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের লোক তাদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করবে, করে নিজেদের ধন্য মনে করবে, কিন্তু সেই নিবেদনের মর্যাদা যে কত সে-কথা ভাববার অবসর রাজপুত্রের হবে না।

এর পরের কবিতা 'আগমন'।

কবি তাঁর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এটির সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছেন:

খেয়াতে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

এটি এর সাধারণ ব্যাখ্যা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এর বিশেষ যোগের কথাও ভাবা যেতে পারে। সেই আন্দোলন বাংলাদেশে যেমন ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছিল তেমনটি আর কখনও ঘটে নি। রাজা অর্থাৎ দেশের মহৎ সম্ভাবনা যে এমন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন তা কেউ ভাবে নি। সবাই সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল। কিন্তু দুর্যোগের রাত্রিতে রাজা যখন এসে পড়েছেন—তিনি এমনি করে হঠাৎই আসেন—তখন আমাদের যা-কিছু আছে সব নিবেদন করে তাঁকে যোগ্য সংবর্ধনা জানাতে হবে:

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
    বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ
    আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
    বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
    আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
    দুঃখরাতের রাজা।

এর পরের কবিতা 'দুঃখমূর্তি'। দুঃখকে কবি ভগবানের মূর্তিরূপে দেখছেন :

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
. . যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।

ভক্তরা চিরদিনই এমন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরের কবিতা 'মুক্তিপাশ' ও 'প্রভাতে'। অকস্মাৎ ভগবানের প্রসাদ-লাভের অপূর্ব সৌভাগ্যের কথা এই দুটি কবিতাতেও বলা হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 'প্রভাতে' কবিতাটির যোগের কথাও ভাবা যেতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের মতন একটা প্রবল ভাব-বন্যা যে দেশে কখনও আসবে তা কেউ ভাবে নি। কিন্তু অজ্ঞানিতভাবে নানা দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে সেই অসম্ভব সম্ভব হল :

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,
কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো
উঠেছে ভরে। *

এর পরের কবিতা 'দান'।

ভক্ত ভগবানের কাছে এমন দান চায় যা হবে মধুর, যাতে কোনো ঝঞ্ঝাট থাকবে না; কিন্তু ভগবান যে দান আমাদের দেন তা কঠিন-কিছু, এক গুরু দায়িত্ব—তা মালা নয়, তরবারি—বজ্রের মতন ভারি।

এমন দান পেয়ে আমরা চমকিত হই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝি ভগবানের দান এমনি বটে—তা সৌখীন কিছু নয় কখনো। দুঃখ-বিপত্তির পাশ কাটিয়ে সেই দানের মর্যাদা রক্ষা করা যাবে না।

---

* পরবর্তী কালে এমন অভাবনীয় ভাব-বন্যা পূর্ব পাকিস্তানে আসে সেখানকার ভাষা-আন্দোলনের ভিতর দিয়ে।

আজকে হতে জগৎমাঝে

ছাড়ব আমি ভয়,

আজ হতে মোর সকল কাজে

তোমার হবে জয়—

আমি ছাড়ব সকল ভয়।

মরণকে মোর দোসর করে

রেখে গেছ আমার ঘরে,

আমি তারে বরণ করে

রাখব পরাণময়।

তোমার তরবারি আমার

করবে বাঁধন ক্ষয়।

আমি ছাড়ব সকল ভয়।

স্বদেশী আন্দোলনের দিক দিয়ে বলা যায়, সেই আন্দোলনের ব্যপদেশে ভগবান আমাদের দেশকে এক সুমহান দায়িত্ব দিয়েছেন যার কথা দেশ আগে ভাবে নি—দেশকে সে দায়িত্ব যোগ্যভাবে বহন করতে হবে।

এর পরের কবিতা 'বালিকা বধূ'। এর রূপকটি সহজবোধ্য। বালিকা বধূ হচ্ছে মানবচিত্ত বা ভক্তের চিত্ত, আর বর হচ্ছেন ভগবান। মানবের বা ভক্তের ভগবানের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনরূপ এক অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়ে গেছে, কিন্তু মানব বা ভক্তের আত্মা বালিকা বধূর মতো সেই বরের মহিমা সম্বন্ধে অনবহিত, সে বরকে মনে করে 'খেলিবার ধন শুধু'। গুরুজন তাকে সমঝায়, —বরকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো চাই, শুনে সেও মনে মনে ভীত হয় আর ভাবে 'পালিব পরানপণে যাহা কহে গুরুজনে'; কিন্তু বরের পাশে ঘুমঘোরে অচেতন হয়েই তার সময় কাটে।

কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝার দুর্দিনে তার খেলাধুলা, অমনোযোগ, এসব দূর হয়ে যায়, সেদিন সে সবলে বরকে আঁকড়ে ধরে তার একান্ত আশ্রয়-জ্ঞানে।

এই বালিকা বধূর জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

ওগো বর, ওগো বঁধু,

জান জান তুমি—ধুলায় বসিয়া

এ বালা তোমারি বধূ।

রতন-আসন তুমি এরি তরে

রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,

সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

মানব-আত্মার শনৈঃ শনৈঃ ভগবান সম্বন্ধে চেতনা লাভ আর সেই আত্মার জাগরণের জন্য ভগবানের অসীম ধৈর্য, অসীম প্রেম, দুয়েরই কথা চমৎকার রূপ পেয়েছে এতে।

এর পরের 'অনাহত' কবিতাটিতেও আমরা পাচ্ছি একটি নতুন বধূর ছবি। সেই নতুন বধূ 'আধেক খোলা' বাতায়নের ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের বিচিত্র জগতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। তার চোখে—

ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইকো আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

কবি বলছেন, বৈশাখী ঝড় যদি উঠে আসে আর তার ফলে বাইরের জগতে বিষম তোলপাড় দেখা দেয়, তখন সেই তোলপাড় নতুন বধূর ঘরের ভিতরেও দেখা দেবে, আর তার ফলে বধূর চোখের অলস দিনের ছায়া, বাতায়নের স্বপন-মাখা ছবি, সব কোথায় উড়ে যাবে, বধূর বক্ষেও উত্তাল নর্তন জাগবে।

এই কবিতাটির ভিতরে মরমী ইঙ্গিত যা আছে তা ভাল বোঝা যাবে 'গীতিমাল্যে'র "ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো" শীর্ষক কবিতাটির সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়লে। স্বদেশী আন্দোলনের দিক দিয়ে বলা যায়, এতদিন দেশ বিশ্ব-জগতের দিকে নতুন বধূর মতো অলস কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু আজ ঝড় এসেছে, তাই তার চেতনায় আমূল পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

এর পরের কবিতা 'বাঁশি'।

প্রেমিকা প্রিয়তমের বাঁশি নিয়ে খেলতে চাচ্ছে, ফুল দিয়ে সেই বাঁশি সাজাতে চাচ্ছে; সেটিও খেলা, কিন্তু প্রেমিকা প্রিয়তমকে বলছে, রাত যখন গভীর হবে তখন সেই বাঁশি সে প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দেবে, আর প্রিয়তম গভীর রাতের তানে যখন বাঁশি বাজাবেন, তখন সেই বাঁশির সুর সে শুনবে।

মনে হয় এতেও মানুষ বা ভক্ত ও ভগবানের কথা বলা হয়েছে। মানুষ অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের বাঁশি অর্থাৎ প্রতীক নিয়ে খেলা করতেই ভালবাসে, তাতেই তার দিনের অনেকটা সময় কাটে, কিন্তু গভীর রাত্রে অর্থাৎ মন শান্ত এবং সংযত হলে, ভগবানের বাঁশির সুর তাকে মুগ্ধ করে।

এর 'অনাবশ্যক' কবিতাটির রূপটি চমৎকার। এর কবির দেওয়া ব্যাখ্যা এই :

> ······আমাদের ক্ষুধার জন্য যা অত্যাবশ্যক তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই অনাবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি, অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুর পরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেইদিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই, ক্ষুধা নেই। (দ্রঃ রবি-রশ্মি, ২য় খণ্ড)

এর এই ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে : বালিকার প্রদীপ হচ্ছে ভাবুকের আপন মনের চিন্তা, ভাবুকরা তাদের সেই চিন্তার প্রদীপ নিজেদের জীবনে জ্বালায়, অজানার উদ্দেশ্যেও চিরদিন জ্বালিয়ে চলেছে। ভাবুকের চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ চায় সেই আলো সে তার দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগাবে; কিন্তু ভাবুক তাতে সম্মত হয় না, সে তার প্রদীপ অজানার উদ্দেশ্যে জ্বালাচ্ছে। এই সব দীপ মানুষের সাধারণ জীবনে অনাবশ্যক যদিও এ-সবের দ্বারা প্রলুব্ধও তারা হয়।

এর পরের কবিতা 'অবারিত'। একটি অপূর্ব কবিতা এটি—কবির মনের একটি গোপন দিক চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে এতে। কবি দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছেন আমরা জানি। নিরিবিলি থাকতে পারলেই তিনি ভালো থাকেন এই কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনের গোপনে আর একটি কামনাও ছিল, সেটি হচ্ছে মানুষের—সর্বসাধারণের—সঙ্গলাভের কামনা। এইকালে, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, সেই সর্বসাধারণের সঙ্গে যোগ কবির জীবনে ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। সেই যোগ যে কবির কত প্রিয় হয়েছিল সেই কথাটি এই 'অবারিত' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি দেখছেন, তাঁর ঘর আর তাঁর নিরিবিলি বাসের জায়গা নয়, সেটি হাট হয়ে দাঁড়িয়েছে—আসতে যেতে যার খুশি সেই সে ঘাটে নৌকো বাঁধে, তাদের

ফিরিয়ে দেবার কথা কবি ভাবতে পারেন না—তাদের সবারই সঙ্গে কবির যেন কি এক মর্মের যোগ রয়েছে। তাই কবি বলেছেন :

পায়ের শব্দ বাজে তাদের
রজনীদিন বাজে।
ওগো মিথ্যে ওদের ডেকে বলি
"তোদের চিনি না যে"।
কাউকে চেনে পরশ আমার
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, "আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
যার খুশি সেই আয় রে।"

রাতে যখন সব নীরব তখনও তাঁর দ্বারে আঘাত বাজে। যে আসে সে কোনো কথা বলে না, তার মুখখানিও ভাল চেনা যায় না। কিন্তু তাকেও ফিরিয়ে দেবার কথা কবি ভাবতে পারেন না। এই রাতের আগন্তুক কে? মনে হয়, তাঁর দেশের নীরব-মূর্তি। তার মুখপানে চেয়ে কবির 'রাত্রি বয়ে যায়'।

অন্য ব্যাখ্যা এই দেওয়া যায় যে, কবি—এতদিন আপন মনে সাধনা করছিলেন ; নিঃসঙ্গ জীবনই তাঁর জীবন এই তিনি ভাবছিলেন ; কিন্তু দেখছেন, তাঁর মনে অগণিত মানুষের ঠাঁই হয়েছে—তাদের কাউকে তিনি পর ভাবতে পারেন না। তারা দিন-রাত তাঁর মন দখল করে আছে।

'অবারিত' কবিতাটিতে কবি বলেছেন সবার সঙ্গে তাঁর যোগের কথা, এর পরের 'গোধূলি লগ্ন' কবিতাটিতে কবি বলেছেন পরম দয়িতের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগের কথা—'নিভৃত সন্ধ্যার উৎসবে'র কথা। এই নিভৃত যোগের সুর যে খেয়ার প্রধান সুর তা আমরা বলেছি।

এর পরের 'লীলা' ও 'মেঘ' দুটিতেই কবি এঁকেছেন পরম-মহানকে ঘিরে নগণ্য মানুষের লীলা। কিন্তু নগণ্য হলেও সেই লীলা মিথ্যা নয় কখনো :

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচকে হাসি হামেশা।
তাই বলে সব মিথ্যে নাকি ?
বৃষ্টি সে তো নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাশা।
শুধু আমরা থাকি নে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই।

এর পরের কবিতাটির নাম 'নিরুদ্যম'। ক্ষণিকার 'উদাসীন' কবিতাটির সঙ্গে এর অনেক মিল চোখে পড়বে। তবে এই 'নিরুদ্যমে' ভগবানে একান্ত আত্মনিবেদনের ভাবটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি জীবনের পথে সবার সঙ্গে প্রবল বেগে ছুটেছিলেন। তেমন বেগে না ছুটলে জীবনে সার্থকতা লাভ হবে না এই তারা ভেবেছিল। সবাই ছুটে চললো, কিন্তু কবি ক্লান্ত হয়ে জলের ধারে শ্যামল তৃণাসনে আশ্রয় নিলেন, চারদিকের সুস্বর ও সুদৃশ্য তাঁকে মুগ্ধ করলো—এমন মুগ্ধ বিশ্রামকে কবি বলেছেন 'আনন্দময় অগাধ অগৌরব'। তিনি অবশ দেহে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু জেগে উঠে দেখছেন তাঁর বিশ্রাম ও ঘুম বৃথা হয়নি :

মোরা ভেবেছিলাম পরানপণে
সজাগ রব সবে ;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলাম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে।

কবি এখানে ভক্তের চিরপরিচিত ভাষায় কথা বলেছেন, কেন না ভক্তি-ধর্মের মতে সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব একমাত্র ভগবানের—মানুষ জীবনে পরমার্থ লাভ করতে পারে নিজেদের চেষ্টায় নয়, ভগবানের কৃপায়। কিন্তু আমরা পরে দেখব রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ-কৃপায় বিশ্বাসী হয়েও পুরুষকারে কম বিশ্বাসী নন।

এর পরের কবিতা 'কৃপণ'। এটি বিখ্যাত। এর ভাবটি মোটের উপর এই : মানুষ সাধারণত নিজের শক্তি-সামর্থ্যে আস্থাহীন, তাই জীবনের পথে সে ভিক্ষা করে ফেরে। বিশ্বের যিনি রাজাধিরাজ সব দিকে তাঁর মহিমা দেখে সে ভাবে তাঁর প্রসাদ কুড়িয়ে নিতে পারলেই তার জীবনে কাজ হবে। কিন্তু সেই রাজাধিরাজ এই ভিক্ষুকের কাছেই প্রার্থনা জানালেন। এখন চাওয়াকে রাজাধিরাজের কৌতুক জ্ঞান করে ভিক্ষুক ছোটো একটি কণা তাঁর হাতে দিলে। ঘরে ফিরে ভিক্ষাপাত্র উজাড করে সে দেখলে সেই কণা স্বর্ণকণা হয়ে তার থলিতে এসেছে। অর্থাৎ মানুষ ভগবানকে—ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে নয়, মহৎ উদ্দেশ্যে—যা দান করে তাতেই তার জীবনে সত্যকার সার্থকতা লাভ হয়।

এর পরের 'কুয়ার ধারে' কবিতাটিতেও বাসনাবর্জিত কর্মের মাধুর্যের কথা কবি বলেছেন।

এর পরের 'জাগরণ' কবিতাটিতেও কবির একান্ত আত্মনিবেদনের সুরটি বাজছে :

ওগো আমার ঘুম সে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি
দেখব তারি নয়ন দুটি
মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

এর পরের 'ফুল ফোটানো' কবিতাটি বিখ্যাত।

মানুষের হৃদয় কার কাছে খুলে যায়? তারই কাছে যে তাকে ভালোবাসে। ভগবান মানুষের পরমবন্ধু, শুধু তাঁরই স্পর্শে মানুষের মনের সব সঙ্কুচিত দল নিজেদের মেলে দিয়ে অপূর্ব শোভা ও গন্ধ বিস্তার করতে পারে। একটি দেশকে বা জাতিকেও তেমনি সত্যকার ভাবে বিকশিত করতে পারে দরদী নেতা, তথাকথিত নেতারা নয় :

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

এর পরের কবিতা 'হার'। বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন ছিল প্রবল ইংরেজের সঙ্গে দুবল বাঙালীর যুদ্ধ। সে যুদ্ধে যে বাঙালীর বার বার হার হবে তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু কবি ভগবানের মঙ্গল-বিধানে একান্ত বিশ্বাসী। তাই তিনি বলছেন, সর্বস্বপণে যদি 'রাজার ছেলের মতো' বাঙালী যুদ্ধ করে তবে হেরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের হার নাও হতে পারে :

তবু এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কী করবে তুমি
সে কথা কেউ ভাবতে পারে ?

বলা বাহুল্য কবির এই প্রত্যয়ের সুরে তাঁর জাতির জীবন-যন্ত্র আজো বাঁধা হয়নি।

এর পরের 'বন্দী' কবিতাটিতেও কবি বলেছেন ভগবানের যা ন্যায়বিধান, যা ধর্ম, তাই মানুষের চিরদিনের পথ। কিন্তু মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে সেই পথ লঙ্ঘন করে, লঙ্ঘন করে দেখে লোভের বজ্রকঠিন ডোরে সে নিজেই বাঁধা পড়েছে।

তেমনি, মানুষ ক্ষমতাপন্ন হতে চায়, সবার ন্যায্য অধিকার দলিত

করে জগতে আপন প্রতাপ বিস্তার করতে চায়। কিন্তু শেষে সে দেখে, তার ক্ষমতা-বিস্তারের কঠিন নিগড়ে সে-ই বন্দী হয়েছে।

এই কবিতাটিরও গঠন খুব পরিপাটি।

এর পরের কবিতা 'পথিক'। গঠনের দিক দিয়ে এটিও খুব সুন্দর। মানুষ তার পরিজনদের মধ্যে দিন কাটায়, সেই পরিজনরা স্বতঃই তার প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু মানুষ যেন পথিক—তার মর্মে ধ্বনিত হচ্ছে দূরের আহ্বান। তাই তাকে উতলা করেছে:

নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা।
আঁধার হতে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কী বারতা।
সপ্তঋষি গগনসীমা হতে
কখন কী যে মন্ত্র দিল পড়ি—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্‌ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত?

পরিজনের ইচ্ছা নয় যে সে তাদের ছেড়ে যায়; তাদের চোখের চাউনিতে সেই কাতরতাই ব্যক্ত হয়; কিন্তু দূরের জন্য পথিকের মনের অধীরতা হ্রাস পেতে চায় না।

এর পরের কবিতা 'মিলন'।

এক প্রভাতের 'নিবিড় নীরব শোভাতে' কবির এক অপূর্ব মিলন ঘটেছিল তাঁর পরম-দয়িতের সঙ্গে—সেই নিবিড় মিলনের সুরটি বাজছে এই কবিতায়। সেই মিলনের আনন্দ ব্যক্ত করতে কবি যেন অক্ষম, তিনি শুধু উপলব্ধি করছেন তাঁর দেহমন, তাঁর আদি ও অন্ত এই মিলনের ফলে জুড়িয়ে গেছে:

আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরাল,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরাল,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল।

প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য কবিকে তাঁর পরমদয়িতের ইঙ্গিত দেয়। তাই বলা যায়, প্রকৃতি কবির চোখে একই সঙ্গে পরমসুন্দর আর পরমরহস্যময়।

কবির উপলব্ধিকে কি Pantheism বলা হবে? ঠিক Pantheism নয়, তবে Pantheism-ঘেঁষা তাঁর উপলব্ধি। কবি Pantheist (সর্বব্রহ্মবাদী) যত, মরমী (অরূপের পূজারী) তার চাইতে বেশি।

এর পরের কবিতা 'বিচ্ছেদ'। কবি দেখছেন, বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে ভগবানের প্রকাশ কত সহজ। কিন্তু কবির জীবন-যন্ত্রে সেই সহজ সুরটি বাজছে না—সেই সহজ প্রাণোচ্ছলতা সেই যন্ত্রে প্রকাশ পায় না। কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা সেই সহজ সুর তাঁর জীবন-যন্ত্রে বাজুক। কিন্তু আজও সেটি ঘটে উঠেনি:

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না এই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কী যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

মুখ্যত এই সহজের সাধনা চলেছে এর পর কবির 'গীতাঞ্জলি' ও গীতি-মাল্যে'। এর পরের কবিতা 'বিকাশ'-এ কবির চোখে পড়েছে প্রভাতের এক নগ্ন দিব্য সৌন্দর্য। কবি তাই আনন্দে গেয়ে উঠেছেন:

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।

অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোকপানে তুলে দে।

এর পরের কবিতা 'সীমা'। খুব বিশিষ্ট এটি। অনন্ত, ভূমা, সাধারণত এ-সবের দ্বারা কবির মন আকৃষ্ট হয় বেশি; কিন্তু এই কবিতাটিতে তিনি সীমার অপরিসীম মূল্যের কথা বলেছেন:

যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে,
ফিরিস নে আর হাজার টানে
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা।

গ্যেটে বলেছেন......প্রত্যেক ঘটনা—প্রত্যেক মুহূর্ত—অশেষ মূল্যবান, কেননা তা অনন্তের প্রতিনিধি। কবিও গীতাঞ্জলিতে বলেছেন:

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

এর পরের কবিতা 'ভার'। এটিও প্রসিদ্ধ। প্রথম কয়েকটি ছত্রেই এই কবিতার মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে:

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
এ যাত্রা তুমি থামাও।

ভগবানের দেওয়া ভার আর নিজেদের পরে আমাদের নিজেদের চাপানো ভার এই দুয়ের পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

যে তোমার ভার বহে, কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তা
হাতে,
বনে পাখি গায় নদীধারা ধায়,
চলে সে সবার সাথে।

কিন্তু

বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি...... ,

তার ফলে

আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে।

মানুষের জীবনের অনাবশ্যক জটিলতা ও কৃত্রিমতার দিকে এইকালে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের আনুকূল্যের প্রতি কোনোরূপ বিমুখতা নয়—বরং পরম উদার প্রকৃতির সাহচর্য-ভরা যে জীবন তার শান্তি ও সুমহৎ সম্ভাবনা তাঁর জন্য গভীরভাবে সত্য হয়েছিল।

এর পরের কবিতা 'টিকা'। প্রভাত প্রথম নয়ন মেলতে কবির চোখে পড়েছে অরুণ শিখা—সেই 'কমলবরণ' শিখা তাঁর অন্তরে জ্যোতির টিকা দিয়ে দিয়েছে, কবির সেই আনন্দ এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে :

ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে,
এ পরশ রেখা দিব না ঘুচিতে
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নবপ্রভাতের লিখা
উদয়-রবির টিকা।

প্রতিদিনের সূর্যোদয় কবির জন্য যে কী মহাসম্পদ ছিল সে-কথা তাঁর রচনায় বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই দিক দিয়ে কবিকে বলা যায় আজন্মমরমী।

এর পরের কবিতা 'বৈশাখে'। তপ্ত হাওয়া দেওয়া এক বৈশাখী মধ্যাহ্নের ছবি ও সুর এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। এই অলস দিনে লক্ষ্যবিহীন হয়ে কবির যে কেটেছে, কবি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন এই দিনের 'অকাজে' কেউ কি তাঁকে ধরা দেয়নি?—দিয়েছে, এই মনে হয় কবির বক্তব্য।

খেয়ার lyricism—গীতিধর্মিতা—প্রভাতবাবুর খুব চোখে পড়েছে। 'বৈশাখে' কবিতাটি এই lyricism-এর একটি ভাল দৃষ্টান্তস্থল; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের lyricism-এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্তস্থল তাঁর গান। বলা বাহুল্য তাঁর গানও কবিতা।

এর পরের কবিতা 'বিদায়'। এটি খুব বিখ্যাত। বরিশাল সাহিত্য-সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হবার প্রাক্কালে এটি লেখা। এর পূর্বে কয়েক মাস স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে কবির কাটে। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন, জাতীয় শিক্ষা, এ-সব ব্যাপারে কবির যে-সব স্পষ্ট চিন্তা দাঁড়িয়েছিল সে-সবের দিকে মন দেবার অবসর কারো ছিল না, সবাই ব্যস্ত ছিলেন বয়কটাদি নিয়ে। এ-সব কারণে কবির ভিতরে অনুৎসাহ দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁর অনুৎসাহের প্রকৃত কারণ কি সেই কথাটি ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়:

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,<br>
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।<br>
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে<br>
হিয়া আমার উঠল কেমন করে<br>
জানি না কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে<br>
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।<br>
আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।<br>
তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে<br>
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।<br>
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া,<br>
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,<br>
আলবালে জল সেচন করা<br>
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।<br>
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।

কাজেই কবি সোজা ভাষায় বললেন :

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

বলা বাহুল্য কবির এই বিদায় গ্রহণ বা বৈরাগ্য অবলম্বন সাধারণ কর্মবিরতি নয়—এ এক নতুন অনুভূতির রাজ্যে কবির অনুপ্রবেশ। এরই বিশেষ পরিচয় হয়েছে তাঁর 'খেয়া'য় আর 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'। (সবুজপত্রের যুগের একখানি চিঠিতে কবি তাঁর এই বিশেষ অনুভূতির কথা বলেছেন।)

এর পরের 'পথের শেষ'-এ কবি বলেছেন, জীবনের সূচনায় পথের নেশা তাঁকে লেগেছিল, অজানা কোন নিরুদ্দেশের জন্যে এতদিন পর্যন্ত তিনি ছুটে চলেছেন; মনে হয়েছিল তাঁর পথের বাঁকে বাঁকে অকস্মাৎ নব নব সৌভাগ্যের সাক্ষাৎকার তিনি লাভ করবেন; কিন্তু আজ সেই সব অকস্মাতের আশা ছেড়ে দিয়ে একটি প্রাপ্তির কথাই তিনি ভাবছেন :

এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

এর পরের কবিতা 'নীড় ও আকাশ'। নীড় অর্থাৎ নানা শোভা-সৌন্দর্য ও শব্দগন্ধময় ধরিত্রীর জীবন আর শব্দগন্ধহীন নিঃসঙ্গ নির্মম আকাশের আকর্ষণ, দুইই এতে চমৎকার আঁকা পড়েছে। কবি বলেছেন, এতদিন তিনি নীড়ের গান গেয়েছেন, কিন্তু আজ কি তাঁকে নিঃসীম আকাশের গান গাইতে হবে :

গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্য 'পরে,
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্ধ্বমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণস্বরে
অর্থবিহীন কলকথায় ?

আকাশ কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে—

আপন মনে পাই নে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,

যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃতপান।

কিন্তু তবু আজও নীড়ে ফিরে এসে কাঁদতে হাসতে আর আলো-ছায়ার বিচিত্র গান গাইতে তিনি ভালবাসেন :

তবু নীড়েই ফিরে আসি
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবুও এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

এর পরের কবিতা 'সমুদ্রে'। একদিন ভোরে কবি তাঁর তরীখানি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—কোথায় যাবেন সে-কথা কিছুই না ভেবে। সেদিন স্রোতের চাঞ্চল্য আর তীরের শোভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁর তরণী যে নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে সাগরজলে এসে পড়বে তা তিনি ভাবেন নি। কিন্তু সাগরে যে এসে পড়েছেন এতে তিনি দুঃখিত নন, বরং 'অকূল পাড়ির আনন্দগানে' তাঁর চিত্ত আজ মুখর :

যাক না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু-হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

হাফিজের একটি সুপরিচিত গজলে পাওয়া যাচ্ছে :

আমরা ভাঙা নৌকার যাত্রী—
হে অনুকূল বায়ু, প্রবাহিত হও।
হয়ত আবার দেখতে পাব
সেই মনোহরাকে॥

এর পরের 'দিনশেষে' কবিতাটিতে কবি তাঁর নিজের দিনশেষের চিত্র এঁকেছেন মনে হয়। দিনশেষে কবির স্থানলাভ হয়েছে ভাঙা অতিথিশালায় যার ফাটা ভিতে অশথ-বট ডালপালা মেলেছে। এই অতিথিশালায় কত কালে কত লোকে দিনের শেষে পায়ের ধূলো ধুয়ে এসেছিল, এসে এর স্নিগ্ধ শীতল

আঙিনাতে শান্তিলাভ করেছিল। কিন্তু আজ সেই অতিথিশালা পরিত্যক্ত, তাতে দীপ জ্বলে না, তার দিঘি শুকিয়ে গেছে। কবি বলছেন:

আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেম এসে?
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায়া।

মনে হয় কবি বলতে চাচ্ছেন, ভারতের যে বরেণ্য প্রাচীন আদর্শের ছায়ায় তিনি তাঁর জীবনের শেষে আশ্রয় নিয়েছেন সেই আশ্রয় আজ তাঁর দেশের লোকদের দ্বারা পরিত্যক্ত। সেটি তাঁর গভীর মনোদুঃখের কারণ হয়েছে।

এর পরের 'সমাপ্তি' কবিতাতেও কবি তাঁর দিনশেষের করণীয়ের কথা বলেছেন। নদীতে স্রোতের ধারা বন্ধ হয়ে এসেছে, তাঁর তরণী শৈবালে আটকা পড়েছে, তাই নৌকো বাওয়া শেষ করে এবার তাঁকে ডাঙায় আশ্রয় নিতে হবে:

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন
সফল হ'ক রে সকল সমাপন।

এর পরের কবিতা 'কোকিল'। কোকিলের ডাক শুনে কবির মনে হচ্ছে তিনি যেন তিন শ' বছর আগে বাংলাদেশে ছিলেন। তখন বাংলার জীবনের সর্বস্তরে সুখ-সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। আজও তেমনি কোকিল ডাকছে, কিন্তু দেশের সেই জীবন অন্তর্হিত হয়ে গেছে—

শহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়!
আর কি বধূ, গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক?

এর পরের কবিতা 'দিঘি'। গ্রামের দিঘি খুব নিরিবিলি, তার চারদিকে গাছপালার ভিড ; সেই দিঘিতে নেমে গ্রামের মেয়েরা দিনের দাহ জুড়ায় ও ঘট ভরে। কবির জীবনের অপরাহ্নবেলা কবির জন্য হয়েছে তেমনি তাঁর দিনের দাহ জুড়োবার দিঘি। সেই দিঘির এই অপূর্ব বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

দিনের কর্ম সেরে গায়ের ধুলো নিয়ে এই দিঘিতে নেমে তিনি দিনের দাহ জুড়াবেন, তাঁর দেহমন শান্ত হবে—এই শান্তি হবে তাঁর রাত্রির সম্বল।

ভগবানে একান্ত আত্মসমর্পণ, এইকালে কবিকে কী অপরিসীম শান্তি দিয়েছিল তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এর পরের কবিতা 'ঝড়'। ঝড়ের উদ্দামতা কবির মনে প্রবল সাড়া জাগিয়েছে—কবি যেন প্রলয়ের আনন্দ-বেদনার স্বাদ পাচ্ছেন :

জলে স্থলে শূন্যে হাওয়ায়
ছুটেছে আজ কী ও ?
ঝড়ের 'পরে পরান আমার
উড়ায় উত্তরীয়।

... ... ...

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্‌খানে ?
ফুরিয়ে যাওয়া ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে।

এর পরের 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে পরমদয়িতের জন্য কবির একান্ত প্রতীক্ষার ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। সেই প্রতীক্ষাই আজ কবির জন্য পরম সত্য :

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে।
... ... ...
জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে.
থমথমিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,—
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল,—
শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে?

এর পরের কবিতা 'গান শোনা'। কবি যেন বলতে চেয়েছেন কবির গানের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে বাইরের প্রকৃতির। 'নবমেঘের' ছায়ায় যখন নদী করবে ছলছল তখন যদি বন্ধু নিরিবিলি হয়ে তাঁর গান শুনতে আসেন, তবে কবি তাঁকে গান শোনাতে পারেন। এই নিরিবিলি ভাব আর বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ এ-সব ক্ষুণ্ণ হলে কবির আর গান গাওয়া হবে না।

এর পরের-কবিতা 'জাগরণ'। প্রিয়তমের আসার পথ চেয়ে কবি রাত্রি জেগে কাটাচ্ছেন ; কখনও তাঁর মনে হচ্ছে এই জাগরণ সর্বৈব বৃথা, কখনও তাঁর মনের কোণে আশার রেখা দেখা দিচ্ছে। এই জাগরণের ছবিটি বড় মর্মস্পর্শী হয়েছে :

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,

খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুণবি তারা?

... ... ...

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
পুরানো তোর বাড়ি।
ভাঙা দুয়ার বাদুড়কে ওই
দিয়েছে পথ ছাড়ি।
সন্ধ্যা হতে ঘুমিয়ে পড়ে
যে যেথা পায় স্থান।
জাগে না কেউ বীণা হাতে,
গাহে না কেউ গান!
হেথা কি তোর দুয়ারে কেউ
পৌঁছোবে আজ রাতে?
এক হাতে তার ধ্বজা তুলে
আলো আরেক হাতে!

... ... ...

ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি
ওরে শান্তিহারা,
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস সাড়া?

'হারাধন' কবিতাটিতে মানুষের অভাববোধ, অতৃপ্তিবোধ, এ-সবের কথা বলা হয়েছে। এমন একদিনের কথা ভাবা যেতে পারে যেদিন মানুষের এই অভাব ও অতৃপ্তি-বোধ ছিল না, তার যা আছে তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু অভাব ও অতৃপ্তি-বোধ যখন থেকে জেগেছে সেদিন থেকে তার আর স্বস্তি নেই—সেই অভাব ও অতৃপ্তি-বোধ ক্রমাগত তাকে তাড়িয়ে ফিরছে।

কিন্তু আসলে এই অভাব ও অতৃপ্তি-বোধ কাল্পনিক—মানুষের খেয়াল–

প্রস্তুত। যথার্থত মানুষের চারদিকে ও তার জীবনে যা আছে তাই তার জন্ত যথেষ্ট—মানুষের অশান্তির, অস্বস্তির, সত্যকার কোনো কারণ নেই।

এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে কবি ব্রাউনিঙ-এর এই দুটি বিখ্যাত ছত্রেও :

God's in His heaven
All's right with the world !

ভগবৎ-বোধ মানুষের অন্তরে এমন শান্তি এনে দিতে পারে। সেই বোধের উদয় হলে মানুষ বুঝতে পারে, সবাইকে পালন ও রক্ষণ করছে যে বিশ্ববিধান, সেই বিধানের অনুবর্তী হয়ে মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে—ক্রমাগত অভাব সৃষ্টি করে ও সে-সব মেটাতে চেষ্টা করে মানুষের সত্যকার কল্যাণ নেই।

খেয়ার শেষের দিকের আরো কয়েকটি কবিতায় এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। তবে পরবর্তী কালে কার্যোদ্যমের প্রতি পক্ষপাত কবি বেশি দেখিয়েছেন। অবশ্য তা সত্ত্বেও শান্তি, সন্তোষ, এ-সব মূল্যহীন হয় নি তাঁর চোখে। যথার্থত এ-সব মূল্যহীন নয়।

এর পরের 'চাঞ্চল্য' কবিতায় একটি ঝড় আসার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গাছপালা, দিঘি ও নদীর জল, সব ছিল শান্ত, কিন্তু আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ দেখে সবার অন্তরে এক বিষম চাঞ্চল্য জেগেছে। যেন প্রকৃতি বলছে :

ঐ যে আকাশে পুবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।

এই অজানা বঁধু জীবনে প্রলয়—বিষম ওলট-পালট—ডেকে আনে। আর সেই 'প্রলয়ে'র ভিতর দিয়ে আসে সার্থকতা।

এর পরের 'প্রচ্ছন্ন' কবিতাটিতে আঁকা হয়েছে সর্বজন-অবজ্ঞাত অভাগিনীর তার পরমদয়িতের গৌরবময় আগমনের প্রতীক্ষা। এটি একই সঙ্গে কবির ও তাঁর দেশের প্রতীক্ষার ছবি—কবির, তাঁর পরমবাঞ্ছিতের জন্ত, আর তাঁর দেশের, পরম সার্থকতার জন্ত।

'অনুমান' কবিতাটিতেও কবির প্রতীক্ষার ছবি আঁকা হয়েছে। কবি প্রতিদিন পল্লব-মর্মরে, নবীন তৃণে, লতায়, গাছে, নবমেঘের সজল ছায়ায়,

প্রিয়তমের আগমনের পদধ্বনি যেন শোনেন। তাঁর অনুমান মিথ্যাও হতে পারে, সন্দেহকারীর এই সন্দেহ প্রকাশে তিনি বলছেন :

…মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হ'ক।
ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ।

অপরূপের রূপে কবির চোখ ও মন যে ভুলেছে এই তাঁর জন্য পরম সত্য।

এর পরের দুটি কবিতা হচ্ছে 'বর্ষাপ্রভাত' ও 'বর্ষাসন্ধ্যা'। দুটিতেই কবির পরম আনন্দ ( তাই তাঁর পরম প্রাপ্তি ) ব্যক্ত হয়েছে—এমন আনন্দ যার ফলে—

ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

এর পরের তিনটি কবিতা হচ্ছে 'সব-পেয়েছি'র দেশ, 'সার্থক নৈরাশ্য' ও 'প্রার্থনা'। এই তিনটিতেই কবির পরম সন্তোষ রূপ পেয়েছে। তিনি দেখছেন, এতদিন—

বিরাম ছিল না তপ্ত শয়ন তলে,
কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে ;
দু-হাত বাড়ায়ে কী জানি কী কথা বলে,
কাঙাল চায় যে কারে কে জানে।
দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি
তাহার ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা,
মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী
আজি হারাল রে সব আশা।

কিন্তু তাঁর জীবনের সেই দুর্যোগের রাত্রির অবসান হয়েছে, আজ তিনি বলতে পারছেন—

ধন্য প্রভাতরবি,
আমার লহ গো নমস্কার।
ধন্য মধুর বায়ু
তোমায় নমি হে বারম্বার।

ওগো প্রভাতের পাখি
তোমার কল-নির্মল স্বরে
আমার প্রণাম লয়ে
বিছাও দূর গগনের 'পরে।।
ধন্য ধরার মাটি
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধুলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাতবেলা।

খেয়া কাব্যের শেষ কবিতাটির নাম 'খেয়া'। কবি তাঁর ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখছেন, হাট ভাঙলে দলে দলে মানুষ ঘাটে আসছে আর খেয়ার নেয়ে তাদের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। এখন ওপারে যাওয়া দেখে কবিরও মন কি এক অজানা সুরে গেয়ে ওঠে।

দিনশেষে ওপার কবিকে মুগ্ধ করেছে—এইটুকুই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর বেশি সংবাদ যা পাওয়া যাচ্ছে সেটি এই—কবির মন শান্ত হয়েছে, কোনো অভিযোগ তাঁর নেই।

এই শান্তিতে কবি কী অবশিষ্ট জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন? পরে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

## শিক্ষা

স্বদেশী আন্দোলন প্রধানত ছিল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন—দেশের শাসকদের অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে দেশের লোকদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ। কিন্তু শাসকদের জবরদস্তি আর এ-দেশের লোকদের মনোভাবের প্রতি তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা বাঙালী জাতির অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এর কিছু-কাল পূর্বে থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের চিন্তা বাংলায় মাথা জাগিয়ে উঠেছিল—রবীন্দ্র-জীবনীতে ও আমার 'বাংলার জাগরণে' সে-সবের কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে। এই সবের মিলিত প্রভাবে স্বদেশী অন্দোলনের প্রবল উত্তেজনার দিনে জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন বাংলার সর্বসাধারণের ও নেতাদের বিশেষ ভাবনার বিষয় হলো। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই দেশের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। তার

পরিচয় বহন করছিল তাঁর বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়। স্বদেশী আন্দোলনের এই জাতীয় পুনর্গঠনের ভাবনার দিনে বিশেষভাবে তাঁর ডাক পড়ল। গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে :

> এই আন্দোলনের ফলে যে 'জাতীয় শিক্ষাসমাজ' বা 'জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রাক্কালে আহূত বিভিন্ন মন্ত্রণাসভা, গঠন-প্রণালী-আলোচনা-সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ও তাহার পর ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নানা কর্মভারের সহিত রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন যুক্ত ছিলেন।

কবির 'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম লেখাটি ও তার অনুবৃত্তি ভিন্ন আর সব লেখাই এইকালের জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনের তাগিদে লিখিত।

এর প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' সুবিখ্যাত। এটি কিন্তু কয়েক বৎসর আগেকার লেখা—সাধনার যুগে, ১২৯৯ সালে, রাজসাহী এসোসিয়েশনে এটি পঠিত হয়েছিল।

বাঙালীর ছেলের শিক্ষা যে সূচনা থেকেই শুরু হয় ইংরেজিতে এই ঘোর অস্বাভাবিক অথচ বহুল-প্রচলিত ব্যবস্থা এই লেখাটিতে কবির মুখ্য আলোচনার —অথবা চিত্রণের—বিষয় হয়েছে। লেখাটি সেইদিনে বঙ্কিমচন্দ্র, জস্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছু এর লাভ হয়নি। এর কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। তা থেকেই ভাল বোঝা যাবে এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে শুধু কবির বক্তব্য নয়, তাঁর বেদনাও :

> যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব-জীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।......অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।
>
> কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে।

……সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে। বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরেজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরেজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।…… কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালি ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।……তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনিই পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ., এম. এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না।…… ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনই একটা শিক্ষা-পুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয়তা সম্বন্ধে কবি আরও বলেছেন :

……বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আঠা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং মাখিয়া উল্‌কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতী বিদ্যা আমরা

সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে।...... আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ একপ্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ অভিধানের সেতু। এইজন্য......দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন,······কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনও সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথনির্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য।

আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার এমন অসামঞ্জস্য যে ঘটেছে, কবির মতে এইটিই আমাদের জীবনে একটি বড সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য, এই হেরফের, কেমন করে ঘুচবে ? কবির উত্তর : বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সাহায্যে—

যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপের দর্শনে

বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করাইয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।......এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।......যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

আমাদের জাতীয় জীবনে, অথবা আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, ভাষা ও ভাবের যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল কবি তার প্রতি দেশের মনোযোগ যথাযোগ্যভাবেই আকর্ষণ করেছিলেন। সেইদিনে তাঁর চেষ্টা তেমন সাফল্যযুক্ত না হলেও উত্তরোত্তর এটি প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। বাংলা সাহিত্য যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে চলেছিল তাও বাঙালীর এই ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্য ঘোচাতে অনেকটা সাহায্য করেছিল।

তবে কবি আমাদের জাতীয় জীবনের যে সংকট প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেটি শুধু ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্যজনিত সংকট নয়। এই সংকটের মূল আরও গভীরে—বলা যেতে পারে এটি পুরাতন ও নূতনের সংঘর্ষজনিত সংকট, প্রাচ্য

ভাবধারার ও প্রতীচ্য ভাবধারার সংঘর্ষজনিত সংকট। যেখানে ভাব ও ভাষার ব্যবধান তেমন নেই, সেই সব দেশেও এমন তীব্র ভাব-বিরোধ দেখা দিয়ে চলেছে। তবে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অনাদর আর উৎকট ইংরেজি-প্রীতি কবির হাতে যে কঠিন আঘাত খেয়েছিল তার ঐতিহাসিক মূল্য অবিস্মরণীয়।

'শিক্ষার হেরফের অনুবৃত্তি'তে কবি তাঁর ইংরেজিনবিশ প্রতিবাদীদের অসন্তোষ বিনীত বাক্যে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন।

'শিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধটি 'ভাণ্ডারে' বেরিয়েছিল ১৩১৩ সালে আষাঢ় সংখ্যায়। আয়রলণ্ডবাসীদের পরম্পরাগত জ্ঞানচর্চা ও মাতৃভাষা বিজেতা ইংরেজের দ্বারা কিরূপে বিনষ্ট হয়, সংক্ষেপে সেই ইতিহাস কবি এতে বিবৃত করেছেন। আয়রলণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করে কবি বলেন, বাংলা-দেশের দশা অবশ্য আয়রলণ্ডের মতো হয়নি, কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন কেমন করে এদেশেও সরকারের তরফ থেকে জাতীয় ভাব ও ভাষা দলনের চেষ্টা চলেছে।

পরিশেষে তিনি উদ্ধৃত করেছেন টলস্টয়ের একটি উক্তি যাতে একালের য়ুরোপের এই গুরু স্পষ্টভাবেই বলেছেন কেমন করে স্বৈরাচারী জারের অধীনে রাশিয়ার সত্যকার জ্ঞানচর্চা বিঘ্নিত হয়েছে। টলস্টয় অবশ্য তাঁর জাতিকে নির্দেশ দেন গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে, এমন কি তা প্রত্যাখ্যান করে, দেশের সত্যকার শ্রীবৃদ্ধিতে মন দিতে।

কবি তাঁর দেশের লোকদের যতটা স্বাবলম্বী হতে বলেছিলেন তা অবশ্য সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের অর্থ ভালো করে উপলব্ধি করবার চেষ্টাও সেদিন তেমন হয় নি।

এর পরের 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভ্যদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কবি পাঠ করেন ওভারটুন হলে (২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩)। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কবির শিক্ষাদর্শন যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে এতে। তাঁর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এতদিন তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন এতে তাঁর সেই সব অভিজ্ঞতা বৃহত্তর দেশের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

সংক্ষেপে কবির বক্তব্য এই: 'জাতীয়' কথাটার উপরে তখন খুব জোর পড়েছিল, কবি প্রথমে এই প্রশ্ন তোলেন:

শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়। 'জাতীয়' শব্দটার কোনো

সীমানির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

প্রচলিত ইস্কুল সম্বন্ধে কবি বলেন :

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাষ্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাতা কলেছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

আমাদের ইস্কুল য়ুরোপের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবি বলেন :

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানাভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে—লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ...এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব।

কবি তাই দেখছেন য়ুরোপের অনুকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে নিষ্ফল হয়েছে।

কবির মতে আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে "বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয় মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে

বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতা-সম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।"

এই সম্পর্কে কবি অবতারণা করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনে গুরুগৃহে বাসের কথা; আর সেই ভাবধারা বর্তমানে যাতে কিছু পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় সেই টোলের কথা। টোল বা চতুষ্পাঠী সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন :

চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ওই পড়া লইয়াই আছেন; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না; সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই সে-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক ছিল। ব্রহ্মচর্য পালন সম্বন্ধে কবি বলেন :

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ-অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য।

তখন শিক্ষাদানের ব্যাপারে নীতি-উপদেশের উপরে খুব জোর দেওয়া হ'ত। সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কবি বলেন :

নীতি-উপদেশ......কোনো মতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়...... সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রার হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে

প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভুরি ভুরি জ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

নীতি-উপদেশের তুলনায় ব্রহ্মচর্যপালনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কবি বলেন :

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্য ভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

সুশিক্ষার জন্য এই প্রয়োজনীয় পরিবেশ সম্পর্কে কবি আরও বলেন :

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয় তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট-কাট-পাথরের কোলে ভূমিষ্ট হইয়া আমরা মানুষ হইব বিধাতার এমন বিধান ছিল না।

দেহ ও মন দুয়েরই সুবিকাশের জন্য প্রকৃতির সংস্পর্শ যে কত অর্থপূর্ণ সে সম্বন্ধে কবির এই উক্তিটি সুবিখ্যাত :

বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতি-নাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির

উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে, এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সঞ্চিত বাতাসে চঞ্চল নানা বর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।

শিক্ষা সম্বন্ধে এই সারগর্ভ চিন্তা আমাদের দেশে অনেকখানি নতুন। কালিদাসের (ইংরেজ রোমান্টিক কবিদেরও) প্রকৃতি-প্রেম থেকে আর তাঁর নিজের আবাল্য গভীর প্রকৃতি-অনুরাগ থেকে এই বিশেষ চেতনা কবির লাভ হয়। কবি তাঁর এই চেতনার প্রতিধ্বনি পান উপনিষদের মন্ত্রেও :

সো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

এই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে কবি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন অল্প-স্বল্প কৃষি-পালন ও গোপালন আর চৌকি টেবিল ডেস্কের পরিবর্তে মাটিতে আসন পেতে বসার ব্যবস্থা, কেন না, কবির মতে "সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা —বহু আয়োজনের জটিল বর্বরতা, বস্তুতঃ তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল।" এই শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত গুরু কেমন করে পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে কবি বলেন :

আমরা যাহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়-মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে।......এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন।

এর পর কবি সম্মুখীন হন এই প্রশ্নের—লেখাপড়া শেখবার জন্য ঘর থেকে ছাত্রদের দূরে পাঠানো তাঁদের পক্ষে হিতকর কিনা। কবির উত্তর এই :

……ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারিদিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে—বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়, জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি—সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধ-ভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে—কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়।

কবির ব্যাখ্যাতে এই শিক্ষাদর্শের প্রতি দেশের মন অবশ্য অনুকূল হয় নি। কিন্তু কবি যে একটি অর্থপূর্ণ আদর্শ দেশের সামনে ধরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের রূপ এতে কিছু বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল; কিন্তু তার চাইতে অনেক বড় ব্যাপার, শিক্ষা সম্বন্ধে কবির যে মূল্য-বোধ এতে ব্যক্ত হয়েছিল সেইটি। প্রকৃতির সাহচর্যে, অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর ও অজটিল

পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মন ও দেহ দুয়েরই বেড়ে উঠার সুযোগ, গুরুদের প্রতি সবার বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ—শিক্ষা সম্বন্ধে বাস্তবিকই এ-সব সর্বকালের জন্য মূল্যবান চিন্তা। কবির এই লেখাটি সম্বন্ধে সেইদিনে চট্টগ্রামের কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত এই সমালোচনা করেছিলেন :

> আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষাদান প্রণালী পরিবর্তন করিলে তেমন সার্বজনীন সাম্যভাব সর্বথা রক্ষিত হইতে পারিবে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে। আশা ছিল তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান বালক-বৃন্দের শিক্ষার একটা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। দুঃখের বিষয় সে আশা তেমনভাবে পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অভীপ্সিত ব্যবস্থা কেবলমাত্র হিন্দুসন্তানগণেরই সর্বাংশে উপযোগী ও কল্যাণকর হইলেও হইতে পারে। (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)

এই সম্পর্কে কবির বক্তব্য কিছু বিশদভাবে পাওয়া যাবে তাঁর এইকালেরই লেখা 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে। যথাস্থানে তার উল্লেখ হবে।

এর পরের প্রবন্ধ 'জাতীয় বিদ্যালয়'—পঠিত হয় কলিকাতার টাউন হলের এক বিরাট সভায় (২৯ শ্রাবণ ১৩১৩)। বাঙালী জাতির সম্মিলিত চেষ্টায় এমন একটি কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলো এইজন্য কবি গভীর আনন্দ ও আশা ব্যক্ত করেন। কবির বক্তব্যের একটি অংশ এই :

> আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল—এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না,—সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে ; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য

নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।

কবির কামনার ব্যাপকতা লক্ষণীয়।

এই বিদ্যালয় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পরিণত হয় College of Engineering and Technology-তে, আর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এর পরের প্রবন্ধ 'আবরণ'ও ১৩১৩ সালে লেখা। এই লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে যথাসম্ভব সহজ হবার কথা ভুলে গিয়ে আমরা দেহ, বিশেষ করে শিশুর দেহ কত অনাবশ্যক আবরণে আবৃত করি, মনকে কত অনাবশ্যক পুঁথির ভারে ক্লিষ্ট ও বিকৃত করি, সে সম্বন্ধে কবি অনেক স্মরণীয় কথা বলেছেন। তাঁর কিছু কিছু উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি:

> অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি,—সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে-সৌভাগ্য হইবে! সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগ্য ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টার বাতাস-আকাশ, মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে—সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়।...... লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না, বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমতো বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে

আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে।... .. বইয়ের মানুষ তৈরি করা কথা বলে, তাহারা যে সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার, কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেই-খানেই যে তাহার মস্ত জিৎ—এইজন্য তাহার কথা তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা, তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। ... যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলো আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদ-রচনা হইয়াছে', এই সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি—বইয়ের অক্ষরগুলা কাটকুটহীন নির্বিকার, তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে—তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলি যে কি করিয়া তৈরি হইতে থাকে, তাহা প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

'আবরণে' য়ুরোপীয় মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি আছে, (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২ খণ্ড, পৃঃ ৩২৬) সেটি মোটের উপর কবির একটি অসতর্ক মুহূর্তের উক্তি। ওই অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত না হওয়াই সঙ্গত। একালে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের য়ুরোপীয় রুচি প্রাচ্য দেশেও সংক্রামিত হচ্ছে।

পরিশিষ্টের লেখাগুলো ছিল সাময়িক প্রসঙ্গ—এ-সবের প্রধান মূল্যও ছিল সেই ক্ষেত্রেই। 'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা' লেখাটিতে কবি মত

প্রকাশ করেন যে, মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের শিক্ষানায়কের পদে বরণ করা সঙ্গত।

শিক্ষা সম্বন্ধে কবির আরো কিছু উৎকৃষ্ট রচনার সঙ্গে পরে আমাদের পরিচয় হবে।

## বিচিত্র প্রবন্ধ

'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য', সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ-সংগ্রহগুলো তাঁর গদ্য গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন ভাগরূপে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে। আমরা পর পর এই প্রবন্ধ-সংগ্রহগুলোর আলোচনা করবো। তাতে সাহিত্য সম্বন্ধে কবির অনেক চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারবো। তাঁর জীবনের শেষের দিকেও সাহিত্য সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেন, যথাস্থানে সে-সবের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হবে।

'বিচিত্র প্রবন্ধ' গদ্য-গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এতে যে-সব লেখা সংগৃহীত হয়েছিল পরে তার অনেকগুলো কবির অন্যান্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ লেখা হয়েছে:

> এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।

আমরা দেখব শুধু রচনারসসম্ভোগ নয়, এক ধরনের বিষয়বস্তুর গৌরবও কবির এই রচনাগুলোকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সার্থক রম্য-রচনাও জ্ঞানগর্ভ। তবে রম্যতা যে তার একটি প্রধান আকর্ষণস্থল তা মিথ্যা নয়।

এর প্রথম প্রবন্ধ 'লাইব্রেরী' ১২৯২ সালে লেখা—অর্থাৎ কবির প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে। লাইব্রেরীর বিচিত্র জ্ঞানসম্ভারের সামনে কবির সুগভীর বিস্ময় এতে রূপ পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে রূপ পেয়েছে তরুণ কবির নতুন আশা:

> বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের এইই বড় কাজ—বিশ্বসাহিত্যকে তা সমৃদ্ধতর করে

এর পরের প্রবন্ধ 'মা-ভৈঃ'—অর্থাৎ মৃত্যুর সামনে ভীত হয়ো না। এটি লেখা ১৩০৯ সালে।

মৃত্যুর সামনে অভয়ের চিত্র কবি বহু এঁকেছেন। সেদিনে বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ কিছু বেশি রটেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এটি লেখা। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ এই :

> যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

উপসংহারে সহমরণেচ্ছু সেকালের বাঙালী সীমন্তিনীদের অসাধারণ সাহসের প্রশংসা কবি করেছেন। কিন্তু এই সব সহমরণে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের সাহসের পরিচয়ই ছিল না, যাকে বলা হয় প্রবল জন-অভীপ্সার প্রভাব তাও ছিল। সেইটি রামমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এর পরের প্রবন্ধ 'পাগল'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ রচনা—১৩১১ সালে লেখা—লেখা হয় মজঃফরপুরে। সেখানে কবির পুত্র কিশোর রথীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে হিমালয়ের দুর্গম তীর্থ কেদারনাথ পরিভ্রমণ করে পিতার সঙ্গে মিলিত হন। কবি পুত্রের এই কৃচ্ছ্রসাধনায় আনন্দিত হন। (রবীন্দ্র-জীবনী দ্রষ্টব্য)

আমাদের প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব ঘটে। তার ফলে আমাদের জীবনে অনেক ভাঙচুর ঘটে বটে, কিন্তু তারই প্রভাবে আমাদের জীবনে নতুন স্বাদ নতুন লাবণ্য দেখা দেয়। কবি মানবজীবনে সেই অপ্রত্যাশিতের ও অভাবনীয়ের মহিমা কীর্তন করেছেন এই লেখাটিতে।

> প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারি দিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিতেছিলাম, আপিসের বড়ো সাহেবের মতো অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবি লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়ো সাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো,

সেই মস্ত যে হিসাবি পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে স্থলে আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এইকালে কবির অন্তরে যে প্রবল ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাবের সঞ্চার হয়েছিল, বলা যেতে পারে, এই লেখাটি তাহারই একটি স্মরণীয় মুহূর্তের রূপায়ণ। গদ্যে লেখা হলেও আসলে এটি কবিতা।

এর পরের প্রবন্ধ 'রঙ্গমঞ্চ'—১৩০৯ সালে লেখা। য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের যে বাহুল্য কবি অপছন্দ করেছেন, আর আমাদের দেশের যাত্রা আদির দৃশ্যপট সম্বন্ধে অনাড়ম্বর ও অজটিল ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন।

মেয়েদের ভূমিকা শুধু মেয়েদের দ্বারাই অভিনীত হবে এটিও তিনি অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন। অবশ্য যুগধর্মের এই শেষোক্ত দাবি অতিক্রম করা শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষেও সম্ভবপর হয় নি। তবে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চ কবির চিন্তা ও রুচির দ্বারা অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল, আর দৃশ্য-পটের সেই অপ্রতুলতায় অভিনয়ের কোনো অঙ্গহানি হয় নি।

এর পরের প্রবন্ধ 'কেকাধ্বনি'।

কেকাধ্বনি মধুর নয়, তবু কাব্যে কেন এর প্রশংসা করা হয়েছে, এর বিশিষ্ট আবেদনটি, সেই কথা কবি বলেছেন। কবির বক্তব্যের একটি অংশ এই :

> কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়,—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

এর পরের প্রবন্ধ 'বাজে কথা'। কবি যে সাহিত্যে Art for art's sake মতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তা আমরা জেনেছি। তা সত্ত্বেও অবশ্য তাঁর

রচনায় গভীর চিন্তা ও গভীর শুভবুদ্ধি বিপুলভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শ্লেষ-উজ্জ্বল 'বাজে কথা' লেখাটির একটি ক্ষুদ্র অংশ এই :

> সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সে অবস্থার প্রলাপ।······ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী,—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘনির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

'বাজে কথা'র পরের লেখাটি 'পনেরো-আনা'। এটিও 'বাজে কথা' জাতীয়। কবি বলেছেন, সংসারে সাধারণত পনেরো-আনা লোককে অনাবশ্যক জ্ঞান করা হয়, আর এক-আনাকে জ্ঞান করা হয় আবশ্যক। কিন্তু আসলে—

> এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমারই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশী যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারে পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

এর পরের 'নববর্ষা' লেখাটিতে কালিদাসের মেঘদূতের প্রতি কবির সুগভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

'পরনিন্দা' লেখাটি সম্পর্কে প্রভাতবাবু বলেছেন :

> পরের ছিদ্রান্বেষী সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ না করিলেও তাঁহার সমালোচকের অভাব কোনোদিনই হয় নাই।······কবিকে নিন্দিত ভর্ৎসিত তিরস্কৃত উপহসিত করা করা ছিল অনেকের অহেতুক আনন্দ।......নির্দয় সমালোচনার ব্যথাটা কবি বিদ্রূপের হাস্যরস দিয়া লঘু করিয়াছেন : দার্শনিকভাবে জীবনটাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন ; "সাধারণতঃ মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায় তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনোই সাধারণভাবে

সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য।......এইরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।"

'বসন্ত-যাপন' লেখাটিতে বসন্তের আগমনে কবির গভীর আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে। আলো-বাতাসের স্পর্শে কবির এমন সুনিবিড় আনন্দ ছিন্নপত্রাবলীতেও ব্যক্ত হয়েছে। এর একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব, তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা।......পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ-কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন ? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার এ-কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ-কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

বিষয়বস্তুর গৌরবও যে কবির রম্য-রচনায় আছে তা বোঝা যাচ্ছে।

এর পরের লেখা 'রুদ্ধগৃহ'—১২৯২ সালে 'বালক' পত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। কবি তাঁর নতুন বৌঠাকরুণের মৃত্যুতে কত গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি'তে তার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু শোক-দুঃখের ঊর্ধ্বে যে আলো ও আনন্দের রাজ্য রয়েছে তার জন্য কবির গভীর কামনা আমরা তাঁর পত্নী-শোকের দিনে দেখেছি; এই 'রুদ্ধগৃহ' লেখাটিতেও কবির তেমনি কামনা ব্যক্ত হয়েছে। শোকাভিভূত অবস্থা কবির জন্য যেন রুদ্ধগৃহে বাস। এর একটি অংশ এই :

> পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাইবোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোনো ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক

নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক।

এর পরের লেখাটি 'পথপ্রান্তে'ও ১২৯২ সালে লেখা। 'রুদ্ধগৃহের' অনুরূপ ভাব এতেও ব্যক্ত হয়েছে। এর একটি অংশ এই :

> প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি—সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভুলাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া তোমাকে যা-হ'ক একটা কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই একটা কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্তযাত্রার অবসান হইত—অন্য পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার জো নাই। একটিকে ভালবাসিলেই আর-একটিকে ভালবাসিতে শিখিবে—অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

অল্পবয়সেও গতি কবির জন্য কত অর্থপূর্ণ ছিল তা লক্ষণীয়।

বিচিত্র প্রবন্ধের শেষের দুটি লেখা হচ্ছে 'ছোটনাগপুর' ও 'সরোজিনী প্রয়াণ'। দুটিই হৃদ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—প্রথমটি স্থলপথে, দ্বিতীয়টি জলপথে। দ্বিতীয়টিতে সেইদিনের চিৎপুরের আর গঙ্গাতীরের স্মরণীয় বর্ণনা আছে।

## প্রাচীন সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্য গদ্য গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কবির একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের নানা আলেখ্য কবির কল্পনার আলোকে চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে এতে।

এর প্রথম প্রবন্ধ 'রামায়ণ'। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা-স্বরূপ এটি লেখা হয়েছিল ১৩১০ সালে।

কাব্যকে কবি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছেন—কোনো কাব্য একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা :

> একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার

নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই—ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

রামায়ণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রামায়ণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।

কবির মতে—

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি, ইহা হইতে তাহা বুঝা

যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের সে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে।

যে-সব সমালোচক বলেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হয়ে উঠে, কোন্‌খানে যথাযথের সীমানা আর কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়ে পৌঁছে তার মীমাংসা কঠিন হয়, তাঁদের কথার উত্তরে কবি বলেন :

> ... ...এ-কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে রামায়ণকথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণকথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে—ইহা তাহাদের কাব্য।

কিন্তু কবির এই কথা পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। কবি নিজে উত্তররামচরিতের সীতা-বিসর্জন সমর্থন করতে পারেন নি। তেমনি রামায়ণের শম্বুক-পর্ব কালিদাস সমর্থন করলেও একালের পাঠকরা সমর্থন করতে পারেন না।

রামায়ণ ও মহাভারত যে যুগের পর যুগ ধরে অতুল জনসমাদর লাভ করে এসেছে তা মিথ্যা নয়। কিন্তু একালে সেই সমাদর যে কিছু হ্রাস পেয়েছে তাও মিথ্যা নয়। তার কারণ, আমাদের দেশের মানুষেরও দৃষ্টিভঙ্গির ও রুচির যথেষ্ট পরিবর্তন কালে ঘটেছে। এই লেখাটির শেষের দিকে কবি বলেছেন :

> পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

কবির এই উক্তি হয়ত অনেকেই যথার্থ বলে মেনে নেবেন না, কেন না

সমালোচনাকে তাঁরা পক্ষপাতহীন বিচার-কর্ম বা মূল্যায়নের চেষ্টা বলেই জানেন। জীবনীকার প্রভাতবাবুও কবির এই উক্তি যথার্থ বলে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু কবির এই উক্তিতে সত্যের পরিমাণ যথেষ্ট। তার বড় কারণ, সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে হৃদয়ধর্মের প্রভাব কম নয়। সাহিত্যের বিচারও তাই হৃদয়ধর্মের সঙ্গে যোগশূন্য হলে গঠনধর্মী না হয়ে ধ্বংসধর্মী হয় বেশি। অবশ্য হৃদয়ালুতা সর্বথা বর্জনীয়।

এর দ্বিতীয় লেখাটি 'মেঘদূত'।

কালিদাসের 'মেঘদূত' চিরদিন কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে—যা সুদূর যা অনায়ত্ত তার জন্য সুনিবিড় কামনা জানিয়েছে। এর পরের দুইটি প্রবন্ধ হচ্ছে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' আর 'শকুন্তলা'। দুটিই বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল—প্রথমটি ১৩০৮ সালে, দ্বিতীয়টি ১৩০৯ সালে। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে দুটিই প্রসিদ্ধ। সাহিত্য-সম্বন্ধে কবির বিশিষ্ট চিন্তা এই দুটিতে প্রথম রূপ পায়।

য়ুরোপের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা কোথায় এই সন্ধানে আমরা কবিকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত দেখি তাঁর বঙ্গদর্শনের যুগে; সাহিত্যেও ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য কোথায়, এই দুটি লেখায় কবি বিস্তারিতভাবে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। কবি তাঁর বক্তব্য পরিচ্ছন্ন করে তুলতে চেষ্টা করেছেন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র শেষ অনুচ্ছেদে:

> একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব! সংসার মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না,—তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদানপ্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবক-নরশিশুতে খেলা করিতেছে, তেমনি, তাঁহার কাব্যতপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত

সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী, হ্রী এবং কল্যাণে উদ্‌ভাসমান; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একপরায়ণ এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। এই সৌন্দর্যে নর-নারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরম স্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এই জন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।

কবি সাহিত্য সম্পর্কে যে মহৎ আদর্শে আনুগত্যের কথা বলেছেন সে সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। কারো কারো মতে সাহিত্য জীবনের ছবি —তা আদর্শের বা নীতির আনুগত্য স্বীকার করতে পারে, নাও পারে। এই মতের বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যায়, মানুষের জীবন যখন সামাজিক ব্যাপার তখন সে জীবন নীতি-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই দিক দিয়ে কবির কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে হবে। আর ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের কথা তিনি যা বলেছেন তারও উচ্চমূল্য অনস্বীকার্য, তবে সাহিত্যের সাধারণ প্রবণতা জীবনের ছবি আঁকার দিকেই এ মিথ্যা নয়। আর সে ছবি সব সময় ঠিক নীতিধর্মী হয় না। আমাদের সাহিত্যেও তেমন ছবি হচ্ছে মধুসূদনের 'সোমের প্রতি তারা' আর রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'। তবে এ-সব ছবি নীতিধর্মী না হলেও নীতিবিরুদ্ধ ঠিক নয়, কেন না, জীবনের গভীর সত্য এ-সবে রূপ পেয়েছে—সেই সব সত্যের প্রতি আমরা অচেতন থাকতে পারি না। অচেতন হয়ে আমাদের কল্যাণ নেই। যাই হোক, এই সব জটিল ব্যাপারের দিকে বেশী মন না দিয়ে আমরা কবির কথা মোটের উপর স্বীকার্য বলে গ্রহণ করতে পারি। কবি Art for art's sake-বাদী বলেই নিজেকে জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টিতে তিনি গভীরভাবে কল্যাণবাদী। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও শেষ পর্যন্ত তাই।

কবি শকুন্তলা চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অপূর্ব হয়েছে এবং সে ব্যাখ্যা সবারই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার যোগ্য। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের মিরান্দা চরিত্রের সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করতে গিয়ে মিরান্দা চরিত্রের প্রতি তিনি পুরো সুবিচার করতে পারেন নি মনে হয়। মিরান্দা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

মিরান্দাকে আমরা তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সেই দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই।

তাহার সেই আশৈশব ধাত্রীভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া আনিতে গেলে তাহার কোনো জায়গায় টান পড়িবে না। সেখানে মিরান্দা মানুষের সঙ্গ পায় নাই, এই অভাবটুকুই কেবল তাহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানকার সমুদ্র-পর্বতের সহিত তাহার অন্তঃকরণের কোনো ভাবাত্মক যোগ আমরা দেখিতে পাই না।

কিন্তু কোনো কোনো শেক্‌স্‌পীয়র-বিশেষজ্ঞ এর বিপরীত কথা বলেছেন। তেমন একটি মত আমরা উদ্ধৃত করছি :

Miranda is "created of every creature's best"; she is the wonder-child of the enchanted island, wellnigh too ethereal to be mated to any of the sons of men. Reared among the 'untrodden ways' she has drawn into her blood the influences of this tropical solitude. She might have inspired the modern poet's vision of a maiden moulded into grace by 'the silent sympathy' of elemental things :

"The stars of midnight shall be dear<br>
To her , and she shall lean her ear<br>
In many a secret place<br>
Where rivulets dance their wayward round,<br>
And beauty born of murmuring sound<br>
Shall pass into her face."

Save her father, and the half-brute Caliban, whom she fears to look on, she has known no human creature, and her character is without the complexity bred by artificial surroundings. The primal instincts of womanhood, as Shakespeare conceived them, tenderness, modesty, simple faith in good, alone stir her breast. So unlearned is she in worldly experience that when Ariel's music draws Ferdinand to her father's cell she takes him for a spirit, "a thing divine". The prince, in equal amaze, salutes her as "the goddess on whom these airs attend."—Boas, *Shakespeare and his Predecessors.* *

* The Modern Readers Shakespeare—Vol.IX—Tempest.

Tempest নাটকখানিরও মর্যাদা কবি কিছু কম দিয়েছেন মনে হয়। মানুষ ও সভ্যতা-সম্বন্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের বিচিত্র ধরনের চিন্তা Tempest-এ রূপ পেয়েছে।

শেক্‌স্‌পীয়রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কবির পূর্ণতর অবধান আমরা পাব তাঁর 'সাহিত্যে'র 'পত্রালাপ' লেখাটিতে।

কুমারসম্ভব সম্বন্ধে কবির সব মন্তব্যই যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। কিন্তু শকুন্তলার দুর্বাসার শাপকে কবি যতটা কম মূল্য দিয়েছেন, মূল শকুন্তলায় তা দেওয়া হয় নি বলেই মনে হয়। আর মূল শকুন্তলায় শকুন্তলার তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত সহজেই আমাদের বোধগম্য হলেও রাজার তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত যে তেমন সহজবোধ্য হয়েছে তা বলা যায় না। শকুন্তলাকে রাজা যে চিনতে পারেন নি এজন্য তিনি দুঃখিত, কিন্তু দুঃখিত হওয়ার অতিরিক্ত অপরাধবোধ তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায় নি—কেউ তাঁর অপরাধের কথা বলেনও নি, সবাই বলেছেন দুর্বাসার শাপের কথা। শকুন্তলা সম্বন্ধে গোটের সুবিখ্যাত উক্তিটি অবশ্য সম্পূর্ণ স্বীকার্য, কিন্তু স্বীকার্য হয়েছে বিশেষভাবে শকুন্তলার তপস্যার জন্যই। শকুন্তলার চরিত্রেই প্রকাশ পেয়েছে তরুণ বৎসরের ফুল আর পরিণত বৎসরের ফল।—এর পরের লেখাটি হচ্ছে 'কাদম্বরী চিত্র'। কাদম্বরীর লেখক বাণভট্ট বর্ণনায় অসাধারণ কুশলী ছিলেন কবি তাঁর সেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে বাণভট্ট সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই:

> সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প বলে—বাণভট্ট পর পর চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন—এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারাবাহিক, তাহা নহে, এক একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্যবিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া, ফ্রেমসমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র শেষ লেখাটি হচ্ছে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। এটি একটি সুবিখ্যাত রম্য-রচনা। অত্যন্ত জনপ্রিয় এটি।

## লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য গদ্য-গ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রধান লেখা 'ছেলে ভুলানো ছড়া' কবির মন্তব্য-সহ 'সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা'য়

প্রকাশিত হয় ১৩০১-১৩০২ সালে অর্থাৎ সাধনার যুগে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেন :

আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপজল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে—সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।

শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে-রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়িভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে-বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে,—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে।

কী গভীর আনন্দ নিয়ে কবি এই সব ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে কবির ছিন্নপত্রাবলীতে।*

প্রবন্ধাকারে লেখা হলেও এগুলো আসলে কবিতার মতো এক অপূর্ব নতুন সৃষ্টি—কবির সংগঠনী কল্পনার আলোকে বাংলাদেশের অতিপরিচিত গ্রাম্য মেয়েলি ছড়া এক অসাধারণ সাহিত্য-সম্পদ হয়ে উঠেছে। বার বার পাঠেও এই সব লেখার মাধুর্য হ্রাস পায় না, তার কারণ আমাদের প্রিয় শিশু ও তার জগৎ এই সব লেখায় প্রিয়তর হয়ে উঠেছে। আমরা কবির কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি :

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী

* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ দ্রঃ।

আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণ-শক্তি বর্তমান লেখকের নাই। একথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

এইসকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে।......এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন আজও তেমনি আছে, সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে,.... বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক .... বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাববশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ।

শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এইসকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয় তাহাতে ক্ষতি নাই, বরঞ্চ ভালোই। কারণ নূতনত্বে চিত্তে আরও অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে

অদ্ভুত কিছুই নাই, কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষ সীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারিদিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে সকলই সম্ভব।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে।

প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত—আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা-খুকুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় নহে। তাঁহারা যে-জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে আমার অপেক্ষা আর-কিছু কেন প্রধান হইবে। আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না। সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনও সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায় মর্ত্য পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ আর কী হইতে পারে। তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সকল যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

......যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানে তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। ওই যে বলা হইয়াছে

নিরালে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি

ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্য অরণ্যের

নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, মনে হয়, সমস্ত সংসার, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।

......ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশের মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম সম্বন্ধসকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়, এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্ত্যের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে—সেও অতি সহজে অবহেলে—তাহার জন্য চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানব-জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।

'ছেলেভুলানো ছড়া'র পরের লেখাটি হচ্ছে কবি-সংগীত—১৩০২ সালে লেখা। কবি-সংগীতে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সম্পদ কবি পান নি। তবে আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ইতিহাসের এটি যে একটি অঙ্গ তা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে আমাদের আধুনিক সাহিত্য যে রাজসভা ত্যাগ করে পৌরসভায় আতিথ্য গ্রহণ করে, এই গানগুলি তার প্রথম পথপ্রদর্শক।

কবির মতে কবি-সংগীত যেমন সাধারণের মনোরঞ্জনের উপযোগী ক্ষণিক সাহিত্যই ছিল, আমাদের একালের খবরের কাগজ ও নাট্যশালাগুলিও অনেক পরিমাণে সেই ক্ষণিক মনোরঞ্জনের কাজই করে যাচ্ছে। তবে তিনি আশা করেছেন অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হবে যে অবসর-বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য ও দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যাবে।

গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধটি কবি লেখেন ১৩০৫ সালে। আমাদের দেশে যে-সব গ্রাম্য ছড়া বা গান এখনো পাওয়া যায় সে-সবকে কবি দুই ভাগে ভাগ

করে দেখেছেন হরগৌরী আর কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরীর গানকে কবি বলেছেন সমাজের গান :

......হরগৌরীর কথা, ছোটো-বড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরী প্রসঙ্গে আমাদের একান্ন পারিবারিক সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য তেজোগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রী দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।

আর রাধাকৃষ্ণের গানকে কবি বলেছেন সৌন্দর্যের গান :

রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এইজন্যই তাহা ছড়ায় গানে যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে—সৌন্দর্যসূত্রে নরনারীর প্রেমের আকর্ষণ সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচারিত। কেবল সামাজিক কর্তব্যবন্ধনে ইহাকে সম্পূর্ণ কুলাইয়া পায় না। সমাজের বাহিরেও ইহার শাসন বিস্তৃত। পঞ্চশরের গতিবিধি সর্বত্রই, এবং বসন্ত অর্থাৎ জগতের যৌবন এবং সৌন্দর্য তাঁহার নিত্য সহচর।

সামাজিক কর্তব্য-বন্ধনের সঙ্গে এই প্রেমের আকর্ষণের বিরোধ বৈষ্ণব সাহিত্যে কেমন রূপ পেয়েছে সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

বৈষ্ণব পদাবলীতে......সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে-গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা-ভয়-লজ্জা-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য কঠিন কুলাচার-লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ্য রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ-সংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

এই সমাজবন্ধন-বিরোধী প্রেম সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন :

এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মানব-প্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। ......আমাদের দেশে যখন বন্ধনহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ

তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য,—বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।……তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে, তেমনি সৌন্দর্য ও ভাবের বেগে সেই সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নিচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ-মধ্যে পূত সূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি বিদ্যা-সুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতির নিপুণ পরিহাস।

কবির সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, শেষ পর্যন্ত বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ দিয়ে ভারতচন্দ্র তাদের প্রেমকে সমাজধর্মী করেছেন।—উপসংহারে কবি বলেছেন, বাংলার গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তুলনায় অল্প। সীতারামের কাহিনীর মনুষ্যত্ববর্ধক গুণাবলী সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রসার সংকীর্ণ—তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না।……তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। ……রামায়ণ-কথায়……সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত।……বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপর যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।

কবি বলেছেন, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। কবির কথা আংশিকভাবেই সত্য। যে-সব অঞ্চলে রামসীতার কাহিনী বেশী প্রচলিত সেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে রামসীতার শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীর উপরে জোর পড়েনি, জোর পড়েছে বরং তাঁদের অলৌকিক শক্তির উপরে।

## সাহিত্য

সাহিত্য গদ্য-গ্রন্থাবলী চতুর্থ ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী' ও 'সাহিত্যের বিচারক' ( প্রথমে এর নাম ছিল 'সাহিত্য-সমালোচনা' ) এই তিনটি লেখা ছিল তার ভূমিকাস্থানীয়।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' লেখাটি স্বল্প-কলেবর। কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে বহু উৎকৃষ্ট চিন্তা বা চিন্তাবীজ এতে আমরা পাচ্ছি। তার ফলে একটি উৎকৃষ্ট কবিতার মতো এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সারগর্ভ ও উপাদেয় হয়েছে। বিশ্লেষণের চেষ্টা করলে এর মূল্যহানির সম্ভাবনা আছে। গোটে বলেছেন—ময়দা বোনা যায় না, আর বীজ পিষতে নেই। আমরা এর কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

> বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটি জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত —তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।
>
> এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া-তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।
>
> ......এক-একটি জড়প্রকৃতির লোক আছে, জগতে খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য—তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।
>
> ......এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন, যাঁহাদের বিস্ময়, প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, লোকা-

লয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

......ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

......এই যে মানুষের জগৎ, ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কী উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ-জিনিস নষ্ট হইতে চায় না; হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার বা মূল্যনিরূপণ সম্পর্কে কবি বলেছেন:

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।

সকল সময় এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানেই সোনায় সোহাগা।

এর পর কবি সাহিত্যে রচনা-নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন:

রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে-শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মানুষ তাহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

এই রচনা-শক্তি সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন :

> হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে। পুরুষমানুষের আপিসের কাপড় সাদাসিধা - তাহা যতই বাহুল্যবর্জিত হয়, ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম, ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্য-সমাজেই প্রচলিত।
>
> মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়—এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি সাদাসিধা ছাঁটা-ছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক—কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই।
>
> ......সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের রূপকের ছন্দের আভাসের—ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।
>
> অরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

একটি কথা হয়ত যোগ করা যায়—নারীর সব প্রসাধন-পারিপাট্যের বাড়া যেমন তার স্বাস্থ্যের বা জীবনীশক্তির সৌন্দর্য, তেমনি রচনার সব কলা-কৌশলের বাড়া রচয়িতার চারিত্রিক বীর্য বা সৌকুমার্য।

সাহিত্যের ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন—চিত্র ও সংগীত। সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। "দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়" এই এক কথায় বলরাম দাস কি না বলিয়াছেন?......এছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।
>
> অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র

ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

এর পর কবি উত্থাপন করেছেন সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টির প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন :

> কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিস তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি, যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মতো বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।
>
> এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানবচরিত্র—সাহিত্য ইহাকেও অন্তর-লোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসংগত নহে—তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর—তাহার সদর-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালি-দাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

> ······সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র। কিন্তু 'মানবচরিত্র, এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে-আকার ধারণ করিতেছে, যে-সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য। ······
>
> বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

আমরা ছিন্নপত্রাবলীতে দেখেছি, কবি অনুভব করেছেন যে তাঁর লেখা যেন তাঁরই নয়, একটা জগদ্ব্যাপ্ত শক্তি যেন তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করছে। অনেক কবিই তাঁদের রচনা সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলেছেন। এ-সব কথা

থেকে মোটামুটিভাবে আমরা এই বুঝে নিতে পারি যে, ভালো লেখার মূলে লেখকের নিজের সজাগ চেষ্টাই যে রয়েছে তা নয়, পরিবেশের ও ইতিহাসের নানা প্রভাবও সেই সাহিত্যিক সৃষ্টির সফলতা দানে বিচিত্রভাবে কার্যকর হয়েছে।

সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে-সব চিন্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো পরে সে-সবের সঙ্গে আমাদের আরো পরিচয় হবে।

'সাহিত্যের সামগ্রী' লেখাটিতে কবির প্রধান বক্তব্য এই :

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে।......

লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।......

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে-কাঠ জ্বলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে-মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।......

প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে-জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশ ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।......

মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে, সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানাপ্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবাৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান-যব-গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি, তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা।......যাহা জ্ঞানের

কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়।... কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।......
অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোনো জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

ভাব সাহিত্যে যে রূপ লাভ করে সেই রূপ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

......যাহা জ্ঞানের জিনিস, তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।...... কিন্তু ভাবের বিষয় সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না। তাহা যে মূর্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলা-কলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না। তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

রচনার বৈশিষ্ট্যের মূল্য সাহিত্যে কত বেশি সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন ;

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাব-প্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়—কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।..... অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার জিনিসটা জলে-স্থলে-বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে—গাছপালা তাহাকে নিগূঢ় শক্তিবলে

বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে তাহা নহে—তাহা হইতে সৌন্দর্য, ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

উপসংহারে কবি বলেছেন:

যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে।—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য অংশে তাহা হেয়।

কবি সাহিত্যের রূপ সম্বন্ধে যে-সব কথা বললেন সে-সব খুব মূল্যবান। বাস্তবিক সাহিত্যকে তার রূপ, রস, ইঙ্গিত ভঙ্গি এ-সব সমেত রূপান্তরিত করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্যেটের এই কথাটিও বুঝবার আছে: অনুবাদে যে সাহিত্য মর্যাদাহীন হয় সে সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়।—তা ছাড়া এও সত্য যে সাহিত্য-রসিকরা ও জ্ঞানীরা জগতের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন অনেকক্ষেত্রে অনুবাদের সাহায্যে।—এর থেকেই বোঝা যায় ভালো সাহিত্যের মধ্যে মহাপ্রাণ এমন কিছু থাকে যা অনুবাদের স্থূল মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এসেও মূল্যহীন হয় না।

'সাহিত্যের বিচারক' লেখাটিতে কবি প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রতিদিনের ঘটনা আর সাহিত্যিক সৃষ্টি এই দুইয়ের পার্থক্যের দিকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সাহিত্য প্রতিদিনের ঘটনার হুবহু ছবি নয়:

সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ-স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ ভাবভঙ্গির নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

সাহিত্যিক সৃষ্টি বাস্তব ঘটনার চাইতে অধিকতর সত্য এ-কথা কবি 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়ও বলেছেন।

এখানে সেই কথাটার ব্যাখ্যা তিনি এইভাবে দিয়েছেন:

মানুষের ভাব-সম্বন্ধে প্রাকৃত সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে—তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্তি করিয়া কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্য-রচয়িতার মতো তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটোবড়ো সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

এ-সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন:

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায় —অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

মন ও সাহিত্যের কাজ সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন:

দুয়ের কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা

বিশেষ কারণে তফাত ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়।······প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে আমাদের সুখদুঃখকে সুদ্ধ বর্তমান কাল নহে চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত সংকীর্ণ সংসারের সহিত উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

মন ও সাহিত্যের সম্পর্কের ব্যাপারটি কিছু জটিল। কবি চেষ্টা করেছেন এটিকে কিছু বিশদ করতে। এ-সম্বন্ধে কবির সিদ্ধান্ত এই ঃ

সাহিত্যকাবদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশই সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে? ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক, তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোনো একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষিসংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও যে-সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্পসময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শন-

শালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়—ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

তা হলে সাহিত্যের বিচার-সম্পর্কে কবির শেষ সিদ্ধান্ত দাঁড়াল :

> সাহিত্য-সৃষ্টি যেমন প্রতিভা-সাপেক্ষ, সাহিত্যের বিচারও তেমনি প্রতিভা-সাপেক্ষ, "সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"

সাহিত্যের সমঝদারি সম্পর্কে গ্যেটের এই উক্তি বিখ্যাত :

> যারা পছন্দ করে ফরাসী রীতি অথবা ইংরেজ রীতি, জার্মান রীতি অথবা ইতালীয় রীতি, তারা প্রত্যেকে চায় তাই যাতে তৃপ্ত হয় তাদের আত্ম-অভিমান। কোনো বিশেষ রীতি বা রীতিসমূহ তাদের কাছে পাবে না শ্রদ্ধা যদি-না তাতে প্রকাশ পায় তাদের নিজেদের মাহাত্ম্য।
> কালকার জন্য কি কাম্য তা নিপুণ বিচারবিশ্লেষণের বিষয় হবে এমন ভাবুক-দলের যদি আজকার সম্মান ও সমাদর লাভ হয় তাদের অসার ভাবনার।
> তিন হাজার বছরের যে না রাখে খবর সে আছে অন্ধকারে অজ্ঞ হয়ে—করে যাচ্ছে শুধু দিন-মজুরি।

তিন হাজার বছর, অর্থাৎ গ্রীক সাহিত্যের সময় থেকে একাল পর্যন্ত। কবিও ছিন্নপত্রাবলীতে বলেছেন, "আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না।"

স্বদেশী আন্দোলনের কালে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ গঠিত হলে তাতে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করা হয়। কবি তাতে এই চারটি বক্তৃতা দেন—'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সাহিত্য' আর 'সাহিত্যসৃষ্টি'।

এই চারটি প্রবন্ধই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এ-সবে অনেকটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কবির সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির দিকে আমরা পাঠকদের মন আকর্ষণ করতে চেষ্টা করবো।

'সৌন্দর্যবোধ' বঙ্গদর্শনে প্রকশিত হয় ১৩১৩ সালে পৌষের সংখ্যায়। সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত অনেক কথা বলেছেন। কেউ কেউ প্রয়োজনের সঙ্গে এর বিশেষ যোগের কথা ভেবেছেন। কেউ কেউ মানুষের মনকে আকর্ষণ করবার এর যে বিশেষ শক্তি তার কথা বেশি করে ভেবেছেন। কবি

যে তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করলেন এই বলে যে, সৌন্দর্যসাধনার গোড়ায় চাই ব্রহ্মচর্যের নিয়ম সংযমের পালন এটি বেশ চমকপ্রদ হল। কবি অবিশ্বাসী-দের সন্দেহের নিরাকরণ করতে চেষ্টা করলেন এই বলে :

যাহাদের চোখে ধুলা দেওয়া শক্ত, তাঁহারা বলিবেন, সংসারে তো আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের জীবন-চরিতটা পাঠ্য নহে। অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার।

এই সমালোচকদের বক্তব্যের উত্তরে কবি বলেন :

অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি, তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ।·····জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই, সেখানেও বাস্তব সত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। বাস্তব সত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই, আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে।

এ-সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন :

কলাবান গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী, সেখানে তাহারা তপস্বী, সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না, সেখানে চিত্তের সাধনা ও সংযম আছেই। অল্প লোকেই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে, তাঁহাদের ধর্মবোধকে ষোলো আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়ো জিনিস গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্মবুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন, যেখানে তাঁহাদের জীবন নষ্ট করিয়াছেন, সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে, রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।·····সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই

প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

কেন বিরোধী সে-সম্বন্ধে কবির বক্তব্য এই :

> আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটোই বড়ো হইয়া উঠে, বড়ো ছোটো হইয়া যায়, যাহা ক্ষণকালের তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না।······মনে করো নদী চলিতেছে; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিলেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায়, তবে সেই ঘূর্ণী এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মতো ঘুরিতে থাকে,—চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে, সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায় তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।
>
> আমাদের কোনো একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে, আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারিদিকেই বাঁধা পড়িয়া তাহার মধ্যেই আপনার সমস্ত বিসর্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে একদল লোক এক রকমের সৌন্দর্য দেখে। এমন কি, আমার মনে হয় য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব,—যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই—তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে।

চিন্তাশীলদের মোটামুটি দুই বড় দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। একদল প্রকৃতিপন্থী—প্রকৃতিতে যা আছে বা প্রকৃতির গতি যেদিকে তারই অর্থ তাঁদের কাছে সবচাইতে বেশি। অন্য দলকে বলা যেতে পারে বিকাশপন্থী—মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে পূর্ণতার একটি স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে; সেই আকাঙ্ক্ষা এমন যে তার চরিতার্থতা না হলে মানুষ নিজেকে সুখী ও সার্থক জ্ঞান করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত দলের চিন্তাশীল। প্রকৃতির দাবিকে তিনি কখনো লঘু করে দেখেন না; কিন্তু সে দাবির চাইতে মহত্তর মানুষের পূর্ণতার দাবি, এ-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে। প্রকৃতি-

পন্থীরা প্রবলপ্রতাপ। একালে হয়তো তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা কবির চিন্তার বেশি মূল্য দিতে রাজি হবেন না। কিন্তু বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হলেও যুক্তির দিক দিয়ে তাঁদের দাবি প্রবল নয়, কেননা বিকাশধর্মের পথেই জীবনের সত্যকার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়।

সৌন্দর্যের সঙ্গে নীতিধর্মের যোগ নেই এই সাধারণত ভাবা হয়; বলা হয়, সৌন্দর্য, Art, এসব নীতি-নিরপেক্ষ—amoral। কবির 'উর্বশীকে'ও নীতি-নিরপেক্ষই ভাবা হয়। কিন্তু নীতিধর্মের বা মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের গভীর যোগ আছে, সেই কথা কবি এখানে বলেছেন। কবির বক্তব্য এই:

> ······মঙ্গল আমাদের ভালো করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালো বলি ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না, যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর;—অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে।······সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া মানি। ·····মঙ্গলের মধ্যে আমরা সেই ঐশ্বর্য দেখি। যখন দেখি, কোনো বীরপুরুষ ধর্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের এই ঐশ্বর্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্যও জগদ্ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে; মঙ্গল সৌন্দর্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরও ব্যাপক আরও গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতম সৌন্দর্য, এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেক সময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না—কিন্তু যখন বুঝি, তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মতো ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর কিছুই দেখি না।

শিল্পে মঙ্গল-ভাবনার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন 'কুমারসম্ভবে' ও 'শকুন্তলায়'। এই দুইখানি কাব্যের প্রসঙ্গ তিনি পূর্বে বিস্তৃতভাবে করেছেন—এই প্রবন্ধেও করেছেন।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালমন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না।……আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে, তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি-মাত্রই আনন্দ, তাহাই সৌন্দর্য।

কবি শিল্পে-সাহিত্যে সৌন্দর্যের ধ্যানকে যে খুব বড়ো স্থান দিয়েছেন ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের প্রবণতা সেইদিকে। কিন্তু য়ুরোপের অনেক চিন্তাশীল সৌন্দর্যের ধ্যানে বা সৌন্দর্য-সম্পর্কে বিমূর্তের—Abstract-এর—প্রশ্রয় না দিয়ে রূপসৃষ্টির—concrete-এর—উপরে জোর দিয়েছেন বেশি। যেমন গ্যেটে বলেছেন :

মোটের উপর বলতে পারি কবিরূপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি কোনো তত্ত্বকথাকে রূপ দিতে। আমার মনে জাগত ছবি—আমার সবল কল্পনার গুণে ঘটত এ-সব—আর কবি হিসাবে আমার কাজ হতো মনে মনে সেই সব অনুভূতি ও ছবি পূর্ণাঙ্গ করে তোলা, আর তারপর সে-সব পরিচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা যেন আমার লেখা পড়ে বা শুনে অপরের মনেও জাগতে পারে তেমন সব ছবি।

—কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২।

রবীন্দ্রনাথও অনেক জায়গায় শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে রূপসৃষ্টির বিশিষ্ট মর্যাদার কথা বলেছেন।

কবিকে বলা হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে তিনি Comparative Literature-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিন। কবি সেই বিষয়টির নামকরণ করলেন 'বিশ্বসাহিত্য'। বিশ্বসাহিত্যের ভাবনা প্রথম উদিত হয় গ্যেটের মনে। একটি লেখায় তিনি বলেন :

জাতীয় সাহিত্য এখন বরং এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে, আর প্রত্যেকেরই উচিত তাকে এগিয়ে আনা।

এই বক্তৃতাটি কবি দেন ১৯০৭ সালের জানুয়ারীতে। তখনও ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের চিন্তা কবির মনে প্রবল। সেইদিনে যে বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি করলেন, আর করলেন খুব আন্তরিকভাবে. এতে প্রমাণ রয়েছে অন্তরের গভীরে তিনি সবসময়েই ছিলেন আন্তর্জাতিক, অন্য কথায় দেশকাল-জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের অনুরাগী। বলা বাহুল্য শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের এটি একটি নিত্যলক্ষণ।

সূচনায় কবি বলেছেন ঃ

> আমাদের অন্তঃকরণের যতকিছু বৃত্তি আছে, সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই।...... জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আব আনন্দের যোগ।.....সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মতো নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া তাহার পেটের কথা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিনিয়া বাহির করে। এইজন্য সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধির একটা অহংকার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে, সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে। তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনেব অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরও বেশি করিয়া আমাদের কাছে আসে।... ..
>
> তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়—সেখানে আর অহংকার থাকে না—সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে দুর্বলের কাছে আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না।

জগতের সঙ্গে আমাদের এই আনন্দের যোগ সম্বন্ধে কবি আরও বলেছেন ঃ

> এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। আপনাকে যখন তেমন করিয়া জানি, তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ-কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালোবাসি, আমার আপনার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেই যখন পাই. তখন এ-কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে।... ..
>
> এমনি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড়ো হয়, সে ততই বড়ো রকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।......

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা, আমাদের মানবাত্মার এই যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহংকার তাহার একটা বাধা; সংসারে এই সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

স্বার্থ, অহংকার, কবি এ-সবকে বলেছেন মানবাত্মার বাধা। কিন্তু এ-সবকে বাধা জ্ঞান না করে মানুষের স্বাভাবিক ধর্মও জ্ঞান করা যেতে পারে।—এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে কবি বলেন: সংসারে স্বার্থ এবং অহংকারের ধাক্কা তো পদে পদেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তারও ভিতর দিয়ে মানুষের নিগূঢ় স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলবার প্রবল চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেছেন:

…কার্যকারণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম। সহজ প্রত্যক্ষ জিনিসের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পুরাপুরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে—তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞানদর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি।… …

তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্মকে পূর্ণ চেতনারূপে পাইবার জন্যই অন্তরে-বাহিরে কেবলই বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া সেখানে মানবের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানে বড়ো আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড়ো করিয়া পাই।

কবির মতে মানবধর্মের এই সমুজ্জ্বল প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় মহাপুরুষের জীবনীতে, আর ইতিহাসে নানা লোকের মধ্যে, নানা দেশে, নানা কালে ও নানা ঘটনায়।

তবে জীবনীতে ও ইতিহাসে এই প্রকাশ খুব বড়ো হয়েও অনেক বাধায়,

অনেক সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাই মানুষের মধ্যে চেষ্টা জাগে সেই পরিচয়কে মনের মতো করে সাধ মিটিয়ে সাজিয়ে চিরকালের মতো ভাষায় ধরে রাখতে :

> এমনি করিয়া, বাহিরের যে-সকল অপরূপ প্রকাশ—তাহা সূর্যোদয়ের ছটা হউক বা মহৎ চরিত্রের দীপ্তি হউক বা নিজের অন্তরের আবেগ হউক—যাহা-কিছু ক্ষণে-ক্ষণে আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, হৃদয় তাহাকে নিজের একটা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করিয়া আপনার বলিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া রাখে। এমনি করিয়া সেই সকল উপলক্ষে সে আপনাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে।

মানুষের এই যে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা, কবি বলেছেন, এই প্রকাশের মোটামুটি দুইটি ধারা—একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। কর্মের ধারায় মানুষ সৃষ্টি করেছে তার সভ্যতা। মানুষের এই সভ্যতা সংকীর্ণ না হয়ে যে পরিমাণে উদার হয়, সেই পরিমাণে মানুষ আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করতে পারে।

কিন্তু সভ্যতায় বা কর্মক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে গৌণভাবে, মুখ্য-ভাবে নয়। মুখ্যভাবেও মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, অর্থাৎ তার হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি আনন্দ-বেদনা এ-সব বেহিসাবীভাবে প্রকাশ করতে চায়—সেই প্রকাশেই তার গভীর সার্থকতা। তেমন প্রকাশ ঘটে তার সাহিত্যে, শিল্পে। মানুষের এই প্রকাশে আরও একটু বিশেষত্ব আছে—

> সংসারে যাহাকে আমরা দেখি, তাহাকে ছড়াইয়া দেখি—তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি—তাহাকে আরও দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই সকল ফাঁক সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মতো আর কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না।······
>
> এমন অবস্থায় এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না, তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়।······এইজন্য মানুষের যে প্রকাশটি তুচ্ছ নয়, মানব-হৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুন্ঠিত না হয়, যাহা কলা-নৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের

অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে. স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয়, নহিলে তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে।

কিন্তু সব মানুষের বিচারবুদ্ধি তেমন সুবিকশিত নয়, সব সমাজও তেমন উন্নত নয়; আর এক একটা সময় আসে যখন যা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র তার মোহ মানুষকে পেয়ে বসে। এমন দুর্দিনে মানুষ তার সাহিত্যে নিজের ভিতরকার যা ছোট তাকে বড়ো করে তোলে. 'আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব, টেনিসনের আসনে কিপ্‌লিঙের আবির্ভাব হয়'।

কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোটো, যাহা জীর্ণ, তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেকে, যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। .....

এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শ-মতোই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি, তবে সমগ্র মানবের বিচার-বুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্য কিভাবে সৃষ্ট হয়ে এসেছে তার উপরে এমনিভাবে আলোকপাত করে কবি উপসংহারে উপস্থাপিত করেছেন বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য:

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেটি এই—সাহিত্যকে দেশ কাল পাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, লেখকেরা নানা দেশ

ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কি, তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয়, সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে,—প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়, ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।......

পৃথিবী যেমন আমার ক্ষেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা—তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাহার রচনা নহে; আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব—প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব, এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব। এই সংকল্প স্থির কবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সাহিত্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়। সেইজন্য দেশকাল আদির বিচিত্র ছাপ তার উপরে থাকে। কিন্তু সেই সব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সত্যকাব সাহিত্যেব এই গুণ আছে যে তা সর্বমানবকে আনন্দ ও প্রেরণা দিতে পারে—মানুষে মানুষে প্রীতিব বন্ধন বাড়িয়ে চলে। যে সাহিত্যের সেই ক্ষমতা নেই তা মহাপ্রাণ বা সত্যকার সাহিত্য নয়। মহাপ্রাণ বা সত্যকার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য হয়ে যে এমন করে সর্বমানবকে আনন্দ ও শক্তি দিতে পারে সাহিত্য সম্বন্ধে এই চেতনা এই বিশ্বাত্মীয়তার যুগে বিশেষভাবেই কাম্য।

কেউ কেউ বলেছিলেন 'সৌন্দর্যবোধ' ও 'বিশ্বসাহিত্য' সম্বন্ধে কবির বক্তব্য তেমন স্পষ্ট হয়নি। এই 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' লেখাটিতে কবি তাঁর বক্তব্যগুলো স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেন। এর কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি:

জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, সৌন্দর্যবোধও তেমনি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।......

জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য। মানুষ তেমনি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে—পূর্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্বে সে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস মানুষের সাহিত্যে আপনা আপনি রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু সৌন্দর্যকে অনেক সময় আমরা নিখিল সত্য হইতে পৃথক করিয়া দেখি এবং তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্যের বিশেষ ভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গিতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি উল্লেখ করেন, ফরাসী সাহিত্যিক Theophile Gautier-এর বিখ্যাত উপন্যাস Mademaiselle de Maupin-এর কথা। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন:

তাহাতে একদিকে একজন পুরুষ ও আর একদিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারে যাহাকিছু প্রতিদিনের, যাহা-কিছু চারিদিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রং সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতি তীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার তো মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারিদিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিত-কর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক

থাক। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

এই সম্পর্কে কবি আরও বলেন :

সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না—সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে। সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্য মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়।

কবির আরও কিছু কিছু উক্তি এই :

জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য।......

সত্যের উপরে মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন, ধর্মবুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এমনি করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে—মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক তাঁহারা, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া, সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কী চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কী পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে, তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।......

সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড শক্ত কাজ। হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা কবি বলি। হিমালয় কেন একটা পানা-পুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয় ;—মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে পায়, ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে, তবে মন তাহাতে নূতন একটা রস লাভ করে। এইরূপে সাহিত্য

আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়।......

সাহিত্যের যাহা উপকরণ, সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড়ো কম নয়। এইজন্যই অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।

ফরাসী সাহিত্যিক গোতিয়ে-র বিখ্যাত উপন্যাসটি সম্বন্ধে কবি যে মন্তব্য করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে-সম্বন্ধে তেমন মনোযোগী না হয়ে কবি বুদ্ধদেব বসু কবির সেই বিচারকে স্বল্পমূল্য জ্ঞান করেছেন (Two Cities পত্রিকায়, Autumne 1960 সংখ্যায় তাঁর Western Influence on Rabindranath Tagore প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

## সাহিত্যসৃষ্টি

'সাহিত্যসৃষ্টি' জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতা। বঙ্গদর্শনে এটি বেরিয়েছিল ১৩১৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায়।

কবি বলতে চেষ্টা করেছেন, কোনো বিশেষ একজন কবির বা সাহিত্যিকের খেয়ালখুশীমতো যে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় তা সত্য নয়। কোনো অঞ্চলে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সব ভাব বা কথাকাহিনী দানা বেঁধে উঠতে চেষ্টা করে, সে-সবই শক্তিমান কবিদের কল্পনায় ও ভাষা-শক্তিতে সংহত রূপ লাভ করে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, ইলিয়াড, রামায়ণ ও মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য-উপন্যাস, ইংলণ্ডের আর্থার-কাহিনী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা-সাহিত্য এইভাবে গড়ে উঠেছে। কবির কিছু কিছু উক্তি এই:

যেমন একটা সূতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে, তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারিদিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে।......এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তারপর টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে হুড়াহুড়ি করিয়া ফল তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোটো ডালে ধরিয়াছে যাহার বোঁটা

নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতে কাঁঠাললীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।······

এমন গাছ আছে, যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না তেমনি এমন মনও আছে, যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায় কিন্তু ভাব-আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক-লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরোপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস আছে এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।·····

এই যে এক মনের ভাবনার আর এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি স্বভাবতই এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে ;—যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না—ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।···বস্তুজগতেও ঠিক জিনিসটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে, তখন চারিদিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়—এও ঠিক তেমনি। অতএব যে-বস্তুটা টিকিয়া আছে, সে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয় তাহা নয়, সে তাহার চারিদিকের পরিচয় দেয়—কারণ সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি উল্লেখ করেছেন :

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে-ভাবটি জাগিয়া ওঠে, সে তো আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না-কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, যাহাকে দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই যে দিব্যমূর্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি, সেই দেখার স্মৃতি তো মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মতো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে-সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা কেমন এক

হইয়া শক্ত হইয়া ধরা দিল। ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীদের যে-সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহ-কর্মের আড়াল হইলে আভাসে চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।······

ফরাসীবিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও বা করুণায় কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল।

রামায়ণ মহাকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, রামায়ণে শুধু একটি প্রাচীন রাজবংশের কাহিনীই নেই, আর্যদের দ্বারা কৃষির বিস্তার, আর্য-অনার্যদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন এ-সব ব্যাপারও তাতে স্থান পেয়েছিল। পরে আর্যজাতির অন্যান্য ভাব ও চিন্তাও, যেমন, ভক্তিধর্মের মহিমা-কীর্তন, রামায়ণে স্থান পেয়েছে।

রামায়ণের কাহিনী একালে মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যের মধ্যে যে নতুন, যুগোপযোগী রূপ পেয়েছে সে-সম্বন্ধে কবি বলছেন :

> মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।······ এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্‌কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না ;—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

মেঘনাদবধকাব্য সম্পর্কে কবির বিশ্লেষণ বহুলাংশে সুন্দর হলেও তাঁর কোনো কোনো মন্তব্য মেনে নেওয়া কঠিন। যেমন রাবণকে তিনি 'ধর্মবিদ্রোহী' বলেছেন। কিন্তু রাবণের চরিত্রে দেবতাদের অনুগৃহীত রামলক্ষ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেলেও ধর্মহীন সে নয়। সীতাকে সে নিয়ে এসেছিল তার ভগিনী শূর্পনখার প্রতি রামলক্ষ্মণের অপমানকর ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্য; কিন্তু সীতার প্রতি কোনো অপমানকর ব্যবহার সে করেনি। তার উপাস্য শঙ্করের প্রতি সে ভক্তিমান। শঙ্করও তার প্রতি বিমুখ নন। কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে তিনি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারছেন না। কাজেই মধুসূদনের রাবণের পরাভব ঘটল তার নিজের কোনো পাপের জন্য নয়, মহামায়ার রামলক্ষ্মণের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য। মধুসূদন এই কাব্যে গ্রীক নিয়তিবাদের অনুবর্তী হয়েছেন। এই কাব্যে কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ বিজয়ী রামের লাভ না হয়ে পরাভূত রাবণের যে লাভ হলো, তার কারণ দেবতাদের কৃপাভাজন না হয়েও রাবণ সুমহৎ চারিত্র-শক্তির পরিচয় দিল। একালের সাহিত্যের বড় কথা হচ্ছে মানবিকতা—অতি-মানুষের নয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের মহিমা-কীর্তন। মেঘনাদবধকাব্যে মধুসূদন সেই ভাবের পথিকৃৎ হয়েছিলেন।

এর পরের প্রবন্ধ 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য'—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল ১৩০১ সালে। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীরভাবে আশান্বিত হয়ে কবি তাঁর বক্তব্যের উপসংহার করেছিলেন এই বলে:

> নববঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় এক শত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয়, তবে সেই উৎসব-সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মতো প্রমাণাতিরিক্ত হস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিপ্রত্যূষের অকস্মাৎ জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলির স্বরে সুর বাঁধিবেন না—তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত

বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উত্থিত করিয়া তুলিবেন—এবং কোনোকালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল, এবং অদ্যকার আমরা যে প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তির আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে-কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।

এর পরের লেখাটি হচ্ছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে কবি এটি লেখেন।

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের মূলে যে-সব প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক শক্তি ক্রিয়া করেছে সে-সবের কথা কবি এই লেখাটিতে ভাবতে চেষ্টা করেছেন :

যেমন ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন, তুষারসংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন—তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাটিয়া যে-সকল কীটজর্জর দলিল পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ, তাহাকে তাহার যথাস্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারিপাশ হইতে বিচ্যুত আকারে যখন দেখি, তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড়ো বা অসত্যরূপে ছোটো করিয়া দেখিতে পারি।

কবির সংগঠনী কল্পনার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে এই লেখাটিতে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পর্কে কবি বলেছেন :

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোনো কারণ নাই—ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়-জলপ্লাবন-ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্যকারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখ-বিপৎ-সম্পদের যে আবর্তন দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির সুসংগতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে-শক্তি নির্বিচারে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্ম-বিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল—তাহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

শাক্তযুগের পরে বাংলাদেশে এসেছিল বৈষ্ণবযুগ। সেই সম্পর্কে কবি বলেন :

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল—মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া, শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবান্‌কে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি, প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস

করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ, সেও গৌরব লাভ করিল, যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সেও সম্মান পাইল, যে স্বেচ্ছাচারী, সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে সৌন্দর্যের অধিকারে ভগবানের অধিকারে কাহারও কোনো বাধা রহিল না।

এই ভাব-উচ্ছ্বাস স্থায়ী হলো না কেন সেই প্রশ্ন সম্পর্কে কবি বলেন:

ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না; এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

কবি আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বড় দুর্বলতার কথা বললেন। আশা করা যাক নতুন কালে এর সংশোধন হবে।

সাহিত্যের শেষ দুটি প্রবন্ধ হচ্ছে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'কবি-জীবনী'। যাঁরা এই মত পোষণ করেন:

ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন একদিকে ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্যদিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাসলেখক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয়,—

তাঁদের কথার উত্তরে কবির মোট বক্তব্য এই:

ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সরষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।......

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে-ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।

কবিজীবনীতে কবি ব্যক্ত করেছেন, কবি টেনিসনের সুবৃহৎ জীবনী পড়ে তিনি কিরূপ হতাশ হয়েছেন, কেননা কবির কাব্যস্রোত কোন্ গুহা থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তার সন্ধান তাতে তিনি পান নি।

এই সম্পর্কে কবির উৎসর্গের ২১ নম্বর কবিতাটির এইসব চরণ স্মরণীয়:

মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

টেনিসনের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবির এই উক্তিটি লক্ষণীয়:

বর্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল—সেখানে প্রাচীনকালের ভগ্নদুর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল, কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ বহন করিয়া তিনি বর্তমানকালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই।

'সাহিত্যে'র পরিশিষ্ট ভাগের প্রথম তিনটি রচনা 'সাধনা'র যুগের। এর 'পত্রালাপ'টি দীর্ঘ—কবি ও তাঁর বন্ধু লোকেন পালিতের মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে যে পত্রালাপ হয়েছিল তারই পরিচয় এতে আছে। এই লেখাটি যেমন উপভোগ্য তেমনি সারগর্ভ। এর সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথম পত্রে কবি যে-সব কথার অবতারণা করেন সে-সবের মধ্যে বিশেষ জোর পড়ে এই কথাটির উপরে যে সাহিত্য লেখকের আত্মপ্রকাশ:

আমার ভালোলাগা, মন্দলাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার (সত্যের) সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে, তাহলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না। আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটা এই।......যখন কোনো একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে, যাতে করে তাতে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভূ সত্য বলে মনে হয়,

তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়।······আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে।*

কবির বক্তব্যের উত্তরে পালিত মহাশয় প্রশ্ন করেন: "সাহিত্য যদি লেখকদের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেকস্পীয়রের নাটককে কি বলবে?"

শেকস্পীয়রকে যে বলা হয় myriad-minded, অর্থাৎ শেকস্পীয়রের লেখায় একটি মানুষের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত হয়নি, বহু মানুষের বিচিত্র দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত হয়েছে, বলা বাহুল্য সেই প্রচলিত প্রসঙ্গের অবতারণাই পালিত মহাশয় করেন। এই প্রশ্নের উত্তর কবি দেন তাঁর দ্বিতীয় পত্রে। উত্তরটিতে সাহিত্য সম্বন্ধে কবির অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হয়। আমরা তাঁর উক্তির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরের সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না। কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারত-কাব্যের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এক নয়,—তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, সেইজন্য তাঁরা আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকার-প্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই বলে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি—কিন্তু তবু এ-কথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত। তেমনি শেকস্পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেকস্পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে।······ভালো

* তুলনীয়: পাণ্ডুর হয়ে গেছে সমস্ত তত্ত্ব, সবুজ আছে শুধু জীবনবৃক্ষ।—ফাউস্ট।

নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতির এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।

লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এই দুয়ের একীকরণ সম্পর্কে কবি আরও বলেন :

অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তিবলে কেবল রস্ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংখ্যার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়—কিন্তু শেকস্পীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল, নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসেবে শেকস্পীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত, বৃহৎ এবং বিচিত্র।......

...শেকস্পীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেকস্পীয়রকে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেসডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফল্‌ষ্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেকস্পীয়রের মানব-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যেতে পারে সে-সম্পর্কে কবির বক্তব্য এই :

লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, এবং আমাদের সমস্ত জীবনসংগীতকে সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি। সেই মূলতত্ত্ব অনুসারে, আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের সেই মূলতত্ত্বটি,—জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মস্বরূপে বিরাজ করবেই।

আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি, কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে। এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয়, এই সত্যটি সংকীর্ণ হলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

এই সাহিত্যের সত্যটি সংকীর্ণ হলে কিরূপ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে, সে-সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন গোতিয়ে-র সুবিখ্যাত মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ গ্রন্থখানি।—গোতিয়ে ও ওআর্ডস্‌ওআর্থের তুলনা করে কবি বলেছেন:

ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্বোক্ত ফরাসি সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন—তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এ-রকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই,—ওআর্ডস্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।

বৃহৎ সত্য কাব্যের সত্য, এ-সব বলতে কবি কি বোঝেন এর পর সেই প্রসঙ্গের অবতারণা তিনি করেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই:

একটি ফুলের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ করবার একটিমাত্র পথ আছে—তার বাহ্য সৌন্দর্য, এজন্য সচারচর ফুলের মধ্যে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের পরিতৃপ্তি নেই—তাতে কেবল আমাদের আংশিক আনন্দ, কিন্তু কবি যখন এই ফুলকে কেবলমাত্র জড় সৌন্দর্যভাবে না দেখে এর মধ্যে মানুষের মনোভাব আরোপ করে দেখিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের আনন্দকে আরো বৃহত্তর গাঢ়তর করে দিয়েছেন।......জগৎ জড়যন্ত্র কিংবা আধ্যাত্মিক বিকাশ এদুটো মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য, সাহিত্য তা নিয়ে তর্ক করে না—কিন্তু এদুটো ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবে মানুষের স্থায়ী এবং গভীর আনন্দ সেই সত্যটুকুই কবির সত্য, কাব্যের সত্য।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে কবি বলেন:

আমি যদি বলে থাকি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপযোগিতা

নেই তবে সেটা অত্যুক্তি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, সাহিত্যের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। বসন না হলেও চলে ( অবশ্য লোকে অসভ্য বলবে ), কিন্তু অশন না হলে চলে না। হার্বার্ট স্পেন্‌সর উলটো বলেন। তিনি বলেন সাহিত্য বসন এবং বিজ্ঞান অশন। ·····

বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের প্রাণরক্ষা এবং জীবনযাত্রায় অনেক সাহায্য করে স্বীকার করি, কিন্তু সে সাহায্য আমরা পরের কাছ থেকে নিতে পারি। ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, কেমিষ্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র, যান্ত্রিকের কাছ থেকে যন্ত্র আমরা মূল্য দিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য থেকে যা পাওয়া যায় তা আর কারও কাছ থেকে ধার করে কিংবা কিনে নিতে পারি নে। সেটা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে আকর্ষণ করে নিতে হয়, সেটা আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বের পুষ্টি সাধন করে।·····

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি। তার পরে আমরা ডাক্তারি শিখে মানুষের চিকিৎসা করি, বিজ্ঞান শিখে মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করতে প্রাণপণ করি। গোড়ায় যদি আমরা মানুষকে ভালোবাসতে না শিখতুম তা হলে সত্যকে তেমন ভালোবাসতে পারতুম কিনা সন্দেহ। অতএব সাহিত্য যে সব-গোড়াকার শিক্ষা এবং সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা আমার তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

ফাল্গুনীর ভূমিকায়ও কবি এমনি ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। কবির এই মত আপাতদৃষ্টিতে স্বীকার্য নাও মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় যে, তাঁর মত অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। মানুষের মানবিকতা সর্বাগ্রগণ্য, আর তার লালয়িতা সাহিত্য।—সাহিত্যে এই মানবিক আবেদনের পরিবর্তে কখনো কখনো দেখা দেয় তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে প্রবণতা। সেটি মোটের উপর সাহিত্যের ও মানুষের দুর্দিনসূচক।

তৃতীয় পত্রে কবি আরও আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের

জগৎ, শেকস্পীয়রের লেখায় শেকস্পীয়রত্ব, এই সবের উপরে। সাহিত্যের জগৎ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্যাস্তকে তিন রকম ভাবে দেখা যাক। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত, চিত্রের সূর্যাস্ত এবং সাহিত্যের সূর্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত হচ্ছে নিছক সূর্যাস্ত ঘটনাটি, চিত্রের সূর্যাস্ত হচ্ছে কেবল সূর্যের অন্তর্ধান মাত্র নয়, জল-স্থল আকাশ-মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে সূর্যাস্ত দেখা, সাহিত্যের সূর্যাস্ত হচ্ছে, সেই জল-স্থল আকাশ-মেঘের মধ্যবর্ত্তী সূর্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে দেখা, কেবলমাত্র সূর্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে প্রকাশ।

প্রকাশ যে সর্বত্র তুল্যরূপে উৎকৃষ্ট হয় না, সে-সম্বন্ধে কবি বলেন :

সুইজরল্যাণ্ডের শৈল-সরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বলতে পার সেখানকার উদয়াস্ত কী রকম অনির্বচনীয় শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেই রকম আছে। বড়ো বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা অনুসারে সকল জিনিসকে এমন করে প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে, তার কতখানি নিজের, কতখানি বাহিরের, কতখানি বিম্বের, কতখানি প্রতিবিম্বের, নির্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সংকীর্ণ কুণো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক না কেন, নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্বপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব নয়, মূল মানুষটি, সেই মানুষের হাসিকান্না অনুরাগ-বিরাগ শেক্সপীয়রের রচনায় কত গভীরভাবে হয়েছে ব্যক্ত সে-সম্বন্ধে কবি বলেন :

ফলস্টাফ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত শেকস্পীয়র যে মানবলোক সৃষ্টি করেছেন, সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেকস্পীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি।......

শেকস্পীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেকস্পীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার

হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রিয়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সম্পর্কে গোতিয়ে সম্বন্ধে কবি বলেন :

> গোতিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূলপত্তন করেছেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখতে পাই নে। যে সৌন্দর্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য ভালবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্যকে অবারিত করে দেয়, মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠছে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে-মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হ'ক, ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়; এইজন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ সেটা একরকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই। অতএব মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে, সাহিত্যের সত্য ততটা বেশি বেড়ে যাবে।

যাঁরা বলেন, সাহিত্যের কেবল একমাত্র সত্য আছে সেটা হচ্ছে প্রকাশের সত্য, অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হলো এবং যথাযথ হলেই সত্য হলো, তাঁদের বক্তব্য সম্বন্ধে কবি বলেন :

> সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেকস্পীয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করি নে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখি নে প্রকাশ পেলে কিনা, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই

প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়োগাছও গাছ, কিন্তু বীজ গাছ নয়।

তৃতীয় পত্রে কবি 'জীবনের মূলতত্ত্ব' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর বন্ধু পালিত মহাশয় এই 'মূলতত্ত্ব' কথাটি সম্পর্কে বলেন যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না, তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়তো না।

'জীবনের মূলতত্ত্ব' বলতে কোন্ ব্যাপারের দিকে কবি ইঙ্গিত করেছিলেন সেই কথা তিনি গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করেন চতুর্থ পত্রে। তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু অংশ এই :

> প্রাচীনকালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যে রকমভাবে দেখত, আমরা ঠিক সেভাবে দেখি নে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে, যাতে করে সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। বৈদিক কালের ঋষি যেভাবে উষাকে দেখতেন আর স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সেভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।...... .....
> এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধিকার হারিয়ে চলে আসছে। নিজের যে-সকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। পূর্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল—দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত এখন তা ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্ছে।
>
> যাই হ'ক, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে।......
> কিন্তু 'তত্ত্ব' শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুশকিলে পড়েছি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে কাজ করছে, তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না। যেটা আমাদের গোচর হয়েছে তাকেই তত্ত্ব

বলা যেতে পারে। সেই মানসিক পদার্থকে কেউ বা আংশিকভাবে জানে, কেউ বা জানে না। অথচ তার নির্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে যায়। সে জিনিসটা ভারি একটা মিশ্রিত জিনিস—তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মত ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাট-বাঁধা নয়, সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান, এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে—সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয়, কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনই তার নিত্যতা দেখতে পান তখনই তাকে নিয়ম নাম দেন। আমি যে মিলনের কথা বললুম সেটা যত মিলিতভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। ··

পূর্বের মতো সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই, কেননা এখনকার এ-মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি, তার পরে একসময়ে সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করি। পূর্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েছে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এইজন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।······

এখন এই পূর্ণমনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি।······এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আসছে, এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আটকা পড়ে পোষমানা ভালুকের মতো নিজের নখদন্ত গোপন করে সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে, যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ওই বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলছে না।

সাহিত্যের মধ্যে শেকস্পীয়র নাটকে, জর্জ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে

আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে, আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়-ভাঙা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্যে শেকস্পীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল—কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্পর্কে কবি আরও বলেন:

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না—সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে মানতে আমাদের আপত্তি নেই। ভালোবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের মানসিক বৃত্তি, এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে, তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না।.........
অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া তবে তাকে কে মানবে? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য?.........
যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেমনি, তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস, তারা দুর্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখনো কোথাও কোনো স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি—......

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে 'জোলা'র নভেলে কোনো দোষ দেখতুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোনো অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ড জিনিসকে খণ্ডভাবেই দেখায়।

উপসংহারে কবি বলেন:

সাহিত্য মোট মানুষের কথা......
শেকস্পীয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক-একটা অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে গুপ্তমানুষকে দেখতে পাই।......
নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হ'ক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হ'ক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হ'ক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হ'ক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আ'র সমস্ত উপলক্ষ।......প্রকৃতির বর্ণনাও উপলক্ষ, কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথাই নেই.......সৌন্দর্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়. উপলক্ষ মাত্র। হ্যামলেটের

ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি—ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

প্রথম পত্রে কবি বলেছিলেন, সাহিত্য লেখকের আত্মপ্রকাশ। শেষ পত্রখানিতে কবি নিজের সেই উক্তি বিশেষিত করেছেন এইভাবে :

> আমার বলা উচিত ছিল লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল।) কখনো নিজত্ব দ্বারা কখনো পরত্ব দ্বারা। কখনো স্বনামে কখনো বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য আকারে। লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্টের অবশিষ্ট তিনটি লেখা হচ্ছে 'বঙ্গভাষা', 'সাহিত্যসম্মিলন' ও 'সাহিত্য-পরিষৎ'।

বাংলা ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ব্যাকরণ, দেশের সর্বস্তরের লোকদের সঙ্গে যোগস্থাপন ইত্যাদি অশেষ প্রয়োজনের কথা কবির এই লেখাগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে।

## আধুনিক সাহিত্য

'আধুনিক সাহিত্য' গদ্য-গ্রন্থাবলীর পঞ্চম ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়।

'আধুনিক সাহিত্যে'র অধিকাংশ প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকটি প্রকাশিত হয় ভারতীতে ও বঙ্গদর্শনে। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ গ্রন্থ-সমালোচনা, কিন্তু আজও এর প্রায় সবগুলোই খুব চিত্তাকর্ষক।

এর প্রথম লেখাটি 'বঙ্কিমচন্দ্র'—বঙ্কিমচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত হয়েছিল। মূলে এটি ছিল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এর কিছু কিছু বর্জিত অংশ গ্রন্থ-পরিচয়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

তরুণ বয়সে প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবির কেমন মনে হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় বর্ণনা এই :

> সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক-প্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমলহাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম-দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় কবির বালক-মনে কিরূপ রেখাপাত করেছিল সে-সম্বন্ধে তাঁর উক্তি এই :

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।........বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত, কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণা করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোত-স্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, একথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবির কিছু-কিছু মতভেদের পরিচয় আমরা পাব এই গ্রন্থেই 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আলোচনায়।

'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি কবি লেখেন· ১৩০১ সালের প্রারম্ভে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পরলোকগমনের পরে। তরুণ বয়সে বিহারীলালের শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রবন্ধটিতে বিহারীলালের প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তিনি ব্যক্ত করেন। বিহারীলাল পূর্বেই আমাদের কিছু আলোচনার বিষয় হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে কবির কিছু-কিছু উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি :

> বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।
>
> কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীত-কাকলিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত। ........বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনা-সংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।.....
> ......সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণত পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির (বিহারীলালের) সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।......তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা।......ইংরেজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—
>
> "Spirit of Beauty, that dost consecrate
> With thine own house all thou dost shine upon
> Of human thought or form"
>
> যাহাকে বলিয়াছেন
>
> "Thou messenger of sympathies,
> That wax and wane in lovers' eyes".
>
> সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী।.......

……কবি যে সূত্রে 'সারদামঙ্গলে'র কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কিনা জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়—কিন্তু এ-কথা বলিতে পারি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। বর্তমান সমালোচক এককালে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গলে'র কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়িভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্য-সৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।

'সঞ্জীবচন্দ্র' কবির একটি খুব উপভোগ্য রচনা। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে-ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়, সেস্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে।

সঞ্জীবচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ 'পালামৌ' সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

'পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞ বার্ধক্যের লক্ষণ আছে—আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে, এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সবত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতন সৃষ্ট জগতের মধ্যে একজোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন।……পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে

জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধা-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয়ের এই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোলরমণীই হউক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোটো হউক, বড়ো হউক, সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।

বিদ্যাপতির 'রাধিকা' লেখাটিতে কবি বিদ্যাপতির রাধিকার রূপকল্পনাটি অল্প কথায় প্রস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা পেয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার সঙ্গে তার অল্পস্বল্প তুলনাও করেছেন, কিন্তু বিশেষভাবে তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন বিদ্যাপতির রাধিকার কমনীয় নবযৌবন-মূর্তি ও তার লীলা। কবির কিছু-কিছু উক্তি এই :

গতি এবং উত্তাপ যেমন একই শক্তির ভিন্ন অবস্থা, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমশক্তির সেই প্রকার দুই ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য, চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের দাহ, প্রেমের আলোক। ⋯ ⋯এমন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে, ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, মেঘের ছায়া পড়িতেছে, সূর্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য।⋯⋯এইখানেই শেষ করা যাইত। কিন্তু এখানে শেষ করিলে বড়ো অসমাপ্ত থাকে। ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এইজন্য বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে, অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে। এত লীলাখেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম-কথা এই যে,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যায়।

লেখাটির সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কবি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তার কারণ—আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও তখন আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করছিলেন, কিন্তু সেইদিনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বীরদর্পে উড্ডীন করেছিলেন স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা। কবির মতে "যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র" এই মূলভাবটি 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি। কিন্তু যৌক্তিকতার পক্ষপাতী হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যে অনেক স্থলে অযৌক্তিকতার ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে তাঁর এই মূল্যবান রচনাটির মূল্য লাঘব করেছেন সে-সম্বন্ধেও কবি স্পষ্টভাবেই আপন মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কিছু-কিছু উক্তি এই :

> বঙ্কিম, গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই তরবারি হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবসর পান নাই।... ....বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসংগত হইয়াছে, তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবাস্তব তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।...যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন অথচ তাহার ভালোরূপ মীমাংসা করেন নাই।... ...বঙ্কিম এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই যে-সকল সামাজিক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র; আর কোনো ফল হয় নাই।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

> যেমন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে নেপথ্যবিধান করিতে আরম্ভ করিলে অভিনয়ের রসভঙ্গ হয়, কাব্যসৌন্দর্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃবর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না; সেইরূপ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে তর্কযুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বলিতে পারেন 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটি স্টেজ নহে, উহা নেপথ্য; স্টেজ ম্যানেজার আমি নানা বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া, নানা স্থান হইতে নানা সাজসজ্জা আনয়নপূর্বক কৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিলাম—এখন কোনো কবি আসিয়া যবনিকা

উত্তোলন করিয়া দিন ; অভিনয় আরম্ভ করুন, সর্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন ; তাঁহাকে শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য কাজ কিছুই করিতে হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখাটি সাধনায় বেরোয় ১৩০০ সালের চৈত্রের সংখ্যায়। এটি কবির একটি বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচনা—শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধানিবেদন। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এর সার্থকতাই রবীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয় হয়েছে। আমরা পূর্বেই জেনেছি, কবি ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানী তেমন নন, তিনি বরং চান ইতিহাস-রস। সেই ইতিহাস-রস প্রচুরভাবেই তিনি এই 'রাজসিংহ' উপন্যাসে পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন মানবিকতাও সাহিত্যে যা চিরদিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসা চরিত্রটির বিশ্লেষণে কবি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সেই অংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

> বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরতজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল, তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাট প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত-জগৎ-বাসিনী রমণী।......
>
> ইতিহাসে মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিমাণ-অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক শক্তি

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁর ...
জাতির পুনরুজ্জীবনও—আর জাতি বলতে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে বুঝেছিলেন মুখ্যত হিন্দুজাতি। তাঁর কালে এদেশের মুসলমানদের মধ্যেও চলেছিল পুনরুজ্জীবনের ভাবনা—সেই চিন্তাধারা সাধারণত ওহাবী-মতবাদ নামে পরিচিত।* হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও মুসলমান পুনরুজ্জীবনবাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, দেশের জন্য তা কত শোচনীয় হয়েছে একালে সে-সব আর বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন করে না।† বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু পুনরুজ্জীবনচিন্তা রাজসিংহে সুপ্রচুর; কিন্তু সেদিকটা রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন মানুচি-প্রমুখ বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকে। কিন্তু সেই সব বিবরণের উৎস ছিল সেইদিনের রাজধানীর ও তার আশপাশের নানা ধরনের গল্পগুজব। বঙ্কিমচন্দ্রের জেবউন্নিসা চরিত্রটি ইতিহাসসম্মত হয়নি, কেননা, ইতিহাসের জেবউন্নিসার প্রায় সারাজীবন কেটেছিল কারাগারে পিতার রোষের ফলে। কিন্তু সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে এটির মূল্য অবিসংবাদিত।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাসখানির আলোচনায় কবি বিশেষ যত্নসহকারে দেখিয়েছেন মাত্রাবোধ সাহিত্যে কত প্রযোজনীয়—তার অভাবে প্রতিভাবান সাহিত্যিক কেমন করে সার্থকতালাভ থেকে বঞ্চিত থাকেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'যুগান্তর' উপন্যাসখানির আলোচনায় কবি বইখানির প্রথম ভাগের উচ্চ-প্রশংসা করেছেন, কেননা তাতে "তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্য গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।" কিন্তু পরবর্তী অংশে গ্রন্থকার নতুন বেশ ধারণ করেছেন, "তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক হইলেন নীতিপ্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন,—পূর্বে যেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল।"

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা কেন শক্ত সে-সম্বন্ধে কবি-বলেন:

যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানাভাবে সমাজের হৃদয়

* হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের প্রথম বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

† পুনরুজ্জীবন-বাদ সম্পর্কে বাংলার জাগরণের তৃতীয় বক্তৃতা দ্রঃ।

[illegible] হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—
তাহাকে সত্য এবং সরসভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা সর্বাঙ্গীণ পরিণতি লাভ করে নাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়—অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে, সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে, তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না; তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা' দ্বিতীয়ভাগ, 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' এই তিনখানি কাব্যের সমালোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 'আষাঢ়ে' কাব্যখানিতে তখন লেখকের নাম ছিল না। এই তিনখানি কাব্যই প্রশংসিত হয়েছে, তাদের মধ্যে 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। 'আষাঢ়ে' কাব্যখানি সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

এরূপ প্রকৃতির রহস্য-কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং 'আষাঢ়ে'র কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা, ভঙ্গি, বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।······হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা এবং ভাবের ভার থাকিলে তবে তাহার স্থায়ী আদর হয়। সমালোচ্য গ্রন্থে 'বাঙালি মহিমা', 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী' প্রভৃতি কবিতায় যে হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।

'মন্দ্র' সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

'মন্দ্র' কাব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নূতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্ম-

বিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।······সে-সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।······কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন,—দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিস্ময়, কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

'শুভবিবাহ' উপন্যাসখানি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন :

অনেক আর্টই, যাহা উদার, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা প্রীতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ, তাহার প্রতি আমাদের মনের সহজ আনন্দ, ইহাও আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত, তবে আর্ট আমাদের ক্ষতিই করিত।······

কারণ, কেবলমাত্র বাছাই করিয়া জগতের যাহা-কিছু বিশেষভাবে সুন্দর, বিশেষভাবে মহৎ, তাহারই প্রতি আমাদের রুচিকে বারংবার প্রবর্তিত করিতে থাকিলে আমাদের একটা রসের বিলাসিতা জন্মায়।

উপন্যাসখানির বিশেষ মূল্য-সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তবচিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম। য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানব-চরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাংলা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধ মাত্র নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছু নাই, যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।

কবি অবশ্য পঙ্কিলতার চিত্রণের নিন্দা করেছেন—রূঢ় বাস্তবের চিত্রণের নয়, কেননা রূঢ় বাস্তবের সার্থক চিত্রণ উচ্চমর্যাদার শিল্প।

'মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস' প্রবন্ধটি সেদিনের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চকর্মচারী আবদুল করিম বি.এ. প্রণীত 'ভারতবর্ষে মুসলমানরাজত্বের ইতিবৃত্ত' প্রথম খণ্ড অবলম্বন করে লিখিত। লেখাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এতে কবি সম্মুখীন হয়েছেন ভারতীয় জীবনের সার্থকতা লাভ হবে কোন্ পথে সেই বড় প্রশ্নের। কবির উক্তি উদ্ধৃত করা যাক :

যে সকল জাতি বিশ্ববিজয়ী, যাহাদের অসন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহাদের সভ্যতার নিম্নকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খল লোভের যে একটা পশুশালা গুপ্ত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাইলে কণ্টকিত হইতে হয়।

তখন আমাদের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের উদয় হয় যে, বৈরাগ্য ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে পরের অন্নে হস্তপ্রসারণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভিক্ষের উপবাসের দিনেও যাহা তাহাকে শান্তভাবে মরিতে দেয়, তাহা স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযোগী নহে বটে, তথাপি যখন মুসলমানদের ইতিহাসে দেখি উদ্দাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সম্মুখে, ক্ষমতালাভ স্বার্থসাধন সিংহাসন-প্রাপ্তির নিকটে স্বাভাবিক স্নেহ দয়া ধর্ম সমস্তই তুচ্ছ হইয়া যায়, ভাই ভাই, পিতাপুত্র, স্বামিস্ত্রী, প্রভুভৃত্যের মধ্যে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, রক্তপাত এবং অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতার প্রাদুর্ভাব হয়,—যখন খ্রীষ্টান ইতিহাসে দেখা যায়, আমেরিকায় অষ্ট্রেলিয়ায় মাটির লোভে অসহায় দেশবাসীদিগকে পশুদলের মতো উৎসাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, লোভান্ধ দাসব্যবসায়িগণ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে নাই, যখন দেখিতে পাই পৃথিবীটাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের কবলে পুরিবার জন্য সর্বপ্রকার বাধা অমান্য করিতে মানুষ প্রস্তুত,—ক্লাইভ, হেষ্টিংস তাহাদের নিকট মহাপুরুষ এবং সফলতালাভ রাজনীতির শেষ নীতি—তখন ভাবি শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে। যদিও জানি যে-বল পশুত্বকে উত্তেজিত করে, সেই বল সময়ক্রমে দেবত্বকে উদ্বোধিত করে, জানি যেখানে আসক্তি প্রবল সেইখানেই আসক্তিত্যাগ সুমহৎ, জানি বৈরাগ্যধর্মের ঔদাসীন্য যেমন প্রকৃতিকে দমন করে, তেমনি মনুষ্যত্বে অসাড়তা আনে এবং ইহাও জানি অনুরাগধর্মের নিম্নস্তরে যেমন মোহান্ধকার, তেমনি তাহার উচ্চশিখরে ধর্মের নির্মলতম জ্যোতি—জানি যে, যেখানে মনুষ্যপ্রকৃতির বলশালিতাবশত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ প্রচণ্ড, সেইখানেই দেবগণের ভোগ বিশুদ্ধতম আধ্যাত্মিক অমৃত উন্মথিত হইয়া উঠে, তথাপি লোভ-হিংসার ভীষণ আন্দোলন এবং বিলাসলালসার নিয়ত চাঞ্চল্যের দৃষ্টান্ত দেখিলে ক্ষণকালের জন্য দ্বিধা উপস্থিত হয়, মনে সন্দেহ জাগে যে, পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য শ্রেয়, না অপাপের, অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চলতা শ্রেয়।

কিন্তু পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের এমন "উত্তুঙ্গ তরঙ্গিত অসাম্য" প্রাচীন

ভারতীয় জীবনেও দেখা দিত বৌদ্ধ জাতকে ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে তার প্রমাণ আছে।

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ কবি বলেন :

- শেষের দিকেই আমাদের অন্তরের আকর্ষণ—কারণ, বিরাট সংগ্রামের উপযোগী বল আমরা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করি না, ধর্ম এবং অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সব-কটাকে একত্র চালনা করিবার মতো উদ্যম আমাদের নাই—আমরা সর্বপ্রকার দুরন্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করিবার প্রয়াসী। কিন্তু শাস্ত্র যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য,—তখন মানবের মধ্যে যে দানবটা আছে, সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আর্কষণ করে।

কিন্তু এও সম্ভবপর কি-না সে-সম্বন্ধে কবির মনে সন্দেহ জেগেছে :

> কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে দেব-দানবের যুদ্ধে দানবগুলো একেবারেই গেছে—দেবতারাও যে খুব সজীব আছেন, তাহা বোধ হয় না। অন্তত সর্বপ্রকার শঙ্কা ও দ্বন্দ্বশূন্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

এই লেখাটি ভারতীতে প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়। তার পর দেশে দেখা দেয় দুইটি প্রবল আন্দোলন—স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, সৌভাগ্যক্রমে দেশের আন্তর বীর্যবত্তার পরিচয় সেই দুই আন্দোলনে লক্ষণীয় হয়েছিল। এইসব আন্দোলনেরই ফলস্বরূপ দেশের লাভ হয়েছে স্বাধীনতা।—স্বাধীনতালাভের পরে ভারতীয় নেতারা বিশেষ জোর দেন শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উপরে। কিন্তু সম্প্রতি দেশকে অতর্কিতে লিপ্ত হতে হয়েছে চীনের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে। বলা বাহুল্য, এর জন্য মুখ্যত দায়ী চীনের লোভ ও হঠকারিতাই। এর পরে ভারতীয় মনোভাবে হয়ত একটা আমূল পরিবর্তন ঘটবে। শান্তি ও মৈত্রী তার জন্য অর্থ হারাবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইসঙ্গে যোগ্যভাবে শত্রুর সম্মুখীন হ'বার কথাও তার বিশেষ ভাবনার বিষয় হবে।

বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা এতে হয়ত আরো দূরে সরে যাবে। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রের অথবা কোনো রকমের বিশ্ব-সমঝোথার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিশ্বশান্তি কি যোগ্যভাবে

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আশা করা যায় সশস্ত্র অনাক্রমণের এই অনেকটা দুর্বহ অবস্থা মানুষকে অস্ত্রত্যাগ ও সত্যকার বিশ্বশান্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করবে।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'ঐতিহাসিক চিত্র' নানা দিক দিয়ে আলোচনা করে কবি উপসংহার করেছেন এইভাবে:

> ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হইলে পক্ষপাতের আশঙ্কা আছে, কিন্তু পক্ষপাত অপেক্ষা বিদ্বেষে ও সহানুভূতির অভাবে ইতিহাসকে ঢের বেশি বিকৃত করে। তাহা ছাড়া এক দেশের আদর্শ লইয়া আর এক দেশে খাটাইবার প্রবৃত্তি বিদেশীর লেখনীমুখে আপনি আসিয়া পড়ে, তাহাতেও শুভ হয় না।
>
> হউক বা না হউক আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীনদৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের চটির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুখ-ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব। এখানে তাঁহার নিজের চেষ্টায় সত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পরিলিখিত পরীক্ষা-পুস্তকের মুখস্থবিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়, কারণ সেই স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম আর একদিন সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ঠুলি চিরদিন বাঁধা রাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘানিবৃক্ষের তৈলনিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক, নূতন সত্য অর্জন ও পুরাতন ভ্রম বিবর্জনের উদ্দেশ্যে অব্যবহার্য।

আধুনিক সাহিত্যের 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধটি যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি. এ. প্রণীত 'সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব' গ্রন্থের আলোচনা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায়। এই রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ। সিংহ মহাশয়ের প্রতিপাদ্য দাঁড়িয়েছিল: "নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না। হয় সোঽহং ব্রহ্ম হইয়া যাও, নয় মূর্তিপূজা কর।" কবি এর উত্তরে প্রথমেই উপস্থাপিত করেছেন কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত:

> মুসলমানেরা মূর্তিপূজা করে না। অথচ মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই বা কখন জন্মেন নাই একথা বিশ্বাস্য নহে।......নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না। তিনি যে সোঽহং ব্রহ্মবাদী ছিলেন না ইহাও নিঃসন্দেহ।......

ব্রাহ্মদের মধ্যেও নিঃসন্দেহ কেহ না কেহ আছেন যিনি প্রবল ভক্তির আবেগবশতই মূর্তিপূজা পরিহারপূর্বক সমস্ত জীবন নিরাকার উপাসনায় যাপন করিয়াছেন।

সিংহ মহাশয়ের যুক্তির অপূর্ণতা কবি নানাভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উক্তিতে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করছি:

আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা নহে—ঠিক তার উল্‌টা।

মনে করো আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্র ক্রোশ-দুই তফাতে আছে। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, সমুদ্র এতই বড়ো যে স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার ধারণা হইতে পারে না, কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ; আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই, যতই প্রয়াস পাই, সমুদ্রকে ছোটো করিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। অতএব তোমার অন্দরের মধ্যে একটি ছোটো ডোবা খুঁড়িয়া তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা করো।

কিন্তু দর্শনশক্তির মধ্যে সীমা দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয় তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়। অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না। আমি যতদূর পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

এই যে প্রয়াস, বস্তুত ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না, আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহচন্দ্রতারকার অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য মধ্যে সে হারাইয়া যায়, এবং প্রভাতকরপ্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চদেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মতো উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না—তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"………যাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া জানি তাঁহাকেই উপাসনা করি। আমাদের সর্বোচ্চ উপাসনা তিনিই আকর্ষণ করেন যিনি এত বড়ো যে কোথাও তাঁহার শেষ নাই।

তর্কের মুখে বলা যাইতে পারে, তাঁহাকে জানিব বড়ো করিয়া, কিন্তু দেখিব ছোটো করিয়া। আপনাকে আপনি খণ্ডন করিয়া চলা কি সহজ কাজ। বিশেষত ইন্দ্রিয় প্রশ্রয় পাইলে সে মনের অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠে। সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটুকু না পাইলে নয় তদপেক্ষা বেশি কর্তৃত্ব তাহার হাতে স্বেচ্ছাপুর্বক সমর্পণ করিলে মনের জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

তাঁহাকে ছোটো করিয়াই বা দেখিব কেন। নতুবা তাঁহাকে কিছু একটা বলিয়া মনে হয় না, তিনি মন হইতে ক্রমশ স্খলিত হইয়া পড়েন।

এর উত্তরে কবি বলেন :

আসল কথা, ঈশ্বরকে সকলে চায় না, পারমার্থিক দিকে স্বভাবতই অনেকের মন নাই। ধন ঐশ্বর্য সুখ সৌভাগ্য পাপক্ষয় এবং পুণ্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবসেবা ও ধর্মকর্ম করাকে জর্জ এলিয়ট Other Worldliness নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ সেটা পারলৌকিক বৈষয়িকতা। তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে। যাহাদের সেইদিকে লক্ষ্য, সাকার-নিরাকার তাহাদের পক্ষে উপলক্ষমাত্র। সুতরাং হাতের কাছে যেটা থাকে, যাহাতে সুবিধা পায়, দশজনে যেটা পরামর্শ দেয় তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্মচতুর লোক পুণ্যের খাতায় লাভের অঙ্ক জমা করিতে থাকেন। নিরাকারবাদী এবং সাকারবাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে।

যাঁরা স্বভাবভক্ত তাঁদের সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাঁহাদের প্রকৃতির সহজ ধর্ম, সংসার যাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না—যেদিকেই স্থাপন কর কম্পাসের কাঁটার মতো যাঁহাদের মন এক অনির্বচনীয় চুম্বক-আকর্ষণে অনন্তের দিকে আপনি ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগদীশ্বরকে বাদ দিলে যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতিগতি চিন্তাচেষ্টা ক্রিয়াকর্ম একেবারেই নিরর্থক এবং সমস্ত জগদ্ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা,······সাধনা তাঁহাদের নিকট দুঃসাধ্য নহে এবং তাঁহারা আপনাকে ভুলাইয়া এবং আপনার ঈশ্বরকে ভুলাইয়া সংক্ষেপে কার্যোদ্ধার করিতে চাহেন না—কারণ, নিত্য সাধনাতেই তাঁদাদের সুখ, নিয়ত প্রয়াসেই তাঁহাদের প্রকৃতির পরিতৃপ্তি।

এরূপ স্বভাবভক্ত যখন মূর্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর আচরণ কেমন হয় সে সম্বন্ধে কবি এই উক্তি করেছেন :

······তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্তিকে অমূর্ত করিয়া

দেখিতে পারেন; তাঁহার প্রত্যক্ষবর্তী কোনো সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাহাকে বিদ্যুদ্‌বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাহাকে দূর করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার তো কথাই নাই; যে লোকের অক্ষরজ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন "গা" এবং "ছ" দেখে, তখন ক্ষুদ্র গ-য়ে আকার ছ দেখে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়, তেমনি তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও দেখিতে পান না, মুহূর্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন, যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।

আবার প্রকৃতিভেদে কোনো কোনো স্বভাবভক্ত লোকপ্রচলিত মূর্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাসবন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রতীক উপাসনায় যে বড়ো রকমের বিপদ আছে সে-সম্বন্ধে কবি এই মন্তব্য করেছেন:

আমাদের দেশে দেবতা কি কেবল মূর্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব। চার হাতকে যেন আমরা চারদিক্‌বর্তী কর্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম, কিন্তু পুরাণে উপপুরাণে যাত্রায় কথকতায় তাহার জন্মমৃত্যু-বিবাহ-রাগদ্বেষ-সুখদুঃখ-দৈন্য-দুর্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া। যতপ্রকার কৌশলে মানুষের মনকে ভুলাইয়া একেবারে আটেঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনোটারই ত্রুটি নাই। এবং এতপ্রকার সুদৃঢ় স্থূল শৃঙ্খলে চতুর্দিক হইতে সযত্ন বন্ধনকে গ্রন্থাকার যদি তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া গণ্য করেন তবে মাছির পক্ষে মাকড়সার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা অসংগত হইবে না।

কবির উক্তিটি কঠোর এবং তা দেশ-এর সমীচীনতা স্বীকার করে নেয় নি। কিন্তু কবির উক্তিতে কি সত্য নেই? দেশের চিন্তাশীলদের উচিত কবির এই সমালোচনার সত্যাসত্য বিচার করা।

আধুনিক সাহিত্যের শেষ লেখাটি হচ্ছে 'জুবেয়ার'। কবি সূচনায় লিখেছেন:

রসজ্ঞ ম্যাথ্যু আর্নল্ড ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের সহিত ইংরেজি পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দেন। যখন যাহা মনে আসিত জুবেয়ার তাহা লিখিতেন কিন্তু প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার রচনা প্রবন্ধ-রচনা নহে, এক একটি ভাবকে স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা। পদ্যে যেমন সনেট, যেমন শ্লোক, গদ্যে এই লেখাগুলি তেমনি।

জুবেয়ারের বাক্সে দেরাজে এই লেখা কাগজসকল স্তূপাকার হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পরে এগুলি ছাপা হয়, তাহাও পাঠকসাধারণের জন্য নহে, কেবল বাছা বাছা অল্প গুটিকয়েক সমজদারের জন্য।

কবির এই রচনাটি অতি উপভোগ্য। বার বার পড়লেও এর মাধুর্য হ্রাস পায় না। জুবেয়ারের বাণী যেমন সারগর্ভ তেমনি উজ্জ্বল; আর কবির অনুবাদ আদৌ অনুবাদ বলে মনে হয় না। আমরা জুবেয়ারের অল্প কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করছি:

যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহা জানিয়াছি তাহা ভালোরূপে প্রকাশ করিতে যৌবনের প্রয়োজন অনুভব করি।

* * *

ব্যবসাদার সমালোচকেরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। ট্যাকশালের চলতি টাকাপয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার। তাহাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে, কিন্তু নিকষ পাথর অথবা সোনা গলাইয়া দেখিবার মুচি নাই।

* * *

সাহিত্যের বিচারশক্তি অতি দীর্ঘকালে জন্মে এবং তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ অত্যন্ত বিলম্বে ঘটে।

* * *

অধিক ঝোঁক দিয়া বলিবার চেষ্টাতেই নবীন লেখকদের লেখা নষ্ট হয়, যেমন অধিক চড়া করিয়া গাহিতে গেলে গলা খারাপ হইয়া যায়। বেগ, কণ্ঠ, ক্ষমতা এবং বুদ্ধির মিতপ্রয়োগ করিতে শেখাই রচনাবিদ্যা, এবং উৎকর্ষলাভের সেই একমাত্র রাস্তা।

সাহিত্যে মিতাচরণেই বড়ো লেখককে চেনা যায়। শৃঙ্খলা এবং অপ্রমত্ততা ব্যতীত প্রাজ্ঞতা হইতে পারে না এবং প্রাজ্ঞতা ব্যতীত মহত্ত্ব সম্ভবপর নহে।

* * *

ভালো করিয়া লিখিতে গেলে স্বাভাবিক অনায়াসতা এবং অভ্যস্ত আয়াসের প্রয়োজন।

* * *

ডুসোণ্ট বলেন, মনের অভ্যাস হইতে স্টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতির অভ্যাস হইতে যাহাদের স্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য।

* * *

সুকথিত রচনার লক্ষণ এই যে, ঠিক যেটুকু আবশ্যক তার চেয়ে সে অধিক বলে, অথচ যেটি বলিবার নিতান্ত সেইটিই বলে ; ভালো লেখায় একই কালে প্রচুর এবং পরিমিত, ছোটো এবং বড়ো মিশ্রিত থাকে। এক কথায় ইহার শব্দ সংক্ষিপ্ত অর্থ অসীম।

* * *

দুর্লভ আশাতীত স্টাইল ভালো যদি জোটে, কিন্তু আমি পছন্দ করি যে স্টাইলটিকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায়।

আধুনিক সাহিত্যের পরিশিষ্টে দুইটি লেখা স্থান পেয়েছে—একটি 'শোকসভা', অপরটি 'নিরাকার উপাসনা'।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে কবি নবীন সেন প্রমুখ কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভা করে বঙ্কিমের জন্য শোক প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হন, কেননা, শোকপ্রকাশের এই রীতিটা বিদেশী। তাঁদের আপত্তির উত্তরস্বরূপ এই 'শোকসভা' প্রবন্ধটি লেখা হয়। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

> পরিচিত ব্যক্তিকে অন্যের নিকট পরিচিত করা কার্যটি তেমন সহজ নহে। জীবনের ঘটনার মুখ্য-গৌণ নির্বাচন করা বড়ো কঠিন। যিনি আমাদের নিকট সুপরিচিত তাঁহার কোন্ অংশ অন্যের নিকট পরিচয়সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা বাহির করা দুরূহ। অনেক কথা অনেক ঘটনাকে সহসা সামান্য মনে হইতে পারে পরিচয়ের পক্ষে যাহা সামান্য নহে।……স্বভাবত কৃতঘ্ন বলিয়া সে আমাদের পাব্লিক অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহা নহে, সে ভালো করিয়া বোঝে না, সম্পূর্ণরূপে জানে না

বলিয়াই তাহার কৃতজ্ঞতা জাগ্রত হইয়া উঠে না। মৃত ব্যক্তির কার্যগুলি ভালো করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাকে মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে। লেখক বলিয়া নহে, কিন্তু স্নেহপ্রীতিসুখদুঃখে মনুষ্যভাবে তাঁহার লেখার সহিত এবং আমাদের সহস্রের সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাকে কেবল দেবতা বলিয়া পুজা করা নহে, কিন্তু স্বজাতীয় বলিয়া আমাদের আত্মীয় করিয়া দিতে হইবে।

'নিরাকার উপাসনা' লেখাটি ১৩০৫ সালে ভারতীর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটিকে 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধটির অনুবৃত্তি জ্ঞান করা যেতে পারে। এর উপসংহারে কবি বলেছেন :

…যখন আমরা যথার্থরূপে তাঁহাকে চাই তখন ব্রহ্ম বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ না হইতেন তবে এই অসৎ সংসার, এই অন্ধকার হৃদয়, এই মৃত্যুবীজসংকুল সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে চাহিতাম না।• কেন তবে আমরা তর্ক করিয়া থাকি যে, আমরা অপূর্ণ জীব, এবং তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। অতএব তাঁহাকে আমরা পাইতে পারি না এবং সেইজন্য অসত্য অজ্ঞান এবং অন্তবিশিষ্ট আকারকে আমরা কেন তাঁহার স্থানে আরোপ করি? আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণস্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই; আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ একমাত্র মুক্তি।

## নৌকাডুবি

'নৌকাডুবি' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হতে শুরু হয় ১৩১০ সালের বৈশাখে। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৩ সালে।

'নৌকাডুবি' এর পূর্ববতী 'চোখের বালি'র সঙ্গে তুলনায় প্রকৃতিতে অনেকখানি বিভিন্ন মনে হয়। 'চোখের বালি'তে প্রবৃত্তির উদ্দামতা যথেষ্ট চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু 'নৌকাডুবি'তে কোথাও তেমন উদ্দামতার পরিচয় নেই। সেজন্য কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, চোখের বালির প্রতিক্রিয়ায় নৌকাডুবি রচিত।

কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না, কেন না, চোখের বালিতেও শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তির সংযমিত রূপই আমরা দেখি।

তবে এটি যথার্থ যে, নৌকাডুবিতে নায়ক-নায়িকার সংযত মনোভাব ও আচরণ খুব লক্ষণীয় হয়েছে।

এই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে কবি নিজে মন্তব্য করেছেন :

সময়ের দাবি বদলে গেছে। একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোনো এক জন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবার-রূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।

কবি যে পরিস্থিতির উদ্ভব করেছেন তার একটা উচুঁদরের সাহিত্যিক রূপ দেওয়া যেতে পারত। সে-সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তাহলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্রাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন। ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহক হয়ে রইল রমেশ—তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেব না।

কবি যেমন ইঙ্গিত করেছেন, তাঁর 'নৌকাডুবি'কে তাঁর একটি দুর্বল রচনা বলেই গণ্য করতে হবে। এতে কিছু স্মরণীয় হয়েছে রমেশের বঞ্চিত জীবনের বেদনা।

কমলার চরিত্র এতে লক্ষণীয় হয়েছে পাতিব্রত্যের একটি প্রতীক হিসাবে। তার অবিশ্বাস্য রকমের সরলতা আর আন্তরিকতা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। নৌকাডুবি কবির বিশেষ মরমী চেতনার যুগে রচিত। কমলার অন্তরে সেই চেতনার কিঞ্চিৎ স্পর্শও লেগেছে। সেইদিক দিয়ে এটিকে একটি রূপক রচনা হিসাবেও পাঠ করা যেতে পারে।

নৌকাডুবির সাহিত্যিক মূল্য কিছু কম হলেও এর ঐতিহাসিক প্রভাব কম হয়নি। শরৎচন্দ্র যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন চোখের বালির গতিধর্মিতার

দ্বারা, তেমনি প্রভাবিত হয়েছিলেন নৌকাডুবির স্থিতিধর্মিতার, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের আনুগত্যের দ্বারাও।—শুধু শরৎচন্দ্র নয়, আমাদের একালের অন্যান্য অনেক লেখক-লেখিকাও এই দুইটি বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, আর অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রভাব তেমন সুফলদায়ক হয় নি। বোধ হয় তার কারণ—এই দুই মনোভাবের ভিতরকার দ্বন্দ্ব তাঁদের চিন্তায় নিরাকৃত হয়নি।

## ধর্ম

গ্রন্থ-পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে :

> ধর্ম গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ, বা পৌষোৎসবে, বা/এবং আদিব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত, 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের ১২ই মাঘ আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটি কলেজ হলে পঠিত হয় এবং 'ততঃ কিম্' ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হয়।

সংক্ষেপ বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের বা সত্যের একান্ত আনুগত্যস্বীকার—শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝার ব্যাপার এটি নয়। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক তো আছেই, বিচারের দিকও আছে। তবে অনুভূতি ধর্মের প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সম্পর্কিত ভাষণ মোটের উপর গভীর অনুভূতিতে, অর্থাৎ ভগবদানুগত্যের কথায়, ভরপুর। বিচারের দিকও তাতে আছে, তবে অনুভূতিই সে-সবের মুখ্য ব্যাপার।

কিন্তু গদ্য বিচারের ভাষা। যা মুখ্যত অনুভূতির ব্যাপার গদ্যে তা সব সময় পর্যাপ্ত প্রকাশ লাভ করে না। এই 'ধর্মে'র প্রবন্ধগুলোয় তাই মাঝে মাঝে আমরা উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক বাণী পাই যা আমাদের বিচারবুদ্ধিকেও তৃপ্ত করে, কিন্তু প্রায়ই যেখানে যুক্তিতর্কের ভিতরে কবি প্রবেশ করতে চেয়েছেন সেখানে বিচার ও অনুভূতি দুই-ই অনেকটা আচ্ছন্ন হয়েছে। কবির মূল মনোভাব বিচারের মনোভাব পুরোপুরি নয়, বরং বিশ্বাসের মনোভাব, তাই এমনটি ঘটেছে। তবে এর কয়েকটি লেখা যেমন অনুভূতি-সমৃদ্ধ তেমনি বিচার-সমৃদ্ধ। সে-সব স্মরণীয় গদ্য-রচনা হয়েছে।

এর প্রথম লেখাটি 'উৎসব'। তাতে কবির প্রধান কথা এই : মানুষের

প্রতিদিনের জীবনের যে স্বার্থপর একক খণ্ড রূপ সেটি তার সত্য রূপ নয়—তার সত্য রূপ সম্মিলিত রূপ, আর সেই সম্মিলিত রূপকে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা দান করে প্রেম। উৎসবের দিনে মানুষের এই যে আনন্দময় প্রেমময় সম্মিলিত রূপ দেখা দেয়, এই লেখাটিতে কবি তারই মহিমা কীর্তন করেছেন—মানুষের অন্তরে প্রেম ও আনন্দ পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত হ'ক এই চেয়েছেন।

এর 'দিন ও রাত্রি' লেখাটির অনেক ছত্র খুব ভাবপূর্ণ। এতে বিশেষভাবে রাত্রির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে—নীলাম্বরা রাত্রি স্তব্ধ ও সুগম্ভীর—যেন অতলস্পর্শ। এর একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া জননী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ, তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্ব-প্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান্ করুক।

অনন্তস্বরূপ ভগবানে নিঃশেষে আত্মবিসর্জনের প্রয়োজন কবি কখনো কখনো অনুভব করেছেন। মানব-ব্যক্তিত্বও তাঁর একান্ত প্রিয়। এই দুয়েরই সম্বন্ধে বহু কথা আমরা পরে পাব।

'মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি ১৩১০ সালে মাঘোৎসবে প্রদত্ত ভাষণ। এর প্রথম অংশে কবির বক্তব্য—

> পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ মনুষ্যের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে।
> ··মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

দ্বিতীয় অংশে কবি বলেছেন : এই পরম দুঃখে অর্জিত মনুষ্যত্ব প্রেমে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দেবারই জন্য—তাতেই সেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা :

> প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, তত তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ, প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই

প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে, ব্রহ্মের প্রীতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

কবির ব্রহ্ম এখানে মুখ্যত একটি মরমী সত্তা—সাধারণত ভগবান্, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, এসব বলতে যে জ্ঞান-অগম্য ব্যাপার বোঝায় তাই। 'পরে—যেমন 'মানুষের ধর্ম' রচনার যুগে—কবি ভগবান্, ব্রহ্ম, এসব বলতে মুখ্যত বুঝেছেন মানুষের ভিতরকার মহৎ সম্ভাবনা বা দেবত্ব। কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাও কবির শেষ কথা নয়।

'ধর্মের সরল আদর্শ' ছিল কবির ১৩০৯ সালে মাঘোৎসবে দত্ত ভাষণ। বোয়ার যুদ্ধের যুগে এটি লেখা। য়ুরোপের জীবনাদর্শ থেকে কবি তখন পুরোপুরি মুখ ফিরিয়েছেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শের দিকে। কবি খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই বলতে চেষ্টা করেছেন উপনিষদের সেই আদর্শ অতি সরল, জটিলতা কিছুমাত্র তাতে নেই, আর তা যেমন সরল তেমনি সার্থক। গায়ত্রী মন্ত্র, যা ব্রহ্মসাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তাও কবির মতে জটিলতাবর্জিত। কিন্তু কবির এই কথাটি বুঝে দেখবার আছে।

কবি সারাজীবন ছিলেন আলোকের প্রেমিক—প্রতিদিন পরম আগ্রহে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করতেন। এই আলোকের স্তবে তাঁর সাহিত্য পূর্ণ। তাঁর অতি নিবিড় প্রকৃতি-প্রেমের সঙ্গে এই আলোকের প্রেম ছিল নিত্য-যুক্ত—সেই প্রকৃতি-প্রেম ও আলোকের প্রেম শুধু তাঁর সৌন্দর্যের ক্ষুধা মিটাতো না, তাঁর আত্মিক সকল ক্ষুধা মিটাতো। এক্ষেত্রে উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে আর জার্মান কবি গ্যেটের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল—গ্যেটেও আলোকের ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্তব নানাভাবে গেয়েছেন; ফাউস্টের শেষে আমরা দেখি, সৌন্দর্যের অনুভূতি ও চর্চা ফাউস্টকে মহত্তর মানসলোকে উন্নীত করছে।

কিন্তু তবু বলতে হবে, প্রকৃতি, আলোক এবং সৌন্দর্য এসবের আবেদন রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের কাছে মত অর্থপূর্ণ, অনেকেরই কাছে তেমন নয়। তাই কবির কাছে তাঁর আলোক ও সৌন্দর্য অভিসারী ধর্মচেতনা যত সরল প্রতিভাত হয়েছে তা বিশেষভাবে তাঁরই বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া ধর্ম মনুষ্যত্ব-সাধনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, প্রকৃতি, আলোক, এবং সৌন্দর্য সেই মনুষ্যত্ব-বিকাশের অনেকখানি সহায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্ব-সাধনা কোনো সহজ ভাব-সাধন নয়—একটি জটিল জীবন-সাধন, কেননা ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায়

এসব জটিল বিষয়ের সঙ্গে তা বিশেষভাবে জড়িত। কবিও সেকথা বলেছেন। একটু পরেই তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। তাই কবির এই লেখাটি ভাবাবেগপূর্ণ হয়েছে বেশি, সেই তুলনায় তেমন বিচারসহ হয়নি।

লেখাটির শেষের দিকে কবি ধর্মসাধনায় পাপবোধের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাঁর উক্তি এই :

> বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয় ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়। বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের উপরে খৃষ্টধর্মের পাপবোধের যে প্রভাব পড়েছিল এখানে তার প্রতি কবি ইঙ্গিত করেছেন।

পাপ, অন্যায়, এসবের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে নানা ধরনের শাস্তির কথা সব ধর্মেই স্থান পেয়েছে। তবে খৃষ্টধর্মে পাপবোধের উপরে কিছু অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্যেটের লেখায় তার প্রতিবাদ আছে।

কিন্তু উৎকট পাপবোধের প্রতি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করলেও অন্যায়, অপরাধ, এসব সম্বন্ধে চেতনা গ্যেটের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে কম প্রবল নয় —সেকথা শ্বাইট্‌জার তাঁর Goethe গ্রন্থে বলেছেন। অন্যায়, অপরাধ, এসবের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কথা রবীন্দ্রসাহিত্যেও কম নেই। তাই বলা যায়, গ্যেটের মতো রবীন্দ্রনাথও উৎকট পাপবোধের নিন্দাই করেছেন। তবে তিনি যে বলেছেন, 'অনন্তস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন……তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়'—তাঁর এই উক্তিতে, ধর্ম-জীবনলাভের পথে যত বিচিত্র বিঘ্ন আছে, সেসবের উল্লেখ বা ইঙ্গিত তেমন পর্যাপ্ত হয়নি। আনন্দস্বরূপকে অন্তরে অনুভব করা খুব বড় ব্যাপার। কিন্তু সেই জানাকে অন্তহীনভাবে জিইয়ে রাখা চাই জীবনের বিচিত্র প্রচেষ্টার মধ্যে। তাই পাপ অন্যায় ত্রুটি এসব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনা সব সময়েই প্রয়োজনীয়, কেননা, এসব জীবনের নিত্যসঙ্গী।* কবির লেখাতেও এসব কথা আমরা নানাভাবে পাব, বিশেষ করে 'গীতালি'র আলোচনাকালে।

* আমিয়েল বলেছেন : There is in a man an instict of revolt, an enemy

ভারতীয় সাধনাকে কবি এখানে যতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবেছেন, আমরা দেখবো, পরে তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তার যথেষ্ট প্রতিবাদ নিজেই করেছেন। মানুষের চেতনা জগতের ইতিহাসের পারম্পর্যের ভিতর দিয়ে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, একথা কবি সহজভাবেই বুঝতেন যদিও তর্কের প্রভাবে কোনো একদিকে একটু বেশিও তিনি ঝুঁকতেন। তাঁর এই প্রবণতার কথা ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি বলেছেন। ( প্রথম খণ্ড, ২৭১ পৃঃ দ্রঃ )

প্রাচীন ভারতের 'একঃ' লেখাটি ১৩০৮ সালে মাঘোৎসবে দত্ত ভাষণ। এটি আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ। এই 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'র কথা 'নৈবেদ্যে' বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে—প্রকাশও সেখানে অনেক উচ্চাঙ্গের হয়েছে। তার একটি কারণ, 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' যুক্তিতর্কের বিষয় তেমন নন যেমন উপলব্ধির বিষয়। এর একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন।……পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ-ষড়যন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি।

কিন্তু অমৃতের জন্য অন্তরে অন্তরে গভীরভাবে প্রার্থী হয়েও মানুষ উপকরণকে উপেক্ষা করতে পারে না। ভারতেও সেই ধারা চলেছে।

এর 'প্রার্থনা' লেখাটি সহজ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত বড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল—শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে তিনটে প্রার্থনা জানাইল,

of all law, a rebel which will stoop to no yoke, not even that of reason, duty and wisdom. This element in us is the root of all sin......The independence which is the condition of individuality is at the same time the eternal temptation of the individual. That which makes us beings makes us also sinners. (P. 164).

তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

······বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ তাহাকে আমরা জানিই না, যতক্ষণ না, সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাখা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতে মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।······আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

কবির আদর্শবাদ যে অনেকখানি কাণ্ডজ্ঞানবাদ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। 'ধর্মপ্রচার' লেখাটি সিটি কলেজ হলে একটি আলোচনা-সভায় পঠিত হয়েছিল—তা আমরা জেনেছি। এতে কবি তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন ধর্মপ্রচারের প্রচলিত ধারা, আর সেইসঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন ধর্মপ্রচারের সার্থক ধারা সম্বন্ধে তিনি যা ভাবতে পেরেছেন সেই সব। তাঁর উক্তি আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি:

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও

করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্ত বাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি।······বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি—কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।······

আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে······ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজনসাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষে সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম তাহাই অনুপযোগী ছিল—ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।········

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।·····

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্"—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।··· ···

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি।······

আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জানে

জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর।......

মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অনেক সময় অনুভব করেছেন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে। তাঁর সেই সব অনুভূতির সঙ্গে তাঁর এই উক্তিটি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এই দিকটা সাধারণ্যে অপরিচিতই বেশি। উপসংহারে ধর্মসমাজ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে—ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে।........মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই।......ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স ভগবনঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি"—"হে ভগবন্ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?" ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিম্নি"—"আপন মহিমাতে"। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

কবি তাহলে ধর্মপ্রচার চাইলেন না, চাইলেন ঈশ্বরোপলব্ধি—ব্যাপক ধর্মবোধ। দলবৃদ্ধির জন্য যে প্রচার তা অবশ্য প্রশংসনীয় নয়, তবে মহৎ চিন্তা, মহৎ ভাব, এসবের যোগ্য প্রচার চাই। কবিও তা করেছেন।

'ধর্মে'র অবশিষ্ট লেখাগুলোর ভিতরে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই তিনটি লেখা হচ্ছে 'দুঃখ', 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' আর 'ততঃ কিম্'।

'দুঃখ' ১৩১৪ সালে মাঘোৎসবে দত্ত ভাষণ। সেই বৎসর ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে অকস্মাৎ কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। কবির সেই

মর্মান্তিক দুঃখের দাহ যেন কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় এই অসাধারণ লেখাটিতে। এর কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

……দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।' একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন।……আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি ঝিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়াছেন—নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে?……হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না; আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি; আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ—এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ,………হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা, হঠাৎ যখন অর্ধরাতে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে, তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি,—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।……

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না

তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।······

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা,তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা।······দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে, নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা, এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

এটি গদ্যে লেখা হলেও একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা। কবির এই চিন্তা সম্বন্ধে 'গীতাঞ্জলিতে' আমরা কিছু আলোচনা করবো। 'স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম' লেখাটিতে মানুষের পরমপ্রিয় স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্বের কথা কবি বলেছেন, আর সেই সঙ্গে নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন সেই স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা কোন্ পথে। কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়, তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,—দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই। স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে।·········
কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-

সকল মাল-মসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে, আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারিব না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে।.......
সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছু পরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।.........
তবেই দেখিতেছি একদিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্যদিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।.....

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে প্রেম; একদিকে প্রবৃত্তি আর একদিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল।... ..
নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন। কবি যে-ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে চায়, সে ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে।.......
তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি ; সে সংসার আমার নিজের হাতে গড়া নয়, সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই, সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারও জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে, সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনির্বাণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য।......
স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে,

সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতি-প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।......মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

'ততঃ কিম্' লেখাটি ১৩১৩ সালে ওভারটুন হলে একটি আলোচনা সমিতিতে পড়া হয়েছিল তা আমরা জেনেছি। এই লেখাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কবির মনে যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল এই লেখাটিতে তিনি তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। য়ুরোপের যে Progress-এর—পার্থিব জীবনের, অশেষ উন্নতির—আদর্শ, ভারতের চতুরাশ্রম ও মোক্ষের আদর্শকে কবি তার চাইতে মহত্তর আদর্শরূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। এই লেখাটির শেষের দিকে কবি বলেছেন:

> প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে, তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবেই তাহার আদ্যন্ত সংগত পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায়। .....
>
> এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে; তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

কবির ব্যাখ্যাত জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের সমালোচনার

সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। সেই ধরনের সমালোচনার যৌক্তিকতা কবি যে স্বীকার করেননি এই ততঃ কিম্ লেখাটিতে তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কালে কালে কবির মতের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় সব দিকেই সম্প্রসারিত হয়ে কালে বিশ্বভারতীর রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া কবির সেইকালের একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠার আদর্শ পরবর্তী কালে অন্তহীন অগ্রগতির আদর্শের রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ-সম্পর্কে তাঁর গীতালির একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

সেই তো আমি চাই
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা
সেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

তবে কবি মর্মে মর্মে হয়ত চিরদিনই ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ ব্রহ্মের বা ভগবানের মরমী সত্তায় আস্থাবান—তাঁতে নিবেদিতচিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ সেইদিনে আনন্দময় ব্রহ্ম, ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ এসবের কথা যত আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন একালের চিন্তাশীলেরা ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে সেই সহজ গভীর প্রত্যয় অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছেন। জগতের দুঃখমূর্তি, অহেতুক ধ্বংসপ্রবণতা, এসব তাঁদের হৃদয় ও মস্তিকের উপরে অনেক বেশি চেপে বসেছে। তবে মৈত্রী, শুভবুদ্ধি, সংযম (কবির ব্রহ্ম বা ভগবান অনেক সময়ে এই সবের নামান্তর একথাও বলা যেতে পারে) মানবীয় জগতে এ-সবের ব্যাপক অনুশীলন কোনো দিন মূল্যহীন হবার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরে সহজ ভক্তি একালের ভাবুকদের জন্য দুর্বোধ্য। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনায় তাঁর নিবেদিতচিত্ততা অবশ্য তাঁদের পরমপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ পরে যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের উপরেই বেশি জোর দেন তা আমরা দেখবো।*

* কিন্তু ঈশ্বরে সহজ ভক্তি একালের ভাবুকদের জন্য দুর্বোধ্য হলেও আসলে মহামূল্য।

# প্রায়শ্চিত্ত

কবির তরুণ বয়সের উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকরূপে প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের সূচনায়।

এর অল্প কিছুকাল পূর্বে কবি পর পর কয়েকটি নিদারুণ শোকের আঘাত পান। তাছাড়া এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবীরা ইংরেজের অত্যাচারের জবাবস্বরূপ প্রথম বোমা নিক্ষেপ করে। আর এই কালেই দক্ষিণ আফ্রিকায় চলেছিল মহাত্মা গান্ধীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন—সেই প্রতিরোধের চিন্তাটি মহাত্মা পান টলস্টয়ের কাছ থেকে। বোমা-নিক্ষেপের প্রতি বিরূপতা কবি সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন করেন তা আমরা জেনেছি। এই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে আরো গভীর আরো ব্যাপক ভাবনার পরিচয় তিনি দেন। বলা যেতে পারে, মহাত্মার প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধের এটি এক স্মরণীয় সাহিত্যিক রূপ।

'বউঠাকুরানীর হাটে'র অনেক অংশ এই প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রক্ষিত হয়েছে। নতুন সংযোজনও অবশ্য এতে যথেষ্ট হয়েছে—সে সবের মধ্যে খুব বিশিষ্ট হচ্ছে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র, আর এই নাটকের গানগুলো। ধনঞ্জয় বৈরাগীর বাহ্য রূপ আমাদের দেশের একজন সাধারণ বাউল বা বৈরাগীর রূপই; কিন্তু তার অন্তরে রয়েছে অমরবীর্য চিন্তা—আর সেই সব চিন্তা তার মুখে ব্যক্ত হয়েছে অতি সহজ ভঙ্গিতে। তাতে সে-সব খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

প্রায়শ্চিত্তের গানগুলোতে খুব লক্ষণীয় হয়েছে গভীর ভগবদানুগত্য—সেই দুর্লভ আনুগত্য বৈরাগীকে ও তার চেলাদের দিয়েছে প্রবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সহজভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি।

কবির এই কালের অসীম ভগবৎনির্ভরতা আর মহাত্মা গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের শান্ত বীর্য—এই দ্বিবিধ মহৎ ভাবনার সম্মিলনে ধনঞ্জয় বৈরাগী এমন একটি অপূর্ব প্রাণবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে অবিস্মরণীয়।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে কবি যে-সব উঁচুদরের—অথচ বৈরাগীর পক্ষে সম্পূর্ণ মানানসই—রাজনৈতিক, নৈতিক ও প্রেমধর্মের কথা দিয়েছেন তার একটা ভাল সংগ্রহ আমরা পাই নাটকের এই সংলাপে :

প্রতাপাদিত্য—

দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে

না। এখন কাজের কথা হ'ক। মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বলো।

ধনঞ্জয়—

না মহারাজ দেব না।

প্রতাপাদিত্য—

দেবে না! এতবড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়—

যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য—

আমার নয়!

ধনঞ্জয়—

আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে।

প্রতাপাদিত্য—

তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে।

ধনঞ্জয়—

হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।

প্রতাপাদিত্য—

দেখো ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়—

যে দুঃখ কপালে ছিল তাকে আমরা বুকের উপর বসিয়েছি মহারাজ—সেই দুঃখই তো আমাকে ভুলে থাকতে দেয় না। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে—ব্যথা আমার বেঁচে থাক।

সজ্জন বসন্ত রায়ের চরিত্রেও গভীর ভগবদানুগত্য একটি সহজ শ্রী লাভ করেছে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি আদৌ জনপ্রিয় হয়নি। বোধ হয় তার কারণ বাঙালীর জাতীয় বীর প্রতাপাদিত্যকে এতে আঁকা হয়েছে একজন নির্মম অত্যাচারী রূপে। তবে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রতাপাদিত্যকে প্রধানত অত্যাচারী রূপে আঁকা

হলেও কিছু পরিমাণে মানবিকও করা হয়েছে—তাতে চরিত্রটির মূল্য বেড়েছে। নাটকের শেষের দিকে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে প্রতাপাদিত্য বলছেন :

বৈরাগী, আমার এক একবার মনে হয় তোমার ওই রাস্তাই ভালো—আমার রাজ্যটা কিছু না।

তার উত্তরে বৈরাগী বলছে :

মহারাজ রাজ্যটাও তো রাস্তা। চলতে পারলেই হল। ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই তো পথিক, আমরা কোথায় লাগি ?

এর সব চরিত্রই, এমন কি ঘাতকদ্বয়ও, বেশ মানবিক হয়েছে। তবে নাটকের শেষের দিকে রাজপুত্র উদয়াদিত্য, রাজকন্যা বিভা, সবাই ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো সংসারত্যাগী হলো—এটি কিঞ্চিৎ অতিনাটকীয় হয়েছে বলা যায়। অবশ্য রাজকুমারের ও রাজকুমারীর সংসারত্যাগই হলো রাজা প্রতাপাদিত্যের নির্মমতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত।

আমাদের ধারণা প্রায়শ্চিত্ত নাটকটি যেমন রচনা হিসাবে উৎকৃষ্ট তেমনি অভিনয়োপযোগীও। ভবিষ্যতে তা হয়ত প্রমাণিত হবে। তবে অভিনেতাদের কুশলী হওয়া চাই, কেননা চরিত্রগুলো সহজভাবে বিচিত্র ও বিশিষ্ট।

এর সংগীতও এর একট বিশিষ্ট অঙ্গ। গভীর শোক হয়ত এর অনেকগুলো গানের মর্মমূলে। সংগীতে এর নাট্যসম্পদ আদৌ ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং এর রাবীন্দ্রিক চরিত্র আরো লক্ষণীয় হয়েছে। কবির যৌবনের বিশিষ্ট সমাজকেন্দ্রিক নাটক 'বিসর্জন' আর তাঁর প্রৌঢ়কালের 'প্রায়শ্চিত্ত' এই দুইটি রচনা পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখলে অনেকটা বোঝা যায় তাঁর শক্তি কী মহৎ পরিণতি লাভ করেছে।

কবি যেকালে তাঁর 'গোরা' লিখেছিলেন সেইকালেই লেখেন 'প্রায়শ্চিত্ত', আর 'গোরা'-র প্রায় এক বৎসর পূর্বে এটি প্রকাশিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত গোরার যোগ্য পূর্ববর্তী। দুটিতেই সহজে চোখে পড়ে জীবন সম্বন্ধে কবির চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা।

## শারদোৎসব

শারদোৎসব নাটকটি ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সময়ে কবি এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন। তাঁর কিছু কিছু উক্তি এই :

শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি

হইয়াছিল ; তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়তো ছেলেরা ঠিক বোঝে না।

সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ্য আছে। মিলন ঠিকমত ঘটিলেই, অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব আকারে প্রকাশ করে।···

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানব-প্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব···।

... ... ... ...

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু উৎসবেরই একটি নাটকের পালা। নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে? লক্ষেশ্বর,—সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া টাকা উপার্জন লইয়া সকলকে সন্দেহ করিয়া ভয় করিয়া ঈর্ষা করিয়া সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে? সেই রাজা, যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন; লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণ শোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

শারদোৎসব কবির একটি জনপ্রিয় নাটক। ছেলেমেয়েরা এটি খুব উপভোগ করে—বিশেষ করে এর গানগুলো আর লক্ষেশ্বরের চরিত্র।

কিন্তু নাটক হিসাবে তেমন বেশি মূল্য এটিকে বোধ হয় দেওয়া যায় না। এর ভিতরকার চিন্তাটি বহুমূল্য, কবির 'দুঃখ' প্রবন্ধে আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, গীতাঞ্জলিতেও পরিচিত হব, কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট চিন্তা শারদোৎসবে যে নাট্যরূপ পেয়েছে তা কি পর্যাপ্ত হয়েছে? কবির 'ডাকঘর' নাটকের মর্মকথাটি অমলকে ঘিরে যেমন রূপ পেয়েছে, উপনন্দকে ঘিরে শারদোৎসবের মর্মকথাটি তেমন রূপ পেয়েছে কি?

আমরা দেখব কবির আরো কয়েকটি নাটকে তাঁর উঁচু চিন্তা পর্যাপ্ত রূপ পায় নি। এই চিন্তাপ্রধান যুগে অনেক খ্যাতনামা লেখকের ক্ষেত্রেই এমন ব্যাপার ঘটেছে।

শারদোৎসবের এই অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কবিও হয়ত সচেতন ছিলেন। তাই ১৩২৮ সালে এটিকে রূপান্তরিত করেছিলেন 'ঋণশোধে'। ঋণশোধের ভূমিকাটি ঋণশোধ নাটকটির মূল্য বাড়িয়েছে। কিন্তু ঋণশোধের আবেদন হৃদয়ের কাছে যত তার চাইতে বুদ্ধির কাছে বেশি।

শারদোৎসবে লক্ষেশ্বরের চরিত্র একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। কবিকঙ্কণচণ্ডীর ভাঁড়ুদত্তের সঙ্গে সে তুলনীয়।

শারদোৎসবকে দেখা উচিত একটি পালাকীর্তন হিসাবে। গানগুলোই এর প্রধান সম্পদ।

## গোরা

রবীন্দ্রনাথের এই বৃহৎ—বৃহত্তম—উপন্যাস প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালের ভাদ্রের সংখ্যা থেকে ১৩১৬ সালের ফাল্গুনের সংখ্যা পর্যন্ত। ১৩১৬ সালেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস রচনার কালে কবির কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু তার পরেও ঠিক সময়েই এর প্রেরিতব্য অংশ প্রবাসী অফিসে পৌছেছিল।

এই গ্রন্থের উৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেছেন:

> একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিন-শ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এতবড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয় ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম, গোরা আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁক দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে-সব অংশ বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে-সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস।…

প্রভাতবাবু লিখেছেন, কবির কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রাক্কালে রামানন্দবাবু কবিকে এই টাকা পাঠিয়েছিলেন।

গোরা রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে আজো এটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস জ্ঞান করা হয়।

কবির মানসের ও রচনাশক্তির এক সুমহৎ পরিণতি এতে সহজভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে—এর এমন মর্যাদার কারণ মনে হয় সেইটি। বিচিত্র লোক-চরিত্রের জ্ঞান, দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর চেতনা, ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ অকম্পিত প্রত্যয় এতে অজস্রভাবে লক্ষণীয় হয়েছে; আর এর রচনানৈপুণ্য সম্পর্কে বলা যায়, নানা ধরনের সমস্যা ও তর্ক এর অনেকটা জায়গা দখল করলেও সেই সব জটিল নিপুণ ও কৌতুককর তর্কবিতর্কের চাইতে এতে অনেক বেশি সত্য হয়েছে এর চরিত্রগুলোর মানবিক আবেদন। সেই চিরপরিচিত মধুর আবেদনই পাঠকসাধারণের কাছে

এর আকর্ষণের প্রধান হেতু। সামাজিক ও ধর্মগত সমস্যাগুলো নিয়ে এর যত বাক্‌বিতণ্ডা সেসব আসলে এক সাহিত্যিক মায়া।

এর গল্পাংশও খুব চিত্তাকর্ষক। এর অ-সাধারণ চরিত্র গোরা সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল তো কখনো স্তিমিত হয় না, এর বিনয় ও ললিতার মতো সাধারণ কিন্তু একান্ত স্নেহের যোগ্য চরিত্রেব পরিণতিও পাঠক পাঠিকারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। এর অপ্রধান চরিত্রগুলোও তাদের নানা ধরনের মতামত ও প্রবণতা নিয়ে যথেষ্ট জীবন্ত।

এর কাহিনীর সূচনাটি এই :

কৃষ্ণদয়াল পশ্চিমে চাকরি করতেন। যৌবনে আচার-বিচার সম্পর্কে তিনি ছিলেন কালাপাহাড—পল্টনের গোরাদের সঙ্গে খুব মিশতেন, মিশে মদ্যমাংসও প্রচুর খেতেন। ম্যুটিনির সময়ে তিনি কৌশলে দুই একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণ রক্ষা করে যশ ও জায়গির লাভ করেন। সেই ম্যুটিনির কালেই একটি আইরিশ স্ত্রীলোক তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নেন ও একটি পুত্র প্রসব করে মারা যান—তাঁর স্বামী আগের দিন লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদয়ালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সন্তানহীনা আনন্দময়ী এই শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। কৃষ্ণদয়ালের পুত্ররূপেই সে পরিচিত হল—তার নাম রাখা হয় গৌরমোহন, ডাক নাম গোরা। যথা সময়ে কৃষ্ণদয়াল তার পইতাও দেন।

কৃষ্ণদয়ালের প্রথম পক্ষের পুত্র মহিম পিতার মুরুব্বিদের অনুগ্রহে সরকারি খাজাঞ্চি খানায় চাকরি করছিল। গোরা ছেলেবেলা থেকেই পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করত। "একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" এবং "বিংশতি কোটি মানবের বাস" আওড়াইয়া ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল"।

আরো কিছু দিন পরে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। এই সময় কৃষ্ণদয়ালের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটল—তিনি ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, গোরা তাঁর ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হতেন। বাড়ির দুই তিনটি ঘর তিনি নিজের জন্য আলাদা করে নিলেন আর সেই অংশের নাম দিলেন "সাধনাশ্রম"। বাপের এই কাণ্ডকারখানায় গোরার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে একবার

বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল—আনন্দময়ী তাকে কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখেন।

তার বাপের কাছে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হতে লাগল, গোরা যো পেলেই তাঁদের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিত। এঁদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য ছিল যৎসামান্য। কিন্তু এঁদের মধ্যে হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মাল। কৃষ্ণদয়াল তাঁর সঙ্গে বেদান্ত চর্চা করতেন। লোকটি যে কেবল পণ্ডিত তা নয় তাঁর মতের ঔদার্য অতি আশ্চর্য। তাঁর চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পুর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য ও গভীরতা ছিল যে তাঁর কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে অসম্ভব হল। কেবল সংস্কৃত পড়ে এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি যে হতে পারে গোরা তা কল্পনাও করতে পারতো না। তাঁর কাছে গোরা বেদান্ত পড়তে আরম্ভ করল এবং দেখতে দেখতে বেদান্ত দর্শনের মধ্যে একেবারে তলিয়ে গেল।

এরপর গোরার সহসা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয় হিন্দুধর্মের সমালোচক এক ইংরেজ মিশনারীর সঙ্গে। সে অবকাশ পেলেই শাস্ত্র ও লোকাচারের নিন্দা করে বিরুদ্ধ মতের লোককে যত রকম করে পারে পীড়া দিত, কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রতি বিদেশী লোকের অবজ্ঞা তাকে যেন অঙ্কুশে আহত করে তুলল। এর ফলে গোরা "হিণ্ডুয়িজম" নাম দিয়ে ইংরেজিতে এক বই লিখতে লাগল—তাতে তার সাধ্যমতো সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বসে গেল। কিন্তু এমন করে মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে গোরা আস্তে আস্তে নিজের ওকালতির কাছে নিজে হার মানল। গোরা বললে, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামির মতো খাড়া করে বিদেশীর আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিল করে আমরা লজ্জাও পাব না, গৌরবও বোধ করব না। যে দেশে জন্মেছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সংকুচিত হয়ে থাকব না, দেশের যা কিছু আছে তার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করে নিয়ে দেশকে ও নিজেকে অপমান থেকে রক্ষা করব।

গোরা এর পর গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করতে লাগল, টিকি রাখল, খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করে চলল। এখন থেকে প্রত্যহ সকাল-বেলায় সে বাপ-মায়ের পায়ের ধুলা নেয়। যে মহিমকে সে কথায় কথায়

বিদ্রূপ করতো তাকে দেখলে উঠে দাঁড়ায়, প্রণাম করে। মহিম এই দেখে মুখে যা আসে তাই বলে, কিন্তু গোরা তার কোনো জবাব করে না।

কবি বলেছেন, "গোরা তাহার উপদেশে ও আচরণে দেশের এক দল লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাহারা যেন একটা টানাটানির হাত হইতে বাঁচিয়া গেল, হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল আমরা ভালো কি মন্দ সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে করিতে চাই না—কেবল আমরা ষোলো আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই"।

এক ধরনের "হিন্দু জাগরণ" তরুণ রবীন্দ্রনাথের ভিতরে আমরা দেখেছি। তার পর এক শ্রেণীর উৎকট-হিন্দুজাগরণ-বাদীদের সঙ্গে কবিকে সংগ্রাম করতেও আমরা দেখছি। বঙ্গদর্শনের যুগে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রেম কবির ভিতরে কি নিবিড় ভাবে সত্য হয়েছিল তারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। বলা যায় স্বদেশী আন্দোলন যখন বোমা বিভ্রাটের দিকে মোড় ফিরলো তখন কবির প্রবল স্বদেশ-প্রেম আর তাঁর মজ্জাগত সত্য-প্রেম একটি নতুন বিশিষ্ট রূপ নিল —তাতে একই সঙ্গে সক্রিয় হল গভীর স্বদেশবোধ আর গভীর সত্য-বোধ বা ভূমার বোধ—বিশ্বমানব সম্বন্ধে নতুন চেতনা। 'গোরা' উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র কবির পরিণত জীবনের সেই সুপরিণত চেতনা। গোরার উদগ্র ভারতপ্রেম কবি এমন প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন তার কারণ, সেই উদগ্র প্রেমের সঙ্গে তাঁর নিজের ছিল দীর্ঘ দিনের পরিচয়, আর তারপর সেই প্রেমের আত্যন্তিকতা তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

বলা যেতে পারে গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দুই রূপে বিভক্ত করে দেখেছেন: উদগ্র স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক গোরা রূপে আর ভূমার প্রেমিক পরেশ রূপে।

গোরাতে কেউ দেখেছেন বিদ্যাসাগরের ছায়া—অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের তেজ ও আত্মসম্মানবোধ, আবার কেউ দেখেছেন ভগিনী নিবেদিতার ছায়া। স্বামী বিবেকানন্দের প্রখ্যাতা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কিছু ছায়া যে গোরার উপরে পড়েছে কবির কোনো কোনো কথায় তার ইঙ্গিত রয়েছে। গোরার মতোই ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন জাতিতে আইরিশ, তাঁর চরিত্রেও ছিল একটা অসাধারণ প্রবলতা, আর তাঁর ভারত-প্রেম ছিল অতি অকৃত্রিম ও আপসহীন। কিন্তু আসলে গোরা তরুণ রবীন্দ্রনাথেরই এক বিশিষ্ট—কিছু অতিশয়িত—রূপ। ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে কবি হয়ত স্পষ্ট করে দেখেছিলেন নিজের সেই

রূপটি।—তথাকথিত হিন্দু-পুনরুজ্জীবন-বাদীদের সঙ্গে গোরার বড় পার্থক্য এই যে, সেই পুনরুজ্জীবনবাদীরা ছিল প্রধানত পরিবর্তন-বিমুখ ও তার্কিক, কিন্তু গোরা তর্ক যতই করুক তার অধিষ্ঠানভূমি ভারতের মহিমময় ঐতিহ্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, তাতে একান্ত আস্থা, আর তার নিজের প্রবল আত্মসম্মানবোধ। তার যুক্তির দুর্বলতা পদে পদে লক্ষণীয় হয়েছে, কিন্তু সেই সব দুর্বলতা সহজেই সবলতার রূপ পরিগ্রহ করেছে তার সেই শ্রদ্ধা, আস্থা ও আত্মসম্মানবোধের রসায়নে। সেই শ্রদ্ধা, আস্থা ও আত্মসম্মানবোধকে বলা যায় যেমন রবীন্দ্র-চরিত্রের তেমনি গোরা-চরিত্রের গ্র্যানিটস্তর।—কবির ভিতরে যে একটি দক্ষ কৌঁসুলি ছিল সে সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন। গোরা উপন্যাসে সেই কৌঁসুলি-গিরিও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই।

গোরার বন্ধু বিনয়—আবাল্য সে ছিল তার সহপাঠী। গোরার প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল নেই। কোনো মতবাদের প্রবলতা তার মধ্যে নেই। সে শুধু শিক্ষিতই নয়, সেই সঙ্গে সুকুমাররুচি ও বিনীত। তার অন্তরটি বড় স্নেহময়, সেই স্নেহ তাকে শক্তি দিয়েছে মত ও রুচির অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও গোরার অকৃত্রিম বন্ধু হতে। তার দলের লোক বলেই সে নিজেকে জানে ও জানায়। নিজেকে জানান দিয়ে চলা গোরার স্বভাব, আর নিজেকে আড়াল করে চলা বিনয়ের স্বভাব। গোরা তার নিজের স্বভাবের ত্রুটির দিকটা সম্বন্ধে যে একেবারেই সচেতন নয় তা নয়, কিন্তু কোনো কাজ দেয় না তার সেই চেতনায়।

উপন্যাসের সূচনায় দুই বন্ধুর পরিচয় হল ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর পরিজনের সঙ্গে। বিনয়ের পরিচয় হল দৈবক্রমে, আর গোরার পরিচয় হল তার পিতার নির্দেশে। পরেশবাবু ছিলেন তার পিতার ছেলেবেলাকার বন্ধু। পরেশবাবুর পরিবারে কৃষ্ণদয়াল গোরাকে ভিড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন এই আশায় যে তাতে গোরার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুরাহা হতে পারবে। হিন্দু-সমাজের ভিতরে গোরার বিবাহ-আদির কোনো সম্ভাবনাই তিনি দেখছিলেন না।

গোরা প্রথম যেদিন পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল সেদিন তার মনটা ছিল কিছু উত্তেজিত। সে সূর্যগ্রহণের সময় ত্রিবেণীতে স্নান করতে গিয়েছিল, দেশের জনসাধারণের বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করে দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ষ্টিমারে যাবার কালে প্রথম শ্রেণীর একজন বাঙালী ও ইংরেজ প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তার বচসা হয়, কেন না তারা স্নানযাত্রীদের ভিড়, ঠেলাঠেলি, আর

নানারকমের দুর্ভোগ দেখে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রকাশ করছিল।—কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, শুঁড়তোলা কটকি জুতো, এই বেশে গোরা পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।• সেদিন বিনয়ও সেখানে উপস্থিত ছিল। এই ছিল তার পরেশবাবুর বাড়িতে প্রথম আগমন। এর পূর্বে পরেশবাবু, তাঁর পালিতা কন্যা সুচরিতা আর সুচরিতার ছোটো ভাই সতীশের সঙ্গে দৈবক্রমে নিজের বাড়িতেই বিনয়ের দেখা হয়েছিল আর তাঁদের মার্জিত ব্যবহারে ও মধুর বাক্যালাপে সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার সেই প্রথম স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা সে গোরাকে বলেছিল আর গোরা তাকে বলতে কসুর করেনি যে এঁদের সংস্রব বিনয়ের এড়িয়ে চলা উচিত। বিনয়কে পরেশবাবুর বাড়িতে দেখে গোরা কত কি মনে করছে এই ভেবে বিনয় মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিল। তার সঙ্গে গোরার এই যুদ্ধবেশ শুধু তাকে নয় পরেশবাবুর বাড়ির অনেককেই কিঞ্চিৎ চকিত করে তুললো। চা দেওয়া হলে গোরা চা খেলে না; তাই নিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরীর সঙ্গে তার কিছু তর্কও হল। কিন্তু বিনয় আগ্রহ করে খেল, যদিও সে চা খেত না।

সেদিন সেই বৈঠকে এসে জুটলেন হারান বাবু, ডাকনাম পানুবাবু। তিনি উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক, গোরাকে তিনি ভালোই চেনেন কেন না গোরা একসময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী সভ্য ছিল। দেখতে দেখতে গোরাতে আর পানুবাবুতে তুমুল তর্ক বেধে গেল। একজন সদ্য সিভিলিয়ানের অভ্যর্থনা সম্পর্কে পানুবাবু মন্তব্য করেন, পরীক্ষায় বাঙালি যতই পাশ করুক বাঙালির দ্বারা কোনো কাজ হবে না। তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে তাঁর মত প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। তার উত্তরে গোরা নিজের কণ্ঠস্বর যথেষ্ট সংযত করে বল্লে, এই যদি সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে পাউরুটি চিবোচ্ছেন কোন লজ্জায়। গোরার প্রধান কথা দাঁড়ল : স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ আর নেই·········কুপ্রথা শুধু আমাদের দেশেই নেই ইংরেজের মধ্যেও যথেষ্ট আছে কিন্তু সে-সবের নিন্দা করবার কথা আমাদের ভদ্রলোকেরা ভাবতে পারে না।

গোরার আবেগময় অকৃত্রিম স্বদেশপ্রাণতার সামনে পানুবাবুর ছিদ্রান্বেষী কথাগুলো দাঁড়াতে পারল না। তার উপর তিনি ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। এর ফলে সুচরিতা দুই একটি মন্তব্য যা করলে তাতে পানুবাবুর আচরণে তার ক্ষোভই প্রকাশ পেল। বলা বাহুল্য পানুবাবু এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর সঙ্গে সুচরিতার বিবাহের কথা চলেছিল। বিনয়ের সেদিন কেটেছিল

বরদাসুন্দরীর আমন্ত্রণে অন্য ঘরে গিয়ে লেখাপড়ায় ও সেলাইয়ের কাজে তাঁর কন্যাদের কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।

সেদিনকার তর্ক-বিতর্কের ফলে সুচরিতার মনের উপরে গোরার ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশানুরাগ গভীরভাবে মুদ্রিত হল, যদিও তার মতের উগ্রতা তার মনকে অনেকখানি বিদ্রোহীও করেছিল।

গোরা বিনয়ের উপরে স্বভাবতই রুষ্ট হয়েছিল; কিন্তু বিনয়ের আন্তরিক প্রযত্নে গোরার বিরূপতা কিছু দূর হল। এই সময়ে মহিম তার বালিকা কন্যা শশিমুখীকে বিয়ে করবার জন্য বিনয়কে বল্লে। বিনয় এতে রাজি হল, কেন না, গোরার সঙ্গে তার সম্বন্ধ দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হোক এই সে চাচ্ছিল। গোরাও এতে কিছু আগ্রহ প্রকাশ করলে এই ভেবে যে এর ফলে বিনয়ের চলচ্চিত্ততা দূর হবে।

পরেশবাবুর পালিতা কন্যা সুচরিতার কথা বলা হয়েছে। তাঁর নিজের কন্যা ছিল তিনটি—লাবণ্য, ললিতা, লীলা,—লীলা দশ-বৎসরের বালিকা। এদের সবারই কিছু কিছু পরিচয় কবি দিয়েছেন, তবে তিনি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন পরেশবাবুর পালিতা কন্যা সুচরিতা আর তাঁর মধ্যমা কন্যা ললিতার পরিচয় দিতে। সুচরিতা ধীর স্থির; তার বয়স বছর আঠারোর কাছাকাছি, পরেশ-বাবুর বিশেষ সান্নিধ্যে সে বেড়ে উঠেছে; তার গাম্ভীর্য তার বয়সের তুলনায় বেশি। কবি বলেছেন, পরেশবাবুর মেজো মেয়ে ললিতা তাঁর বড় মেয়ে লাবণ্যের বিপরীত বল্লেই হয়। লাবণ্য উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটাসোটা, হাসিখুশি, লোকের সঙ্গ ও গল্পগুজব ভালবাসে, কিন্তু ললিতা তার দিদির চেয়ে মাথায় লম্বা, রোগা, রং আর একটু কালো, কথা-বার্তা বেশি বলে না, আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করলে কড়াকড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে। সেজন্য তার মা বরদাসুন্দরী তাকে ভয় করে চলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতনামা নায়কদের চাইতে তাঁর নায়িকারা অনেক বেশি প্রাণবন্ত। কথাটা অনেকখানি সত্য। তাঁর সেই প্রাণবন্ত নায়িকাদের দুই দলে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। এক দলের নেত্রীস্থানীয়া সূর্যমুখী ও দেবী চৌধুরাণী, অপর দলের নেত্রীস্থানীয়া কমলমণি, ভ্রমর, লবঙ্গলতিকা। প্রথম দলের নায়িকারা ধীর, স্থির, পরমস্নেহবতী; দ্বিতীয় দলের নায়িকারাও স্নেহবতী কিন্তু ধীর স্থির তেমন না হয়ে কিছু চঞ্চল, কিছু ঝাঁঝালো প্রকৃতির। বলা বাহুল্য আমাদের সাহিত্যে এরা নতুন সৃষ্টি। প্রথম দলের নায়িকারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী।

দ্বিতীয় দল আমাদের শ্রদ্ধা যতটা দাবি করে তার চাইতে বেশি দাবি করে আমাদের মনোযোগ—তাদের আমরা ভুলতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের সুচরিতা ও ললিতা এই দুই বিশিষ্ট দলেরই প্রতিনিধিস্থানীয়া। তাদের বয়স অবশ্য কম, সংসারের অভিজ্ঞতা তাদের বেশি লাভ হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যতটা অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটলো, তাতে তাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে অবিস্মরণীয়ই হলো। অবিস্মরণীয় হলো তাদের চরিত্রের অন্তর্নিহিত অকৃত্রিমতা, সুবুদ্ধি, সুরুচি ও তেজের জন্য। তারা যে বাংলার ও বাঙালির মেয়ে এ-বিষয়ে কারো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি হয়েও তারা সহজেই সর্বজাতীয়া—তাদের অকৃত্রিমতা, বুদ্ধির দীপ্তি, সুরুচি ও তেজ তাদের সেই শক্তি দিয়েছে। অবশ্য তাদের চাইতেও মহত্তর চরিত্র আনন্দময়ী—তাঁর কথা পরে হবে। গোরা উপন্যাসের এইসব নারী-চরিত্র বিশ্ব-সাহিত্যে বাংলার বা ভারতের নতুন উপহার।

গ্যেটে তাঁর আঁকা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন:

> মেয়েরা হচ্ছে রূপালি থালা তাতে আমরা সাজাই সোনালি আপেল। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বাস্তব-জীবনে যেমন দেখা যায় তাই থেকে সিদ্ধান্ত নয়, ওসব আমার সহজাত, অথবা সৃষ্টি হয়েছে আমার মধ্যে, কেমন করে তা ভগবান জানেন। সে-জন্যে আমি যেসব নারী-চরিত্র এঁকেছি সবই ভাল হয়েছে। বাস্তবের চাইতে আরো ভাল সেসব।

এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের এইসব নারী-চরিত্র সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বাঙালি বা ভারতীয় নারীত্ব এক অভিনব প্রাণসম্পদ ও শ্রী লাভ করেছে এই সব চরিত্রে।

ললিতা ইচ্ছা করলে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে—কবি বলেছেন। কিন্তু শুধু তার ভাষাই তীক্ষ্ণ নয়, তার দৃষ্টিও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। এর পরও বিনয়ের পরেশবাবুর বাড়িতে যাওয়া আসা চলতে লাগল। সুচরিতার সঙ্গেই তার আলাপ হ'ত বেশি, আর সেই আলাপের মুখ্য বিষয় ছিল গোরা। গোরার মতামত, তার স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, তার সবল চরিত্র, বেশ নিপুণভাবে বিনয় এসব বিষয়ে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করত—গুছিয়ে কথা বলতে তার একটি স্বাভাবিক পটুতা ছিল। বিনয়কে ললিতার ভাল লেগেছিল তার আতিশয্য-বর্জিত প্রকৃতি ও নম্র ব্যবহারের জন্য। সে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেকথাও ললিতা সহজেই বুঝেছিল। সেই সঙ্গে তার চোখ এড়ায়নি যে বিনয় নিজের মতামত প্রকাশ না করে গোরার মুখপাত্র হয়ে কথা বলতেই ভালবাসে। এটি ললিতার

অসহ্য হল, আর বিনয়ের এই দুর্বলতার প্রতি খোঁচা দেওয়া তার একটি কাজ হয়ে দাঁড়াল। ললিতার এই তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বিনয় বিব্রত বোধ করলে।

গোরা দীর্ঘ উপন্যাস। তার ঘটনার জালও সুবিস্তৃত। কাজেই তার সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তির চেষ্টা না করাই সঙ্গত। পাঠকরা এটি যত্নে পাঠ করবেন, এই তাঁদের কাছে এই মহাগ্রন্থের ন্যূনতম দাবি। গ্রন্থের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে—ভেঙে গেছে প্রধানত আনন্দময়ীর বাধায়, তিনি বুঝেছিলেন বিনয় নিজের মন তেমন না জেনে এই বিয়েতে মত দিয়েছে আর বিনয় ও ললিতার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সুনিবিড় হয়েছে,—কিছু কিছু ঘটনা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করেছে। অন্য দিকে গোরার প্রবল স্বদেশ-প্রেম ও সেজন্য নিঃশেষে আত্মত্যাগ সুচরিতার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে—সে গোরাকে জ্ঞান করছে তার জীবনে নতুন বাণীর বাহক—তার নতুন গুরু; অবশ্য তার শ্রেষ্ঠ গুরু যে পরেশবাবু এ-বিষয়েও সে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু বিনয় ও ললিতার বিবাহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল পরেশবাবু স্ত্রী ও তাঁর সমাজের বন্ধুদের ব্রাহ্ম-সংস্কার—বিনয় ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ না করলে ললিতার সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না, এই দাঁড়াল তাঁদের অনড় দাবি। আর বিনয়ের পক্ষে বাধা হল তার হিন্দু-সংস্কার—অবশ্য সেই সংস্কার খুব জোরালো নয়, তবে খুব দুর্বলও নয়—ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে তবে ললিতার সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারবে এতটা অগ্রসর হতে তার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হল। শেষে ললিতা বল্লে, ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে তবে বিনয় যে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন এ সে চায় না—তাঁর আত্মসম্মানে কোনো আঘাত না লাগুক। বিনয়ও বল্লে, সে চায় না যে তাকে বিয়ে করতে এসে ললিতা তাঁর প্রিয় ধর্ম-বিশ্বাস কিছুমাত্র সংকুচিত করবেন—"প্রীতি যদি প্রভেদকে স্বীকার করতে না পারে তবে জগতে কোনো প্রভেদ কোথাও আছে কেন।" হিন্দুমতেই বিনয়ের ও ললিতার বিবাহ হল, তবে এই বিবাহে বিনয় শালগ্রামশিলা রাখলে না। কন্যাপক্ষে কেবল পরেশবাবু এই বিবাহে যোগ দিলেন—সুচরিতার জীবনের গতি কিছু ভিন্ন-মুখী হতে যাচ্ছে ভেবে তিনি তাকেও ডাকলেন না। তবে সে নিজেই এসে হাজির হল। আর এলেন আনন্দময়ী—গোরার নিষেধ অমান্য করে। ললিতার এই বিদ্রোহ সমর্থন করা পরেশবাবু শেষ পর্যন্ত সঙ্গত মনে করলেন, কেন না তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, "মানুষকেই সমাজের খাতিরে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হবে একথা কখনোই ঠিক নয়—সমাজকেই

মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে", পরেশবাবুর এই কথা শিরোধার্য করেই বিনয় ললিতার সঙ্গে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হল।

গোরার জীবনে ছোটবড় অনেক ঘটনা ঘটলো তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল বাংলার পল্লীর সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয়। কবি বলেছেন:

> সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে, এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না—যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে। পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানারকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এতদিকে এত প্রকার আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এক গ্রামে নীচজাতিদের মধ্যে গোরা দেখলে চড়া কন্যাপণের জন্য অনেক পুরুষের খুব বেশি বয়সে বিবাহ হয়, অনেকের হয়ই না। অন্যদিকে বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে কঠিন নিষেধ। এর ফলে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হয়ে উঠেছে। গোরা এদের পুরোহিতদের বশ করে এদের মধ্যে বিধবাবিবাহের কথা তুলল। গ্রামের লোকরা এতে ক্রুদ্ধ হল, বল্লে, ব্রাহ্মণরা যখন বিধবা বিবাহ দেবেন তখন আমরাও দেব।

এমন গ্রামে ঘোরার সূচনায় একবার গোরাকে গ্রামে পুলিশের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল, আর পুলিশকে বাধা দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

প্রথম থেকেই সুচরিতাকে গোরা সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারেনি, কয়েকবার তার সঙ্গে তার দেখা হয়। সুচরিতার ব্যক্তিত্ব, তার সবল বুদ্ধি, সর্বোপরি তার গভীর স্বদেশানুরাগ গোরার মনকে ভিতরে ভিতরে তার প্রতি অনুকূল করছিল। গোরা প্রথম প্রথম সেই দিকটা সম্বন্ধে কিছু ভাবেনি। সুচরিতাকে দেশের সেবার জন্য পাওয়া যাবে এতটাই সে মনে স্থান দিয়েছিল, কেন না, সুচরিতা যে তার প্রতি শ্রদ্ধাবতী তা সে জানতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুচরিতা সম্পর্কে

তার এই দুর্বলতা তার পুরোপুরি চোখে পড়ল। সে সংকল্প করলে, জেল ভোগের জন্য আর বিশেষ করে তার মনের নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করবে, প্রায়শ্চিত্ত করে সে পূর্ণশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ হবে—যে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, কেবল জ্ঞানতপস্বী, কোনোরূপ হৃদয়ালুতা যার জন্য আদৌ পথ নয়।—কবি বলেছেন :

> হৃদয় গোরাকে হার মানাইয়াছিল—হৃদয়ের প্রতি সেই অপরাধে গোরা নির্বাসন দণ্ড বিধান করিল। কিন্তু নির্বাসনে তাহাকে লইয়া যাইবে কে। সে সৈন্য আছে কোথায়।

গঙ্গাতীরে গোরার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তার কাছে সংবাদ পৌঁছল কৃষ্ণদয়াল বাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, গোরাকে তখনই তাঁকে দেখতে যেতে হবে।

একটি কঠিন যোগাভ্যাসের কালে কৃষ্ণদয়ালের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। গোরা ঘরে এলে তিনি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত পুরোপুরি তাকে বল্লেন।—গোরা তাঁর শ্রাদ্ধ করে তাঁর ঔর্দ্ধ-দৈহিক অকল্যাণ ঘটাবে এই ভেবে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। গোরার মাতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল্লেন :

> বাপ তোকে পাছে হারাই এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে যাস তাহলে কাউকে দোষ দিতে পারব না গোরা, কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে যে বাপ।

কবি বলেছেন, "এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্তজীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল।"

গোরা পরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে বল্লে, পরেশবাবু আমার কোনো বন্ধন নেই। —সে তার জন্মবৃত্তান্ত যা শুনেছিল সব বল্লে। সুচরিতা একটু আগে পরেশ বাবুর তোরঙ্গ সাজাচ্ছিল। পরেশবাবু সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে যাবেন ঠিক করেছিলেন, সুচরিতাও আবেদন জানিয়েছিল সে তাঁর সঙ্গে যাবে। তার বিবরণ শুনে তাঁরা দুজনেই স্তম্ভিত হলেন।

কথায় কথায় গোরা বল্লে :

> কাল রাতে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবন লাভ করি।—এতদিন শিশুকাল থেকে আমাকে যে কিছু মিথ্যা যে কিছু অশুচিতা আবৃত করে ছিল আজ যেন তা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করি। আমি ঠিক যে

কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি— তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চমকিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না......আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন ?

পরেশবাবু বল্লেন, "কেন ?"

গোরা বল্লে, "আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে—সেই জন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান নি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুরই দেবতা নন, যিনি 'ভারতবর্ষের দেবতা'।

গোরার নতুন অনুভূতির আবেগ পরেশবাবুকে স্পর্শ করলো।

শেষে গোরা সুচরিতার দিকে ফিরে হেসে বল্লেঃ সুচরিতা আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি—আমার হাত ধরে তোমার ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।

সুচরিতা চৌকি থেকে উঠে নিজের হাত গোরার হাতে রাখল। তখন গোরা সুচরিতাকে নিয়ে পরেশবাবুকে প্রণাম করলে।

বাহ্যতঃ গোরার জীবনে একটা বড় রকমের আকস্মিক ঘটনা ঘটল। কিন্তু আসলে তার সমগ্র জীবন অনিবার্য বেগে একটা সমূহ পরিবর্তনের দিকে—একটা নবজন্ম লাভের দিকে—অগ্রসর হচ্ছিল।

গোরা উপন্যাসকে জ্ঞান করা যেতে পারে প্রাচীন ভারতের একালে নবজন্ম লাভের মহাকাব্য—তার সংকীর্ণ আত্মবোধের দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে নবজন্মের উদার আলোকের মধ্যে জেগে ওঠা। এমন নবজন্ম বিশেষ ভাবে লাভ হল গোরার। অগ্রবর্তী পরেশও উপলব্ধি করলেন আলোক থেকে আরো আলোকে জন্ম-লাভের প্রয়োজন।

এতে বহু চরিত্র। তার কয়েকটির সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় হয়েছে। এর আরো দুটি প্রধান চরিত্র হচ্ছেন আনন্দময়ী ও পরেশবাবু। আনন্দময়ী বিদুষী নন আদৌ। কিন্তু তাঁর গভীর স্নেহময় প্রকৃতির সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানের এমন

একটি যোগ ঘটেছে যার গুণে তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ তাঁর পরিবেশের তুলনায় আশ্চর্যভাবে উদার হয়েছে, অথচ সে উদারতা তাঁর জন্য ও সেই পরিবেশের জন্য একটুও বেমানান হয়নি।

আনন্দময়ীকে সহজেই মনে হতে পারে সাহিত্যের একটি আদর্শ চরিত্র। কিন্তু আদর্শের সমস্ত গুণপনা তাঁকে একটুও অবাস্তব করে নি—এইটিই বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করবার। তাঁর অপরিসীম স্নেহ আর বিপুল কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে একটি পুরো বাস্তব মানুষের মতো তিনি আমাদের সমগ্র চেতনাকে স্পর্শ করেন। গোরা বিনয় সুচরিতা ললিতা সবার জীবনে এই কল্যাণময়ী মাতার অমৃতস্পর্শ লাভ হল।

এমন মাতৃমূর্তি বাংলা সাহিত্যে আর নেই। হয়ত জগতের সাহিত্যেও নেই। ম্যাকসিম গোর্কীর Mother-এ গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু আনন্দময়ীর মতো সহজ মহাপ্রাণতা নেই।

সৌভাগ্যক্রমে আনন্দময়ীর মতো মাতৃমূর্তি বাংলার বাস্তব জীবনে কথনো কথনো দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের জননী আর স্যর গুরুদাসের জননী তাঁদের মধ্যে লোকবিশ্রুতা।

পরেশবাবুর চরিত্রের যে শান্তি, অপাতদৃষ্টিতে তা মনে হতে পারে অনেকটা নির্জীবতা—তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরী ও তাঁর সমাজের নবীন নেতা পানুবাবু তাঁকে নির্জীব নির্বিরোধ অকর্মণ্য বলেই জানেন। কিন্তু পরেশবাবুর এই নির্জীবতার অন্তরালে সর্বদা জাগরূক রয়েছে আত্ম-অন্বেষণ—কারো প্রতি অন্যায় বা অবিচার না করবার অকৃত্রিম আগ্রহ, আর যা তিনি সংগত মনে করেন তা করবার শান্ত সংকল্প। এইজন্য সুচরিতার ভিতরে হিন্দু-চেতনা বাড়তে চাচ্ছে ভেবে তিনি তাকে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পুরো অবকাশ দিলেন—নিজের মত ও রুচি তার উপরে চাপাতে চেষ্টা করলেন না।

গ্রন্থের শেষে আমরা দেখি তাঁর কন্যার নতুন পদ্ধতির বিবাহে তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পশ্চাৎপদ হননি, কেন না তিনি এতে কোনো দোষ দেখেন নি। বলাবহুল্য এই কাজটি হল আসলে বিপ্লবাত্মক, এর ফলে বৃদ্ধ বয়সে গৃহ তাঁর জন্য আর শান্তির নীড় রইল না—ব্রাহ্মসমাজও তাঁকে ত্যাগ করলে। পরিণত রবীন্দ্র-চরিত্রেও আমরা প্রত্যক্ষ করি এমন শান্ত বিপ্লবের বহু চিত্র। কবি তাঁর অনেক কবিতায় ও নাটকে এই শান্ত বিপ্লবের কথা বলেছেন—তার চিত্র এঁকেছেন। পরেশের চরিত্র কিছু নতুন দীপ্তি নিয়ে ফুটেছে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশে।

অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে মহিম। সরকারী খাজাঞ্চি খানায় সে নিয়মিতভাবে চাকুরি করে যাচ্ছে। কিন্তু তার বোধশক্তি খুব তীক্ষ্ণ, এমন চাকরি করা যে বিড়ম্বনা সে সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন। তার সঙ্গে অবশ্য সে এ-ও বোঝে যে সংসারের দায়ে আবদ্ধ মানুষকে এই ঘানি টানতেই হবে, এ ভিন্ন অন্য পথ নেই। মাঝে মাঝে বেনামীতে উপরওয়ালা সাহেবের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে সে চিঠি লেখে আর ধরা পড়ার মতো অবস্থা হলেই সাহেবের বদান্যতার ও অন্যান্য গুণের ভূয়সী প্রশংসা করে' আবার খবরের কাগজে চিঠি পাঠায়। মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী বাঙালির যে-ছবি মহিমের চরিত্রে ফুটেছে তা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত, কিন্তু এই অতিরঞ্জনটুকুর সাহায্যে এই শ্রেণীর লোকদের একটি মর্মস্পর্শী চিত্রই কবি এঁকেছেন।—মহিমের কন্যার বিবাহ শেষ পর্যন্ত হল গোরার একান্ত ভক্ত অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশকে বলতেই সে এ বিবাহে রাজি হয়েছিল, পণের কথা কানেও তোলেনি। কিন্তু তার পিতা যখন বরপণ কষে আদায় করতে পশ্চাৎপদ হলেন না তখন তার পিতৃভক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না।

পানুবাবু আর বরদাসুন্দরী দুজনকেই কবি এঁকেছেন গোঁড়া ব্রাহ্ম করে'—ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে এদেশে সভ্যভব্য আর কিছু যে থাকতে পারে তা তাঁদের চিন্তার বাইরে। এই গোঁড়ামির অতিরিক্ত কোনো সম্পদ তাঁদের চরিত্রে নেই বল্লেই চলে। তবে সুচরিতাকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য পানুবাবুর আগ্রহাতিশয্য ও প্রযত্ন কবি যে ভাবে এঁকেছেন তাতে পানুবাবুকে প্রধানতঃ অবাঞ্ছিত ও হাস্যকর করে' আঁকা হলেও তাঁর প্রতি, যেন কবির অজ্ঞাতসারে, কিঞ্চিৎ করুণারও অসদ্ভাব হয়নি—শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত পানুবাবুর কালিবর্ণ মুখ আমরা ভুলতে পারি না। আর পরেশবাবুর মতো নির্বিরোধ 'ভালোমানুষ' স্বামীদের নিয়ে বরদাসুন্দরীরা তো চিরদিনই প্রবল অসন্তোষ জ্ঞাপন করে এসেছেন।

গোরাতে একটি বিশিষ্ট অপ্রধান চরিত্র হচ্ছেন হরিমোহিনী—সুচরিতার মাসি। জীবনে বহু দুঃখ ও বঞ্চনা ভোগ করে তিনি সুচরিতার কাছে এলেন তাঁর গোপীবল্লভ বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে। সংসারের অনেক যাতনা সয়ে মনে মনে গোপীবল্লভকেই তিনি সার জেনেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অকৃত্রিম ভক্তি-ভাবের সঙ্গেই অনেকটা তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁতে ছিল আপনজনের প্রতি প্রবল টান —তাঁর রাধারাণীকে (সুচরিতার পূর্ব নাম ছিল রাধারাণী) ব্রাহ্ম সংস্রব থেকে উদ্ধার করে উপযুক্ত হিন্দুঘরে পাত্রস্থ করবার বাসনা। এর জন্য হরিমোহিনীর যে আগ্রহ ও তৎপরতা প্রকাশ পেল তা অতি যত্নে চিত্রিত হয়েছে। সুচরিতার

জন্য তাঁর শ্বশুরকুলের যে মহাসম্ভ্রান্ত কিন্তু গ্রাম্য ভাবীবর তিনি এনে হাজির করলেন সে আমাদের দেশের গ্রাম্য সমাজের একটি অপূর্ব প্রতীক।

তেমনি গ্রাম্য সমাজের প্রতীক নীলকুঠীর সাহেবের গোমস্তা মাধব চাটুজ্যে। সে গ্রাম্য সমাজের একটি বড় জোঁক: বুদ্ধি তার খুব তীক্ষ্ণ, ব্যস্তসমস্ত সে আদৌ নয়, সেই সঙ্গে এক ধরনের ধর্মেকর্মে মতিও তাতে আছে। সে কি ভণ্ড? না, একই সঙ্গে ভণ্ড ও পরলোকভীত?—দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কবির পরিচয় কত গভীর ছিল গোরার অপ্রধান চরিত্রগুলো তার বিশিষ্ট প্রমাণ।

বলা যেতে পারে পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীকে যেমন নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক করে' কবি এঁকেছেন তাতে ব্রাহ্মদের প্রতি কবির অপ্রসন্নতা কিছু তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হয়ত তাই পেয়েছে। কিন্তু তার মূলে অপ্রীতি নয়, বরং প্রেমের প্রাবল্যই। ব্রাহ্মসমাজ ছিল বিশেষ ভাবে কবির নিজের সমাজ—সত্যকার অগ্রসরতা যাঁদের কাছ থেকে তিনি আশা করতেন। সেই সমাজের সংকীর্ণতা তাঁকে কিছু অসহিষ্ণু করেছিল মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে ছেলেমেয়েদের আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় পাই; কিন্তু তাঁর উপন্যাসে তেমন পাই না। তাঁর গোরা এর ব্যতিক্রম। এতে লীলা ও সতীশ এর চরিত্রবৈভব বাড়িয়েছে। সতীশের প্রতিদ্বন্দ্বী লীলাকে আমরা অবশ্য বেশী দৃশ্যে পাই না, কিন্তু সতীশের উপস্থিতি এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র। বেশি বকে বলে তার দিদি তার নাম দিয়েছিল বক্তিয়ার। পরিচিতদের মধ্যে, বিশেষ করে তার বন্ধু বিনয়কে পেলে, তার বকুনির আর অন্ত থাকে না। কবির ছেলেবেলাকার অনেক কল্পনা ও খেয়াল সতীশের মুখ থেকে আমরা নতুন করে শুনি। তবে যথেষ্ট বকিয়ে হলেও সতীশ খুব ভদ্র—বোধ হয় শিশু-রবিরই মতো—কারো সঙ্গে মারামারি এমন কি তেমন ভাবে ঝগড়া-ঝাঁটি করতেও আমরা তাকে দেখি না। সতীশকে সবাই স্নেহ করে—স্নেহেরই সে যোগ্য।

সর্বসাধারণ পাঠকের কাছে গোরার বেশি মূল্য একটি বৃহৎ চিত্রশালা হিসাবেই। এত সার্থক চরিত্র-সৃষ্টি কবির আর কোনো গ্রন্থে ঘটেনি। কিন্তু সাহিত্যে যাঁরা শুধু ছবির সন্ধানে ফেরেন না, জীবন ও সমাজের নানা গোপন খুঁটিনাটি ব্যাপারের সন্ধানেও ফেরেন, তাঁরাও এতে তাঁদের কাম্য বহু বস্তু পাবেন। সে সবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই দুটি: হিন্দু ব্রাহ্ম সম্পর্ক, আর ব্রাহ্মদের ভবিষ্যৎ। এইসব সমস্যার কথা কবি যে এইকালে বা এইকাল পর্যন্ত যথেষ্ট ভেবেছিলেন তার স্পষ্ট পরিচয় গোরাতে আছে। তবে গোরাতে এসব

সমস্যা সম্বন্ধে কবির চিন্তা-ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে ইঙ্গিতেই বেশি। এর পরে তাঁর 'আত্ম-পরিচয়' প্রবন্ধে এইসব সমস্যা তাঁর মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়েছে। —সেই প্রবন্ধের আলোচনা কালে গোরার এই দিকটার কথা সহজেই এসে পড়বে।

## শান্তিনিকেতন (১)

শান্তিনিকেতন ভাষণগুলো ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত। এর প্রথম আট খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩১৬ সালের বৈশাখ পর্যন্ত। প্রথমে আমরা সেই আট খণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করবো।

এই ভাষণগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রভাতবাবু বলেছেন :

> শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন। গত বৎসব অগ্রহায়ণ মাসে শমীন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, তারও কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ একই দিনে শমীন্দ্র-জননী স্বর্গতা হন।...মনের এই অবস্থায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরতোরণে প্রত্যুষান্ধকারে কবি ধ্যানে বসিতেন।

এই ভাষণগুলো ছিল কবির প্রাত্যহিক মৌখিক ভাষণ—পরে এগুলো লিপিবদ্ধ হ'ত। গীতায় বলা হয়েছে, চার প্রকারের পুণ্যকর্মা ব্যক্তিরা ঈশ্বরের ভজনা করেন, অর্থাৎ তাঁর শরণ নেন। তাঁরা হচ্ছেন আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, আর জ্ঞানী। আর্তি যে এইকালে কবির একান্ত-ভগবদানুগত্য স্বীকারের এক বড় হেতু তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আর্ত তিনি যত, এই যুগেও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী তিনি তার চাইতে কম নন।

বোঝা যাচ্ছে শোকের আঘাতের প্রচণ্ডতা থেকে কবি যথাসম্ভব উদ্ধার পেয়েছেন ভগবানে একান্ত আত্মসমর্পণের ফলে ; আর সেই একান্ত আত্মসমর্পণের ফলে তাঁর ভাষা হয়েছে সহজ সরল হৃদয়ের ভাষা। পূর্ববর্তী 'ধর্ম' গ্রন্থের ভাষণ-গুলোর সঙ্গে তুলনায় শান্তিনিকেতনের ভাষণগুলোর অনলঙ্কার, অনায়াস ও ঋজুতা সহজেই চোখে পড়ে। প্রভাতবাবু বলেছেন 'ধর্মে'র ভাষণগুলো উপনিষদ-নির্ভর কিন্তু শান্তিনিকেতন ভাষণগুলো ঠিক তাই নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোও কম উপনিষদ-নির্ভর নয়।

এই যুগেই কবি 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা বা গানগুলো লেখেন—সেসবে এই অনলঙ্কার ও ঋজুতা স্বভাবতই আরো চিত্তগ্রাহী হয়েছে।

এই অধ্যায়ের নাম আমরা দিয়েছি "বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই"। ভক্তের যে সংগোপনের পূজা সেইটি এই স্তরে কবিমানসের প্রধান লক্ষণ। অবশ্য কবির অন্যান্য চিন্তা ও প্রবণতারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

শান্তিনিকেতন এক বৃহৎ গ্রন্থ। একান্ত-ভগবৎ-শরণ ও তদনুরূপ জীবন-দর্শন যাঁদের প্রিয় এর অনেক লেখা তাঁদের আনন্দ দেবে—মনকে নাড়াও দেবে। জ্ঞানের কথাও এতে সুপ্রচুর। আমরা এর বিভিন্ন ভাষণ থেকে কিছু কিছু বাণী উদ্ধৃত করছি। কোনো কোনো ভাষণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও আমরা করবো।

> সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কে আবৃত করে থাকে—তার হাত থেকে যেন মুক্তি লাভ করি। (সংশয়)।
>
> আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। (আত্মার দৃষ্টি)।
>
> সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই; ভগবানকে কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষা পাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না; ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে......(ত্যাগের ফল)।
>
> প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই"। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধরূপ থাকলেও চলবে না। (সামঞ্জস্য)।

শান্তিনিকেতনের ভাষণগুলোয় স্বভাবতই ভগবানের সঙ্গে প্রেমের যোগ সাধনের উপরে জোর পড়েছে। কিন্তু এই প্রেমের যোগ সাধনায় মাঝে মাঝে যে বিকারও দেখা দেয় সেকথা কবি স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁর 'বিকার শঙ্কা' ভাষণে। এই দিক দিয়ে এই ভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তরা সাধারণত এদিকটার তেমন উল্লেখ করেন না। এর কিছু কিছু অংশ এই:

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে সেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি।......এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

...কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর—ছন্দ এবং ভাষা,...এই কলেবর রচনার কাজ যেমন তেমন করে চলে না—কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়—তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃ পতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়।......তার পরে আর একটা বড়ো আশ্রয় আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতর এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—সে-কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীর ভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্ছে ভাবের আশ্রয়—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে-রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

রসের বিকার সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে—তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না,......রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন

সেইটেকেই সিদ্ধি বলে ভান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না; অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না,……।

নৈবেদ্যের "যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে" শীর্ষক সনেটটি স্মরণীয়।

আলোক…প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে তুমি স্পষ্ট করে দেখো তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না; যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতন, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক থেকে আর এক রূপের খেলা; কোথাও তার শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরণা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপ সাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। (দেখা)।

এখানে একই সঙ্গে আমরা ভক্তকে আব কবিকে দেখছি। বরং কবিকে বেশি দেখছি।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়, চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি। (শোনা)

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে—অসতো মা সদ্‌গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে, বলতে হবে, অসতো মা সদ্‌গময়—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরা করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না—তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো—(হিসাব)

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয় অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু

সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, এই যে জিনিষটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ, তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। (দীক্ষা)

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না—তারা পরস্পরের সহায় হয়।

......আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য বস্তু। (মানুষ)।

যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয়জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত ঐশ্বর্যময়,—আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করেনি—প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য—তার হাতের অমৃতপাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না। (উৎসব)।

.....হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল করো, আমার কণ্টকিত অহংকারের বৃন্ত থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও। (সঞ্চয়-তৃষ্ণা)।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে যাব এ-কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান। (পার করো)।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে—সেই জন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

...যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে

থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজের যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী ; ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছোয় না ; এই জন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না ; সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

…সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহু লোককে বহু বন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই।

…ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্ম-বুদ্ধির দুর্বলতা আছে—নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে, নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই, এবং পুজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে, নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে ক্ষমা নেই ; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতে নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে। ( দিন )।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধুলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্ত দিন নিয়তই বাজতে থাকে—যাতে আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সংগীতে পরিণত করে সংসারের কর্মক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুলতে পারি। ( রাত্রি )।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

…আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি—না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেন না স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। (বিশেষ)

…মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র: আমার সুখ দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌর জগতের মধ্যে সেই মানুষ এক কণা বালুকার মতো যৎসামান্য—এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু বলে কিনা প্রেম করবে। অর্থাৎ তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে বসবে। বড়ো হয়ে উঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই একথা জানা কথা।…মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। . তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি—সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তাহলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।…

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এই জন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া।…

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন।

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে শুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সেকথা তাঁর ধুলি জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই—তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাজাঞ্চির হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেখানে কোনো মতে পৌঁছায় না ... যেদিন বলতে পারব, আমার টাকার কাজ নেই, খ্যাতিতেও কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস, যে দিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আমি তোমার, সেইদিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন —সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে। (প্রেমের অধিকার)।

অনন্ত ও ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্বাইট্‌জার (Schweitzer) বলেছেন:

Mysticism for its part must never be thought to exist for its own sake. It is not a flower but the calyx of a flower. Ethics are the flower Mysticism which exists for itself alone is the salt which has lost its flavour···There is no Essence of Being, but infinite Being in infinite manifestations. It is only through the manifestations of Being and through those into which I enter into relations that my being has any intercourse with infinite Being. The devotion of my being to infinite Being means devotion of my being to all manifestations of Being which need my devotion and to which I am able to devote myself. Only an infinitely small part of the infinite Being comes within my range. The rest of it passes me by like distant ships to which I make signals they do not

understand. But by devoting myself to that which comes within my sphere of influence and needs me I make spiritual inward devotion to infinite Being a reality and thereby give my own poor existence meaning and richness. The river has found its sea'

(Civilization and Ethics)

... .. ... ...

বিশ্বসাম্রাজ্যের আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা,—ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ওই একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জন্যে প্রতিদিনই যে আমার দ্বারে আসছেন আর যাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন, কেননা এইখানে তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন—আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করছেন—কেন না ইচ্ছার কাছে ছাড়া ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বলছেন, রাজ-খাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও। (ইচ্ছা)।

কেউ কেউ বলেন উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান সেই—উপাসনা কেবল মাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

...ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তার প্রকাশ হত তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি না কি, "আনন্দরূপমমৃতং" তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।...

...যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যত দিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানা সৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাবেন, তত দিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে?...

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে— তার সমস্ত সৌগন্ধ এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদঘাটিত করে

দিয়ে বলছে—"অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়" মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পুজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে? (প্রার্থনার সত্য)।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন। (বিধান)।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজপ্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ; এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হ'ক। (তিন)।

শান্তিনিকেতন চতুর্থ খণ্ডের 'পাওয়া' ভাষণে কবি বলেছেন:

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ কথা ঐশ্বর্য-গর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না। কিন্তু 'গীতালি'তে তিনি বলেছেন:

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালোবাসা
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥

'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলোর যুগে একদিকে কবি দেখছিলেন ইয়োরোপের যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার দম্ভ অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মে সমর্পিত শান্ত জীবন। গীতালির যে কবিতাটি উদ্ধৃত হল তার ভিতরে কবির পূর্ণতর উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায়, মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্য সে কাঁদছে। সে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব। অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জানলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু তো মুক্তি লাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বের অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ। (সমাজের মুক্তি)।

সুফীরা এবং বৈষ্ণবরাও এই পরম অধীনতার কথা বলেছেন। কোরআনে এই অধীনতাকে পরম সত্য জ্ঞান করা হয়েছে।

…ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে ঋষি বলেছেন, তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের দ্বারা পান নি দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে যেন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে ফল ভক্ষণ করেছিলের তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল। তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়। (বিশ্বব্যাপী)।

কবির প্রকৃতি-বোধের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাঁর আনন্দ সহজেই মরমী আনন্দ হয়ে ওঠে—তাঁর সেই উদ্দীপ্ত মুহূর্ত অবশ্য তেমন চিরস্থির কিছু নয়, তবে বার বার সেই আনন্দ তিনি উপলব্ধি করেন।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না

কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই, সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনি এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল।* ( ভাবুকতা ও পবিত্রতা )

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটি হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন।...সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তন উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনও একবার সেখানে যেতে যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একবারে কাত হয়ে উলটে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ়, অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না—বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না।—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না। ( অন্তর বাহির )।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটাকে আমরা গড়ে

*সাহিত্যিক সাধনায়ও সংযম সাধনের একান্ত প্রয়োজন—কবির সেই উক্তিটি এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

তুলছি তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এ সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশকালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। ( পরিণয় )

নিত্যধাম বলতে কবি যা বুঝেছেন তাঁর সেই চিন্তাটি লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি নিত্যপরিবর্তনের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর সেই চিন্তার সঙ্গে বলাকায় আমরা আরো পরিচিত হব। বিজ্ঞানের পক্ষপাত নিত্য পরিবর্তনের দিকেই। তবে মানুষের মনে যে ন্যায় ও সৌন্দর্যের স্বপ্ন রয়েছে—চিরদিন রয়েছে—সেটিও একটি বড় সত্য, মানুষের জীবনের 'শৈলপথে' চালনা করে সেই স্বপ্ন। আমরা 'মানুষের ধর্মে' দেখবো সেখানে নিত্যপরিবর্তনের উপরে জোর পড়েছে।—ষষ্ঠ খণ্ডের 'প্রার্থনা' ভাষণটিতে কবি ভগবানে বিলীন হতে চেয়েছেন :

> হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো—আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি কেবলই তুমিময় আনন্দ।

কিন্তু ভাবের এই স্তরে কবির স্থিতি ঘটেনি। না ঘটাই অবশ্য ভাল হয়েছে—ঘটলে কবিকে আমরা হারাতাম।

> একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।
>
> এটা বেশি করে জানতে হবে, যে জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্র ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না। ( মরণ )।
>
> বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা

হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না। (অহং)।

...অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতি-পথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলেই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশপরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং উপকূলের নানা ঘাত প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সংগীত। (নদী ও কূল)।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, তাই অহং-এর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।...

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়। (ব্রহ্মবিহার)।

...আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বলব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো? আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই। (নীড়ের শিক্ষা)।

জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন। (শক্ত ও সহজ)।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি এই দেশকাল-বদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকু মাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত খুঁত ক'রো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা চরমার্থ বলে কল্পনা করো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উলটোদিকে নয়, নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, প্রেমের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেন না তাঁতেই তোমার পরম হওয়া। ( হওয়া )।

ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধন-স্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি। ( মুক্তি )।

শান্তিনিকেতন প্রথম আট খণ্ড ভাষণের কিছু কিছু পরিচয় এ পর্যন্ত দেওয়া হল।

এইবার নবম, দশম ও একাদশ খণ্ডের ভাষণগুলোর কিছু পরিচয় আমরা-দেব। একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের অক্টোবরে। গীতাঞ্জলির শেষ কবিতার তারিখ হচ্ছে ২৯ শ্রাবণ, ১৩১৭।

নবম খণ্ডের 'তপোবন' ভাষণটি বিখ্যাত—১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ওভারটুন হলে এইটি দেওয়া হয়। এতে কবি কোনো নতুন কথা বলেন নি, তবে ভারতীয় জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা সেটি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। এর একটি অংশ এই :

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিক্‌কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক

ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।......

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়।

'ভক্ত'ভাষণে হজরত মোহম্মদের সাধনা সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

ভক্তের জীবনের মহৎ মূল্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

...তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনও তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ, তোমাকে আমরা কাছে পাই, তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতি-ফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্‌ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের

সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তি-সুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই।

দশম খণ্ডের শেষ ভাষণটি হচ্ছে 'বিশ্ববোধ'—১৩১৭ সালে মাঘোৎসবে এইটি দেওয়া হয়েছিল। এতে কবির মুখ্য বক্তব্য ছিল এই : ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে জোর দিয়েছিল বিশ্ববোধের উপরে, সর্বানুভূতির উপরে—

গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্য সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

ইয়োরোপের যেসব আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন ( abstract ) পদার্থ অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে, তাঁদের কথার উত্তরে কবি বলেন ;

..এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূর গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূর যেতে পারেন না।

কবির দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতের এই বিশ্ববোধ একালে আমাদের জীবনের জন্য বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়েছে :

...আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়, ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব।

এই সাধনা যে একালে আমাদের দেশে বিঘ্নিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কবি সচেতন :

...আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতে অন্য কোথাও

তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন, যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেননি। তাঁকে হারানো মানে হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদে পদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না।

কিন্তু কবি এই বিশ্বাসে বলীয়ান যে ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন উপলব্ধি আজও শক্তিহীন হয়ে যায় নি। প্রাচীন শ্রেষ্ঠ চিন্তার বৈভব হারিয়ে একালের ভারত আচার-অনুষ্ঠানের জালে কত বন্দী হয়ে পড়েছে সে সম্বন্ধে কবির তীব্রতর চেতনা প্রকাশ পায় এর পরে 'অচলায়তন' প্রভৃতি রচনায় ।

একাদশ খণ্ডে 'গুহাহিত' ভাষণে কবি বলেছেন :

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু ; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি।

তোমাদের ওই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠেছে।

শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয় অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী আমরা পেলাম। মাঝে মাঝে ভগবৎ-প্রেমও অপূর্ব ভাষা পেয়েছে এতে। তবে এতে অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগও দেখা দিয়েছে, অনন্তের মধ্যে কবির নিজেকে বিলিয়ে দেবার প্রবণতা জেগেছে। তাতে ভাষা তীক্ষ্ণতা অনেকটা হারিয়েছে।—যেমন 'ধর্মে' তেমনি 'শান্তিনিকেতনে' উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনার, অর্থাৎ ভাবাবেগ নয় সহজ সচেতনতা যাতে প্রকাশ পেয়েছে তেমন রচনার, পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

কবির বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ Sadhana প্রধানত শান্তিনিকেতন ভাষণগুলো অবলম্বন করে লেখা।

## গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালের শ্রাবণে। এই কাব্যের অনেকগুলো কবিতা সুর দেওয়া গান, কতকগুলো তা নয়। কিন্তু এর সব কবিতাই আসলে গান—একটি নিঃসঙ্গ মনের বেদনার ও চেতনার সুর এসবে নিবিড়। গীতাঞ্জলির পরের 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'ও মুখ্যত গানের সংগ্রহ—গানরূপেই সেসবের অনেকগুলো সার্থক কবিতা হয়েছে। তবে এই তিনখানি কাব্যের মধ্যে ভাবের পার্থক্যও রয়েছে। কবিতাগুলো পাঠকালে তা বোঝা যাবে।

নৈবেদ্যে আমরা দেখেছি কবির ভিতরে নিবিড় ঈশ্বরযোগ—কবি যে একান্ত ভাবে ঈশ্বরের এই স্থির এবং অগাধ প্রত্যয়।

কিন্তু সেই প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কিছুর জন্য—প্রেমের চিত্তবিমোহন সম্পর্কের জন্য—খেয়াতে আমরা কবির আকুলতা দেখেছি। সেই আকুলতার আরও ঘনীভূত রূপ আমরা শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয় দেখেছি—সেই ঘনীভূত আকুলতাই গীতাঞ্জলিতে ছন্দে সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, এবং শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোর তুলনায় অনেকক্ষেত্রেই সার্থকতর রূপ লাভ করেছে। হৃদয়াবেগ কবিতায় বা গানেই রূপ পায় ভাল।

খেয়াতে আমরা ভাষার সরলতা দেখেছি। কিন্তু সেই সরলতায়ও অলঙ্কারের অপ্রতুলতা ঘটে নি। গীতাঞ্জলির ভাষায় অলঙ্কার বাদ পড়েছে বলা যায়, আর নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই অনলঙ্কার অনেক ক্ষেত্রে ভাবের এক অসাধারণ শক্তিশালী বাহন হয়েছে। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ যে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিকদের এবং ও অঞ্চলের শিক্ষিত সাধারণের মন সহজে হরণ করতে পেরেছিল তার একটি বড় কারণ মনে হয় এই কাব্যের ভাষার অনলঙ্কার আর সেই সঙ্গে অবশ্য কবির অনুভূতির গভীরতা—অনুবাদে সেসবের প্রাণ ও সৌন্দর্য অনেকটা অবিকৃত থাকতে পেরেছিল। আর তার সঙ্গে এই কাব্যে আধুনিকতারও যোগ ঘটেছিল। পাঠকরা সহজেই বুঝেছিলেন এই কাব্যের কবি যে অবাঙ্মনসগোচর ভগবানের প্রেমেই নিবিড়ভাবে বন্দী হয়েছেন তাই নয় মানুষের ভালোমন্দ সম্বন্ধে গভীর চেতনা, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ, এসবও তাঁতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্য একই সঙ্গে সর্বকালের আর বিশেষ বিশেষ কালের বাণী।

গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানের রচনার কাল ১৩১৬-১৭ সাল। কিন্তু এর প্রথম

গানটি ১৩১৩ সালে রচিত হলেও এটি গীতাঞ্জলির যোগ্য ভূমিকা হয়েছে। এতে অহংকে ভগবানের পায়ে নিঃশেষে নত করবার যে ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে গীতাঞ্জলির বহু গানেই সেইটি কবির অন্তরতম কামনা। প্রেমের পথে অহংকারের মতো বালাই আর কি হতে পারে।

এই অহংকে ভগবানের পায়ে নিঃশেষে নত করার আগ্রহ এই কালের রাজা নাটকেও ব্যক্ত হয়েছে।

গীতাঞ্জলির প্রথম দিকের 'বিপদে মোরে রক্ষা কর' শীর্ষক গানটি (৪নং) সুবিখ্যাত। কবির বহু লেখায় বিশেষ করে তাঁর 'দুঃখ' প্রবন্ধে এই ভাবের প্রকাশ আমরা দেখেছি। কিন্তু ভক্তরা সাধারণত এ ভাবে কথা বলেন না, কেননা, তাঁদের 'আমি' আর থাকেনা, আমি 'তুমি'ময় হয়ে যায়। আমির তুমিময় হবার প্রয়োজনের কথা কবিও কোনো কোনো 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে বলেছেন—গীতাঞ্জলিতেও শেষের দিকে তার পরিচয় রয়েছে। বলা যেতে পারে কবি এই গানটিতে বলতে চেয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে মানুষের আচরণ কেমন হবে সেই কথা। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ তাপ বাথা যাইই আসুক কিছুকেই ডরানো চলবে না, সমস্তের সামনে মাথা উঁচু রাখতে হবে, নইলে মনুষ্যত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে, মনে হয়, এই এখানে কবির বক্তব্য, নৈবেদ্যে যেমন তিনি বলেছেন—

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

কিন্তু সম্পূর্ণ নিবেদিতচিত্ত ভক্তের সামনে ভগবানই থাকেন, ভক্ত আর থাকেন না, অর্থাৎ থেকেও নেই। গীতিমাল্যে আমরা সেই ভাবের কবিতা কিছু বেশি পাব। রাজার ঠাকুরদা আর সুরঙ্গমা তেমনি সম্পূর্ণ নিবেদিতচিত্ত ভক্ত।

গীতাঞ্জলির প্রথম দিকের অনেকগুলো গান শারদোৎসব থেকে নেওয়া—শরতের আকাশ বাতাস প্রান্তরের নয়নভুলানো রূপ সেসবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শুধু শরৎ-প্রকৃতির শোভাই নয় যিনি আনন্দরূপমমৃতং তাঁকে কবি সেই শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে দেখছেন—এইটি কবির অন্তরের কথা। এই আনন্দরূপের চিত্রণ গীতাঞ্জলির বিরহের আকুলতায় বৈচিত্র্য এনেছে।

খেয়াতে আমরা দেখেছি, কবির ভগবৎ-অনুরাগ যেন কিশোরীর নব অনুরাগের রূপ নিয়েছে—তেমনি কান্ত, তেমনি পেলব। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে সেই 'অনুরাগ' অনেকগুলো কবিতায় বিরহবেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ২৩, ২৪, ২৮, ও ২৯ সংখ্যক কবিতা। এইসব কবিতার কোনো কোনো চরণে বিরহ-বেদনা তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না। ( ২৩ )

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে। ( ২৪ )

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে। ( ২৮ )

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জান, মন তোমারে চায়। ( ২৯ )

এর পরের অনেক কবিতায়ও বিরহের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সেই বিরহ এক গভীর আশ্বাসে অনেকটা সুসহ—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। (৩৪)

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। ( ৪৬)

তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ, লহ।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহ।

যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না,
যাক সে ধুলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ। (৫৭)

আমরা বলেছি, গীতাঞ্জলি শুধু ভগবৎ-প্রেমমূলক কাব্য নয়, এটি একটি আধুনিক কাব্যও। শুধু গীতাঞ্জলি নয় কবির অন্যান্য ভগবৎ-প্রেমমূলক কাব্যও তাই, কেননা কবি আধুনিক জগতের লোক। তাঁর একান্ত ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গেও বিশ্বজগৎ, বিশেষ করে মানব তার সমস্ত জটিল সম্পর্ক সমেত, নিবিড়যোগে যুক্ত। এর ৪৩ নম্বর কবিতাটি রাখিবন্ধনের গান, এটি পাঠিয়েছিলেন তিনি অজিত কুমার চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের উদ্দেশ্যে। তার সঙ্গে একটি দীর্ঘ পত্রও তিনি পাঠান। সেই বিখ্যাত পত্রের কিছু অংশ এই :

"তোমাদের আশ্রমে তোমাদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়ো দিন করে তুলো। বড়ো দিন মানে প্রেমের দিন মিলনের দিন—যে প্রেমে যে মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকে শত্রু ব'লে দূরে ফেলতে পারব না। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব সকলকে নিয়ে এক হব—এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গ-বিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত হোক। তা হলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তা হলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পায়—সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকালস্থায়ী মৃণ্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তা হলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে।"

দেশের এমন এক জটিল পরিস্থিতি ও তাতে কবির অন্তরতম কামনা কত সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতার ছত্রগুলির মধ্যে :

প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি।

এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখি।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে, কেহই
রবে না বাকি।
আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি। (৪৩)

যিনি পরম সত্য পরম সুন্দর পরম কল্যাণ তাঁব হাতে রাখি পরিয়ে কবি জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের সবার হাতে প্রীতির রাখি পরাতে চাচ্ছেন, কেন না, তাঁকে, অর্থাৎ সেই সত্য সুন্দর ও কল্যাণ-স্বরূপকে, জানলে কেউ পর থাকে না।

কিন্তু এমন ভাবনায় যাঁদের অনুরাগ নেই কবির কথায় তাঁরা সেদিন ভ্রুভঙ্গি ভিন্ন হয়ত আর কিছু করেন নি। কবি তার ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু এমন চিন্তার মূল্য সম্বন্ধে যাঁরা উদাসীন তাঁদের প্রশংসা করাও কঠিন, কেন না তাঁরা আর যাই হোন দায়িত্ব-বোধ-সম্পন্ন নন। কবি যা বল্লেন তা একজন মরমী সাধকের কথাই নয়, বরং একজন বিশেষদায়িত্ববোধসম্পন্ন সংসারীরও কথা। সৌভাগ্য ক্রমে কবির সত্যকার অনুরাগীর দল এঁদের চাইতে সংখ্যায় ও মর্যাদায় কম ছিলেন না। তা বোঝা গিয়েছিল কবি এইকালে, অর্থাৎ 'নোবেল প্রাইজ' লাভের পূর্বে, তাঁর স্বদেশীয়দের যে আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন তা থেকে।

এই কবিতাটিকে কেউ কেউ বলতে পারেন কিছু চিন্তা-প্রধান। কিন্তু তাহলেও এটি একটি স্মরণীয় কবিতা, কেন না, এটি কবির এক মহৎ ও সৃষ্টিধর্মী চিন্তার স্বচ্ছ প্রতীক।

গীতাঞ্জলির কতকগুলো কবিতা, বিশেষ করে প্রথম দিকের আন্তরিকতার জন্য চিত্তাকর্ষক হলেও ভাবালু হয়েছে কিছু বেশি। 'মেঘের

'পরে মেঘ জমেছে' কবিতাটির কথা ভাবা যাক। সুরে ও ছন্দে এটি উপভোগ্য—মর্মস্পর্শীও—কিন্তু কবিতা হিসাবে এটি দুর্বল। মানব মানবীর প্রেমের সঙ্গে তুলনায় 'ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের বৈশিষ্ট্য ( অবশ্য খুব সূক্ষ্ম সেই বৈশিষ্ট্য ) এর রূপকল্পনায় তেমন ব্যক্ত হতে পারে নি। এটির তুলনায় 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' শীর্ষক কবিতাটি উচ্চতর মর্যাদার—অনুভূতির নিবিড়তা আর রূপকল্পনার পর্যাপ্তি দুয়েরই জন্য। "আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে" শীর্ষক কবিতাটিও তেমনি কিছু বেশি ভাবালু।

গীতাঞ্জলির প্রথম দিকের অনেক কবিতার এমন দুর্বলতা সম্বন্ধে কবিও সচেতন ছিলেন মনে হয়। ৮৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন :

একা আমি ফিরব না আর
এমন করে—
নিজের মনে কোণে কোণে
মোহের ঘোরে।
তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
ছোটো করে ঘিরতে গিয়ে
আপনাকে যে বাঁধি কেবল
আপন ডোরে।
যখন আমি পাব তোমায়
নিখিলমাঝে
সেইখানে হৃদয়ে পাব
হৃদয়রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল,
তারি 'পরে বিশ্বকমল,
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।

গীতাঞ্জলিতে কবির ভগবৎ-প্রেমে প্রথমে দেখা যায় একটা তীব্র আকুলতা—কেন সেই আকুলতা তা ভাল করে বুঝবার সামর্থ্য যেন কবির নেই। কিন্তু তারপর কবি সচেতন হয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন, ভগবানকে পাওয়ার অর্থ তাঁকেই একান্ত করে পাওয়া নয়, তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে তাঁকে পাওয়া।

অবশ্য প্রখ্যাত ভক্তদের জীবনে এই দুই রকমের 'পাওয়া'ই আমরা দেখি। শুধু ভগবানকে নিয়েই যাঁরা বিহ্বল, আর কিছুর খবর যেন রাখেন না বা রাখতে

চান না, এমন ভক্তরা আছেন, আবার যাঁরা ভগবানকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন সেই সঙ্গে জগতের কাজেও নিজেদের মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন এমন ভক্তরাও আছেন। গীতাঞ্জলিতে কবির ভিতরে এই দুই ভাবই আমরা দেখি। এই সম্পর্কে দুইটি কবিতা আমরা উদ্ধৃত করছি।

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে কোন দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

আজো সময় হয়নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি?
ওগো ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধু-পারের পাখি
আপন কুলায়মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে॥ (৮৩)

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো। (১৪)

শুধু গীতাঞ্জলিতে নয়, এই প্রায়-পরস্পরবিরোধী ভাব কবির অনেক লেখায় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগযুক্ত যে ভগবান তাঁর সঙ্গেই যোগযুক্ত হবার কথা তিনি বেশি ভেবেছেন।

আধ্যাত্মিক সাধনায় গুরুকরণ ও বিশেষ সাধনভজন আমাদের দেশে একটি সুপরিচিত পথ। আমরা উৎসর্গে দেখেছি কবি কোনো গুরু বা পণ্ডিতের অনুবর্তী হতে চান নি—সে-পথ অবলম্বন করতে কেমন শঙ্কিত হয়েছেন। গীতা-গুলির যুগে যখন আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা তাঁর ভিতরে খুব প্রবল হয়েছে তখনও কোনো গুরুর বা কোনো বিশেষ সাধনপদ্ধতির অনুবর্তী তিনি হন নি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপক অথবা বর-বধূর রূপক অনেক সময়ে তাঁর বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে, কখনো ভগবানকে তিনি দেখেছেন মহিমান্বিত সম্রাট অথবা প্রভুরূপে—সখারূপেও ; কিন্তু কোনো বিশেষ সাধন বা প্রক্রিয়া বা পুজাপদ্ধতির দিকে তাঁর মন যায়নি। এই কালে কাদম্বরী দেবী নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পত্রব্যবহার হয়, সেই পত্র থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের খ্যাতনামা সাধকদের প্রতি কবি গভীর ভাবে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন কিন্তু তাঁদের অনেকের সাধন-পদ্ধতি, অর্থাৎ পরিমিত দেবতার পুজা-আদি তিনি জ্ঞাতসারেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর পত্রের কিছু কিছু অংশ এই :

> ...আমি আমাদের দেশে প্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলির ভিতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।...আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্তি নন—অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয়, তাঁরা জন্মমৃত্যুবিবাহ সন্তান-সন্ততি ক্রোধ-দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ। সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে গেলে নিজের বুদ্ধিকে একেবারেই অন্ধ করতে হয় এবং সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায়—তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন—সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচার-ব্যবহার।

অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতি-গত সমস্ত সংকোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে— তাঁকে অবলম্বন ক'রে আমাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরা ভগবানের নাম ক'রে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি। স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি-যুক্তিকে একেবারে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে!...অমরা ধর্মকে আমাদের নিজেদের চেয়ে নেবে যেতে দিয়েছি, আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারিনে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্য নয়, অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত-মুগ্ধ কল্পনাই ভালো...।...

...আমাদের দেশে যাঁরা মহাপুরুষ জন্মেছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁরা আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এ সমস্তই আমি মানি. কিন্তু আমার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও দেশব্যাপী দুর্গতি এবং তার কারণের কথা যখন ভাবি তখন কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাবার প্রবৃত্তি একেবারেই চ'লে যায়। আমাদের ধর্মের মধ্যে-এত মূঢ়তা। নিজের শক্তিকে এমন চারিদিক থেকে পঙ্গু করা, নিজের বুদ্ধিকে একান্তভাবে অন্ধ করা।...

এমন কথা কবি অবশ্য এইকালেই বলেন নি, পূর্বেও নানাভাবে বলেছেন— তাঁর বিশিষ্ট রচনায়ও এই সব ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যাই হোক গীতাঞ্জলির শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে কবির ভগবানকে লাভের আকুলতা একটা বড় সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর চারপাশের নানাভাবে দুর্গত লোকদের প্রতি তাঁর বর্ধিত প্রেমে ও দায়িত্ববোধে—দেশের সমগ্র জীবন-চেতনাকে আরো বাস্তব-মুখী করার কাজে। গীতাঞ্জলির 'ভজনপূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাকপড়ে', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে,' 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ আপমান' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাগুলোয় এবং আরো অনেক কবিতায় কবির সেই ভাব স্মরণীয় রূপ পেয়েছে।

গীতাঞ্জলির কতকগুলো কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন, মানুষই যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল তাই নয়, ভগবানও মানুষের প্রেম লাভের জন্য পরম আগ্রহী। শান্তিনিকেতন ভাষণে কবির এই চিন্তার সঙ্গে আমাদের

পরিচয় হয়েছে। এর সমর্থনে কবি এই যুক্তির অবতারণা করেছেন যে ঈশ্বর যদি এমন প্রেমের প্রয়োজন বোধ না করতেন তবে তাঁর একাকিত্ব বিষম একাকিত্ব হত।

নিরীশ্বরবাদীদের কাছে তো কবির এসব কথা আদৌ গ্রাহ্য নয়, যাঁরা যুক্তিবাদী আস্তিক বা মরমী (যেমন Schweitzer) তাঁরাও কবির এই যুক্তি মেনে নিতে ইচ্ছুক নন, কেন না. তাঁদের মতে, বিশ্ববিধাতার বা বিশ্বাত্মার (World Spirit এর) স্বরূপ জানবার কোনো উপায় মানুষের নেই, তাই তাঁর সঙ্গে যোগের অর্থ বিশ্বের সকলের সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের ও সেবার যোগ।*

কিন্তু কবির এই চিন্তাটি পরম হৃদ্য। বৈষ্ণব, সুফী, অনেক ইয়োরোপীয় মরমী এঁরা সবাই এমন প্রত্যয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাছাড়া বিশ্বাত্মার-স্বরূপ অজ্ঞেয়. যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে এই মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা কঠিন হলেও আমাদের অন্তরাত্মা এই চিন্তায় সান্ত্বনা পায় না। বরং যেমন করে হোক আমাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন, শুভ সাধনার শুভ ফল হয়, চিরকাল এই বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে। বিশ্বাসের এই অভাব হলে তার জীবন প্রকৃতই অর্থ হারায়। এই দিক দিয়ে এই ভাবটি একটি মানব-সত্যরূপেই গণ্য হবার যোগ্য। গীতাঞ্জলির 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে,' 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি' শীর্ষক কবিতায় তাঁর এই বিশিষ্ট ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এগুলো গীতাঞ্জলির খুব স্মরণীয় কবিতা। কাদম্বরী দেবীর কাছে পত্রে কবি সুফীদের সাধনার উল্লেখ করেন। কবির উক্তিটি এই :

> আর যাই হোক. সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চলবে না। কল্পনাকে হৃদয়কে বুদ্ধিকে কর্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে --তাকে কোনো কারণেই. কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখলে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। মনে করো না সেই মুক্তি— জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি, সে প্রেমের মধ্যে মুক্তি। তুমি মনে কোরো না প্রতিমা-পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না। যদি সুফীদের প্রেমের-সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কি আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন

---

*Indian Thought and its Development by Schweitzer—শেষ অধ্যায়।

করিয়েছেন। তাঁদের সেই প্রেম কেবল একটা শূন্য ভাবের জিনিস নয়, তা অত্যন্ত নিকট, প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, অথচ তার সঙ্গে কোনো প্রকার কাল্পনিক জঞ্জালের আবর্জনা নেই।

সুফী সাধনার ( মুসলমানদের ভক্তি সাধনার) সশ্রদ্ধ উল্লেখ কবির 'আধুনিক সাহিত্যে' 'সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধেও রয়েছে। সুফী সাহিত্যের সঙ্গে কবির পরিচয় কেমন ছিল তা জানা যায় না। ছিন্নপত্রাবলীতে একজন মৌলবীর উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর প্রতি কবি ছিলেন বিরক্ত। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের তাপসমালা ( এটি ছিল সুফী সাধক ও কবি ফরিদ উদ্-দীন আত্তারের তায্‌কিরাতুল আউলিয়া গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ) তিনি যত্ন করে পড়েছিলেন মনে হয়। চারুবাবুর মুখে শুনেছি পারস্যে যাবার আগে ব্রাউন সাহেবের পারশ্য সাহিত্যের বিরাট ইতিহাস কবি কয়েকদিন কাছ ছাড়া করেন নি। প্রভাতবাবু বলেছেন, ১৯১০ সালে মহামতি গোখ্‌লে ভারতবর্ষের অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্তিত করবার জন্য আন্দোলন করেন, কিন্তু দেশের প্রায় সর্বত্রই উচ্চবর্ণের ধনী হিন্দুরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, এ সময়ে হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ করবার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ বসু যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাও শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষ থেকে বাধা পেয়েছিল, গীতাঞ্জলির স্বদেশ ও স্বজাতির দুর্গতি বিষয়ক কবিতাগুলোর উপরে এইসব ঘটনার প্রভাব পড়েছিল।

গীতাঞ্জলির 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' শীর্ষক গানটি বোধ হয় মহর্ষির স্মরণে রচিত। কবির এই কালের ব্যাকুলতার সঙ্গে এর যোগ নেই বলা যায়। গীতাঞ্জলিতে এমনি আরো কতকগুলো নিটোল লিরিক রয়েছে। এর 'ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান' শীর্ষক কবিতাটি এমনি একটি লিরিক।

এর মৃত্যু বিষয়ক কবিতায় যে প্রশান্তি ব্যক্ত হয়েছে সেটি ইয়োরোপীয় সমঝদারদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' শীর্ষক কবিতাটিতে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস ফুটেছে। কবির 'তব সিংহাসনের আসন হতে' শীর্ষক কবিতাটিতেও যেন সূচিত হয়েছে কবির পরবর্তীকালের অপ্রত্যাশিত আন্ত-র্জাতিক সমাদরের আভাস।

গীতাঞ্জলিতে কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। কিন্তু যাকে উচুদরের কবিতা বলা যায়—রস আর রূপ দুই দিক দিয়েই উঁচুদরের—তার সংখ্যা এই কাব্যে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এতে ভগবৎ-প্রেম এমন

একটি বেদনাময় রূপ পেয়েছে যার আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া হৃদয়বান পাঠকের পক্ষে কঠিন। অনুভূতির গভীরতার ও তীব্রতার নিজেরই যেন একটি চিত্তগ্রাহী রূপ আছে।

রূপকল্পনার দিক দিয়ে গীতাঞ্জলির অনেক কবিতার মিল বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে, কিন্তু এর ভিতরকার যে তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ তার সাক্ষাৎ বিশেষভাবে আমরা পাই সুফী সাহিত্যে।*

গীতাঞ্জলির শেষ কবিতাটিতে কবি 'অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে' ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে চেয়েছেন; (সেই তিমির অবশ্য করুণাঘন।) নিজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'বসন ভূষা মলিন হ'ল ধুলায় অপমানে শকতি যার পড়িতে চায় টুটে' এই বলে। এইকালে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায়-অর্থহীন কিন্তু তীব্র আক্রমণে কবি খুব বেদনাবোধ করছিলেন। তার ছায়া এর উপরে পড়েছে মনে হয়।

*জালাল-উদ্দীন রুমি-র মসনবী-সূচনার কয়েকটি চরণ এই:

বেশনও আয্ নয়্ চুঁ হেকায়েত্ মীকুনদ্।
বায্ জুদায়ীহা শিকায়েত মীবুনদ্॥
আয্ নয়েস্তাঁ মরা ববুরিদা আনন্দ্।
আয্ নফিরম্ মর্দ ও যন্ নালিদা আন্দ্॥
বাঁশির কাছ থেকে শোনো কি সে বলছে।
বিরহের যত কান্না তাই সে কাঁদছে॥
(বলছে) আমাকে আমার জন্মস্থান থেকে কেটে আনা হয়েছে।
আমার আর্তস্বর শুনে কাঁদছে যত নর ও নারী॥

## রাজা

গ্রন্থ পরিচয়ে রাজা নাটকটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে: রাজা ১৩১৭ সালের পৌষমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই "রাজা" প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া (প্রথম সংস্করণ) ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল। "লেখকের নিবেদন", রাজা।

এই "বর্তমান সংস্করণ"ই এখন প্রচলিত, রচনাবলীতেও এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

রাজা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে অন্যান্য নাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অরূপ রতন ( মাঘ ১৩২৬ ) "নাট্য রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" "যে বৌদ্ধ আখ্যানটি অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচিত হল" ( পৌষ ১৩৩৮ )। রাজা নাটকটি রবীন্দ্রনাথ পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বা প্রকাশিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে।

রাজা নাটকের মূল আখ্যানটি রয়েছে বৌদ্ধ কুশজাতকে। খুব সংক্ষেপে সেইটি এই। রাজপুত্র কুশ ছিল অসাধারণ জ্ঞানবান, কিন্তু দেখতে কুৎসিত। তার স্ত্রী প্রভাবতী ছিল অপূর্বসুন্দরী। দিনে স্বামীকে দেখলে বধূ তাকে অপছন্দ করবে এই আশঙ্কায় কুশের মাতা নিয়ম করেছিলেন তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ দিনের বেলায় পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে না। প্রভাবতী স্বামীকে দেখতে চাইলে তাকে দেখানো হয় তার সুদর্শন দেবরকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রভাবতী তার কুরূপ স্বামীকে দেখলে ও তাকে পরিত্যাগ করে পিতৃগৃহে চলে গেল। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কুশ শ্বশুরগৃহে গিয়ে নীচবৃত্তিতে নিযুক্ত হল, আর শেষে প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের হাত থেকে তার শ্বশুরকে উদ্ধার করে বীর্যশুল্কে পত্নীর প্রেম লাভ করল।*

মূল আখ্যানটির অনেক বদল হয়েছে কবির রাজা নাটকে, বিশেষ করে এটিকে দাঁড় করানো হয়েছে একটি রূপক নাট্য রূপে। এটিকে অধ্যাত্ম রসের নাটক বলা হয়েছে। কিন্তু সেটি এর 'সামান্য' পরিচয়। নৈবেদ্য, খেয়া, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলি, রাজা, গীতিমাল্য, এসবেরই প্রধান রস অধ্যাত্ম রস। স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ অথবা বিদ্রোহী মানবাত্মা বিচিত্র দুঃখ-বিপত্তি-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে কেমন করে ভগবানে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে সার্থকতা লাভ করল, বলা যেতে পারে, সেইটি এর বিশেষ কথা বা রস। শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয় ও গীতাঞ্জলির কবিতাগুলোয় যে একান্ত ভগবৎ-শরণ-কামনা লক্ষণীয় হয়েছে সেইটি রাজাতেও লক্ষণীয়। সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে রাজা খুব বিশিষ্ট হয়েছে এর গানগুলির জন্য। যেমন প্রায়শ্চিত্তের গানগুলি তেমনি রাজার গানগুলি নাট্যের প্রাণস্বরূপ হয়েছে।

রাজা নাটকটি অঙ্কে বিভক্ত নয়; এতে রয়েছে ছোটো বড়ো কুড়িটি দৃশ্য। পাত্র-পাত্রী হচ্ছে—রাজা, তাকে কেউ দেখতে পায় না; রানী সুদর্শনা,

* দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী ২য় ভাগ।

রাজার সঙ্গে তার মিলন হয় অন্ধকার গৃহে কিন্তু রানী এতে সন্তুষ্ট নয়, সে চায় আলোয় হাজার' হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে তার রাজাকে সে দেখবে, ঠাকুরদা, সে রাজার প্রাচীন ভক্ত, রাজাকে বন্ধু বলে জানে, রাজার কাছে কিছুই সে যাচ্ঞা করে না, কিন্তু রাজার কাজ করবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত, সুরঙ্গমা, রাজার দাসী, রাজার একান্ত আজ্ঞানুবর্তিনী সে। এর অন্যান্য চরিত্র হচ্ছে রানীর সখী রোহিণী, ঠাকুরদার বালকদল, স্ত্রীলোকদল, কয়েকজন নাগরিক, পথিক, কয়েকজন সামন্ত রাজা, বাউল, প্রভৃতি।

নাটকের সূচনায় রানী সুদর্শনা অন্ধকার ঘরটা সম্পর্কে তীব্র অভিযোগ জানাচ্ছে—তার উত্তরে সুরঙ্গমা বল্লে, "তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরও অন্ধকার রাখবে না?" রানী সুরঙ্গমার কাছে জানতে চাইলে রাজা দেখতে কেমন। সুরঙ্গমা বল্লে, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন। এতে রানী খুব বিস্মিত হল। সুরঙ্গমা বল্লে,"হাঁ তাই বলব—সুন্দর নয়।...সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য।' সুরঙ্গমা হাওয়ায় রাজার আসার গন্ধ পেল, কিন্তু রানীর সে বোধ নেই। সুরঙ্গমা দরজা খুলে দিলে, রাজা ঘরে এল। রাজার সঙ্গে কথায় রানী ব্যগ্রতা প্রকাশ করলে সে রাজাকে দেখবে। রাজা বল্লে রানী সহ্য করতে পারবে না, তার কষ্ট হবে। কিন্তু রানীর মন তাতে প্রবোধ মানল না। সেদিন ছিল বসন্তপুর্ণিমার উৎসব, রাজা রানীকে বল্লে, "তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানের সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো"। সুরঙ্গমা বল্লে, বসন্তপুর্ণিমার উৎসবে পঞ্চমে বাঁশি বাঁজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে, সে লুকোচুরির মধ্যে কি রাজাকে দেখা যাবে, ? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁধা লাগবে না? রাজা বল্লে, "রানীর কৌতূহল হয়েছে।" সুরঙ্গমা বল্লে, "কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে ? তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী তোমার কৌতূহলকে শেষে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।"

ভগবান চোখে দেখবার জিনিস নয়, তাঁকে চোখে দেখবার কৌতূহল বৃথা, একথা কবি শান্তিনিকেতনে 'গুহাহিত' ভাষণে বলেছেন—আরও অনেক লেখায়ও বলেছেন।

রাজা শুধু একটি রূপক নাট্য নয়, এটি একটি ঋতু-উৎসবের নাটকও—এতে বসন্ত-উৎসব অনেকগুলো দৃশ্যে রূপায়িত হয়েছে।

এই বসন্ত উৎসবের মধ্যমণি হচ্ছে ঠাকুরদা, বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু অন্তরে তার চিরযৌবন। এই নাটকে নাচের গানগুলো ঠাকুরদাকে ঘিরে এক অপূর্ব আনন্দ-লোকের সৃষ্টি করেছে। বৈষ্ণবের ভক্তি-রসের উল্লাস 'রাজা'র মতো রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনায় ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু সেই অপূর্ব উল্লাস সুনিয়ন্ত্রিত, সুলিখিত; তাই থেকেই 'রাজার' লাভ হয়েছে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা। রাজা কবির শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর অন্যতম।

এই বসন্ত উৎসবে কাঞ্চী, কোশল, বিদর্ভ প্রভৃতি ছয়টি রাজ্যের রাজারা যোগ দিয়েছিল আর যোগ দিয়েছিল রাজবেশী সুবর্ণ। তার মনোমোহন রূপ দেখে রাণী ভুললো, মনে করলে সেই তার আঁধার ঘরের রাজা। তার জন্য রোহিণীর হাতে সে মালা পাঠালো। কিন্তু অচিরে সে বুঝল সে ভুল রাজাকে মালা দিয়েছে। তবে ভুল বুঝতে পেরেও মনকে সে পুরোপুরি ফেরাতে পারলে না। এই ভুল রাজা তার প্রাসাদে আগুন লাগাল। সে রাজাকে ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল।

তার পিতা কান্যকুব্জরাজ কন্যার এমন আচরণে একান্ত ক্ষুব্ধ হল। এর উপর কাঞ্চী প্রভৃতির রাজারা এসে দাবি করলে, রানী সুদর্শনা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন, তাঁর জন্য নতুন করে স্বয়ম্বর সভা ডাকা হক তাতে তিনি এই রাজাদের যাকে খুশি বরণ করবেন। রাণী সুদর্শনার অন্তরে প্রবল দ্বন্দ্ব চলেছে—রাজার প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণ আর রাজবেশী সুবর্ণের জন্য তার প্রবল মোহ এই দুয়ের মধ্যে; তার অভিমান উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে এই জন্য যে তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য রাজা এলো না, অন্তত তার বাপকে এমন বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য রাজার এগিয়ে আসা উচিত ছিল। সে ঠিক করল, আত্মহত্যা করে মরবে।

রাজারা স্বয়ংবর সভায় আসন গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাদের সবারই মন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের দ্বারা আন্দোলিত। রানী সুদর্শনার স্বয়ংবর সভায় প্রবেশের পূর্বে সেখানে এসে হাজির হল ঠাকুরদা, সেনাপতির বেশে এসে বললে, রাজা এসেছেন। সমস্ত রাজারা সচকিত হয়ে বল্লে, কোথাকার রাজা। ঠাকুরদা বল্লে, "আমার রাজা···আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে···তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন"। কাঞ্চীর রাজা বল্লে, কিভাবে আহ্বান করেছেন? ঠাকুরদা বল্লে, "তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে"। রাজারা একে একে সভা ছেড়ে চলে গেল। কেবল কাঞ্চীর রাজা গেল রাজার সঙ্গে যুদ্ধ

করতে। যুদ্ধে সে খুব আহত হল, কিন্তু চিকিৎসার ফলে বেঁচে গেল। রাজা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন, কেননা সে অভীত এবং অকপট।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রানীর কঠিন অভিমান গললো, তার কানে যেন এসে পৌঁছল বীণার স্বর করুণ-মিনতি-মাখা। রানী রাজার কাছে পৌঁছবার জন্যে পথে বেরিয়ে পড়ল, বল্লে, "তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমি-ই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি, বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।" সুরঙ্গমা বল্লে "কিন্তু সে গর্বও তোমার টিকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।"

তুলনীয় :

> কত কালের সকাল-সাঁঝে
> তোমার চরণধ্বনি বাজে,
> গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
> গেছে আমায় ডেকে। (গীতাঞ্জলি)

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রানী রাজার প্রাসাদের সামনে গিয়ে পৌঁছল, তার সঙ্গে সুরঙ্গমা ঠাকুরদা আর কাঞ্চীর রাজাও। সবাই পথের ধুলায় ধূসর। কাঞ্চীর রাজা বল্লে, "ঠাকুরদা,···এই ধুলোর খেলায়···আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে, যাতে একে আর চেনা না যায়।" ঠাকুরদা বল্লে, "সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানেই যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে যাবে—এখন দেখতে দেখতে সব রং ফিরে যাবে।"

রাজার শেষ দৃশ্য অন্ধকার ঘর। তাতে রানী রাজাকে বল্লে, "······আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে আমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।" রাজা বল্লে, "তোমার মধ্যে আমার উপমা আছে।" রানী বল্লে, "যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছুই

নয়, সে তোমার।"* রাজা বল্লে, "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে, বাইরে চলে এস—আলোয়।" রানী বল্লে, "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"

একই সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে কবির নিবিড় মরমী যোগ, আর সেই ভগবানের বিশ্বের সঙ্গে যোগ লক্ষণীয়।

অরূপ রতনের ভূমিকায় কবি রাজা নাটকের এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন:—সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নইলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই "আপন অন্তরের আনন্দরসে ভগবানের উপলব্ধি" সম্পর্কে যুক্তিবাদীদের যা বক্তব্য তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এখানে বড় ব্যাপারটি এই যে কবির জীবনের একটি স্তরে এমন 'উপলব্ধি' তাঁর জন্য সত্য হয়েছিল, আর তিনি সেই উপলব্ধির একটি চিত্তাকর্ষক সাহিত্যিক রূপ দিতে পেরেছিলেন।

* দ্রঃ গীতাঞ্জলির "তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর" শীর্ষক কবিতা।

—এই 'উপলব্ধির' তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি তাঁর জীবনে ও রচনায় আমরা দেখি; কিন্তু এর অসদ্‌ভাব তাঁর জীবনে কখনো ঘটেনি বলা যায়।

## অচলায়তন

অচলায়তন প্রবাসীতে বেরিয়েছিল ১৩১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায়, লেখা হয়েছিল আষাঢ়ে। সেই বৎসরেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই কালে কবির ভিতরে চলেছিল নিবিড় ভগবৎ স্মরণ। তার বিভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখেছি শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয়, 'রাজা'য় ও গীতাঞ্জলিতে। গীতাঞ্জলির শেষের দিকে দেখা যায় ভগবানকে নিজের মনে পূজা করেই কবি আনন্দ পাচ্ছেন না, যে ভগবান বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত তাঁর কথা তিনি যথেষ্ট ভাবছেন, আর তাই থেকে তাঁর চারপাশের দুঃস্থ দুর্গতদের ভাগ্য তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় হয়েছে। কাদম্বরী দেবীর কাছে লেখা পত্রে আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে দেশে যে বিচিত্র মূঢ়তা চলছে তা কবির গভীর অসন্তোষ উদ্রেক করেছে।

অচলায়তনে কবি দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেই সব মূঢ়তা ও দুর্গতির দিকেই। যে বিদ্রূপের কশা তিনি দেশের অসাড় মনের উপরে হেনেছেন তা তীব্র—কবিও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বইখানি সহজেই অনেক কঠিন কটু আলোচনার কারণ হয়েছিল। সেই সব আলোচনার উত্তরে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার কিছু কিছু অংশ এই:

> ···আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ-কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম—আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব।···যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে, হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের দেশের আদর্শকে যে-ব্যক্তি যে-পরিমাণে ভালবাসিবে সেই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে—ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে

সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে—সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ-দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে···ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না, কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? অন্তরে যে সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র—অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ওই বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে—যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি? তবে কি এই কথাই সত্য যে, আমাদের কোথাও পাপ নাই, আমরা বিধাতার অন্যায় বহন করিতেছি? যদি তাহা সত্য না হয়, যদি পাপ থাকে তবে সে পাপের বেদনা আমাদের সাহিত্যে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? আপনাকে বলিতেছি আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্টনাম দিয়া ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই—অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন—আমাদেরও গুরু আসিতেছেন—দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন—তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব, তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত। দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি—আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি—সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না—গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব—আর কোনো পুরস্কার চাই না।

কোনো কোনো সমালোচক বলেছিলেন এই নাটকে কবি সব মন্ত্রকেই কঠিন বিদ্রূপ করেছেন। তার উত্তরে তিনি বলেন:

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ-কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না—যে হেতু মন্ত্রের সার্থকতা

সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়—মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায় তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে? কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না—এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্কজিনিস আর কী হইতে পারে? যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই সমস্ত কৃত্রিম বন্ধনজাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। ভাব তো রূপকে কামনা করে কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেন না সে যতদিন বাঁচিবে ততদিন কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। ......শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন—যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে—ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই কথা। অবশ্য এই সার্বজনীন সত্য অচলায়তনে

রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।"
(দ্রঃ গ্রন্থ-পরিচয়)

অচলায়তন শ্লেষাত্মক নাটক। তাই এর চরিত্রগুলো প্রধানত idea বা ভাবের প্রতীক। এর প্রধান চারটি চরিত্র হচ্ছে পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য আর গুরু। পঞ্চক আর মহাপঞ্চক দুই ভাই। পঞ্চক হচ্ছে গতি-চাঞ্চল্য নতুন আশা নতুন সম্ভাবনা এসবের প্রতীক—যা বহু কাল ধরে কেবল আছে, যা কঠিন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতাকে পীড়া দেয়। পঞ্চকের বিপরীত চরিত্র মহাপঞ্চক। যা আছে যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত তাই তার কাছে চিরন্তন সত্য, তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া সে মহা-অকল্যাণকর মহাপাতক বলে মনে করে। উপাচার্য, অধ্যেতা, ছাত্র এরা প্রচলিত ধারার অনুবর্তী হয়েই চলছে, তবে সনাতনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ক্বচিৎ কখনো বিচলিতও হতে চায়। আচার্যও সনাতন ধারা মেনে চলেছেন কিন্তু তাঁর মনে প্রবল সন্দেহ জেগেছে—হয়ত ভুল করা হয়েছে, সত্যকার যে পথনির্দেশ গুরু তাঁদের দিয়ে গিয়েছিলেন সে নির্দেশ পালিত হয়নি। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অচলায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ করে মহাপঞ্চকের সঙ্গে তাঁর বড় রকমের মতভেদ হল, আর তিনি ও পঞ্চক দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত হলেন।

গুরু বহুকাল পূর্বে এই আয়তনে এসেছিলেন কিন্তু তার পরে আর তিনি এখানে আসেননি। অনেকে তাঁর নাম শুনেছে মাত্র, তাঁকে চেনে না। তাঁর আনাগোনা চলে শোণপাংশুদের অঞ্চলে। তারা অচলায়তনের লোকদের বিপরীত প্রকৃতির। কাজের পর কাজ তাদের চঞ্চল করে রেখেছে, স্থির হয়ে বসে থাকতে তারা জানে না। কৃষিকর্ম, লোহার বিচিত্র ব্যবহার, সব তাতেই তাদের উদ্দীপনা। ফলে তারা দুর্দম্য। শোণপাংশুদের কাছে গুরু দাদাঠাকুর রূপে পরিচিত, তিনি শোণপাংশুদের সকল কাজে আনন্দ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করেন।

আর দাদাঠাকুরের আনাগোনা চলে অচলায়তনের প্রান্তে অবস্থিত অস্পৃশ্য দর্ভকদের পল্লীতেও। তাদের আচার নেই কোনো মন্ত্র নেই। তারা অচলায়তন-বাসীদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের হীন বলে জানে, কিন্তু খুশি মনে অতি সরল ভাষায় ভগবানের নামগান করে। গুরু তাদের কাছে পরিচিত গোঁসাই-রূপে।

অচলায়তনের পঞ্চক লুকিয়ে শোণপাংশুদের সঙ্গে মেলামেশা করে সে সংবাদ কেবল অচলায়তনের আচার্য জানেন, কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ

করেন না। শোণপাংশুদের সঙ্গে মেলা মেশা করে পঞ্চক নতুন নতুন উদ্দীপনা বোধ করে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপও—আকাশ আলো মেঘ বৃষ্টি —তাকে আনন্দে উৎফুল্ল করে।

তাহলে গুরু হচ্ছেন মানুষের নব নব আত্মপ্রকাশের নব নব সৃষ্টির-প্রবণতার প্রতীক—মানুষের অশ্রান্ত কর্মায়োজন, ভগবানে সহজ প্রত্যয়, অজটিল জীবনধারা, এইসব সেই সৃষ্টি-ধর্মের অনুকুল। অচলায়তনে আচারের কঠিন বন্ধনে সেই সৃষ্টি-ধর্ম ব্যাহত হয়েছে। তবে নিশ্ছিদ্র আচারপরায়ণতাও নব নব সম্ভাবনার অনুরাগী প্রাণকে নিঃশেষে দমিয়ে দিতে পারেনি—পঞ্চক তার প্রমাণ। আচার ও অযৌক্তিকতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতে সে যেন রামমোহনের মুক্ত অন্তরাত্মার প্রতীক।

অচলায়তন হচ্ছে স্থবিরপত্তন দেশে। চণ্ডক নামে একজন শোণপাংশু স্থবিরক হয়ে উঠবার জন্যে বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। সেই সংবাদ পেয়ে স্থবিরপত্তনের রাজা তাকে মেরে ফেলে। শোণপাংশুদের মধ্যে খবর রটে আরো দশজন শোণপাংশুকে স্থবিরপত্তনে ধরে নিয়ে গেছে ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবার জন্যে। এতে গুরু—শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর—তাদের আদেশ দেন স্থবিরপত্তনের বিরুদ্ধে অভিযান করতে, তিনি বল্লেন, "আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে"।

অচলায়তন যে কেউ কখনো ভাঙতে পারে সে-কথা মহাপঞ্চক কখনো ভাবেনি। গুরু ম্লেচ্ছ শোণপাংশুদের নিয়ে যোদ্ধবেশে এসেছেন দেখে মহাপঞ্চক জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি আমাদের গুরু"? গুরু বল্লেন, "হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।" মহাপঞ্চক বল্লে, "আমি তোমাকে প্রণাম করবো না।" গুরু বল্লেন, "আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করবো না —আমি তোমাকে প্রণত করবো।" মহাপঞ্চক বল্লে, "পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।" শোণপাংশুরা মহাপঞ্চককে বন্দী করে শাস্তি দিতে চাইলে, গুরু বল্লেন, "শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।"

গুরু দর্ভকপল্লীতে গেলেন আচার্য ও পঞ্চকের খোঁজে। সেখানে তিনি দর্ভকদের আনা ভোগ সবার সঙ্গে ভাগ করে খেলেন। একজন বালক জিজ্ঞাসা করলে, "এতে পাপ নেই?" গুরু বল্লেন, "কিছু না—পুণ্য আছে।" পঞ্চক গুরুর সঙ্গ নিতে চাইলে। গুরু বল্লেন, পঞ্চককে পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে অচলায়তনেই। সেই পুনর্গঠনের কাজে শোনপাংশুরা হবে তার সঙ্গী। মহাপঞ্চক সম্বন্ধে গুরু বল্লেন, তাকেও অচলায়তনেই অনেক কাজ করতে হবে। "এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোকভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।" কিন্তু নতুন আচার্যের পদে গুরু বরণ করলেন পঞ্চককে। পুরাতন আচার্যকে তিনি কর্ম থেকে অবসর দিলেন। বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস"। আচার্য বল্লেন, "আমি কোনো সম্পদ চাইনে—আমাকে একটু রস দাও।" অর্থাৎ তিনি ভগবানের সঙ্গে ও সবার সঙ্গে একান্ত প্রেমের যোগ চাইলেন।

অচলায়তনের নতুন মন্দিরে সবার জায়গা যাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে গুরু বল্লেন, নইলে আবার তাঁকে সেই মন্দির ভেঙে ফেলতে হবে। কর্মচঞ্চল শোণপাংশুদের সম্বন্ধে তিনি বল্লেন, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, "ওরা একটু বসতে শিখুক"। ওদের এই 'বসতে শেখা'র কাজে সহায় হবে মহাপঞ্চক।

মহাপঞ্চককে তাহলে গুরু দিলেন ভারতীয় ব্রাহ্মণের যে দায়িত্ব তাই। ভারতীয় জীবনে তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণের স্থান সম্বন্ধে কবির চিন্তার সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। দেখা যাচ্ছে এইকালেও সেই চিন্তা কবির ভিতরে প্রবল। এই চিন্তা পরে তাঁর ভিতরে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়।

পঞ্চককে অচলায়তনের নতুন গুরুর পদে বরণ করা হল—এটি খুব অর্থপূর্ণ। ভারতীয় জীবনে ব্রাহ্মণকে (মহাপঞ্চককে) বিশেষ মর্যাদার স্থান কবি দিলেন, কিন্তু নেতৃত্বের ভার তিনি দিলেন পঞ্চককে—মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত চেতনা, ভূমার সঙ্গে সহজ যোগ যার প্রধান পরিচয়স্থল।

শ্লেষ অচলায়তনে খুব শক্তিশালী হয়েছে। তাই থেকেই এই নাটকের সাহিত্যিক মর্যাদা। এই নাটক সম্বন্ধে কবির এই কথাটিও

স্মরণীয় : "আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্টনাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই।" বলা যেতে পারে, এই সময় থেকে জাতীয় জীবনের অবাঞ্ছিত বিকৃতিগুলির উপরে কবির আঘাত তীব্রতর হয়ে চলে।

ভাবা যেতে পারে এরূপ রচনার ঐতিহাসিক মূল্যই বেশি।

কিন্তু এতে এমন একটি বিকৃতির উপরে আঘাত হানা হয়েছে যে বিকৃতি বিচিত্র নামে বারবার মানুষের ইতিহাসে দেখা দেয়। সেই দিক দিয়ে এই নাটকের চিরন্তন মূল্যও কম নয়।

অচলায়তনে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের যে ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন পরে সে সম্বন্ধে কবির আরো চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব।

কবির ভগবৎ-প্রেম আর বাস্তবের বোধ কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাঁর অচলায়তন তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর পূর্বে গোরাতেও তাঁর উপলব্ধির সেই পরিচয় আমরা পেয়েছি।

## ডাকঘর

ডাকঘর লেখা হয় শান্তিনিকেতনে ১৩১৮ সালের পূজার ছুটির পরে এটি প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি (দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী)। চারুবাবু বলেছেন, এটি তিন দিনে লেখা হয়েছিল।

এটি যে সময়ে লেখা হয় সে সময়ে কবির মনের অবস্থায় বেশ একটা অসাধারণত্ব দেখা দিয়েছিল। তাঁর শরীরের অবস্থাও ভালো ছিল না। তিনি বলেছেন :

> ...শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল।...... আমর মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। ষ্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন

আমার আর দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় (ডাকঘর) লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।"

কিন্তু ডাকঘরে যে-ভাব ব্যক্ত হয়েছে পূর্বেও কবির রচনায় তার পরিচয় আমরা পাই। এই সম্পর্কে উৎসর্গের সুবিখ্যাত 'আমি চঞ্চল হে' শীর্ষক কবিতাটি (৮নং) আর 'না জানি কারে দেখিয়াছি দেখেছি কার মুখ', শীর্ষক কবিতাটি (১১নং) পঠনীয়।

এর পাত্রপাত্রীরা হচ্ছে—রুগ্ন বালক অমল, তাকে কবিরাজ বাইরের আলো বাতাসের সংস্রব থেকে আড়াল করে রাখতে ব্যস্ত, অমলের পালক-পিতা মাধব দত্ত, কবিরাজ, দইওআলা, ঠাকুরদা, প্রহরী, মোড়ল, বালকগণ আর শশী মালিনীর ছোটো মেয়ে সুধা।

ডাকঘর নাটিকাটির তিনটি দৃশ্য। প্রথম দুই দৃশ্যে অমলকে মুখ্যত সুদূরের পিয়াসীরূপে দেখা যাচ্ছে—কবির ছেলেবেলাকার ভাব অনেকটা রূপ পেয়েছে তাতে। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যের শেষের দিকে ডাকঘরের রূপকের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রূপক নাট্য হিসাবে রাজার সঙ্গে এর কিছুটা মিল সহজেই চোখে পড়ে। রাজার রানী সুদর্শনা অন্ধকার ঘরের রাজাকে চোখে দেখতে চায়, আর ডাকঘরে রুগ্ন অমল রাজার চিঠির আশায় দিন গুনছে। তবে 'রাজা' নাটকে ব্যক্ত হয়েছে মানবমনের একটি জটিল দিক—স্বাতন্ত্র্যে যার বিশেষ রুচি সেই মানবাত্মার ভগবানের একান্ত আনুগত্য স্বীকারের দিক—কিন্তু ডাকঘরে ব্যক্ত হয়েছে মানুষের হৃদয়-মনের অপেক্ষাকৃত অজটিল একটি কামনা—যে অপরূপ বিচিত্র শোভায় সৌন্দর্যে আভাসে নিজেকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিকটে দূরে মেলে ধরেছে তার সঙ্গে আর একটু অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপন—তার চিঠি পাওয়া, তার বার্তা অন্তরে উপলব্ধি করা। অমল অতটা ভাবে নি। সে দূরে রাজার ডাকঘরের নিশান দেখেই খুশী। প্রহরী তাকে তামাশা করে বল্লে একদিন ঐ ডাকঘর থেকে অমলের নামে রাজার চিঠি আসবে—ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকুটুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন। প্রহরীর সেই তামাশা করে বলা কথাটা অমলের মনে যেন

গেঁথে গেল। রাজার চিঠি সে পাবে এই হ'ল তার সব সময়ের ভাবনার বিষয়। যার সঙ্গে তার আলাপ হয় তাকেই সে এই চিঠির কথা বলে। মোড়ল তার এমন কথা শুনে খুব বিদ্রূপ করলে, কিন্তু ফকির বেশী ঠাকুরদাকে অমল যখন এই কথা বল্লে, তখন ঠাকুরদা বল্লে, রাজার চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে। অমলের চোখে ভাসতে লাগলো কত পাহাড় বেয়ে, কত বাঁকা নদীর পথ ধরে, কত উঁচু আলের উপর দিয়ে রাজার হরকরা সেই চিঠি নিয়ে আসছে। তুলনীয়ঃ

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

শেষ দৃশ্যে মোড়ল এক টুকরা সাদা কাগজ অমলের হাতে দিয়ে বল্লে এই চিঠি রাজা তার বন্ধু অমলকে পাঠিয়েছে। অমল ফকিরকে জিজ্ঞাসা করলে, এই কি সত্যি রাজার চিঠি। ঠাকুরদা বল্লে, হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি, এই সত্য তাঁর চিঠি। এর পরও মোড়ল চিঠি নিয়ে খুব হাসি তামাশা করলে, কিন্তু অমল বল্লে, মোড়ল মশায়, তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করিনি—দাও আমাকে তোমার পায়ের ধূলো দাও।—সে সরল বিশ্বাসী, বিশ্বাসেই তার আনন্দ তার সান্ত্বনা, কুটিলদের ধরনধারন সে বোঝে না।

এর পরের অংশটুকু পুরোপুরি রূপক। দ্বার ভেঙে রাজার দূত প্রবেশ করে সংবাদ দিয়ে গেল মহারাজ আজ রাত্রে আসবেন। (তাঁর আহ্বান এমনি করেই আসে।) অমল উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কতরাত্রে দূত, কত রাত্রে। দূত বল্লে, আজ দুই প্রহর রাত্রে। কিন্তু তার আগে রাজা তাঁর বালক-বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর সকলের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

রাজকবিরাজ এসে ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিলে। অমলকে বল্লে, অর্ধরাত্রে যখন রাজা আসবেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরোতে পারবে? অমল বল্লে, পারব, আমি পারব। বেরোতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধ হয় কতবার দেখেছি কিন্তু সে যে কোন্‌টা সে তো আমি চিনি নে। রাজকবিরাজ বল্লে, তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। রাজকবিরাজ মাধবকে বল্লে, এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্যে পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখ।

মোড়লকে নির্দেশ করে বল্লে, ওই লোকটিকে তো এই ঘরে রাখা চলবে না। অমল বলে উঠল, না, না, কবিরাজ মশায়, উনি আমার বন্ধু। তোমরা যখন আসনি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন। রাজ-কবিরাজ বল্লে, আচ্ছা বাবা উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ ঘরে রইলেন।

এ কথার একটি অর্থ এই যে, কবি তাঁর অকরুণ নিন্দুকদেরও প্রীতি নিবেদন করছেন, কেন না এক হিসাবে তারাও তাঁর নবজীবন লাভের বার্তাবহ।

রাজা আসবে শুনে মাধব দত্ত অমলের কানে কানে বল্লে, বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা ক'রো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব। অমল বল্লে, আমি তাঁর কাছে চাইব তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন—আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করবো। মাধব দত্ত কপালে করাঘাত করে বল্লে—হায় আমার কপাল।

ক্রমে অমলের চোখে ঘুম এলো। রাজ-কবিরাজ বল্লে, এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এলো, এলো. ওর ঘুম এলো। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসবো—ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটির থেকে আলো আসুক। ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বল্লে. ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতন হাত জোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন। আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এসব কি ভালো লক্ষণ। এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন। ঠাকুরদা বল্লে, চুপ কর অবিশ্বাসী, কথা কয়ো না।—অর্থাৎ তোমরা ভীত ও শোকার্ত হচ্ছ একে মৃত্যু মনে করে. কিন্তু এ মৃত্যু নয়, এ সরল ভক্তের নিবেদিত আত্মার পরমদয়িতের সঙ্গে মিলন।

অমল ঘুমিয়ে পড়লে সুধা এসে বল্লে, আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না। রাজকবিরাজ বল্লে, আচ্ছা দাও তোমার ফুল। সুধা জিজ্ঞাসা করলে ও কখন জাগবে। রাজকবিরাজ বল্লে, এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন। সুধা বল্লে, তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে? বলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি।

সুধা মর্ত্যের স্নেহ প্রীতি মাধুর্য, যে লোক মর্ত্য ছেড়ে পরমপ্রিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তাকেও মর্ত্য ভোলে না।

এই নাটিকা আশ্চর্যভাবে জটিলতা-বর্জিত, আর সেই সঙ্গে অপূর্ব-ব্যঞ্জনা-

ভরা। ফলে এর আবেদন সহজেই বিশ্বজনীন হতে পেরেছিল। বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়, বহু দেশে এটি অভিনীতও হয়েছিল।

কবি এটিকে বলেছেন গদ্য-লিরিক। কিন্তু গদ্য-লিরিক হয়েও এটি নাটকই—জীবাত্মার ও পরমাত্মার সহজ মিলনের মহানাটক ক্ষুদ্র পরিসরে এখানে অপূর্ব ভাবে অভিনীত হয়েছে। আর এই নাটক উপভোগ করার জন্য যে আস্তিক্য-বোধের প্রয়োজন, বলা যায়, সেটি মানুষের মধ্যে সহজাত।

## শান্তিনিকেতন (২)

অবশিষ্ট শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোর পরিচয় নিতে চেষ্টা করা যাক। একান্ত ভগবৎ-শরণ-কামনা, সেই শরণ লাভে জীবনের সার্থকতা, এসব এই ভাষণগুলোরও মূল কথা। তার সঙ্গে প্রচুর জ্ঞানবত্তাও এসবে আমরা পাব। আমরা কবির কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি :

> অনন্ত চিরদিনই সকল কালে সকল দেশে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ-কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি—সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ।—কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন,—চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, তাতে নূতন করেই আনন্দ লাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা-হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই—তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র। (পূর্ণ)

*    *    *    *

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল, কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদী

সাজিয়ে. কেবল মন্ত্র প'ড়ে আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে. এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো প্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না, এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল, জ্ঞান ও হৃদয়-বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশে তৃপ্তিসাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। (সামঞ্জস্য)

* * * *

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোখকান, আমাদের হাতপা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে—বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে

জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে বাতায়নে এই মহা-উদ্বোধনের আহ্বানে বাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে—বলছে, ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো। বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না—উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও—আত্মানং বিদ্ধি।' (জাগরণ)

কর্মের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্ম-নিবেদন, ঘরের কোণে বসে কে একে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষ মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব-মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না, ইতিহাসের সুদূর প্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তীর্ণ করতে।……

কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়, তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না। কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় সমস্তই মিথ্যা, এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তরবাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা।…এতবড়ো বৃহৎ সংসারকে এতবড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে। ( কর্ম-যোগ )

'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' ভাষণে কবি উপসংহারে বলেন :

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চির প্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি—কিন্তু তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না আনি, যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্ক তুষার-স্রুত এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতের দিকপ্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে সে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্চারিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা।

....সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।

( সুন্দর )

...অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেন না মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ—আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নিচে নামতে হয়েছে—তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়—প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না করে মানুষ বলে জ্ঞান করে, সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় বলেই যথার্থরূপে নিজেকে সম্মানিত করে। ( সত্য বোধ )

…অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, কেবলই রসে মজে থাকলে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমাদের মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেছে—আনন্দ হতেই তিনি যে কিছু সৃষ্টি করেছেন আবার আর একদিকে—স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যাদ্বারা যে কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব। ( ছোটো ও বড়ো )

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড় জিনিস দিয়ে গিয়েছেন ? কোনো সম্প্রদায় নয়—এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে দলের পুজো থেকে আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব —এইজন্যেই তো আশ্রম। যে কোনো দেশ থেকে যে কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ দেশান্তর দূর দূরান্তর থেকে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়। ( মুক্তির দীক্ষা )

…মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা একদিকে অন্যদিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন—এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে। ( সৃষ্টির ক্রিয়া )

## সঞ্চয়

'সঞ্চয়' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। কিন্তু এর দুটি প্রবন্ধ ভিন্ন সবগুলোই ১৩১৮ সালে লেখা।

এর প্রথম প্রবন্ধটি ১৩১৯ সালের জ্যৈষ্ঠে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আর শেষ প্রবন্ধটি সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যায়।

'সঞ্চয়' প্রবন্ধ সংগ্রহেও ধর্মজীবন কবির মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়েছে, তবে এই আলোচনা বিচারপ্রধান।

এর প্রথম লেখাটি রোগীর নববর্ষ। কবি ছিলেন কিছু অসুস্থ। লেখাটির সূচনায় বলছেন:

> আমার রোগশয্যার উপর নব বৎসর আসিল। নব বৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেকদিন দেখি নাই।

কবির শান্ত মনের সামনে নতুন বৎসর এসেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্য-মূর্তি ধরে:

> জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার তো আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেই খানেই কি চরম দেনা-পাওনা?—এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই কেবল আনন্দ আছে, কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয় —সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া হাসিমুখ করিয়া।

সৌন্দর্যতন্ময়তা কবি বার বার চেয়েছেন। সৌন্দর্য ছিল তাঁর কাছে সত্যের শ্রেষ্ঠ রূপ। কিন্তু কেমন করে যেন সেখানে তাঁর স্থিতি হয়নি। সৌন্দর্যতন্ময়তা আর কর্মচাঞ্চল্য এই দুয়েরই ভিতরে সারাজীবন তিনি আন্দোলিত হয়েছেন।

বলা যেতে পারে, একই সঙ্গে তিনি প্রাচীন ধ্যানী ভারতের প্রতিনিধি আর এযুগের কর্মচঞ্চল ভারতেরও প্রতিনিধি। অথবা, একই সঙ্গে তিনি সৌন্দর্য-উপাসক কবি আর শ্রেয়োবাদী তপস্বী।

'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধের উপসংহারে কবি বলেছেন :

...সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমাণ এবং তাহা বহু। এই সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনই তাহা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যে যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে. প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাঁধা পাখি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

এই প্রবন্ধে তিনি মূর্তিপূজার প্রতি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেন :

...জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পুজা করি তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পুজা হইতে পারে না।

পরমহংস দেবের একটি উক্তির উল্লেখ ও সমালোচনা এই প্রবন্ধে আছে।

মূর্তি-পূজা সম্বন্ধে কবির পুর্ণাঙ্গ বক্তব্য বোধ হয় পাওয়া যায় তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের সাকার ও নিরাকার' প্রবন্ধে।

'ধর্মের নবযুগ' প্রবন্ধটি কবি পাঠ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের ১৩১৮ সালের মাঘোৎসবে। সেই বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকপদ তিনি গ্রহণ করেন আর আদি ব্রহ্মসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তাঁর সেই নতুন সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে এই প্রবন্ধের শেষের দিকে। এই সংস্কার সম্পর্কে তিনি আমেরিকা থেকে তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন :

...আমি আমাদের সমাজের ( আদি ব্রাহ্মসমাজের ) গোঁড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তাঁরা হিন্দুসমাজের দোষকে গ্রহণ করে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছিলেন। তেমনি আবার অন্য সমাজের ( নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ) যাঁরা গোঁড়া তাঁরা সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য বশতঃ হিন্দুসমাজকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে স্বজাতীয় সমাজের সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে আঘাত করবেন—এও কোনো মতে চলবে না—এই জন্যেই আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমরা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিতে চাই। এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এর যোগ রেখে এর মধ্যে একটি নূতন অথচ উদার প্রাণ সঞ্চয় করতে চেয়েছিলুম—এই জন্যেই আমি একান্তভাবে কামনা করি শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে তোমার যোগ কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। তাঁদের দ্বারাই আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে চাইনে। আমরা তাঁদের চেয়েও বড় হতে চাই।

এই প্রবন্ধে তিনি এইসব স্মরণীয় উক্তি করেন :

...আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে, দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।...

.........আধুনিক পৃথিবীতে পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা

হয় নাই, মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনে সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।······বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তি পূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তি-পূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে,—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল, যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না।

কিন্তু কবির মতে ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানের বিষয় নন—তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ স্থাপন করতে হবে।

...ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ এবং—এষোস্য পরম আনন্দ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না, ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

এই রসস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গ যোগ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

···দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিচ্ছেদ ও সমাজের

বিরোধকে ভয় করেন নাই, দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য করিয়া দেখিতেছি। কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

এ সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন:

> ...পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য, সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিলন। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের আচার বিচার অনুষ্ঠান কল্পনা কাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই: কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুলসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

কবির বিশ্বাস রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় একালের মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসা একটা বড় সার্থকতা লাভ করেছে।

রামমোহনের উদার সাধনা যে একালের মানুষের চিত্তের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ সহায় হয়েছে সে বিষয়ে অনেকেই কবির সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা খুব অর্থপূর্ণ হলেও তুল্যরূপে উদার কি না সে সম্বন্ধে অনেকে কবির সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

তাছাড়া রসস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের কথা কবি যতটা ভাবাবেগ নিয়ে বলেছেন ততটা ভাবাবেগ সঙ্গত কি না সে বিষয়েও একালের ভাবুকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

এই ভাষণের শেষে যে প্রার্থনাটি রয়েছে তার একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। কবির বীর্যবন্ত উদার চিন্তা আর ব্রাহ্মসাধনাকে নব রূপ দেবার প্রবল সংকল্প দুইই এতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে:

> ...হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্ব মানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে

হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চির সংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয় সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার আহ্বান ভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্ছিত; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই; আজ ঝড় আসিয়া পড়িল, আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধন-পাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক।

আজ বেদনার দিন আসিল, কেন না আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না, আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেন না আজ চলিবার দিন...।

কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষা যত হয়েছিল সেই অনুপাতে উদ্যম কি দেখা দিয়েছিল? প্রচারের ক্ষেত্রে কবি কিছু দূর অগ্রসর হতে পারতেন, কিন্তু বেশি দূর নয়। তাঁর সৌন্দর্যবোধ বা মাত্রাবোধ—তাঁকে বাধা দিত মনে হয়। 'ধর্মের অর্থ' প্রবন্ধটির কিছু কিছ অংশ এই:

...মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনার মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ, তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এই জন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব।...

...চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে

পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে, আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব—সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

…আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে—যখন ধূলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না; স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে—তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয়, এবং অন্যান্য লেখাতেও কবির এই চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে কবি আলোচনা করেছেন ব্রাহ্মসমাজে সেই শিক্ষার কিরূপ আয়োজন হতে পারে প্রধানত সেই দিকটা।

ব্রাহ্মসমাজের ভাবাত্মক লক্ষণটি কি সে প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেছেন:

সেটি হচ্ছে অনন্তের ক্ষুধাবোধ অনন্তের রসবোধ—এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে; তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মকে কবি বলেছেন, "মানব-ইতিহাসের সামগ্রী—মানুষ আপনার গভীরতম অভাব বোধের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।" এ সম্বন্ধে তিনি আরো বলেছেন :

> মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্ম-শক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাঁহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল।···ব্রাহ্মসমাজে আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, কোনো বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজা পদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে অনন্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্ম, বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্ম, বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব পরিষ্কার ধারণা দিয়ে কবি চেষ্টা করেছেন সেই ধর্মের শিক্ষা কেমন করে দেওয়া যাবে তার আলোচনা করতে। তাঁর সিদ্ধান্ত এই :

> ...ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালক-বালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণ সঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।
>
> নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়,

যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

কিন্তু এমন সুযোগ সকল ঘরে নেই। সেজন্য কবি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন আশ্রম-প্রতিষ্ঠার—

...ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা মুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপিত করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পুজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে, এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেন না পূর্বেই বলিয়াছি ধর্ম সাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

...যে ধর্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই না বিলীন হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে; কোনো সংকীর্ণ দেশ কালপাত্রের দ্বারা কর্তব্য বুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন

মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীর ভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতা দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদাই প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্ক সভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দ সংগীত এক সুরে বাজিয়া উঠিতেছে ; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে,—তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণ ভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবন চেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো বড়ো বালক বৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

যথেষ্ট সংখ্যক আশ্রম যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তা সহজেই বোঝা যায়। তবে প্রকৃতির আনুকূল্য ও অপেক্ষাকৃত অজটিল ও লক্ষ্য সম্বলিত জীবনযাপন কবি যে শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছেন তাঁর সেই চিন্তা নিঃসন্দেহে মহামূল্য।

শিক্ষা সম্বন্ধে কবির অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। এ সম্বন্ধে তাঁর আরো কিছু বক্তব্য পরে পাব।

'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধটিও ১৩১৮ সালের মাঘোৎসবে পঠিত হয়েছিল—'ধর্মের নবযুগ' পঠিত হয়েছিল ১১ই মাঘ তারিখে, আর 'ধর্মের অধিকার' ১২ই মাঘ তারিখে। ধর্মের নামে যে বিচারহীনতা দেশে বহুকাল ধরে প্রশ্রয় পেয়ে আসছে এতে সে সবের উপরে কবি তীব্র আঘাত হেনেছেন। তাঁর কিছু কিছু উক্তি এই :

যে সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন,

বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন কি তাহাই কর্তব্য।

...আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনো মতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

...ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের শিরোধার্য হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নিচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না, একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে

চান না; ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য—কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে। কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোট ছোট ভেলা তৈরী করা হয়—তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুশি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে?

…ভারতবর্ষে আর্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।…অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে

না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়।

...বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না—সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে।... যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনো উচ্চাসন পাইবে না।

কবির শেষ উক্তিটি জীবন-বর্ধক চিন্তা হিসাবে মহামূল্য। ধর্ম ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগযুক্ত; কিন্তু প্রাণবন্ত যে ধর্ম তা ঐতিহ্যকে বার বার শোধিত করে জীবন-বর্ধক ভাবনার দ্বারা। তেমন শোধনের অভাব ঘটা মারাত্মক।

সঞ্চয়ের শেষ প্রবন্ধটি হচ্ছে 'আমার জগৎ'। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে যে বিশ্লিষ্ট জগতের পরিচয় দেন সে জগৎ নয়, মানুষের সহজ চোখে যে অপূর্ব জগৎ প্রতিভাত হয় তারই কথা কবি এতে বলেছেন। এর উপসংহারটি এই:

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নাই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয় সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয়

প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়—সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না,… ….কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্যমাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্ব-সঙ্গীত নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর—কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান—এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয়, এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামবে না, মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন।

…এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি, সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

## পরিচয়

'পরিচয়'ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। এর প্রথম চারিটি লেখা ভিন্ন অবশিষ্ট লেখাগুলো ১৩২১ ও ১৩২২ সালে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম দুইটি প্রবন্ধ ১৩১৯ সালের বৈশাখে যথাক্রমে 'প্রবাসী' ও 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, আর তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়

১৩১৮ সালের 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এই চারিটি প্রবন্ধের কিছু আলোচনা এই স্তরে আমরা করবো।

পরিচয়ের প্রথম প্রবন্ধটি হচ্ছে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ। এর বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জটিল। কাজেই এসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতীয় জীবনে মিলনের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ যতটা দেখেছেন অনেকে সে তুলনায় বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত দেখেছেন বেশি।* প্রাচীন ভারতীয় জীবনের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে কবিও কম সচেতন নন। শেষের দিকে এ-দেশে আত্মপ্রসারের পথ রুদ্ধ হয়ে আত্ম-রক্ষণী-শক্তির সংকোচের দিকেই যে স্পষ্ট প্রবণতা জেগেছিল সেকথা তিনি বলেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর প্রধান বক্তব্য এই :

> …এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্ম-প্রসারণের উদ্বোধন চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য-যুগে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবির প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবিরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয় হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

আত্মপ্রসারণ ও আত্মসংকোচনের ক্রিয়া আধুনিক ভারতবর্ষে কিভাবে চলেছে সে সম্বন্ধে কবি উপসংহারে বলেছেন :

> …অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, ঐক্যকে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের

*শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ গ্রন্থে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে জাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়, —এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে সৃষ্টিধর্মী নতুন চেতনা—নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' লেখাটি সেই দিক দিয়েই খুব অর্থপূর্ণ।

পরিচয়ের দ্বিতীয় লেখাটি হচ্ছে, "আত্ম-পরিচয়"। এটিও খুব প্রসিদ্ধ।

আমরা কবির কতকগুলো লেখায় দেখেছি ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে কবি বেশ ভাবছেন। ব্রাহ্মসমাজের যে মূল আদর্শ তার প্রতি তিনি পুরোপুরি শ্রদ্ধাবান, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে রূপ গ্রহণ করেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তিনি দেখছেন সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্য আর আমেরিকার য়ুনিটেরিয়েন খৃষ্টানদের অনুকরণ আর আদি ব্রাহ্মসমাজে তিনি দেখছেন অনড় ভাব—এর সভ্যরা হিন্দুসমাজের দোষকে গ্রহণ করে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছেন। কবি তাই চেষ্টা করেন শান্তি-নিকেতন আশ্রমেই যথার্থ উন্নত ব্রাহ্মজীবনের ভিত্তি পত্তন করতে। আমরা দেখেছি এজন্য তিনি হিন্দুসমাজের সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করেছিলেন। মনে হয় তাঁর ধারণা হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের ও ধর্মের যে

মর্মকথা—'অনন্তের ক্ষুধাবোধ ও অনন্তের রসবোধ'—তা যদি তিনি অন্ততঃ শিক্ষিত হিন্দুদের গ্রহণীয় করতে পারেন তবে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আবির্ভাব সার্থকতার পথে দাঁড়াবে। প্রথম প্রথম ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ ছিল হিন্দুসমাজকে কতকটা রূঢ়ভাবে নাড়া দেওয়া—তার বহু শতাব্দীর মোহাচ্ছন্নতা থেকে তাকে জাগিয়ে তোলা। কবির ধারণা সে-কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে—হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগেছে। এখন ব্রাহ্মসমাজের কাজ ব্রাহ্মধর্মের যে মর্ম, তার অন্তর্নিহিত প্রাগ্রসরতা, তাতে হিন্দুসমাজকে উদ্বোধিত করে তোলা। কবির মতে এই পথেই ব্রাহ্ম আন্দোলন সত্যকার সার্থকতা লাভ করতে পারে।

'আত্ম-পরিচয়' প্রবন্ধে কবির মোট বক্তব্য এই : ব্রাহ্মরা যে নিজেদের ব্রাহ্ম বলে সেটি তাদের নতুন পরিচয়, তাদের পাকা পরিচয় এই যে তারা হিন্দু। এই পাকা পরিচয় যদি ব্রাহ্মরা যথাযোগ্যভাবে স্বীকার না করে তবে তারা অসার্থক হবে—ভারতবর্ষে তাদের উদ্ভব একটি অর্থহীন ব্যাপার হবে।

বলা বাহুল্য কবির উক্তি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি এইসব যুক্তির অবতারণা করেছেন :

> ব্রাহ্মরা বলতে চায় :.... আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়, এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এর উত্তরে কবির বক্তব্য এই :

> অন্ধকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে···কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না।···হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে—সংখ্যা হিসাবে তাহারাই প্রবল। হিন্দু সমাজের মধ্যে যদি নানা-প্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায়

আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এত বড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

কিন্তু এর উত্তরে ব্রাহ্মরা বলতে পারে হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকল প্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করে রাখে এবং যদি কোনো নতুন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে সেই সমাজকে ব্রাহ্মদের আপনার সমাজ বলে স্বীকার করবার দরকার কি।

এর উত্তরে কবি যে যুক্তির অবতারণা করেছেন এই প্রবন্ধে সেইটি তাঁর প্রধান বক্তব্য। সেটি এই:

...তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে—পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই করিব—পুত্ররূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

এ সম্পর্কে কবির আরো কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি এই:

সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধি লাভ করে......একদিন বঙ্গ সাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল......ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু-সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে।

যাঁরা বলেন—ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলা উচিত নয়, তা বিশ্বের সামগ্রী, তাঁদের কথার উত্তরে কবির বক্তব্য এই:

...বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা তো দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন। তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই

অর কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপ গাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বথ গাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনো প্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়—কিন্তু এই সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেবসিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

যাঁরা বলেন, ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নয়, তাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাতে হবে, তখন হিন্দুসমাজের সঙ্গে তার মিল কেমন করে করা যাবে—তাঁদের কথার উত্তরে কবি বলেন :

হিন্দুসমাজ মৃত নয়, তার মত ও আচরণ আজ যতই নির্দিষ্ট মনে হোক তাই তার চরম সম্পূর্ণতা নয়। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া? সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনই তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না...অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি, দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার

করিলেই, যথার্থ নিজের উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাকে যদি স্বতন্ত্র নিচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নিচেই মিলাইয়া লইবে, কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানাদিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে—সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীনতা হইবে না—সে দিনে দিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

কবি সমাজ ও সম্প্রদায় এই দুইয়ের মধ্যে একটি বড়ো রকমের পার্থক্য দেখেছেন। কবির ভাষায়: "আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?" এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এদেশের যাঁরা হিন্দুসমাজ থেকে খৃষ্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুখৃষ্টান, তেমনি এদেশের মুসলমানরা হিন্দুমুসলমান:

> ...বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্রে বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানব-ধর্মের বিরুদ্ধ।

এই সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন:

> ...চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে

তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফ্যুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যের মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে—আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্ম সমস্যার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকে সেদিন কবির দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নি। সংক্ষেপে সেই দিকটি এই: যেদিন ব্রাহ্মকে কবি তার হিন্দুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে বললেন, সেদিন জাতীয়তা-বোধের ব্যাপক প্রসারের ফলে হিন্দু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়েছে। আর ব্রাহ্ম সেই তুলনায় কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই সেইদিনে ব্রাহ্মের নিজেকে হিন্দু বলার ব্যবহারিক অর্থ—সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব উন্নত ও সৃষ্টিধর্মী চিন্তা ও চেষ্টা ছিল ব্রাহ্মের বিশিষ্টতা নির্দেশক সে সবের অনেকটা পরাভব স্বীকার আর মুখ্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুর, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের প্রতি বিমুখ হিন্দুর অনেকখানি প্রাধান্য লাভ। বলা বাহুল্য এর ফল হিন্দুর জন্যও শুভকর হতে পারে না।

সমস্যাটা বাস্তবিকই জটিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্রাহ্মের বিশিষ্ট সাধনাকে ক্ষুণ্ণ করতে চান নি আদৌ বরং অম্লান রাখতেই বলেছেন। তবে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখা বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য।

তা কষ্ট সাধ্য হলেও সেই সাধনাতেই ব্রাহ্মকে ব্রত হতে হবে—অর্থাৎ একই সঙ্গে তাতে চাই হিন্দুর, অন্য কথায় দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যধারার সঙ্গে তার নিবিড় যোগের উপলব্ধি, আর তার নতুন সাধনার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতনতা, কেন না, যে প্রাগ্রসরতা বিশেষভাবে প্রেমধর্মী নয় তার শুভকর না হয়ে অশুভকর হবার সম্ভাবনা বেশি বলা যেতে পারে এই ছিল কবির বক্তব্য। এ দেশের মুসলমান ও খৃষ্টানদের সম্পর্কেও এই কবির ইঙ্গিত, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ইঙ্গিত।

কবির এই ধরনের চিন্তার ও উক্তির কদর্থ সহজেই করা যেতে পারে, বলা যেতে পারে, তিনি প্রকারান্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে নতি স্বীকার করতে বলেছেন।

কিন্তু এই গুরু সমস্যার দিকে এমনভাবে তাকালে সমস্যাটি নিয়ে শুধু ভালগোল পাকানো হবে। একালে গণতন্ত্রের নায়কদের অথবা রাষ্ট্রের পরিচালকদের যে এক বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে প্রধানতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বা ক্ষমতার বলে বহু কিছু সংসাধিত করে চলা, অন্ততঃ সেই চেষ্টা করা, তা সত্য কিন্তু এমন সংকট কালেও দায়িত্ববোধসম্পন্ন লোকদের-তারা চিরদিনই সংখ্যালঘু-একই সঙ্গে সত্যের সাধনা আর প্রেমের সাধনা অম্লান রাখা ভিন্ন সত্যকার করণীয় অন্য কিছু নেই। তাদের সাধনা অকৃত্রিম হলে সবারই জন্য তা কল্যাণপ্রসূ হবে—এ আশা করা যায়।

পরিচয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। তখন দেশে একই সঙ্গে স্বতন্ত্র মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় আর স্বতন্ত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যম দেখা দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই সব চেষ্টা ছিল জাতীয়তার পরিপন্থী। কিন্তু কবি এই সব প্রচেষ্টাকে জাতীয় জীবনের এই স্তরে অসার্থক বিবেচনা করেন নি।

কবির এই লেখাটি খুব গুরুত্বপুর্ণ। এক হিসাবে দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এইটি তাঁর সব চাইতে গুরুত্বপুর্ণ রচনা। কবির উক্তির কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> ...পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো না কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলনরক্ষার সদুপায়।
>
> ···বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দুদিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য। এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে, পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে কবি বলেন :

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর, মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

...আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য প্রবল হয়ে উঠে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, এই সমস্যা সম্পর্কে কবি বলেন :

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

......আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই

সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে—যাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই,—তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিতে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে।

যাঁরা সন্দিগ্ধ হয়ে বলেন :

...হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিয়াছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনও আমাদের যতটা আছে তখনও তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না, তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

তাঁদের কথার উত্তরে কবি বলেন :

......দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রত চিত্ত যে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের

জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে, বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

কবি হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সমর্থন করেছিলেন এই আশায় যে এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানের 'বিশেষত্ব' নষ্ট না হয়ে 'মহত্ত্ব' লাভের পথে চালিত হবে। কবির সেই আশা আজও তেমন ফলবতী হয় নি। কালধর্মে হিন্দু ও মুসলমানের অনেক পরিবর্তন অবশ্য ঘটেছে, যদিও সেসব পরিবর্তন খুব বাঞ্ছিত ধরনের নয়। তবে মানুষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হতে পারে। আশা করা যায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের সে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে সেসব ভবিষ্যতে তাদেরও সমগ্র দেশের যথেষ্ট উপকারে আসবে।

পরিচয়ের চতুর্থ প্রবন্ধ 'ভগিনী নিবেদিতা'। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পরে কবি এটি লেখেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আমাদের দেশের সর্বসাধারণের প্রতি অসাধারণ প্রেম কবির গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

> ···নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস তাঁহার আত্মীয়স্বজনের স্নেহমমতা তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ চিৎরূপ যে কী তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্ব-প্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা।
>
> ····ভগিনী নিবেদিতা যে সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সবগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো

আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্ত তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না এবং তেমন বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।......

...তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন, our People তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

......লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না। অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল্"-দের প্রতি অবিচার করে।...শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল

বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নির্বাপিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই, এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না, মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?

## জীবনস্মৃতি

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে। এটি প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালের ভাদ্রের সংখ্যা থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণের সংখ্যা পর্যন্ত। এর প্রথম সংস্করণে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বহু ছবি ছিল।

এর ভূমিকাস্বরূপ কবি লেখেন :

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহাকিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।.........

অনেক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের

ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে,—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—সুতরাং, পটের উপর যে-ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখবার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে,—তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে-সকল শহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্নে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সে ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

বাস্তবিক কবির জীবনস্মৃতি একটি বিরাট চিত্রশালা। তাঁর বাল্য কৈশোর ও নবযৌবন যেসব পরিবেশে অতিবাহিত হয়েছিল, যেমন জোড়াসাঁকো বাড়িতে, গঙ্গাতীরে, হিমালয় পাহাড়ে, আমেদাবাদে, বিলাতে, সেসবের পরম উপভোগ্য—অনেক ক্ষেত্রে অবিকৃত—চিত্র পাঠকরা এই গ্রন্থে পায়। বিশেষ করে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আবাল্য যোগের চিত্র এতে পরম মনোহর হয়েছে।

কবি তাঁর তরুণ মনের রূপরেখাও এতে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু সে-দিকটা পর্যাপ্ত নয়। নিজের কথা সবিস্তারে বলতে কবির আগ্রহ কম—এমন কি কুণ্ঠা যথেষ্ট। তার বড় কারণ—কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ আত্মকথা।

তাঁর সেই ইঙ্গিত-ভঙ্গি ভরা কথা যাঁরা বোঝেন না তাঁদের বোঝাবার দুঃসাহস তাঁর নেই।

এই গ্রন্থে 'কড়ি ও কোমল' রচনার কাল পর্যন্ত অথবা তার সূচনা পর্যন্ত, কবির স্মৃতিকথা বিবৃত হয়েছে। এর উপসংহার করেছেন তিনি এই বলে:

> ...তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনো মতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, আমার প্রাণ বলিত— ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।'.........
>
> ......মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়-লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপরে চাপিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।
>
> ......আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমল কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রং নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

......একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনের এখন ঘরের ও বাহিরের মেলা-মেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালো-মন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয় পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।...

## পথের সঞ্চয়

'পথের সঞ্চয়' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে। এর প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছিল ১৯১২ সালে কবির ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বে ও পরে। বহু উৎকৃষ্ট চিন্তা এসবের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাওয়া যাবে। এর প্রথম লেখাটি আর শেষের দিকের লক্ষ্য ও শিক্ষা প্রবন্ধটি খুব বিশিষ্ট। প্রবন্ধগুলোর কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিচ্ছি।

এর প্রথম প্রবন্ধ 'যাত্রার পূর্বপত্র' (এটি শান্তিনিকেতনে দত্ত ভাষণ) কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কতকটা ঐতিহাসিক কারণে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আদিব্রাহ্ম সমাজের কিছু বিরূপ মনোভাব ছিল। সেই বিরূপতা এতদিন কবির ভিতরেও লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু এই যাত্রার পূর্বপত্র প্রবন্ধে কবিকে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টান ধর্মের শিক্ষার প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান্। খৃষ্টান তাপস এণ্ড্রুজের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেই এটি তিনি লেখেন।

বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এই কালে কবির মনে একটা আকুলতা জেগেছিল—তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এই প্রবন্ধের সূচনাতে কবি বলেছেন তিনি য়ুরোপে যাচ্ছেন তীর্থযাত্রীরূপে। য়ুরোপীয় সভ্যতা

বস্তুগত, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নেই, আমাদের দেশের এই সংস্কার সম্পর্কে কবি বলেছেন :

···মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এ-বিষয়ে কবি বিশেষভাবে অবহিত হন এই সময়ের বড়ো ঘটনা টাইটানিক জাহাজ ডুবির ফলে। কবি বলেছেন :

দুই হাজার যাত্রী লইয়া আটল্যান্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল ; সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবন রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্যমূর্তি দেখিতে পাইয়াছি।

এরই সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন আমাদের দেশে আত্মত্যাগের কার্পণ্যের। তাঁর উদ্ধৃত দুটি দৃষ্টান্ত এই :

···স্টিমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদূরে পাশ দিয়া আর একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল...জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ধারের জন্য তাহারা মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল ; বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনো মতেই দুঃসাধ্য বলা চলে না।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে ; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে

তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয় এজন্য দিতে চাহিল না।

টাইটানিক ডুবি সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন :

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায় আমরা এক মুহূর্তে অনেকগুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো একজন মাত্র মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ পাইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্য সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচাইবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্ম-সংবরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিদ্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সম্মুখে অপঘাতমৃত্যুর কালো মূর্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়, সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া সে শক্তিকে দেখিয়াছি য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না। সেই অজস্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল দ্বীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই।

এই প্রবন্ধে কবির আরো কিছু কিছু স্মরণীয় উক্তি এই :

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আন্তর রূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃ

কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্যনিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

...খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশের পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখ-পীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা।

...তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে 'সর্বভূতই এক', সে একটা বাক্যমাত্র: তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম নামক আত্মার যে চরম শক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম রহিলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না, এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন।

তাহ দুঃসহ যজ্ঞতাপন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে, ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না, ইহা তপস্তার সৃষ্টি, এবং সেই তপস্তার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

য়ুরোপে দুর্বল জাতির প্রতি ন্যায়ধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুব্ধতার মধ্য হইতেই ধিক্কার ও ভর্ৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবলের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেখানে অনেক আছেন। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন—কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে।......তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে, তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার ন্যায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, পৃথিবীর সমস্ত দুর্বলকে ক্ষয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্য তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই, এইজন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি।......আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে, শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অক্ষমের দারিদ্র্য কদর্য।

আমাদের এই যে দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার গৌরবে

প্রসারিত করিতে পারি নাই, তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তিসাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই, যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব—কিন্তু জাতীয় সদ্‌গতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মানুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিবে ততক্ষণ, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের যে স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

...তাহাদের ধর্মকে আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূলপদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি, পাছে অন্যের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি, পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অনুকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎ-সংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই।......

এই সমস্ত বিঘ্নবিপদ আছে, সেইজন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে, বাধায় দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বোম্বাই শহর'। প্রথম ছবিটা দেখেই কবির মনে হয়েছে 'বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে—কলিকাতার সেটি যেন নেই ; সে যেন যেমন তেমন করে জোড়াতাড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে।' বোম্বায়ের [illegible] ও শিশুদের চিত্র, বিশেষতঃ নারীদের সংকোচহীনতা

ও তাদের মুখের 'প্রশান্ত প্রসন্নতা' কবিকে আনন্দ দিয়েছে। বোম্বায়ে দেশী লোকের ধনশালিতা আর তার সঙ্গে তাদের সরল ও উদার জীবনযাত্রা কবির বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

তৃতীয় প্রবন্ধ 'জলস্থল'। কবির বক্তব্যের কয়েকটি ছত্র এই :

...যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীর্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌঁছিবে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিদ্র্য ঘুচাইতে পারে না, বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

চতুর্থ প্রবন্ধ 'সমুদ্র-পাড়ি'। উপসংহারে কবি বলেছেন :

...মানুষের উদ্যম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। সেইজন্য আজ য়ুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়—রাজ্যে, বাণিজ্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে,—এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে—ক্ষণকালের জন্য যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে এই দেহতত্ত্ব

সাধন করিতে হইবে, যেমন করিয়া হউক, আমাদিগকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে—কেন না, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক—কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবর সৃষ্টির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই, এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া যে মায়ার মতো খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

বলা বাহুল্য কবির কথাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'কলেবর আত্মারই একটা দিক' এটি ভারতীয় চিন্তায় কবির বিশিষ্ট নতুন দান।

পঞ্চম প্রবন্ধ 'যাত্রা'। নতুন নতুন পথে যাত্রা করবার অপরিসীম আনন্দের কথা কবি এতে বলেছেন। কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

....যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল ঝম্‌ঝম্‌ করে।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে তবু আলস্য ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'আনন্দরূপ'। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ, এই উপলব্ধি কবির বহুবার বহুভাবে হয়েছে।

লোহিত-সমুদ্রে একদিন প্রভাতে কবির চিত্ত কেমন করে এই উপলব্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হয়েছিল তারই কথা এই লেখাটিতে বলেছেন। গীতিমাল্যের 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' শীর্ষক কবিতাটি কবি এই সময়ে লেখেন।

সপ্তম প্রবন্ধ 'দুই-ইচ্ছা'।

মানুষের দুই ইচ্ছার একটিকে কবি বলেছেন স্বাভাবিক আর অপরটিকে বলেছেন অস্বাভাবিক—

> স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে—আরও, আরও, আরও।

এই দুরন্ত ইচ্ছাটাতে মানুষ দেখেছে শয়তানের কারসাজি। কিন্তু এই ইচ্ছা যত বিপজ্জনকই হোক একে ধ্বংস করা যায় না—ধ্বংস করায় কল্যাণও নেই। কবির ভাষায়—

> ...উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেন না এই আরো'র ইচ্ছাই মানুষের যথার্থ বাহন।

উপসংহারে কবি বলেছেন :

> ......সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ, অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলস্পর্শ অমৃত পারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।

অষ্টম প্রবন্ধ 'অন্তর বাহির'। উপসংহারে কবি বলেছেন :

…ব্যবসায়ী আর্টিস্ট্ বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিস্ট্ সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে: তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষমাত্র।

নবম প্রবন্ধ 'খেলা ও কাজ'।

জাহাজের য়ুরোপীয় যাত্রীদের চঞ্চল চলাফেরা ও খেলার উদ্যম কবিকে আনন্দ দিয়েছে—দেশ সম্বন্ধে ভাবিয়েছেও। কবির মন্তব্যের কিছু অংশ এই:

…যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র, শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।……

…স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে, ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছ হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেইখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের বেলায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর রাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে; যাহার ভালো করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি। অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এর পরে কবি ফরাসী দেশ হয়ে ইংলণ্ডে পৌছেন। 'পথের সঞ্চয়ের' এর

পরের সবগুলো লেখা—শেষটি ছাড়া—প্রধানত ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ সম্বন্ধে। সেসব থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> ইহাদের ('নেশন' পত্রের সম্পাদক ও লেখকদের) মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জানেন ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল কাব্য রচনা করিতেছেন না। ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না। এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্য আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্য অংশ অতি সামান্য দেখা যায়—মনের খাদ্য পুরোপুরি জন্মিতেছে না।
>
> (লণ্ডনে)

> আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল—আমি একজন বন্ধুর (উইলিয়ম রোটেন্‌স্টাইনের) দেখা পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল। বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অন্যান্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার। কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে শুভ-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তরদৃষ্টিতে জড়িত এই যে সহজ সঙ্গ, ইহার মতো দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন,

তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতি-দিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন। (বন্ধু)

ইংলণ্ডের বর্তমানকালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইঁহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইঁহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইঁহারা সাহিত্য জগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজন বোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে।

......ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের সঙ্গে সুইন্‌বর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ হইবে। যাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিত্বের কবি, সুইন্‌বর্ন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইঁহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন সুতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্‌টকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন। সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে।

বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য তাহা এমন সরল। সরল বলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই। কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফলফুলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না; অথবা নিজেকে মনোরম বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনো জবরদস্তি করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয়; তাহাকে গ্রহণ করা তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।......শক্তি উপলব্ধির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিখাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি ঝোঁক দেয়। তাহা সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুটাকে সমান মূল্য দিয়া সাঁচ্চাকে অপমানিত করে। সে এ কথা ভুলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে সুনির্দিষ্ট

করিয়া জানার দ্বারাতেই কী আমার আছে সেইটে সুস্পষ্ট করিয়া জানা যায়। সেই সুস্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিলাভের একমাত্র পথ্য। অহংকার আত্ম উপলব্ধির সীমাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াই আমাদিগকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। সুতরাং অহংকারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সত্যের দুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি। আমাদের দেশের মতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য একটা উদ্যম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উদ্যমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়। তাহা অনেকসময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অদ্ভুতরূপে হাস্যকর হইয়া উঠে। আয়র্লণ্ডেও যে সেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ্ মূরের Hail and Farewell—নামক বই পড়িলেই কতকটা বুঝা যায়। (কবি য়েট্স্।)

স্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুকের হাতে আমার এই তর্জমাগুলির (গীতাঞ্জলির) একটি কপি পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একদিন আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্ত প্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে। চলা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ধক্য কোনো কোনো মানুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে, আবার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করে। ইঁহার শরীর মনে বার্ধক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইঁহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখনি তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেন না, সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না; তাহা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করিতে পারে।...এখানকার যে সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহারা অন্যায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে। কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদূর-বিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই সকল অধীন দেশের

সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ে বোধ ম্লান না হইয়া থাকিতে পারে না। ...এমন অবস্থায় যখন এখানকার মনীষীসম্প্রদায়ের মধ্যে একদলকে দেখিতে পাই যাহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় ন্যায়পরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন, তখন বুঝিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশদ্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর এক দিকে স্বাস্থ্যতত্ত্বও উদ্যমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আলো আছে। এই শুভবুদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে অনুভব করা যায়।

...ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ, এইজন্য তাহা শিকারীর শিকার ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মতো নহে—তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আর একটা জিনিস দেখিয়া বার বার বিস্মিত হইলাম,...সে ইহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে, তাই ইহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে, চিন্তার ঢেউ, কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিন্তাকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না। (ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ)

...উট্রম সাহেব (পাদ্রি) আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রত্যেকেই নিজের কুটিরের চারিদিকে বহু যত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা

আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর একটি সুফল এই যে, এই উৎসাহ মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রম সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এই প্রকার মঙ্গলব্রতে নিয়ত উৎসর্গ করা জীবন যে কী সুন্দর তাহা ইহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ব মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িতেছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে, ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। ( ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি )

য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে তাহা যতই বলবান হইয়া উঠিতেছে ততই অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তরের লোহার সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া বড়ো করিয়া, ব্যবহার করিতে শিখিব।

( সংগীত )

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্যে দিয়া উদ্‌ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে; তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই—এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া থাকিবে, এমন অদ্ভুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেইসময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় মস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া পড়িয়াছিল।...

ঘুম ততক্ষণই ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে—বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই বড়ো বড়ো দোকান বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু সকালে যখন চারি দিকে হাঁক ডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর কেহ যখন চূর্ণ করিয়া নাই তখন সনাতন দরজা আটে ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে। (সমাজ ভেদ)

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; সুতরাং সেখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎ সৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতেই সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসার যাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনি নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংযত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনি জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

(সীমার সার্থকতা)

...মানুষের সকল শিক্ষার মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী স্ত্রী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে মানুষ পবিত্রচিত্ত অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দ স্বরূপ। (সীমা ও অসীমতা)

আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ প্রেম ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি, তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই;

তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। (শিক্ষাবিধি)

'পথের সঞ্চয়ে'র শেষের দিকের 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধটির উল্লেখ আমরা করেছি। এর পূর্বে কবি শিক্ষা সম্বন্ধে জোর দেন প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে। এই প্রবন্ধটিতে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন মানব জীবনে লক্ষ্যের পরম অর্থপূর্ণতার উপরে। কবির কিছু কিছু বাণী আমরা উদ্ধৃত করছি:

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা সেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়।........কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পুর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে, কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা।

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সানভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে। এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনী শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের

সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

...এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা। এত-বড়ো একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি, যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতঃই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর সহকারে ঘোষণা করা নিচেষ্টতার গায়ের জোরি কৈফিয়ত—যে লোক কোনো মতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না, সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়।......বিষফোঁড়ার চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়, কিন্তু সুচিকিৎসক ফোঁড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোঁড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে, এই বেদনা তাহার প্রাপ্য, কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।...কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে।...ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না।...এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়। কারণ জীবনের চালনা ক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই, পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তর প্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি, কারণ শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা।...

অতএব কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমনভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক

বা মানসিক যে কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরম করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে।...

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না, এমনকি সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে।...

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী, তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে।...আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে, আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়। যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না।...মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্র প্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে আনিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারংবার নানাদিকে হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই, ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে,...মানব-জীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব, এবং সমস্ত

ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থ ই নাই।

কবির কথা যে সত্য, ভারতের মধ্যযুগে সন্তদের আবির্ভাবে আর উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণে তার প্রমাণ রয়েছে। এই দুই কালে আমাদের দেশ কোনো কোনো দিকে সত্যকারভাবে উন্নত হয়েছিল, যদিও তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের লাভ হয় নি।

পথের সঞ্চয়ের শেষ লেখাটি হচ্ছে 'আমেরিকার চিঠি'। এটি এক বরফ পড়া স্তব্ধ শীতের প্রভাতের এক অপূর্ব বর্ণনা, শুভ্রতাব এমন নির্মল আবির্ভাবকে কবি নমস্কার নিবেদন করেন এইভাবে :

> তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো ; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক—বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না ; তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবিচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুভ্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করিতে দাও।
>
> ......তাহার পরে এই তপস্যার স্তব্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে একেবারে দিগ্‌দিগন্তর আনন্দকলসীতে ( কাকলিতে ? ) পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

## গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলির কাল থেকে আমরা দেখলাম ভগবৎ শরণ যেমন কবির একান্ত বাঞ্ছিত হয়েছে তেমনি সমাজ, ধর্ম, প্রতিদিনের জীবনযাত্রা এসব সম্বন্ধে দেশের ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁর প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ লিপিকুশলতার পরিচয়ও তিনি দিয়ে চলেছেন।

এইবার আমরা গীতিমাল্যের কবিতাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করবো। সঞ্চয় ও পরিচয়ের প্রবন্ধগুলোর যুগে এই কাব্যের সূচনা। কিন্তু এর কবিতাগুলোয় আমরা মুখ্যভাবে পাই কবির নিবিড় এবং প্রশান্ত ভগবদানুগত্য। এইকালের শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোর সঙ্গেই এগুলোর মিল বেশী—সেইসব ভাষণের চিন্তা গান হয়ে উঠেছে এতে, একথা বলা যায়।

গীতিমাল্যের প্রথম কবিতাটি বা গানটি রচিত হয় ১৩১৭ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি রচিত হয় ১৩১৬ সালে। কিন্তু এর প্রকৃত সূচনার তারিখ ১৫ চৈত্র ১৩১৮ সাল। সেই সময় থেকে ১৩২১ সালের ৩রা আষাঢ় পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলো গীতিমাল্যে স্থান পেয়েছে। এই কাব্য রচনার কালে প্রায় ষোল মাস কবির কাটে ভারতের বাইরে—ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়। কিন্তু সেই কালে কবিতা রচিত হয় মাত্র চোদ্দটি—তারও পাঁচটি সমুদ্র বক্ষে। কবির এই সময়কার কর্মব্যস্ত জীবনের পরিচয় তাঁর জীবনীতে পাওয়া যাবে।

গীতাঞ্জলিতে মুখ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে ভগবৎ-প্রেমের আকুলতা, আর গীতিমাল্যে মুখ্যতঃ ব্যক্ত হয়েছে সেই প্রেমের প্রশান্তি—শান্ত আত্মনিবেদন। তা থেকে সহজেই মনে হতে পারে গীতিমাল্য কাব্য হিসাবে গীতাঞ্জলির চাইতে উৎকৃষ্টতর। অজিতবাবু সেই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু রূপের দিক দিয়ে গীতিমাল্যের বেশির ভাগ কবিতা উৎকৃষ্টতর হলেও আসলে চিত্তাকর্ষক কবিতার সংখ্যা গীতাঞ্জলির চাইতে গীতিমাল্যে বেশি নয়। ভগবানের সঙ্গে কবির প্রেমের যোগ সম্পর্কে অনেক চিন্তা গীতিমাল্যে সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে; কিন্তু গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো প্রেমের বেদনায় সমৃদ্ধতর। স্পষ্ট চিন্তা যত মূল্যবান হোক কাব্যে বেদনার মর্যাদা বেশি।

আমরা গীতাঞ্জলিতে দেখেছি অনন্তস্বরূপ ভগবানের দিকে কবি যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন মানুষের দিকে ও জগতের দিকে। কিন্তু গীতিমাল্যে অনন্তস্বরূপের দিকেই তাঁর আকর্ষণ—অনন্তের বেদনাবোধ ও অনন্তের রসবোধ—তাঁর জন্য অনেক বেশি সত্য হয়েছে। শেষের দিকের ৯০ নম্বরের কবিতায় কবির অন্তরাত্মার সেই পরিচয় চমৎকার রূপ পেয়েছে:

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরান খানি দেয় যে ভরে।
পাগল করে এমন ক'রে।
সোনার আলো কেমনে হে,
রক্তে নাচে সকল দেহে।

কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে।

Amiel-এর রচনায় অসীমের মাদকতা, intoxication of the infinite, আমরা পাই—পরমহংস রামকৃষ্ণের জীবনে তো প্রচুর পরিমাণেই পাই। তবে তাঁর জীবনের শেষের দিকে এর প্রভাব থেকে কিছু অব্যাহতি এবং আরো স্বাভাবিক অবস্থা তিনি কমনা করতেন। গীতিমাল্যের কিছু কিছু বিশিষ্ট কবিতার পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করবো। কবির পরমপ্রিয় ব্যক্তিত্ব অসীমের আকর্ষণে কিভাবে বিপন্ন হয়েছে তার একটি অদ্ভুত পরিচয় রয়েছে এর ১৯ নম্বর কবিতায়:

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয় মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি।
হঠাৎ আকাশ উজলি'
কারে খুঁজে কে ওই চলে।
চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার যাক সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধব নাহি মানি।

এমন 'মরণ' কবি একই সঙ্গে চাচ্ছেন ও চাচ্ছেন না।

কবি হাফিজের একটি বিখ্যাত গজলেও এই ধরনের ভাব ব্যক্ত হয়েছে।
তার কয়েকটি চরণ এই :

হৃদয়ের উপরে আমার আধিকার আর থাকছে না,
ওগো হৃদয়ের অধিস্বামীরা দোহাই তোমাদের
আমাকে বাঁচাও।
হায় আমার গোপন কিছুই আর রইল না ॥

অহঙ্কারে উচ্চশির হয়ো না, হলে নিজের অভিমানে মোমবাতির মতো জলবে। প্রিয়তম এমন যে তার হাতে পড়ে কঠিন শিলা হয় মোম ॥

হাতখালি, তবে স্ফূর্তি কর, আর মাতাল হও।

সত্তার পরশপাথর ভিক্ষুককে করে ধনপতি ॥

গীতিমাল্যের সূচনায় ৫ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন কেমন করে অসীমের চমক তিনি জীবনে প্রথম অনুভব করেছিলেন :

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না তো কোনমতে।
... ...
সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হল বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
... ...
রইল পড়ে পসরা মোর
পথের পাশে।
চারিদিকের আকাশ আজি
দিক্-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইল পথের পাশে।

এর পরের কবিতায় কবি এই অভাবিতের হাতে তাঁর জীবনের হাল ছেড়ে দিচ্ছেন—এমন ছেড়ে দেওয়াকেই সৌভাগ্য জ্ঞান করছেন :

ছেড়ে দে  দে গো ছেড়ে,
নীরবে  যা তুই হেরে,
যেখানে  আছিস বসে
বসে থাক  ভাগ্য মনি।

এর ১৭ নম্বর কবিতাটি একটি বিখ্যাত লিরিক :

যেদিন  ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি  ছিলেম অন্যমনে।
আমার  সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে  রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায়  দখিন সমীরণে।
ওগো  সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন  সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন  নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার  হৃদয়-উপবনে॥

এই কমল কি? কবির প্রতিভার বোধও হতে পারে, অনন্তের বেদনাবোধ ও রসবোধও হতে পারে। তবে এটি গীতিমাল্যের কবিতা; এই বিবেচনায় অনন্তের বোধ হওয়াই বেশি স্বাভাবিক।

২৮ নম্বর কবিতাটি ১৯১২ সালের ৩ জুন তারিখে লোহিত সমুদ্রে লেখা। কবি বিলাত যাত্রা করেন ২৪ শে মে তারিখে। এই কবিতাটি পথের সঞ্চয়ের আনন্দরূপ প্রবন্ধটির সঙ্গে পঠনীয়। অনন্তের মাদকতা কবির জন্য যত প্রবল হোক বিশ্বভুবনের সঙ্গে, তার প্রাণধারার সঙ্গে, কবির যে যোগ তা তাঁর পরম কাম্য। সেই প্রেমের যোগ তাঁর জন্য প্রাণ—তাঁর জন্য সুধাধারা :

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

আরো আলো আরো আলো

এই নয়নে প্রভু ঢালো।

সুরে সুরে বাঁশি পুরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান।

আরো বেদনা আরো বেদনা

দাও মোরে আরো চেতনা।

দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে

মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে

মোর আমি ডুবে যাক নেমে।

সুধাধারে আপনারে

তুমি আরো আরো আরো করো দান।

ইংলণ্ডের লেখা দুইটি কবিতা খুব বিশিষ্ট—৩০ নম্বর (সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি শীর্ষক) ও ৩২ নম্বর ('তোমারি নাম বলব নানা ছলে' শীর্ষক)। ৩০ নম্বরটিতে কবি দেববজ্রপাণির খড়্গের গুণকীর্তন করেছেন। কেন তাঁর মনে এই ভাবনার উদয় হয়েছিল তা জানা যায় না। ৩২ নম্বরটিতে কেবল ভগবানের নামের উপর কবির অসীম নির্ভরতা ব্যক্ত হয়েছে।

৩১ নম্বর কবিতাটি আমেরিকায় লেখা। এই একটিমাত্র কবিতাই তিনি সেখানে লিখেছিলেন। রাজার প্রতাপ, ধনীর অর্থ, সুন্দরীর হাসি, সবই কবিকে কিনে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কিন্তু শিশু তাঁকে বিনামূল্যে কিনে নিলে।

ইংলণ্ডের জ্ঞানী গুণীদের কাছ থেকে কবি যে অভাবিত আন্তরিক সমাদর পেয়েছিলেন তার জন্য তাঁর গভীর কুণ্ঠা ব্যক্ত হয়েছে ৩৪ নম্বর কবিতায়ঃ

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।

পরতে গেলে লাগে, এরে

ছিঁড়তে গেলে বাজে।

কণ্ঠ যে রোধ করে,

সুর তো নাহি সরে,

ঐ দিকে যে মন পড়ে রয়

মন লাগে না কাজে।

৩৯ নম্বর কবিতায় (এটি মধ্যধরণী সাগরে লেখা) কবি প্রভাত আলোর মতো, শিশুর জননীর মুখ তাকানো হাসির মতো, প্রস্ফুটিত সন্ধ্যামালতীর মতো সহজ হতে চাচ্ছেন:

বাজাও আমারে বাজাও।

বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে

সেই সুরে মোরে বাজাও।

যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে

শিশুর নবীন জীবন বাঁশিতে

জননীর মুখ তাকানো হাসিতে—,

সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।

যে সাজে সাজালে ধরায় ধূলিরে

সেই সাজে মোরে সাজাও।

সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে

শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,

যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে

সেই সাজে মোরে সাজাও।

কিন্তু এমন সহজ হওয়া কবির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তার বড় কারণ, তিনি একালের মানুষ—একালের মানুষের মনের জটিলতা তাঁর জন্য সহজাত। এই দ্বন্দ্ব কবির জীবনে আগা-গোড়া দেখা যায়।

এই কবিতাটিতে কিন্তু সহজের রূপ চমৎকার ফুটেছে।

৪৩ নম্বর কবিতাটিকেও কবির কাঙ্ক্ষিত সহজ ভগবৎ আনন্দ, ভগবৎ শরণ, ভগবৎ প্রসাদ, অপূর্ব ভাষা পেয়েছে:

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে

তারি মধু কেন মন মধুপে খাওয়াও না।

নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে

তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে

সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে।

আমার চিত্ত কমলটিরে সেই রসে

কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,

তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে।

তেমনি করে সুধাসাগর সন্ধানে

আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না।

পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ

তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;

তেমনি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে

কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না।

অনন্তের বোধ বা ভগবৎ-চেতনা যে কী দুরবগাহ্য রূপ ধ'রে ভক্তের জীবনে আসে, ভক্তের জীবনে এক অচিন্তিতপূর্ব চেতনা ও বেদনা সঞ্চারিত করে, সেকথা বলা হয়েছে এর ৫৭ নম্বর কবিতায় :

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা

তোমায় জানাতাম।

কে যে আমায় কাঁদায়, আমি

কী জানি তার নাম।

কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে,

ফিরি আমি কাহার পিছে,

সব যে মোর বিকিয়েছে

পাই নি তাহার দাম।

এই বেদনার ধন সে কোথায়

ভাবি জনম ধরে।

ভুবন ভরে আছে যেন

পাইনে জীবন ভরে।

সুখ যারে কয় সকল জনে

বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,

গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে'

বাজে অবিশ্রাম।

কবি তাঁর সাধনায় কোনো গুরুর শরণাপন্ন হন নি, হতে সংকোচ বোধ করেছেন—সেকথা আমরা জেনেছি। সেই কথা কবি পুনরায় বলেছেন গীতিমাল্যের কয়েকটি কবিতায়। কোনো গুরুর চাইতে প্রকৃতির সহজ নির্দেশ তিনি কাম্যতর জ্ঞান করেছেন :

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে।
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

পথের ধারে ছায়াতরু
নাই তো তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা।
দিনের আলো হলে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে
কয় না কিছু আর।

তাঁর বেদনার একান্ততার সামনেও যে তাঁর জীবনের পথ খুলে যায় সে কথাও তিনি বলেছেন :

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি সম
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে।

খ্যাতনামা দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর একটি লেখায় এই মর্মের মন্তব্য করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ গুরুকরণ করেন নি সেজন্য আধ্যাত্মিক সাধনায় সাফল্য লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। মনে হয় গীতিমাল্যের ৭২ নম্বর কবিতাটি কবির তরফ থেকে তার উত্তর।

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম বলে
যেমন খুশি এলেম চলে
ভয় করি নি তোমায় আমি
অন্ধকারে।
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে।
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে
ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।

বিপিনচন্দ্র পালের মতো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যে এমন কথা বলতে পেরেছিলেন এটি আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু কবির উত্তরটি তুলনারহিত। বাস্তবিক যাঁরা পথ পেয়েছেন তাঁদের সেই সৌভাগ্যের মূলে কোনো গ্রন্থ বা গুরু নন, তাঁদের এমন সৌভাগ্যের কারণ—সত্যের নিবিড় বাহুবন্ধনে তাঁরা বাঁধা পড়েছিলেন।

ভগবৎ প্রসাদ কবির জীবনে লাভ হয়েছে এই আনন্দিত বার্তাই গীতিমাল্যে বহুভাবে বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এর শেষের দিকের ১০৪ ও ১০৫ নম্বর কবিতার সুর কিছু ভিন্ন, তাতে আনন্দের চাইতে বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্টতর। ১০৪ নম্বর কবিতার কয়েকটি ছত্র এই:

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।

শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়া,
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে,
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে।
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে,
বরণের মালা পরায়ে॥

আর ১০৫ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন ঃ

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
চিনি নাই তো আমি তারে ;
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা।
তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে,
দিনে রাতে চুরি করে
এনেছি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিলব আসি,
এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
তখন তোমার দেখব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা॥

কবির এই সময়কার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় এইকালে সহসা তিনি একটি কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রকে লেখা একটি পত্রে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। তার কিছু অংশ এই ঃ

....রামগড়ে যখন ছিলুম তখন থেকে আমার conscience-এ কেবলি ভয়ংকর আঘাত করচে যে বিদ্যালয় জমিদারি সংসার দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার যা কর্তব্য আমি কিছুই করি নি—আমার উচিত ছিল নিঃসংকোচে আমার সমস্ত ত্যাগ করে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া, এবং আমার সমস্ত পরিবারের লোককে একেবারে চূড়ান্ত ত্যাগের মধ্যে টেনে আনা ; সেইটে যতই হচ্ছিল না ততই নিজের উপর এবং সংসারের উপর আমার গভীর অশ্রদ্ধা ঘনিয়ে আসছিল এবং কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার

ideal-কে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে, আবার নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।"

তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, এইকালে, অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ লাভের পরে, তাঁর ইংরেজী বই থেকে প্রচুর অর্থাগম হচ্ছিল, তাই দিয়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে তাঁর পুত্র ও তিনি সুরুলে ও রামগড়ে দুইটি বাড়ি কেনেন। সেইটি কবির এখন বিবেকের দংশনের কারণ হয়ে থাকবে। প্রভাতবাবু কবির এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গুরুত্ব তেমন স্বীকার করেননি। কিন্তু আমরা দেখবো এই দ্বন্দ্ব কবির জীবনে আমৃত্যু চলেছিল, অবশ্য সব সময়ে যে প্রবলভাবে চলেছিল তা নয়।

গীতিমাল্যের শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে এই বেদনাকর মানসিক অবস্থা থেকে কবি অব্যাহতি পেয়েছেন এবং আবার আনন্দ তাঁর জন্য সহজ হয়েছে। গীতিমাল্যের শেষ কবিতাটি এই ঃ

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র ভাষণে,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে,
তোমায় করি গো নমস্কার।

# নোবেল প্রাইজ লাভ

কবির নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদ আসে ২৯ কার্তিক, ১৩২০ ( ১৩ই নবেম্বর, ১৯১৩ )। তখন গীতিমাল্যের প্রায় আধাআধি লেখা হয়েছে। কবির কোনো কোনো উক্তিতে দেখা যায় এই ব্যাপারে তিনি দেখেছিলেন তাঁর প্রতি ভগবানের দাক্ষিণ্য, কিন্তু সমসাময়িক কবিতায় এর উল্লেখ নেই। গীতিমাল্যের ৪৭ নম্বর কবিতার প্রথম দুই ছত্রে আছে বটে ঃ

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে<br>তুমিই আমার বন্ধু

—এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৪ অগ্রহায়ণ তারিখে—কিন্তু এই উল্লেখকে খুব নির্ভরযোগ্য ভাবা যায় না। এমন অনুল্লেখের কারণ মনে হয় এই ঃ এইকালে ( বিলাত যাবার আগে থাকতে ) কিছুদিন ধরে দেশের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি—যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—কবির প্রতিভাকে মূল্যহীন প্রতিপন্ন করবার কাজে যেন ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের বিদ্বেষ ও অর্থহীন কটূক্তি তীক্ষ্ণ-অনুভূতি-সম্পন্ন কবিকে কম আঘাত দেয়নি। কিন্তু এসব লেখার কোনো প্রতিবাদ তিনি করেননি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পরে তাঁর সেই বিরোধী দলই তাঁর প্রশংসায় যেন বেশি মুখর হলেন। তাঁদেরই ব্যবহারে কবি ধৈর্যহীন হয়েছিলেন। এইকালে কবি য়েট্‌স্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি যে পত্র লেখেন তার একটি অংশ এই ঃ

**The perfect whirl-wind of public excitement it has given rise to its frightful. It is almost as bad as tying a tin at a dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecing crowds all along. I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never had any friendly feeling towards me nor ever read a line of my works, are loudest in their protestations of joy. I cannot tell you how tired I am of all this shouting, the stupedous amount of its unreality being something appalling........**

এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে বহুলোক শান্তিনিকেতনে যান কবিকে অভিনন্দন জানাতে। তাঁদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন— কবির খ্যাতনামা বন্ধুও কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু অভিনন্দনের উত্তরে কবি যা বললেন তাতে তাঁর মনের এতদিনের ক্ষোভ আর চাপা রইল না। তাঁর উত্তরের কিছু কিছু অংশ এই :

আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসংকোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই।....যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্মবীর সর্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনপরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজন আছে।........কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র, সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবি তখন এ কথা তাঁর বলা চলবে না যে, নির্বিশেষে সর্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন।....কবি বিশেষের কাজে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি একথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে 'বহন করে এসেছি। এমন সময় কিজন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখন পর্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি।........যে কারণেই হোক, আজ য়ুরোপে আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণীজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই।

........অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান-উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করব? আমার আজকের এদিন তো চিরদিন থাকবে না, আমার ভাঁটার বেলা আস্‌বে, তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার তো ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।

তাই আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি—যা সত্য তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। কোনো কোনো দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই।····

কবির উত্তর দীর্ঘদিন নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্রভাবে আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু সে সবের কোনো প্রত্যুত্তর কবি দেননি।

বহুদিন ধরে কবির মনে ক্ষোভ জমেছিল—তা অনাবৃত না করে তিনি পারছিলেন না। কিন্তু কাজটি অমানবিক না হলেও আর কবিজনোচিত হলেও এটি যে কালোচিত হয়নি তা বলতে হবে। কবি নিজেও তা পরে বলেন।

কিন্তু কবির এই উক্তিতে এমন একটি সত্য ছিল যা সেদিনের গণ্ডগোলে চাপা পড়েছিল। সেটি প্রকাশ পায় পরে এন্‌ড্রুজ সাহেবকে লেখা কবির একখানি চিঠিতে, তার কিছু অংশ এই ঃ

····At that time I was physically tired; therefore the least hurt assumed a proportion that was perfectly absurd. However, I am glad that there is still that child in me, who has its weakness for the sweets of human approbation. I must not feel myself too far above my critics. I don't want my seat on the dais; let me sit on the same bench with my own audience and try to listen as they do. I am quite willing to know the healthy feeling of disapponitment when they don't approve of my things; and when I say "I don't care!" Let nobody believe me.

কবির এই স্বীকারোক্তিটি অপূর্ব। ধনী ও মানী কুলের এই নির্জনতা-প্রিয় মানুষটি আসলে ছিলেন সপক্ষ-বিপক্ষ, ক্ষুদ্র-মহৎ সবার আপনার জন, সবার সঙ্গে সমানের মতো মেলামেশায় তাঁর ছিল গভীর আনন্দ। আর একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই দশজনের নিন্দা-প্রশংসার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র উপেক্ষা ছিল না। এই সহজ মানব-বন্ধু তাঁর সমসাময়িক কালে

তাঁর সেই প্রাপ্য মূল্যটি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আশা করা যায় কালে সেই ভুল পুরোপুরিই সংশোধিত হবে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ তাঁর প্রতিবাদীদের দেওয়া আঘাত তিনি কেমন নিঃশেষে ভুলে যেতে পেরেছিলেন।—তবে বিপিন পাল মহাশয়ের প্রতি একটি পত্রে কবি অনুদার মন্তব্য করেছিলেন।

নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কবি গচ্ছিত রেখেছিলেন পতিসরের কৃষি ব্যাঙ্কে। প্রভাতবাবু বলেছেন :

....কবি কোনো নামকরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রাখিয়া এই নগণ্য গ্রাম্য ব্যাঙ্কে রাখিলেন কেন, এ প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলেন যে, গ্রামের উন্নতির জন্য চাষী কোথায় টাকা পাইবে, তাঁহার ধনে তাঁহার পরিবারের লোকের যেমন দাবি তাঁহার প্রজাদের দাবি তাহা হইতে কম নহে।

## "পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে"

### গীতালি

গীতালির কবিতাগুলো গীতিমাল্যের কবিতাগুলোর পরেই লেখা হয়। গীতালির শেষ কবিতাটির রচনার তারিখ ৩ কার্তিক, ১৩২১। প্রভাতবাবু বলেছেন ৪৬ দিনে গীতালির ১০৮টি গান লেখা হয়েছিল।

গীতিমাল্যের শেষ কবিতায় কবির যে আনন্দ ও সার্থকতার ভাব দেখেছি কতকটা তাই আমরা দেখছি গীতালির সূচনার কবিতায়। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা লেখা হয় ৪ ভাদ্র, ১৩২১ ; অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনার কয়েকদিন পরে। দ্বিতীয় কবিতায় কবি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন ভগবান, অর্থাৎ বিশ্ব-বিধাতা যে আছেন সে কথা কেউ ভাবে না। আর তৃতীয়টিতে কবি বলেছেন, যারা লুঠ-করা-ধন জড়ো করে বড়ো হয়েছে তাদের এক নিমেষেই পথের ধুলায় পড়তে হবে, আর বঞ্চিতদের বলেছেন :

নিচে বসে আছিস কে রে
কাঁদিস কেন।
লজ্জা ডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস কেন।

ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধুলার'পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে।

গীতালির ও বলাকার কবিতাগুলো প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভের পরে লেখা—কয়েকটি আগেও লেখা। কিন্তু কবি মহাযুদ্ধের পূর্বেই জগতের এক আসন্ন বিপর্যয় ও সেই বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে এক রক্তাভ নব-অরুণোদয় কেমন করে যেন মর্মে অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

> য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা ( বলাকার 'সর্বনেশে' ) লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগ-সন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নব যুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল।........

গীতালির অনেক কবিতার উপরে যে প্রথম মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, এর অনেকগুলো কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির সেই বিবেকের দংশন—সেই অপরাধ ও ব্যর্থতাবোধ—গীতিমাল্যের শেষের দিকে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সেইসঙ্গে অবশ্য কবির নতুন বিশ্ববিপর্যয়-বোধের কথাও ভাবা যেতে পারে। গীতালির ৬ নম্বর কবিতায় কবির এক অন্তর্বেদনার পরিচয় যথেষ্ট স্পষ্ট :

ও নিঠুর আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে ?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।
মারকে তোমার

ভয় করেছি বলে
তাই তো এমন
হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে।

এর ২৭ নম্বর কবিতায়ও কবির গভীর অন্তর্বেদনা ব্যক্ত হয়েছে ঃ

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।
মাটির'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তারে।
ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে।

এর বিশেষ বাউল রূপটি লক্ষণীয়।

শ্রীযুক্ত অমল হোমের একটি লেখা থেকে জানা যায় গীতালির ৩৩ নম্বর কবিতাটি কবি এক ঝড়ের ভিতরে গাইতে গাইতে (বোধ হয় সুরুল থেকে) শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কবিতাটি এই ঃ

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথি।
আকাশ কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,

প্রলয় আমার কেশে বেশে
করছে মাতামাতি।
যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে
গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি।।

সহজেই মনে হতে পারে মহাযুদ্ধের ছায়া এর উপর পড়েছে। কিন্তু আমাদের ধারণা, এতে কবির ব্যক্তিগত অন্তর্বেদনাই ব্যক্ত হয়েছে। কবি বলেছেন, 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি'। কিন্তু মহাযুদ্ধের অন্ধকার তো সর্ব-মানবকে আবৃত করেছিল। পরে অন্য লাইনে বলেছেন, 'যে পথ দিয়ে যেতে-ছিলেম'....। এখানেও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের কথাই বলা হয়েছে মনে হয়। তবে ঝড়ের বা সর্বনেশের ভয়াল আবির্ভাব কবির জীবনে যেমন হয়েছে তেমনি জগতেও হয়েছে।

অবশ্য এই কঠিন অন্তর্বেদনার মধ্যেও জগতের আনন্দরূপ কবির জন্য আবৃতই হয়নি ঃ

কোন বারতা পাঠালে মোর পরাণে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে
বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতাবিতানে।
তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগাল,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগাল।
তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে,
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে।।

পূর্বেও আমরা দেখেছি জগতের আনন্দরূপ কবির জন্য যেন নিশ্বাস-বায়ু। এর ২০ নম্বর কবিতাটি ( 'এক হাতে ওর কৃপাণ আছে' শীর্ষক ) সুবিখ্যাত। সর্বনাশা

বা প্রলয় এসেছে মহাযুদ্ধের বেশে, সেই প্রলয়ের ভিতর দিয়েই পরম বেদনায় নতুন সৃষ্টি হবে—এর এই ব্যাখ্যা সহজেই মনে পড়ে। তবে এর অন্য ধরনের ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে।

এর ৩২ নম্বর কবিতার এই ক'টি ছত্রে গভীর ব্যর্থতাবোধ অথবা পরাভব এক অপূর্ব বিজয়ের ইঙ্গিতও দিচ্ছে। কবির অসীম ভগবৎ-নির্ভরের পরিচয়স্থল এটি :

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে ॥

এর ৩৭ নম্বর কবিতাটি চিন্তার দিক দিয়ে বিশিষ্ট। কবি বলেছেন :

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফোটাই।

ভগবান অনন্তস্বরূপ, তাঁর অন্তহীন প্রকাশ কবি উপলব্ধি করছেন, তাই ভগবান নিত্য তাঁকে দিচ্ছেন আর কবি ভগবানের কাছ থেকে নিত্য নিচ্ছেন।

একালের ইতিহাস-চেতনার অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষের যে নব নব সার্থকতা লাভ হচ্ছে সেই চিন্তার এ এক নতুন রূপ। টেনিসনও এই ধরনের কথা বলেছিলেন। তবে টেনিসনের কথা ঠিক ভক্তের কথা নয় বরং জ্ঞানীর কথা।

৪০ নম্বর কবিতায় প্রাচীন ও গতানুগতিকের প্রতি কবির বিরাগ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে :

ঐ প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস নে—
রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে
স্বপন নিয়ে পড়ে থাকিস নে।

উঠল এবার প্রভাতরবি,
খোলা পথে বাহির হবি,
মিথ্যা ধুলায় আকাশ ঢাকিস নে ॥

জীর্ণ প্রাচীনের পূজা কবির কাছে বোধহয় কঠিনতম তিরস্কার লাভ করেছে এর পরের কবিতায় :

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে রাখিস বুকের 'পরে
আকাশভরা সূর্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।
শিশির ধোওয়া এই বাতাসে
হাত বুলাল ঘাসে ঘাসে,
ব্যর্থ হবে কেবল যে সে
তোদের ছোটো কোণের ঘরে।
মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে
ধুলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগযুগান্তরে ॥

সত্যাশ্রয়িতার যে-মূল্য কবি নির্দেশ করেছেন তাই তার যথার্থ মূল্য। তবে বুদ্ধির দোষে অথবা শক্তিহীনতার ফলে সেই মূল্য অনেক সময় আমরা দিই না—না দিয়ে অবশ্য তার ফল ভোগ করি।

এর ৪৭ ও ৪৮ নম্বর কবিতা দুইটি খানিকটা পরস্পর-বিরোধী। ৪৭ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন :

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে!
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি

গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে ॥

কিন্তু ৪৮ নম্বর কবিতায় নিজের ব্যর্থতার কথাই কবি মুখ্যভাবে বলছেন :

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।
ফিরছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন সে গহন রাত্রি শেষে
অগাধ জলের তলা হতে
অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথায় রে পাই ॥

এই দুই ভাবই এই স্তরে কবির মনে প্রবল হয়েছিল। এর বিভিন্ন পরিণতি আমরা পরে দেখব।

এর ৫০ নম্বর কবিতাটি প্রিয়তমের উদ্দেশে কবির একটি অপূর্ব প্রার্থনা। কবির গোপন বিজন ঘরে প্রিয়তম রয়েছেন, এ সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তিনি নীরবে শয়ান—আজও জাগ্রতরূপে কবি তাঁকে পাননি। তাঁকে পূর্ণ জাগ্রতরূপে পাবার জন্যই কবির পরম ও চরম কামনা :

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন' পরে—

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি

আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,

মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,

তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—

প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো॥

কবির এই কামনা কি পূর্ণ হয়েছিল? এর উত্তর আমরা পাবো কবির জীবনের অন্তিমে।

এর ৭৭ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন ঃ

সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে

এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে

ওগো বন্ধু, বলো দেখি

শুধু কেবল আমার এ কি?

এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

থাক না তোমার লক্ষ গ্রহতারা,

তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা।

সইবে না সে, সইবে না সে,

টানতে আমায় হবে পাশে,

একলা তুমি, আমি একলা হলে॥

কবির এই চিন্তার সঙ্গে পূর্বেও আমাদের পরিচয় হয়েছে। এতে পরিচয় রয়েছে কবির অসাধারণ আশাবাদিতার। কিন্তু কবির জীবনের একটি স্তরে এই আশাবাদিতা প্রায় লোপ পেয়েছিল।—তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

গীতালির শেষের দিকের অনেকগুলো কবিতায় কবির আশাবাদিতার ও গতির প্রতি অনুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সেই সব কবিতার মধ্যে

খুব প্রসিদ্ধ হচ্ছে 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,' শীর্ষক কবিতাটি। গীতালিতে এই বিশেষ গতি-অনুরাগের সূচনা হলেও গীতালির পরে বলাকা কাব্যে ও তার পরে আরো কয়েকটি রচনায় কবির এই গতি-অনুরাগ ব্যাপকভাবে রূপ পেয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্ব শুধু গতি-প্রশস্তি বা গতিধর্মী প্রাণের প্রশস্তি নয়। এর বিশিষ্ট রূপটি দেখা যাচ্ছে ৯৩ নম্বর কবিতায়। তার শেষ চারটি লাইন এই :

ভুল আমারে বারে বারে
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
আপন মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

মনে হতে পারে এটিও গতি-প্রশস্তিরই কথা। কিন্তু তা যে নয় তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে এই চার লাইনের উপরের দুই লাইনে :

পরের কথায় চলতে পথে ভয় করি যে।
জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে।

'জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে'—এটি রবীন্দ্র-গতি-তত্ত্বের ভারকেন্দ্র। গতি তাঁর জন্য অহং-এর বিলাস নয়, সেই গতিপরায়ণ অহং বিশেষভাবে যুক্ত ভগবানের সঙ্গে, অর্থাৎ অহংকে বেষ্টন করে আছে যে মহত্তর চেতনা বা সত্য তার সঙ্গে। তাই সব গতি সুগতি হয় না, দুর্গতিও হয়—সব ভাঙা-গড়ার দিকে যায় না। বাংলা সাহিত্যে সুগতির বা সার্থক ভাঙার বড়ো দৃষ্টান্ত মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। গতি যেখানে দুর্গতি হয়েছে তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই আমাদের দেশে ও সাহিত্যে।

গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের মতো গীতালিতেও কতকগুলো উৎকৃষ্ট লিরিক আছে—তাদের পূর্ণাঙ্গতা সহজেই চোখে পড়ে। কয়েকটির উল্লেখ করছি :

১৭ নম্বর 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার' শীর্ষক।
২৩ নম্বর 'যে থাকে থাক না দ্বারে' শীর্ষক।
৪৮ নম্বর 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন' শীর্ষক।
৫৫ নম্বর 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি' শীর্ষক।
৭৫ নম্বর 'কূল থেকে মোর গানের তরী' শীর্ষক।
৮৬ নম্বর 'আবার যদি ইচ্ছা কর' শীর্ষক।

গীতালির শেষ দুটি কবিতায় একটি পূর্ণতার দিকে কবির চোখ পড়েছে। কবি একই সঙ্গে ভাবছেন নিজের জীবনের পূর্ণতালাভের কথা আর বিশ্বমানবজীবনেরও

পূর্ণতালাভের কথা—সেই পূর্ণতা আজ মুদিত আছে, কিন্তু নতুন প্রভাতে তা ফুটে উঠবে। ভালো-মন্দ-সুখ-দুঃখ বড়ো, ছোটো কিছুই বৃথা নয়—সব কিছুর সাহায্যে ঘটেছে সেই পূর্ণতা।

সর্বমানব একালে যে এক বৃহৎ যুগসন্ধিক্ষণে এসেছে কবির এই চিন্তার সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছি।

একটা নতুন যুগ যে এসেছে, এক বিরাট নতুন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে একালের মানুষ যে চলেছে, তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় এই নতুন যাত্রার পরিণতি সেটি আজও অস্পষ্ট, কেননা ভীষণ সব মারণাস্ত্র মানবজাতির সামনে ওৎপেতে আছে—মানুষের শুভবুদ্ধি তার উপরে আজো জয়ী হতে পারেনি।

## রবীন্দ্রকাব্যে—বলাকা

১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় নতুন মাসিকপত্র 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এতে লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অচিরে এই পত্র হয়ে উঠল তাঁর নতুন সাহিত্যিক অভিব্যক্তির বাহন। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীও তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এতে দেন। ফলে 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে বহন করে আনলো এক নতুন সাহিত্যিক যুগ—চলিষ্ণুতা শুধু তার মন্ত্র হলো না রচনার রীতিতেও বিচিত্রভাবে তার প্রকাশ ঘটলো। বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার ব্যাপক প্রচলন এই সবুজপত্রের যুগ থেকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এর যে বিশিষ্ট উপহার তার সঙ্গে অচিরে আমাদের পরিচয় হবে।

'বলাকার' যেটি প্রথম কবিতা ( 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা' শীর্ষক ) সেটি তারুণ্যের ধ্বজাবাহী সবুজপত্রের জন্য বিশেষভাবে লেখা হয়েছিল। আমরা গীতালির শেষের দিকে কবির প্রবল গতি-অনুরাগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সেই গতি-অনুরাগের একটি উচ্ছলিত রূপ আমরা পাই বলাকার এই প্রথম কবিতাটিতে এবং তার পরে অন্যান্য বহু কবিতায়ও। বলাকার কিছু কবিতার ভিতরে যে প্রচারের ভাব রয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়।

তবে এই প্রচার কবির জন্য শুধু বুদ্ধি ও সংকল্পের ব্যাপার নয়। যৌবন-শক্তির এক ধরনের নতুন বোধ কবির মনে যে এইকালে সঞ্চারিত হয়েছিল, তারও যোগ ঘটেছিল এর সঙ্গে। গ্যেটে বলেছেন, 'সাধারণে যৌবন আসে মাত্র একবার কিন্তু যাঁদের ভিতরে স্বাভাবিক প্রতিভা আছে তাঁরা নতুন করে যৌবন অনুভব করেন।' বলাকায়ও সেই যুগে যৌবনের একটি বিশিষ্ট নতুন স্ফুরণ আমরা কবির ভিতরে দেখি।

বলাকার যুগে যে কবির ভিতরে একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল এক নতুন তারুণ্য আর প্রচার-প্রবণতা এর ফলে কবির এই যুগের রচনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে এমন কিছু কবিতাও আমরা পাই যা মুখ্যতঃ উদ্দীপনার বাণী। অবশ্য সাহিত্য কিছু পরিমাণে প্রচারধর্মী হতে বাধ্য, কেন না, সাহিত্য শুধু অনুভূতির ব্যাপার নয়, বুদ্ধিরও ব্যাপার। তবে সেই বুদ্ধি ও অনুভূতির সংযোগ কোথায় শোভন ও সার্থক হয়েছে আর কোথায় সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে সাহিত্য সমঝদারির ক্ষেত্রে সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টিই রাখতে হয়। বলা বাহুল্য এই বিচারের ক্ষেত্রে মতভেদের অবকাশ সুপ্রচুর।

বলাকার প্রথম কবিতাটি যে প্রচারধর্মী বেশি তা আমরা বলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এরও ভিতরে দুই-একটি এমন স্তবক আছে যাতে কবির নব-তারুণ্যের আবেগ সুস্পষ্ট :

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

এসব চরণের প্রভাব কবি নজরুলের রচনায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কবি নবীনকে বিশেষিত করেছেন এইসব বিশেষণে :

কাঁচা, দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত ও অমর।

এই পরিচিত কথাগুলো অনেকটা নতুন শ্রী নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। কবির অনুভূতি পরিচিত কথার গায়ে এমনি নতুন লাবণ্য, নতুন দীপ্তি মাথিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় কবিতাটি ('সর্বনেশে') সম্পর্কে কবির বক্তব্য আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। সর্বনেশেকে বা প্রলয়কে কবি সর্বান্তঃকরণে বরণ করছেন, কেন না, তিনি নিঃসন্দেহ যে, সেই বেদনা ও দুঃখের ভিতর দিয়ে সর্বমানবের কল্যাণ আসছে। কবির এই প্রবল আশার পরিচয় আমরা পাব 'বলাকা'র বহু কবিতায়।

তৃতীয় কবিতার মূল কথা বলা হয়েছে প্রথম চার ছত্রে:

আমরা চলি সমুখপানে
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

তারুণ্যের যে জয় হবে এ বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ, কেন না, তরুণদের 'সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী'।

এর চার নম্বর কবিতাটির নাম ছিল 'শঙ্খ'। এটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু-মাস বাকী আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে, ঔদ্ধত্যে হ'ক, ভয়ে হ'ক, নির্ভয়ে হ'ক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার-স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমা রোলাঁ, বার্ট্রণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

এর শেষ স্তবকে কবি বলেছেন :

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

এই ধরনের উক্তি বারবার কবি করেছেন। এই থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন ভারতের বৈরাগ্য ও ধ্যানের জীবন আর একালের ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মের উদ্দীপনা এই দুয়ের দ্বন্দ্ব কবির ভিতরে যথেষ্ট প্রবল হয়েছিল। সবুজপত্রের সূচনায় প্রমথ চৌধুরীকে কবি এই স্মরণীয় পত্রখানি লেখেন :

> আচ্ছা রাজি আছি······বুদ্ধির যন্ত্রটাকে বেশি খাটাতে সাহসও হয় না ইচ্ছাও হয় না—একটা মৌরসী ছুটির জন্যে মনটা মাঝে মাঝে দরখাস্ত লিখতে বসে। গাল পাড়বার বেলায় বৈরাগ্যকে রেয়াৎ করিনে কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে যেন বাঁশি বাজাতে থাকে—একেবারে ভিতরের দিক থেকে সে আমাকে উদাস করে তোলে। যদি শুষ্ক বৈরাগ্য হত তাহলে এ'কে কাছে আসতে দিতুম না কিন্তু এ যে বাসন্তী রঙে রাঙানো—আমের বোলের গন্ধে ভরা। "Deep-delved earth"—এর মধ্যে যে মদে বহু বৎসরের পাক ধরেছে সেই মদের মত এ যেন আমার প্রকৃতির ভিতরে ভিতরে আপনার মাদকতাকে প্রবীণ করে তুলেছে। এই বৈরাগ্যের হাওয়াটা যখন হু হু করে বইতে থাকে তখন মাসিক পত্রটত্রগুলো মন থেকে কোথায় উড়ে চলে যায় তার ঠিকানা নেই, তখন দেশের হিতের দিকে খেয়ালও থাকে না। যাই হোক lucid intervals একেবারে আসবে না এমন হতে পারে না, অতএব আশা আছে।

বুদ্ধিজীবী প্রমথ চৌধুরীর আকর্ষণে কবি তাঁর দীর্ঘদিনের ভক্তি-সাধনার প্রতি যে দৃষ্টিতে চাইছেন তাও লক্ষণীয়।

অনেকটা সবুজপত্রের আকর্ষণে কবিকে যে নতুন করে কলম ধরতে হয়েছিল, মনে হয়, সেইটি বলাকার অনেকগুলো কবিতার প্রচারধর্মিতার একটা বড়ো হেতু। তবে কবির নতুন যৌবন-বোধ যেখানে যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে সেখানে প্রচারের ভাব স্বভাবতঃই চাপা পড়েছে।

এর পঞ্চম কবিতাটি মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে ৫ ভাদ্র ( ১৩২১ ) তারিখে লেখা। ৪ ভাদ্র তারিখে কবি লিখেছিলেন গীতালির 'বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই' শীর্ষক কবিতাটি। তাতে বঞ্চিতদের বিজয়ের কথা তিনি বলেন।

বলাকার ৫ নম্বর কবিতাটিতেও কবি সেই বঞ্চিতদের কথাই বলেছেন—তাদেরই সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে ঝড়ের ভিতর দিয়ে তরণী বেয়ে বেয়ে আসছে রজনীগন্ধা ফুলের একটি গুচ্ছ হাতে নিয়ে।

এর ৬ নম্বর কবিতাটি এলাহাবাদে একটি পুরাতন ছবি দেখে কবি লেখেন। কেউ বলেছেন সেই ছবিটি ছিল তাঁর স্ত্রীর, কেউ বলেছেন সেটি ছিল তাঁর নতুন বৌঠাকরুণের। দ্বিতীয় অনুমানটিই সত্য মনে হয়, কেন না, এই কবিতায় আছে :

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

কবি ছবিকে লক্ষ্য করে বলছেন :

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাতিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।

তার কারণ, কবি দেখছেন তাঁর নিজের জীবন কি বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে :

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।

কিন্তু কবি বুঝছেন তাঁর চিন্তা ভুল, ছবিও অর্থাৎ যার ছবি সেও স্থির নয়—সেও তার প্রিয়জনদের উপরে বিচিত্রভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে :

ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা,
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।

৭ নম্বর কবিতাটি হচ্ছে তাজমহল সম্বন্ধে কবির বিখ্যাত কবিতা। এর কয়েকটি স্তবকে কবির বর্ণনায় অসাধারণ শক্তির পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু এই বিখ্যাত কবিতাটি আমাদের চোখে কিছু ত্রুটিপূর্ণ। এর শেষের দিকে কবির গতি-অনুরাগ মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। আমাদের সেই বহুদিন পূর্বের আলোচনাটিতে আমরা বলেছিলাম :

> ....কবির গতি-তত্ত্ব জীবন-তত্ত্ব এ সব শিরোধার্য ক'রে নিয়েও যখন কবিকে বলতে শুনি "মিথ্যা কথা,—কে বলে রে ভোলো নাই?"—তখন আমাদের অন্তরপুরুষ কেমন একটু পীড়ন অনুভব করে। কবি যা বলছেন তা মিথ্যা নয়, তবু মনে বলে, "আর যে বলে বলুক, কিন্তু কবির মুখ থেকে এ কথাটা এই ভঙ্গীতে শুনতে রাজি হওয়া যায় কি?"

এই কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি এই মন্তব্য করেছেন :

> বেগমমণ্ডলী-পরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলতি পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধূলির উপরে প'ড়ে ধূলি হয়ে যায়নি, ক্লান্তি-প্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল।....
>
> ....দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে—তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে, সে-প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

শাজাহান ও মমতাজের প্রেম সম্ভোগের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল একথা মনে না করাই সঙ্গত। যাদের জীবন প্রধানত সম্ভোগে কাটে তাদের প্রেমেও যে কখনো কখনো মহত্তর সুর লাগে স্বয়ং দুষ্মন্ত তার প্রমাণ।

তাছাড়া এখানে প্রেম অমরতা লাভ করেছে অনেকটা মহৎ শিল্পের শক্তিতে। মহৎ শিল্প নিন্দিত প্রেমকেও অমরতা দান করেছে। (দান্তের ফ্রান্‌সেস্‌কা ও পাওলো আর মধুসূদনের 'সোমের প্রতি তারা' স্মরণীয়)।

ভগবান নেই, বিশ্বজগতে কোনো মঙ্গল-বিধান নেই, এসব কথা যেমন মানুষের অন্তরাত্মার সায় পায় না, তেমনি সময়ের প্রভাবে প্রেমিক প্রেম ভুলে যায় একথা মেনে নিতেও মানুষের অন্তরাত্মা রাজী হয় না।

"তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ" এই চিন্তাটি অবশ্য খুব মূল্যবান। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝবার আছে, যা মানুষের মহৎ সৃষ্টি সেসব সসীম হয়েও অসীম-ব্যঞ্জনাভরা—সেসব অতিক্রম করে যাবার কথা ঠিক ওঠে না।

এই কবিতাটির অসম্পূর্ণতা হয়ত কবিও অনুভব করেছিলেন। শোনা যায় এটি তিনি লিখেছিলেন তাজমহল না দেখে। এর পর তাজমহল দেখে তিনি লেখেন ৯ নম্বর কবিতাটি। তার আলোচনাকালে আমরা দেখবো সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কবি তাজমহলের দিকে তাকিয়েছেন।

৮ নম্বর কবিতাটির নাম ছিল 'চঞ্চলা'। আধুনিক বিজ্ঞানের গতিবাদ, পরমাণুবাদ, এসব অবলম্বন করে এটি লেখা।

কিন্তু এটি কবিতা হয়ে উঠেছে এর মানবিক সম্পদের গুণেই। নতুন নতুন কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, এসবের আবেগ কেমন করে মানুষের জগতে নতুন নতুন কীর্তি স্থাপন করে চলেছে, নতুন নতুন সভ্যতার জন্ম দিচ্ছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য অবলম্বন করে কবি সেই মানব-সত্যকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই সম্পর্কে খুব বড়ো এই কথাটি তিনি বলেছেন যে, জগতের এই নিরন্তর গতি ব্যাহত হলে যেমন সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে যেত, তেমনি মানুষ যদি নতুন নতুন সৃষ্টি করে চলতে অক্ষম হতো তবে মানব-সভ্যতাও অচল ও অর্থহীন হয়ে যেতো।

এই বিশ্বব্যাপক ও প্রাণপ্রদ গতির রূপ কবি এঁকেছেন এইভাবে :

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,<br>
চলেছ যে নিরুদ্দেশে সেই চলা তোমার রাগিণী,<br>
শব্দহীন সুর<br>
অন্তহীন দূর<br>
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও<br>
উদ্দাম উধাও ;<br>
ফিরে নাহি চাও,<br>
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

প্রলয়ঙ্কর, মহাযুদ্ধ আর পরাধীনতার জন্য ভারতীয় জীবনের বিচিত্র গ্লানি, এসবের পরিপ্রেক্ষিতে কবির গতিতত্ত্ব সেদিন বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

গতিতত্ত্বের দার্শনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন ফরাসী দার্শনিক বের্গ্‌সঁ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু গতিতত্ত্ব ঘেঁষা হলেও তার বড়ো পরিচয় এই যে, তা প্রাণোচ্ছল।

গতি যেমন সত্য, স্থিতিও তেমন সত্য, এই বলাকা কাব্যেই কবি সেকথা বলেছেন। ৯ নম্বর কবিতাটির উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী শাজাহানের কথা এতে বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিরহী শাজাহানের কথা আর তাঁর প্রেয়সীর কথা। কবি দেখছেন তাজমহল শাজাহানের প্রতিভার চিহ্নমাত্র নয়, এ এক অপূর্ব প্রাণরসে সমৃদ্ধ ঃ

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী....

তাজমহলের আর একটি বড়ো রূপও কবির চোখে পড়েছে, তিনি দেখছেন, সম্রাটের মন সম্রাটের ধনজন এই রাজকীর্তি থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে, কিন্তু—

আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

শাজাহানের অন্য যত পরিচয়ই থাকুক তাজমহলের শাজাহানকে মানুষ বুঝে নিয়েছে প্রেমিকরূপে, আর সেইভাবে বুঝে আনন্দিত হয়েছে।

মহৎ সৃষ্টি এমনিভাবেই মানুষের জন্য নতুন নতুন অর্থ প্রকাশ করে চলে। ১০ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন, তিনি চেষ্টা করে যা সঞ্চয় বা সংগ্রহ করেছেন তা তাঁর প্রিয়ের যোগ্য উপহার হবে না, কেন না, সেসব ভঙ্গুর, অল্প-ক্ষণেই তাদের শোভা-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর প্রিয়ের যোগ্য উপহার বরং

হবে তাঁর ( কবির ) মনে যে সব ভাবচ্ছটা বা সৌন্দর্যচ্ছটা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে পলকে মিলিয়ে যায় সেইসব। সেইসব চঞ্চল কিন্তু অপূর্ব মুহূর্তের এই বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী॥

এই ক্ষণিক ভাবচ্ছটার বা সৌন্দর্যচ্ছটার কথা কবি তাঁর অনেক কবিতায় ও গদ্য রচনায় বলেছেন। তাঁর গানগুলো তাঁর এই ক্ষণিক অথচ অবিস্মরণীয় ভাবচ্ছটার বিশিষ্ট পরিচয়।

১১ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন, মানুষের অসুন্দর আচরণ দেখে, নিদয়তা দেখে, আমরা চাই ভগবান এসবের বিচার করুন। কিন্তু এসবের বিচার তিনি করেন জগতে সৌন্দর্য অম্লান রেখে, জননী, বন্ধু, জায়া এদের অন্তরে অপরাধীদেরও জন্য প্রেম অনির্বাণ রেখে।

যারা জগতে ঘোর অন্যায়, অত্যাচার করে চলেছে তাদের সেই পাপের ভার শেষে তাদেরও জন্য দুর্বহ হয়ে উঠতে আমরা দেখি, ও সেই অপরাধকারীদের জন্য করুণা বোধ করে ভগবানকে বলি—এদের মার্জনা করো। কিন্তু ভগবানের মার্জনার রূপ ভয়ঙ্কর—যা অসুন্দর ও অস্বাভাবিক তাঁর বিধানে তা বিধ্বস্ত হয় :

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়শিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১২ নম্বর কবিতায় কবি বলছেন, আমরা ভগবানের কাছে নানা ধরনের দান চেয়ে চলেছি; পেয়েছিও প্রচুর; কিন্তু সেইটি আমাদের জন্য সার্থকতার পথ নয়। আমরা সার্থক হতে পারি যদি ভগবানকে আমরা দিতে পারি, অর্থাৎ আমাদের যা শ্রেষ্ঠধন তা যদি বিশ্বকে দিতে পারি।

এই চিন্তা কবির রচনায় বারবার দেখা দিয়েছে।

১৩ নম্বর কবিতায় কবি তাঁর নব তারুণ্যের কথা মুখ্যভাবে বলেছেন। পৌষের পাতা-ঝরা বনে যেমন হঠাৎ বসন্তের বাতাস দেয় তেমনি কবির যৌবন বহুদিন বিগত হবার পরে নতুন করে তাঁতে আবির্ভূত হয়েছে। সেই যৌবন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
শুধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

অন্তরে যৌবনের আনন্দ ও উদ্দীপনা কবি চিরদিন অনুভব করেছিলেন বলা যায়। একেবারে শেষের দিকে সেই আনন্দ ও উদ্দীপনা বার্ধক্যের ক্লান্তিকে কখনো কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

১৪ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'মাধবী'। মাধবী ফুটে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরকার বহুকালের গোপন আয়োজনের ফলে, আর সেই ফোটা মাধবী অচিরস্থায়ী হলেও অপূর্ব শোভার আধার। কবির অন্তরাত্মার যা গভীরতম সাধ-স্বপ্ন তাও একদিন সেই মাধবীর মতো শুধু এক বেলাকার জন্যে ফুটে উঠে কবির জীবনকে ধন্য করবে, অন্তরে অন্তরে এই আশা তিনি পোষণ করেন।

পরম পাওয়াকে কবি বলেছেন ক্ষণিক, কেন না, একাল পর্যন্ত সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর হয়েছে। ইতিহাসেও সব শ্রেষ্ঠ পাওয়া এক হিসাবে ক্ষণিক পাওয়া, কেন না, তারপর তার বদল হচ্ছে।

বলা বাহুল্য কবির বিশেষ দৃষ্টি ফোটার অপূর্বতার দিকে। সেই ফোটার মুহূর্তই তাঁর কাছে পরম মুহূর্ত।

১৫ নম্বর কবিতায় কবি তাঁর কবিতাকে বলেছেন শৈবালের দল—শৈবালের মতো তাদের শিকড় কোথাও মাটিতে দৃঢ় মূল হয়নি।

মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে, আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।

বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,

অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

আপাতদৃষ্টিতে কবির গান ও কবিতা এই ধরনেরই মনে হয় বটে। কিন্তু আমরা দেখে আসছি কবির অন্তরে অন্তরে বয়ে চলেছে এক গভীর চেতনার ধারা—সেই উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর রচনা।

১৬ নম্বর কবিতায় এর নাম 'রূপ'। কবি বলেছেন, বিশ্বে বিপুল বস্তুরাশি আছে, আর মানুষের অসংখ্য ভাবনা-কামনা আছে—সেই সব বস্তুকে অবলম্বন করে মানুষের ভাবনা-কামনা ক্রমাগত রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে :

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি,—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

মানুষের যে-সব চিন্তা-ভাবনা আজও রূপ পায়নি, ভবিষ্যতে তারা বিচিত্র রূপ পাবে, হয়তো ভয়ঙ্কর রূপও পাবে—সেই অজানা ভবিষ্যতের কথা কবি ভাবছেন।

১৭ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'প্রেমের পরশ'। কবি বলেছেন, জগতের যত বৈভব সেসব তখন সার্থক হয়ে ওঠে যখন আমাদের প্রেমের দৃষ্টি সেসবের উপরে পড়ে। এই ভাব কবির অনেক লেখায় ব্যক্ত হয়েছে।

১৮ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'যাত্রা'। তাতে কবি বলেছেন, জাতিই জীবনের পরম সত্য। আমরা যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি ততক্ষণ যত কিছু বস্তুভার জমিয়ে রাখি—তাতে নতুন নতুন দুঃখের ভার বেড়ে যায়। কিন্তু যখন আমরা চলি তখন সেই চলার বেগে—

বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।

এই চলা-সম্বন্ধে কবি আরও বলেছেন :

পুণ্য হই সে-চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে

নবীন যৌবন

বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

এই গতির উদ্দীপনাকে কেউ কেউ ভাবতে পারেন শুধু গতির জন্য গতি. অর্থাৎ অন্ধ গতি। কিন্তু কবি এই কবিতার শেষে বলেছেন ঃ

ওরে মন,

যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।

তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,

গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

আসল কথা, এখানে কবির কোনো দার্শনিক চিন্তা ব্যক্ত হয়নি, ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নব যৌবন-বোধ আর সেই বোধের ফলে গতিতে অপরিসীম আনন্দ।—কবি আপন স্থবির জাতির মুক্তি দেখেছেন গতিতে।

১৯ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'জীবন মরণ'। এতে কবি বলেছেন, জগতকে তিনি এত ভালোবেসেছেন যে, তার ফলে তাঁর জীবন আর তাঁর ভুবন এক হয়ে গেছে ঃ

ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো

জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

কিন্তু কবি এও জানেন যে, এত ভালোবাসা সত্ত্বেও এই জগৎ একদিন তাঁকে ত্যাগ করে যেতে হবে ঃ

একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না

মোর আঁখি এ-আলোকে লুটিবে না,

মোর হিয়া ছুটিবে না

অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে,

মোর কানে কানে

রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,

শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এই অবস্থায় কবির সিদ্ধান্ত এই ঃ

এমন একান্ত করে চাওয়া

এও সত্য যত

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া

সেও সেই মতো।

এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

২০ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'যাত্রাগান'। কবির সুরুল থেকে ক'লকাতায় যাবার কালে রেলগাড়িতে এটি লেখা হয়। কিন্তু এতে কবির যে ব্যথার গভীরতা ও আনন্দের উদ্দীপনা ব্যক্ত হয়েছে সেটি ঠিক কি জন্য তা জানা যাচ্ছে না। ব্যথা এবং আনন্দ দুইই বেশ উচ্ছলিত এই কবিতাটিতে ঃ

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে ;
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২১ নম্বর কবিতাটি সম্পর্কে (এর নাম ছিল 'অগ্রণী') চারুবাবু লিখেছেন ঃ ২১ পৌষ (১৩২১) এলাহাবাদ থেকে (সুরুল হয়ে) ক'লকাতায় ফিরবার কালে কবি রেললাইনের দুইধারে বুনো ফুলের সমারোহ দেখে বলেছিলেন, কবে বসন্ত আসবে তার খবর নিয়ে এই সব বসন্তের দূত এসে হাজির হয়েছে, এরা দুদিন বাদেই ঝরে মরে যাবে, এদের সঙ্গে বসন্তের সাক্ষাৎ ঘটবে না, কিন্তু এরা যে বসন্তের আগমনী—এদের রূপে গন্ধে মধুতে গেয়ে যেতে পারল এই আনন্দেই অকাল মরণ বরণ করে নিচ্ছে হাসিমুখেই।—ক'লকাতায় গিয়ে সেই বুনো ফুলদের সম্বন্ধে কবি এই কবিতাটি লেখেন। এই নাম-না-জানা ফুলদের তিনি সম্বোধন করেছেন "ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল" বলে।

যারা মহৎ-কিছুর জন্যে দুঃখ-ক্ষতি-মৃত্যু বরণ করতে কুণ্ঠিত নয় তাদের প্রতি কবি বারবার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

২২ নম্বর কবিতাটির নাম ছিল 'মুক্তি'। এর পূর্বেই আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন ধরে কবির মনে চলেছিল একান্ত ভগবৎ-শরণ কামনা। তারপরে গীতালির শেষের দিকে তাঁর চোখে যেন নতুন করে পড়ে বৃহৎ জগৎ। ভগবানের সঙ্গে এই যে নতুন ধরনের দূরত্ব কবি অনুভব করেছেন তারই কথা এই কবিতায় বলা হয়েছে মনে হয়।

এই মুক্তিতে কবি একটা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করছেন এই জন্য যে, এর ফলে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন :

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
তাড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলতে টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

কবি পঞ্চভূতে বলেছেন : "একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই"। "মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল লুকিয়ে থাকে" শীর্ষক গানটি এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

২৩ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'দুই নারী'। নারীত্বের দুই রূপ কবি দেখেছেন—উর্বশীতে ও লক্ষ্মীতে। উর্বশী মোহিনী আর লক্ষ্মী কল্যাণী। নারীর এই দুই রূপের কথা কবি আরো কয়েকটি কবিতায় বলেছেন।

২৪ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'স্বর্গ'। স্বর্গ বলতে মানুষ যা কল্পনা করেছে কবির মতে তা কল্পনাই। সেই স্বর্গ লুকিয়ে আছে আমাদের এই ধুলোমাটির ধরায়। সেই স্বর্গ গড়ে তোলার কথা কবি পরে বলেছেন।

২৫ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'এবার'। এতে কবি বলেছেন, নব-যৌবনে যেমন কলহাস্য তুলে ফাল্গুন কবির আঙিনায় আসতো এখন আর তেমন করে সে আসে না :

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে,
অনিমেষে

নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

২৬ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'আবার'। কবি বলেছেন, ফাল্গুন আবার তাঁর কুঞ্জবীথিকায় আসুক প্রেমের 'সোনার বরণ' ফুল ফোটাবার জন্যে :

আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

২৭ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'রাজা'। প্রজারা রাজার খাজনার দায় এড়াবার জন্য মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এমন রাজা যে, তাঁর খাজনার তলব এড়াবার উপায় মানুষের নেই। মানুষকে তিনি পুরোপুরি জানেন।

কবি বলেছেন, এমন রাজার দায় যখন এড়াবার উপায় নেই তখন নিজেদের সব বিকিয়ে দিয়ে সেই দায় থেকে অব্যাহতি পেতে হবে। অর্থাৎ চাই তাঁতে সর্বস্বসমর্পণ।

এই সর্বস্বসমর্পণের পরে আমাদের যে স্বত্ব লাভ হবে তাই ভগবানের রাজত্বে আমাদের পাকা স্বত্ব।

২৮ নম্বর কবিতাটির নাম ছিল 'দেনা-পাওনা'। এটি সুপ্রসিদ্ধ। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের একটি বিশেষ দিক এতে খুব একটি লক্ষণীয় রূপ পেয়েছে।

কবির বক্তব্য এই : মানুষ ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টি ভগবানের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাই তাদের একমাত্র সম্বল—সে সবের উৎকর্ষসাধনের দায় তাদের নেই। কিন্তু মানুষ ভগবানের কাছ থেকে যা পেয়েছে অতন্দ্রিত চেষ্টায় তার উৎকর্ষ সাধন করে তবেই সেইসব শক্তির সদ্‌ব্যবহার সে করতে পারে।

কবির মূল বক্তব্যটি রূপ পেয়েছে এই কবিতার শেষ দুই স্তবকে :

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসি মুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

মানুষের শুধু ভগবানের কাছ থেকে নিলে চলবে না তাঁকে দিতে হবে, আর সেই দেওয়াতেই মানুষের চরিতার্থতা—এ কথা বহুভাবেই কবি বলেছেন।

এতে কবির উপলব্ধির স্বচ্ছতা লক্ষণীয়। গ্যেটেও এই ভাব ব্যক্ত করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত "নর-দেবতা" কবিতায় ( কবিগুরু গ্যেটে দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৪-৯৭ দ্রঃ )। তার প্রথম স্তবকটি এই ঃ

মানুষ হবে মহৎ,
হবে হিতৈষী ও সৎ,—
এই কেবল তাকে
পৃথক করতে পারে
বিশ্বচরাচরের
সকল কিছু থেকে।

২৯ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'তুমি আমি'।

কবি বলেছেন যে, পর্যন্ত না ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন সে পর্যন্ত নিজেকে তিনি দেখেননি—জানেননি। ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট মানুষের ভিতরে ভালোমন্দের যে দ্বন্দ্ব—সেই দ্বন্দ্বে কখনো তার পরাভব, কখনো তার বিজয়—তাই দেখে ভগবান নিজেকে উপলব্ধি করলেন ঃ

আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

মানুষের পরাভব দেখে ভগবান ব্যথিত হন ; তার বিজয় দেখবার জন্য তাঁর অসীম কৌতূহল।

প্রাচীন ভাবুকরা বলেছেন ভক্ত না হলে ভগবানের প্রকাশ হ'ত না।

৩০ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'অজানা'। অজানার প্রেমের আকর্ষণ দুর্বার—এই কথা কবি বলেছেন ঃ

আমি যে অজানার জাতি সেই যে আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ
এক নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

স্মরণীয় ঃ ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।

৩১ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন, ভগবানের সৃষ্টি তাঁর (ভগবানের) চোখে নতুন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয় সেই সৃষ্টিতে আমাদের যে গভীর আনন্দ তার ভিতর দিয়ে তাকে দেখে আমাদের সত্তার চমকে তাঁর সত্তা চমকিত হয়।

এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

৩২ নম্বর কবিতায় কবি স্মরণীয় করেছেন বিজন পদ্মাতীরে তিনি যে একটি অপূর্ব সন্ধ্যা দেখেছিলেন সেইটি। চিরকালের ধন এমনি করেই ক্ষণকালে লাভ হয় ঃ

তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নতুন করি।

'ক্ষণিকা'র একটি কবিতায়ও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এর ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ নম্বর কবিতা ৩১ ও ৩২ নম্বরের সঙ্গে তুলনীয়।

৩৬ নম্বর কবিতাটি অতি বিখ্যাত। এই কবিতা সম্পর্কে কবি বলেছেন ঃ

'বলাকা' বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই

এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আরেক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাকপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানিনে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানিনে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—এখানে নয়, এখানে নয়।

জগৎ এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছে, আর সেই ভবিষ্যৎ অনেকটা মঙ্গল-ভবিষ্যৎ, এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো ধারণা অথবা বিশ্বাস। সেই ধারণা অথবা বিশ্বাস, এক গভীর আবেগময় রূপ পেয়েছে এই কবিতায়। এই দিক দিয়ে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এই কবিতাটি বিশিষ্ট।

এর ৩৭ নম্বর কবিতাটিও বিখ্যাত। মহাযুদ্ধের মতো এমন প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার কেন ঘটলো আর সেই প্রলয়কালে দায়িত্ববোধসম্পন্ন লোকদের কি করণীয় সে সম্বন্ধে কবির বক্তব্য সংক্ষেপে এই :

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় বারবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

এই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে যে মঙ্গল-ভবিষ্যৎ আসছে সে সম্বন্ধে কবি অনেকটা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন ঃ

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?

বলা বাহুল্য কবির আশা আজও ফলবতী হয়নি। তবে আশা ভিন্ন আর কিই-বা সম্বল মানুষের আছে !

৩৮ নম্বর কবিতাটি খুব বিশিষ্ট। এর নাম ছিল 'নূতন বসন'। নতুন বসন কবির মনে যে আনন্দ-চাঞ্চল্য জাগায় তার প্রকাশ এতে অপূর্ব হয়েছে। সেকালের অভিসারিকার বেশবিন্যাসের আনন্দের যেন এক নতুন প্রকাশ আমরা দেখছি একালের কবির রচনায় ঃ

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতনভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয় যে তারে আনি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ,

তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফরানী,
আজ তোরা দেখ্ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি,
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।

৩৯ নম্বর কবিতাটি লেখা হয়েছিল শেক্সপীয়রের মৃত্যুর তিনশততম স্মৃতি বার্ষিক উপলক্ষে। মহৎ প্রতিভা কালে কালে মানুষের চেতনায় কেমন নতুন নতুন রূপ লাভ করে চলে—সেই কথা কবি বলেছেন।

৪০ নম্বর কবিতার নাম ছিল 'চেয়ে দেখা'। আমাদের চেতনার দুটি ভাগ। একটি শুধু বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত, অপরটিতে প্রতিভাত হয় যেসব অতীত ঘটনা ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা এসেছি সে সবের আভাস-ইঙ্গিত। এই দুয়ের যোগের ফলে আমরা যা দেখি তাতে বিচিত্রভাবে ছায়া ফেলে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা—যার অনেকটা আমরা ভুলে গেছি—মনে হয় এই কবি বলেছেন।

৪১ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন, চোখের সামনে তিনি যা-কিছু দেখেছেন তা এক দিব্য শোভায় মণ্ডিত হয়ে তাঁকে অসীম আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু সেই আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি কথাটি যোগ্যভাবে বলার ভাষা তিনি খুঁজে পাননি।

৪২ নম্বর কবিতায় কবির বক্তব্য মনে হয় এই ঃ

> যা আমাদের জীবনের জন্য সত্য ও সার্থক তা সুন্দরের বেশে, দীন-দরিদ্রের বেশে, শান্তিভঙ্গকারীদের বেশে বার বার আমাদের সামনে আসে, কিন্তু তাদের এড়িয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবনধারায় ব্যাপৃত হয়ে আমরা জীবন কাটাই, কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারি সেই জীবনধারায় সুখ নেই—সত্য ও সার্থককে বাদ দিয়ে জীবন নিরানন্দ।

৪৩ নম্বর কবিতায় কবির বক্তব্য মনে হয় এই ঃ

অনন্ত পরিবর্তন-স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। পিছনে যা ফেলে এলাম তা আমাদের মনে বেদনা জাগায় আর সামনে যা আসছে তা আমাদের আকর্ষণ করে। আমরা যে জীবন-বীণা বাজাচ্ছি ক্রমাগত তা ফেলে ফেলে যাচ্ছি, তবে সেই বীণার গান আমাদের মনের মধ্যে রয়ে যায় আর আমাদের সেই গান যে শুনছে সেই প্রিয়া আমাদের চিরদিনের। কিন্তু সেই প্রিয়াকে হঠাৎ কখনো কখনো দেখতে পাই, তার বেশি তাকে পাই না ঃ

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসাযাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে।

এই কবিতাটির নাম ছিল 'পথের প্রেম'। পথ আমাদের ক্রমাগত আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে, সেই পথের বাঁকে বাকে নতুন নতুন সৌন্দর্যের ঝলকে আমাদের মনপ্রাণ মুগ্ধ হয়।

৪৪ নম্বর কবিতাটির নাম ছিল 'যৌবন'। যৌবনের এক অপূর্ব জয়গান এটি। কবিতা হিসাবেও এটি উচ্চাঙ্গের—চিন্তা, রূপকল্পনার প্রকাশ, সবদিক দিয়েই। এর প্রথম স্তবকে যৌবনকে কবি বলেছেন ঃ

তুই পথহীন সাগর পারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত ;

দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন ঃ

মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটা পথে
তুই যে শিকারি ···

তৃতীয় স্তবকে বলেছেন ঃ

তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাধনে····;

চতুর্থ স্তবকে জরা-জয়ী যৌবনকে বলেছেন ঃ

খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
অমর পুষ্প তব,
আলোক পানে—লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

আর শেষ স্তবকে কবি দেখেছেন যৌবনের চিরজ্যোতিষ্মান রূপ ঃ

প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্ধ্বশিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

বলাকার শেষ কবিতাটির নাম ছিল 'নববর্ষের আশীর্বাদ'।

কবি বলেছেন, যে জীবনপথের যাত্রী তার জন্য—

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ....

এই সবকে যাত্রী যেন গ্রহণ করে রুদ্রের প্রসাদরূপে ; অমৃতের অধিকার এমনি ভাবেই লাভ হয়—তা সুখ-শান্তি ও আরামের ব্যাপার কদাচ নয়।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্য বিশেষভাবে খ্যাত তার গতি-তত্ত্বের জন্যে। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান স্তরে গতি খুবই অর্থপূর্ণ। কিন্তু তবু এই ব্যাপারটি সাময়িক।

বলাকার সত্যকার লক্ষণীয় সম্পদ কবির নতুন যৌবনবোধ—নতুন উদ্দীপ্ত আশা। তাই তার প্রকাশ মাঝে মাঝে অপূর্ব হয়েছে। সেই উদ্দীপ্ত আশা ও আনন্দ কবির 'আমি'-কে বিশেষ অর্থপূর্ণ করেছে।

এর তিনটি কবিতা আমাদের কাছে খুবই উচ্চাঙ্গের মনে হয়েছে—২৮ নম্বর ('পাখিরে দিয়েছ গান গায় সেই গান' শীর্ষক), ৩৬ নম্বর ('সন্ধ্যা-রাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' শীর্ষক) আর ৪৪ নম্বর ('যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে' শীর্ষক)। চিন্তা, কল্পনা, রূপ, এসবের সংমিশ্রণ সবই এই কবিতাগুলোয় উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

বলাকার কবিতাগুলো অনেকটা বুদ্ধিদীপ্ত। সেই সঙ্গে অনুরাগদীপ্তও সেসব। কিন্তু পূরবীর কাল থেকে বুদ্ধির দীপ্তি অনেক সময়ে কবির কাব্যের মুখ্য সম্পদ হয়েছে।

# ফাল্গুনী

ফাল্গুনী সবুজপত্রে বেরোয় ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যায়। এর ভূমিকাটি (তখন এর নাম ছিল বৈরাগ্যসাধন) বেরোয় সবুজপত্রের ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যায়। ফাল্গুনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালের ফাল্গুনে।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে ফাল্গুনী ১৩২২ সালের মাঘে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্পর্কে প্রভাতবাবু বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ একাধারে বৈরাগ্য সাধনের তরুণ কবিশেখরের ভূমিকায় ও ফাল্গুনীতে বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয়ের পূর্বে তিনি স্বয়ং তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে সাজিয়া নামিয়া আসিলেন, মনে আছে সাজঘরের কাছে তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া গিয়াছিলাম ; রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে দর্শকদের কী জয়োচ্ছ্বাস। ত্রিশ বৎসর পূর্বের যুবক রবীন্দ্রনাথ যেন নবকলেবরে সেখানে উপস্থিত। সে কী চঞ্চল-জীবন্ত মূর্তি! তারপর আসিলেন বৃদ্ধ অন্ধ বাউলের রূপে। তখন সে আবার কী শান্ত সমাহিত মূর্তি। 'ধীরে বন্ধু ধীরে' এই গানটি কবির কণ্ঠে সেদিন যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমৃত্যু তাঁহাদের কর্ণে সেটি ধ্বনিত হইবে।

বলা বাহুল্য ফাল্গুনী একটি ঋতুনাট্য। ঋতুনাট্য সম্বন্ধে কবির মুখ্য বক্তব্য আমরা শারদোৎসবের ভূমিকায় পেয়েছি। শারদোৎসবের মতো ফাল্গুনীরও প্রধান আকর্ষণস্থল এর গানগুলো। যৌবনের আনন্দ ও উদ্দীপনা অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে সেইসব গানে এবং কিছু কিছু সংলাপেও। কবি এটিকে বলেছেন নাট্যকাব্য, অর্থাৎ নাট্যের আকারে কাব্য। সেই কাব্যও অবশ্য গীতিকাব্য। তবে ভাল গাইয়ে আর ভাল অভিনেতাদের সংযোগ ঘটলে যে এটি একটি পরম উপভোগ্য নাট্যও হ'তে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে এটি মুখ্যত উপভোগ্য কাব্যরূপে অথবা পালাকীর্তন রূপে।

কবি তাঁর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে ফাল্গুনী সম্বন্ধে বলেছেন :

> জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে

তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার-সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছনদিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে,—আনবো সেই জরাবুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে।

ফাল্গুনীর ভূমিকাটি কবির একটি অপূর্ব রচনা। দেশের যেসব পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছিলেন, কবির কাব্যে বাস্তবতা নেই, দেশের লোক কবির কাব্য বোঝে না, কবি যেন দশহস্তে শ্লেষ-শর নিক্ষেপ করে তাঁদের বিদ্ধ করেছেন। আর সেই সন্ধান কী অব্যর্থ!

গতিতে কবির অসীম প্রীতি আর নতুন যৌবনবোধ আমরা বলাকা কাব্যে দেখেছি। কবির গীতপ্রীতি তার পূর্বে গীতালিতেও দেখেছি। কবির সেই গীতপ্রেমের আর যৌবনবোধের একটি উচ্ছলিত রূপ আমরা পাই ফাল্গুনীতে।

এর চরিত্রগুলো সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানারকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে খবরটা এখনও তাদের মনের মধ্যে পৌছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই

বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

অচলায়তনের ঘোরস্থিতিধর্মী মহাপঞ্চকের প্রতি কবি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন ফাল্গুনীর 'দাদা' সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য সেই ধরনের। কবি যে যথেষ্ট আশাবাদী তার পরিচয় রয়েছে তাঁর এই মনোভাবে। কিন্তু আসলে মহাপঞ্চক ও 'দাদা'র মতো লোকদের বদলানো কঠিন। অন্য কথায়, অচলায়তনে ও ফাল্গুনীতে কবির মতের চাইতে তাঁর সৃষ্টি বেশি অর্থপূর্ণ হয়েছে।

# সবুজপত্রের যুগের ছোটগল্প

সাধনার যুগের ছোটগল্পের পরে ১৩০৫ সালে ভারতীতে যেসব ছোটগল্প প্রকাশিত হয় সেসবের অন্তত প্রথমটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। অপর-গুলোর সত্যকার যোগ সাধনার যুগের ছোটগল্পের সঙ্গে তেমন নয়। সাধনার যুগ ও সবুজপত্রের যুগ এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান সাড়ে আঠারো বৎসরের। এই দীর্ঘকালে কবি বেশি ছোটগল্প লেখেননি—১৩০৫ সালে ভারতীতে লিখেছিলেন সাতটি, তার পরে ১৩০৭ থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখেন ১৩টি ( নষ্টনীড় বাদে, তার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে )। ১৩০৫ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত লেখা ছোটগল্পগুলোর একটি সাধারণ লক্ষণ যদি নির্দেশ করতে হয় তবে বলা যায়—সেটি হচ্ছে গল্পের পাত্র-পাত্রীদের মনোবিশ্লেষণের দিকে কবির কিছু বেশি ঝোঁক—সেই ঝোঁকে কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়েছে এই কালের ছোটগল্পের পাত্র-পাত্রীদের প্রাণধর্ম। এই কালের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৩১৮ সালে লেখা দুইটি গল্প—'রাসমণির ছেলে' ও 'পণরক্ষা' সুপ্রসিদ্ধ। দুটিই খুব করুণ। চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে এই দুইটিতে বিশেষ লক্ষণীয় রাসমণি।

কিন্তু ১৩২১ সালের সবুজপত্রের ছোটগল্পগুলোতে কবির মন ও মেজাজের সম্পূর্ণ নতুন স্পর্শ আমরা পাই। কবির এই কালের যে নবযৌবনবোধ অথবা নবজীবনবোধ তার স্পর্শ তো আমরা পাই-ই, সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোর পরিবেশ-সচেতনতা বা কবির জগৎ-সচেতনতা নতুন শক্তি ও সৌষ্ঠব নিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। প্রাণপ্রাচুর্য ও সমৃদ্ধতর মনীষা এই দুয়ের যোগে সবুজপত্রের যুগের ছোটগল্প খুবই বিশিষ্ট।

সবুজপত্রের বৈশাখ সংখ্যা থেকে কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত পর পর সাতটি গল্প কবি লেখেন। তারপর কয়েক বৎসর তিনি ছোটগল্প লেখেননি। এই গল্প-গুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক্।

প্রথম গল্প 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারিলাল কবির একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ব্যক্তির বিশিষ্ট রূপের দিকে কবির নজর সবসময়েই রয়েছে—তারই ফলে তাঁর সৃষ্টি শেক্সপীয়র, গ্যেটে, টলস্টয় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের মতো এতো বিচিত্র হয়েছে

—বনোয়ারিলালে কবি একই সঙ্গে দেখেছেন তার অনেকটা খাপছাড়া ব্যক্তিত্ব আর তার পরিবেশের বিচিত্র ভঙ্গীর দুরতিক্রম্য বাস্তবতা। খাপছাড়া ব্যক্তিত্ব কবি পূর্বেও আঁকতে চেষ্টা করেছেন—যেমন, 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিত্বের খাপছাড়া দিকটাই বেশি স্পষ্ট হয়েছে, সে তুলনায় সেই ব্যক্তিত্বকে ধারণ করে আছে যে পরিবেশ তার বাস্তবতা তেমন পর্যাপ্ত রূপ পায়নি। সবুজ পত্রের যুগের গল্পগুলো বিশিষ্ট হয়েছে যেমন তাদের চরিত্রগুলোর সহজ প্রাণ-সম্পদের গুণে তেমনি বা ততোধিক তাদের পরিবেশের বাস্তবতার উপরে কবি যে প্রচুর আলোকপাত করতে পেরেছেন তার ফলে। সাধনার যুগের কোনো কোনো গল্পেও কবির এই ক্ষমতার পরিচয় রয়েছে, তবে সবুজপত্রের যুগে কবির এই ক্ষমতা আরও স্বচ্ছন্দ হয়েছে।

এই গল্পগুলো সম্বন্ধে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে: পরিবেশ যতই কঠোর হোক সেই পরিবেশের পাষাণ-দেয়ালে মাথা ঠুকে এদের পাত্রপাত্রীরা শুধু রক্তাক্তই হচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত তারা সেই পরিবেশকে অগ্রাহ্য করছে, অন্তত তার সামনে মাথা নত করছে না—তা সেজন্য যত মূল্যই তাদের দিতে হোক।

দ্বিতীয় গল্প 'হৈমন্তী'।

এর গল্পাংশ যৎসামান্য। এর বিশিষ্ট সম্পদ এর দুইটি চরিত্র—হৈমন্তী আর তার পিতা গৌরীশঙ্কর। দুজনেই স্বল্পবাক্। তাদের রূপও কবি এঁকেছেন অল্প কয়েকটি রেখায়। হৈমন্তীর পিতা সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

> ....যে হিমালয়ে বাস করিতেন সেই হিমালয়ের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গাম্ভীর্যের শিখরদেশে একটি স্থির হাস্য শুভ্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদয়ের ভিতরটিতে স্নেহের যে একটি প্রস্রবণ ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

আর হৈমন্তী সম্বন্ধে বলেছেন:

> ....এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গলিল না। আমি জানি, কী অকলঙ্ক শুভ্র সে, কী নিবিড় পবিত্র।

বাংলাদেশ থেকে দূরে পশ্চিমে তাদের জীবন কেটেছে, অনেকটা তাতেই বাঙালী হয়েও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় তারা এতটা স্বতন্ত্র।

বিবাহের বাজারে আমাদের দেশে বরপক্ষ যে অতি দায়িত্বহীন মনোভাবের

পরিচয় দেয় তা খুব জানা ব্যাপার। কবির বর্ণনা তাই একটুও অতিরঞ্জিত হয় নি। বধূ-নির্যাতন প্রতিরোধে তরুণ বরের শোচনীয় অক্ষমতা যা আঁকা হয়েছে তাও অতিরঞ্জিত নয়। বর নিজেকে আর দেশের ঐতিহ্যের দুর্বল অংশকে কঠিন ধিক্কার দিচ্ছে এই বলে :

> বন্ধুরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন। স্ত্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন? কেন! যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী পরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।

Art for art's sake-বাদের প্রতি কবির অনুরাগ সুবিদিত। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই সবুজপত্রের যুগেও দেখছি, জীবনে কি গ্রহণীয় আর কি বর্জনীয় আর্টের ক্ষেত্রেও সে চিন্তা কবির ভিতরে প্রবল। সবুজপত্রের যুগের ছোটগল্পগুলোকে তো প্রচারধর্মীই বলা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা রসোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প, তার কারণ, কবির দৃষ্টি যেমন সাময়িকের দিকে তেমনি চিরন্তনের দিকেও। বনোয়ারিলাল, হৈমন্তী, গৌরীশঙ্কর—এরা শুধু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী নরনারী নয়, এরা চিরন্তন নরনারীও। কবির এই যুগের সৃষ্টি ইবসেনের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়।

তৃতীয় গল্প 'বোষ্টমী'।

শিলাইদহ অঞ্চলে সর্বক্ষেপি নামে একজন বৈষ্ণবী ছিল; কবিকে সে গৌর বলতো—বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির সঙ্গে তার আলাপও হতো। কেউ কেউ বলেছেন তাকে অবলম্বন করেই এই 'বোষ্টমী' গল্পটি লেখা হয়েছে।

বৈষ্ণবীর গার্হস্থ্য জীবন সুখেরই ছিল। তার স্বামী ছিল বেশ ভালো মানুষ আর তার প্রতি যথেষ্ট স্নেহশীল। কিন্তু তাদের গুরুঠাকুরের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তার উপরে। সেই গুরুঠাকুর ছিল অতি সুদর্শন, তার স্বামীর সমবয়সী, আর তাদের বিশেষ ভক্তির পাত্র। এতেই সংসার-জীবন বৈষ্ণবীর

কাছে স্বাদহীন অর্থহীন হয়ে যায়—সে সংসার ত্যাগ করে বৈষ্ণবীর জীবন গ্রহণ করে।

বৈষ্ণবীও বিদ্রোহিনী নারী—সবুজপত্রের যুগে সৃষ্ট অনেক নারীই বিদ্রোহিনী—ভগবানের নাম করে, তাঁর শরণ নিয়ে, সে অনির্ভরযোগ্য সংসার-জীবন ছেড়ে আসার দুঃখ অনেকখানি ভুলতে পেরেছে। বোষ্টমীর ভক্তিমণ্ডিত পথচারী জীবন একটি সুন্দর রূপ পেয়েছে এতে।

চতুর্থ গল্প 'স্ত্রীর পত্র'।

এটি খুব বিখ্যাত। এটি কবির বিরুদ্ধপক্ষের যথেষ্ট উষ্মার কারণ হয়েছিল।

এতে দুইটি বিশিষ্ট নারী-চরিত্র আমরা পাচ্ছি—মেজবৌ মৃণাল আর পাগল স্বামীর বিবাহিতা আশ্রয়হীনা বিন্দু। বিন্দুর মতো মেয়েরা আমাদের দেশে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করে কবি তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে তাকে অবিস্মরণীয় রূপ দিয়েছেন—আর সেই সঙ্গে মৃণালের তীক্ষ্ণ ও সবল বিচারবুদ্ধি ও গভীর বেদনাবোধও তিনি রূপায়িত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে নারীর বিদ্রোহের এমন শক্তিশালী রূপ আর আঁকা হয়নি।

বিন্দু তার দুর্বহ জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেলে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে—এই সময়ে বহু মেয়ে নানাকারণে এমনভাবে আত্মহত্যা করেছিল—আর মৃণাল সংকল্প গ্রহণ করলে সম্মান ও স্বাধীনতা-বিহীন গার্হস্থ্য জীবনে সে আর ফিরে যাবে না।

বলা বাহুল্য এটি একটি চরম পন্থা। মনে হয় কবি বলতে চান : এমন চরম দশায় এমন চরম পন্থা অবলম্বন করেও মানব-আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করা চাই—নারীরও জন্য তাইই পথ।—মৃণালের চিঠির শেষ অংশ এই :

> তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল, প্রভু—তাতে তার আর যা হবার তা হোক। এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা।
>
> আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।

পঞ্চম গল্প 'ভাই ফোঁটা'।

এটি মুখ্যত মনস্তাত্ত্বিক। নায়ক সত্যধন দত্ত যে বংশের সন্তান তার বিশেষ খ্যাতি ছিল ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য। সত্যধন সেই ঐতিহ্যেই মানুষ। নিজেকেও

সবুজপত্রে যখন 'জ্যাঠামশায়' বেরিয়েছিল তখন অনেকেই এটিকে একটি ছোটোগল্প মনে করেছিলেন। বাস্তবিক এই অধ্যায়টি ছোটগল্পের মতনই পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু পরের অধ্যায়গুলো থেকে বোঝা গেল জীবন-সাধনা-সম্বন্ধে অনেক জটিল ব্যাপারের ইঙ্গিত কবি তাঁর এই চতুরঙ্গ উপন্যাসে দিয়েছেন।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এর প্রধান চরিত্র জ্যাঠামশায়। জ্যাঠামশায় এতে একটি প্রবল চরিত্র নিঃসন্দেহ—এমন শ্রদ্ধার ও প্রীতির যোগ্য নাস্তিক কবি আর আঁকেন নি। কিন্তু আসলে শচীশের কথাই, অর্থাৎ নানা জটিল ভাবাবর্তের ভিতর দিয়ে শচীশের অন্তরাত্মার শেষ পর্যন্ত একটি বন্দরে এসে ভেড়ার কথা, চতুরঙ্গের মুখ্য বিষয়। আর শচীশের পরেই দামিনীর কথাও এতে একটা বড়ো জায়গা দখল করেছে। শ্রীবিলাস মোটের উপর এতে একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন দর্শক।

শচীশের জীবনের আরম্ভ তার নাস্তিক জ্যাঠা জগমোহনের চেলা রূপে। কবির জীবনস্মৃতিতে দেখা যায় তাঁর ছেলেবেলায় শিক্ষিতদের কেউ কেউ নাস্তিক্যে খুব আগ্রহ দেখাতেন। জগমোহন তেমনি একজন উৎসাহী নাস্তিক। তবে জগমোহনের সত্যকার পরিচয় এই যে, দেশের ভদ্রসমাজেরও অনাচারে ও মূঢ়তায় তাঁর বেদনা ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না—তাঁর নাস্তিক্য সেই বেদনা ও ক্ষোভ থেকে জাত। তাই তাঁর চরিত্রে মানবিক আবেদন খুব বেশি। দেশের এই অনাচার ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই হল জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে শচীশের প্রথম পাঠ গ্রহণ।—'জ্যাঠামশায়' অধ্যায়ে জগমোহনের ছোট ভাই হরিমোহনের চরিত্রও কবি যত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিচারহীনতা, ভয়, দুর্বুদ্ধি, এসব মানুষের জীবনে কত বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। হরিমোহন তার জীবন্ত মূর্তি। অথচ কবির আঁকা হরিমোহন অত্যন্ত বাস্তব—দেশের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই তা স্বীকার করতে বাধ্য। দেশের মূঢ়তা, দুর্বলতা এত রূপে এই অভিজাত বংশের সন্তানের চোখে পড়েছিল, আর তাঁকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ করেছিল এসব ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

শচীশের মতো আরো কয়েকজন তরুণ জ্যাঠামশায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল; তাদের একজন শ্রীবিলাস—শচীশের সহপাঠী ও তার বিশেষ ভক্ত। 'চতুরঙ্গ' গল্পটির প্রবক্তা শ্রীবিলাস।

সেবার কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে পাড়ার নিম্নস্তরের লোকদের চিকিৎসার জন্য জগমোহন শচীশ প্রভৃতির সাহায্যে নিজের বাড়িতে একটি প্লেগ হাসপাতাল খোলেন। এই প্লেগে জগমোহন মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শচীশকে বললেন: "যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।"

তাঁর মৃত্যুর পরে শচীশ যে কোথায় গেল তার দলের লোকেরা দুই বৎসর পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর পেলে না। শেষে শ্রীবিলাস জানলে শচীশ অর্থাৎ নাস্তিক শিরোমণি শচীশ, লীলানন্দ স্বামীর দলে যোগ দিয়ে কীর্তনে মেতে নেচে বেড়াচ্ছে।

শচীশের সঙ্গে দেখা হ'লে শচীশ শ্রীবিলাসকে বললে:

জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন। ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়, জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে-মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি,—এখন রাতের বেলাকার এ-মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ-দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

শচীশের ভিতরে যে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে সে-সম্পর্কে শ্রীবিলাসের মন্তব্য এই:

বুঝিলাম, শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি সেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে আমি শ্রীলিবাস নয়, সে-আমি "সর্বভূত"—সে-আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো—নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক আমার তো নাই, আমি তো ভেদ জ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না—আমি যে আমি।

একালের বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সেকালের ভাবাবেগধর্মী ভক্তির সাধনার পার্থক্য কোথায় সে কথাটি শ্রীবিলাসের এই উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শচীশ এই দুই সাধনারই মর্ম উপলব্ধি করতে চায়। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত শচীশের এই ভাবোন্মাদ কেটে গেল। তার জীবনের বড়ো সিদ্ধান্ত দাঁড়াল:

যে-মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।....

....তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া

আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ-কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

বলা বাহুল্য কবির জীবনেও এটি একটি বড়ো সিদ্ধান্ত।

লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে বাসকালে শচীশের জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য হয়েছিল তার প্রতি দামিনীর আকর্ষণ। দামিনী লীলানন্দ স্বামীর এক ভক্তের সন্তানহীনা স্ত্রী, মৃত্যুকালে সেই ভক্ত তার বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে তার যুবতী স্ত্রীরও ভার গুরুর উপরেই দিয়ে যায়। কিন্তু ভক্তির ভাব দামিনীতে ছিল না। তার সম্বন্ধে শচীশ তার ডায়ারিতে মন্তব্য করে:

····দামিনীর মধ্যে নারীর····এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে-নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী প্রবলভাবে আকৃষ্ট হ'ল শচীশের প্রতি। নিজের সঙ্গে কিছুদিন তার যোঝাবুঝি চললো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উপযাচিকা হয়ে একরাতে প্রবেশ করলো শচীশের শয়নকক্ষে। শচীশ ঘুমের ঘোরে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারলে। বুকে যথেষ্ট আঘাত পেয়ে দামিনী শচীশের কক্ষ থেকে ফিরে এলো।

এর পর শচীশকে পাবার আশা ত্যাগ করে দামিনী চাইলো শচীশের সেবা করে জীবন কাটাবে। কিন্তু শচীশ সে সেবা গ্রহণ করলে না, বললে: "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

শেষ পর্যন্ত দামিনীর বিবাহ হ'ল শ্রীবিলাসের সঙ্গে শ্রীবিলাসেরই আগ্রহে। দামিনীর উদগ্র কামনা শচীশের কাছে যে আঘাত পেয়েছিল তারই ভিতর দিয়ে তার শোধন হ'ল।—সে বুকে যে আঘাত পেয়েছিল সেটি পরে কঠিন আকার ধারণ করে। সে-সম্পর্কে সে শ্রীবিলাসকে বলেছিল:

সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল····তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে···· এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া

তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য ?

সেই আঘাতেরই ফলে অল্পদিনেই দামিনীর মৃত্যু হলো। মৃত্যুর সময় শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলো নিয়ে সে বললে, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

তাদের বিবাহ সম্বন্ধে কবির বক্তব্য মনে হয় এই : তারা দুজনেই স্বাভাবিক ও সাধারণ নরনারী কোনো আদর্শের বা আইডিয়ার তাড়নায় একঝোঁকা হওয়া তাদের স্বভাব নয়। নানা ঘটনার ফলে তাদের জীবন হলো সমৃদ্ধ আর সুপরিণত। তাই তাদের মিলন হলো নির্ভরযোগ্য মিলন—যোগ্যপাত্রের সঙ্গে যোগ্যপাত্রীর মিলন। কিন্তু তবু শ্রীবিলাসের মন কেন দামিনীর দিকে আকৃষ্ট হলো তা ভাল বোঝা গেল না। হয়ত সে সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য : প্রেম অন্ধ। তবে অন্ধপ্রেম যে দুইজনের সম্মেলন ঘটালো তারা সুপরিণত যুবক-যুবতী—তাদের মিলন সার্থক হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

আমরা বলেছি জীবনসাধনা সম্বন্ধে অনেক জটিল ব্যাপারের ইঙ্গিত কবি চতুরঙ্গে দিয়েছেন। বাস্তবিক কবি যেসব কথা বলেছেন সেসব ইঙ্গিতই—জীবনের পর্যাপ্ত চিত্রণ সেসব নয়। শচীশের অন্তর্জীবনের পরিণতির কথাই কবি এতে মুখ্যভাবে বলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু লীলানন্দ স্বামী কী গুণে শচীশকে মুগ্ধ করলেন, ভক্তিরস থেকে শচীশ জীবনে প্রকৃতই কী সম্পদ পেলে সেসব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে চিত্ত-উদ্দীপক বাণী আমরা পাই বটে, কিন্তু শচীশের অন্তর্বিপ্লব ও নতুন উপলব্ধি বুঝবার পক্ষে সেসব যথেষ্ট নয়। ভক্তিরস সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞাতব্য আমরা বরং শান্তিনিকেতন ভাষণগুলোয় আর খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি কাব্যে পাই। চতুরঙ্গে ভক্তির পন্থাকে অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আবেগ-ধর্মী ভক্তির পন্থাকে কবি অনির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছেন বেশি। সেই কথাটি ব্যক্ত হয়েছে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পরে দামিনীর এই তীব্র মন্তব্যে :

> ....আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?....তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান, তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

চতুরঙ্গ মোটের উপর আইডিয়া-প্রধান উপন্যাস। শচীশের একটি উক্তি উদ্ধৃতি করা হয়েছে। তার এই দুইটি উক্তিও চতুরঙ্গে খুব চোখে পড়ে ঃ

আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙ্গিনাতেই যাওয়ার পথ....আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায় কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না।

আমি (শ্রীবিলাস) বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি। অর্থাৎ ভগবৎ উপলব্ধির কোনো সুপরিচিত পথ নেই, সেটি আত্মোপলব্ধির দুস্তর ক্ষুরধার পথ, কিন্তু দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষকে সে পথে চলতেই হয়—মনে হয় এই কবির বক্তব্য।

## ঘরে-বাইরে

ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে, আর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালের গোড়ার দিকে।

সেই দিনে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে নানা ধরনের বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল, বোধহয় তার বড় কারণ, এতে নায়িকা বিমলার চরিত্রে যে ধরনের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, এর পূর্বে নারী-চরিত্রে তেমন দ্বন্দ্ব আমাদের সাহিত্যে চিত্রিত হয়নি। গ্রন্থ-পরিচয়ে পাঠকদের সেই সব অভিযোগ ও কবির উত্তর উদ্ধৃত হয়েছে। যাঁরা অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের একটি প্রধান বক্তব্য ছিল এই ধরণের ঃ 'সন্দীপ যত বড়ো মন্দ লোকই হউক তাহাকে দিয়া সীতাকে অপমান কেন?' তার উত্তরে কবি বলেন ঃ

আমি কৈফিয়তস্বরূপ বাল্মীকির দোহাই মানিব,—তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা-লক্ষ্মী, আমি বিশ হাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি। বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া, জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়াছেন? রাবণ রাবণের যোগ্যই কাজ করিয়াছে, দুঃশাসন-জয়দ্রথ যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদিগকেই

সাজে—তেমনি আমার মতে সন্দীপ সীতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপেরই যোগ্য—অতএব সে-কথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে'। এবং সেই সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।

আমাদের দেশের পাঠক সমাজের সাহিত্যিক বোধের এত অপরিণতি একালে অতীতের বিষয় হয়েছে আশা করা যায়।

এতে প্রধান চরিত্র তিনটি—নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ। অপ্রধান চরিত্র এতে অনেকগুলো আছে, তবে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ফুটেছে তিনজনের চরিত্র—মেজোরানী, চন্দ্রনাথবাবু আর অমূল্য।

নিখিলেশ বয়সে নবীন আর বহুকালের এক বড জমিদারির মালিক। কিন্তু এর চাইতে তার বিশিষ্ট পরিচয় এই যে, সে উচ্চশিক্ষিত আর উচ্চ আদর্শের অনুরাগী। এক্ষেত্রে তার জীবনে বিশেষ সাহায্যলাভ হয়েছে তার শিক্ষক চন্দ্রনাথবাবুর গভীর আদর্শনিষ্ঠা থেকে। তাঁর সম্বন্ধে নিখিলেশ এক জায়গায় বলেছে :

> আমি যে-বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না—কিন্তু ওই মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

এর পূর্বে কয়েকটি আদর্শনিষ্ঠ-চরিত্র আমরা পেয়েছি 'গোরা'-তে। নিখিলেশ বয়সে নবীন হলেও আদর্শের অনুরাগ তার চরিত্রে যথেষ্ট প্রাবীণ্য এনে দিয়েছে। তার সংযত ও শান্ত চরিত্র বিশেষ করে তার অসাধারণ দরদী মন, খুব লক্ষণীয়,এত লক্ষণীয় যে, সেজন্য তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক জ্ঞান করা যেতে পারতো। কিন্তু তাকে একজন বেদনাময় মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে তার পত্নী বিমলার প্রতি তার অতি গভীর প্রেম—সেই প্রেমের ফলে তার পত্নীর হৃদয়-মনের পূর্ণ নির্বাধ বিকাশ তার জন্য একটি সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এ সম্বন্ধে তার ( পত্নীর প্রতি ) বিখ্যাত উক্তি এই :

> ...আমার ইচ্ছে...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।...
>
> ....যে পেটুক মাছের ঝোল ভালবাসে, সে মাছকে কেটেকুটে সাঁতলে

সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভরতি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া-জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তারপরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাইনি কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করিনি।

নিখিলেশের যে ইচ্ছা, বলা যেতে পারে, মোটের উপর তা এক অসম্ভবের ইচ্ছা, কেন না মানুষের পরিচয়ের শেষ নেই—বাইরে তো নেইই, ঘরেও নেই। —কিন্তু নিখিলেশের মূল বক্তব্যটি মহামূল্য। সেটি এই ঃ দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পূর্ণ বিকশিত জীবনের উপরে, লোকাচার, মোহ, ছদ্মপ্রভুত্ব এসবের উপরে নয়; সেই পথে বিপদ ও দুঃখ যথেষ্ট আছে. তৎসত্ত্বেও বলতে হবে, সেইসব বিপদ ও দুঃখ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করায় শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা নেই—একালের শ্রেষ্ঠ চিন্তা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতিই দিতে চায়। ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানিতে নিখিলেশকে দেখা যাচ্ছে সেই যথেষ্ট বিপদ ও দুঃখের পথের লাঞ্ছিত কিন্তু অসাধারণভাবে সহিষ্ণু যাত্রীরূপে—অসম্ভব-ঘেঁষা এক আদর্শ তার জীবনে নিয়েছে বাস্তবের রূপ। ঘরে-বাইরে উপন্যাসখানির এক বড় মূল্য এইজন্যে।

নিখিলেশ ও বিমলার যখন বিবাহ হয় তখন নিখিলেশ কলকাতায় এম. এ. পড়ছে। তাদের বিবাহিত জীবনের নয় বৎসর পরে 'ঘরে-বাইরে'র আখ্যায়িকা আরম্ভ হলো।

এই নয় বৎসর গভীর দাম্পত্য-সুখে তাদের জীবন কেটেছে। বিমলা তেমন সুন্দরী ছিল না—ছিল সুলক্ষণা। সেই সুলক্ষণের জোরেই গরীবের ঘরের মেয়ে হয়েও এতোবড়ো ঘরে তার বিয়ে হ'তে পেরেছিল। কিন্তু বিমলার মনে সজীব ছিল তার মায়ের পাতিব্রত্যের ছবি, মনে মনে সেও সংকল্প করেছিল পাতিব্রত্যের সাধনাই হবে তারও জীবনের সাধনা। কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন সুগভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও তাদের প্রকৃতির ভিতরে বড়ো রকমের পার্থক্য ছিল। নিখিলেশ ছিল অসাধারণভাবে ক্ষমাশীল ও সমবেদনাশীল, কিন্তু বিমলা তার দুই বড়ো বিধবা জায়ের ঈর্ষা ও চাপা বিদ্রূপ ক্ষমা করতে পারতো না—এই ব্যাপারে তার স্বামীর সহনশীলতাকে তার মনে হতো অতিরিক্ত ভালোমানুষি।

বিমলা ও নিখিলেশের প্রকৃতির মধ্যে আরো যেসব বড়ো রকমের পার্থক্য ছিল বৃহত্তর জগতের সংস্পর্শে এসে সেসবও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'ঘরে-বাইরে'র আখ্যায়িকার পটভূমিকা বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশীর, অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনীয় জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবার তাগিদ নিখিলেশ তার কলেজ-জীবনেই অনুভব করে আর সেজন্য নানারকমের ব্যয়সাধ্য চেষ্টাও তখন থেকেই তার শুরু হয়। তার সেই স্বদেশের সেবা ছিল নীরব ও নিরুপদ্রব। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরে স্বদেশী আন্দোলন যখন দেশে আরম্ভ হলো, তখন যে শুধু তার হাঁকডাক বেড়ে গেল তাই নয়, যারা সেই আন্দোলনে উৎসাহী হতে পারলো না, তাদের উপরে চলল উৎসাহীদের উপদ্রব। নিখিলেশ সেই উপদ্রবকে দেশের জন্য সমূহ অকল্যাণকর মনে করলো। (স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কবিরও এমন মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।)

নিখিলেশের জমিদারিতে দলবল নিয়ে স্বদেশী প্রচার করতে এলো সন্দীপ। সে ছিল নিখিলেশের সহপাঠী। তখন থেকেই নিখিলেশ তার প্রতি ছিল একই সঙ্গে অনুরক্ত আর বিরক্ত—অনুরক্ত, সন্দীপের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগের জন্য, আর বিরক্ত, তার প্রকৃতির অনেকখানি স্থূলতার জন্য। তার সম্বন্ধে নিখিলেশ এক জায়গায় বলেছে :

> ...সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্মসম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাডনা করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারী। .

সন্দীপে কবি রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন সেইদিনের একজন খ্যাতনামা দেশনায়ককে এই মত কেউ কেউ ব্যক্ত করেছিলেন।

সন্দীপের ফোটোগ্রাফ বিমলা পূর্বেই দেখেছিল। কিন্তু তখন তার তেমন ভালো লাগেনি। তার মনে হয়েছিল সন্দীপবাবুর চেহারায় উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু তা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। কিন্তু তাদের নাটমন্দিরে বন্দেমাতরম্ শব্দের সিংহনাদের সঙ্গে মহাসমারোহে সন্দীপ ও তার দলবল যখন প্রবেশ করলো আর বিশেষ করে যখন সন্দীপের জ্বালাময়ী বক্তৃতার তরঙ্গ ছুটলো তখন সন্দীপের সেই মূর্তি মুহূর্তে বিমলাকে একেবারে অভিভূত করে দিল। বিমলার উক্তির একটি অংশ এই :

> বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের

আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল একসময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বৌ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ওই ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তার রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

পরদিনই সন্দীপের অন্যত্র যাবার কথা ছিল। কিন্তু বিমলা প্রস্তাব করলে, সে নিজে উপস্থিত থেকে সন্দীপবাবুকে খাওয়াবে। শুনে নিখিলেশ আশ্চর্য হলো, কেন না, এর পূর্বে বিমলা নিখিলেশের বন্ধুদের কাছে বের হ'তে রাজি হয়নি।

সন্দীপের মুখে স্বদেশের ও বিমলার যুক্তস্তব, একই সঙ্গে সন্দীপের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রকৃতির স্থূলতা আর অসাধারণ তেজ, এইসব অচিরে বিমলার উপরে কেমন প্রভাব বিস্তার করে চললো, বিমলা যখন অনুভব করলে সন্দীপের প্রভাবে তার জীবনে কক্ষচ্যুতি ঘটবার সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে তখনও কেমন করে নিজের মনকে বশে আনা তার পক্ষে প্রায় অসাধ্য হলো; এসব অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে আর সত্যতার সঙ্গে এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে বিমলার এমন 'পতন' বা 'পরিবর্তনের' সামনে নিখিলেশের অতি কঠিন অন্তর্বেদনা; কিন্তু সেই বেদনার ঝঞ্ঝা সে অতিক্রম করতে পারলে বিমলার জন্য যা সত্য তা সে পুরোপুরি স্বীকার করবে তার এই প্রবল কিন্তু মর্মন্তুদ সংকল্পের সহায়তায়।

উপন্যাসখানির শেষের দিকে অঙ্কিত হয়েছে সন্দীপের ও তার দলভুক্তদের জবরদস্তিমূলক স্বদেশী প্রচারের ফলে অন্যায় ও বিরোধ কত প্রবল হয়ে দেখা দিল সেই চিত্র। এই অন্যায় ও বিরোধের আগুনে আহুতি দেবার জন্য বিমলাকে তার স্বামীর সিন্দুক থেকে ছয় হাজার টাকার মোহর চুরি করতে হলো, আর সন্দীপের শিষ্য অমূল্যকে নিখিলেশের কাছারিতে ডাকাতি করতে হলো। সন্দীপের ভয়ংকর শিক্ষা অমূল্যর তরুণ নিষ্পাপ জীবনে যে অকল্যাণ ডেকে আনলো তার সামনে বিমলার সর্বনাশা ভাবাবেগ সংযত হলো ও তার ভিতরকার

সুপ্ত মাতৃত্ব জেগে উঠলো। এই মাতৃত্বই তাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলো সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে।

গ্রন্থের শেষে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানেরা সন্দীপের উপরে বিষম ক্ষেপে উঠেছে. তার ফলে কালবিলম্ব না করে সন্দীপকে নিখিলেশের গৃহ ত্যাগ করে যেতে হলো। এই সঙ্গেই চন্দ্রনাথবাবু এসে সংবাদ দিলেন মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠে সন্দীপের দলের অত্যাচারী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুট করেছে আর মেয়েদের উপরেও অত্যাচার আরম্ভ করেছে। সংবাদ শুনে নিখিলেশ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেল—কোনো অস্ত্র বা লোকজন সে সঙ্গে নিলে না।

এই হাঙ্গামায় অমূল্য বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আর নিখিলেশের মাথায় বিষম চোট লাগে। সেই চোট সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি এই মনে হয় কবির ইঙ্গিত। সাধু উদ্দেশ্যযুক্ত অসাধু কর্ম-পরম্পরার পরিণতি হলো এক মহা অনর্থে।

সন্ত্রাসের পন্থায় দেশের হিতসাধন যে সম্ভবপর নয় কবির এই সুস্পষ্ট মতের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা পরিচিত হয়েছি। কিন্তু দেশের অনেকে কবির মত গ্রহণ করেননি। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে সন্ত্রাসের পন্থার বা বিপ্লব-পন্থার পরিণতি এঁকে এ বিষয়ে কবি তাঁর গভীর উৎকণ্ঠারই পরিচয় দেন। তাঁর জীবনের শেষের দিকে পুনরায় তিনি এই বিষয়ের অবতারণা করেন 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসে।

এর অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে মেজোরাণীর, অর্থাৎ নিখিলেশের মেজো বৌঠাকরুণের চরিত্র সুঅঙ্কিত হয়েছে, একথা আমরা বলেছি। বাস্তবিক মেজোরাণীর মতো এতো প্রাণোচ্ছল নারী-চরিত্র কবি কমই এঁকেছেন—তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেই প্রাণোচ্ছলতার মূল্য বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে একটি বিষাদের ছায়াও সেই প্রাণোচ্ছলতাকে ঘিরে রয়েছে। মেজোরাণী এ সংসারে আসেন নয় বৎসর বয়সে—তখন নিখিলেশের বয়স ছয় বৎসর। দুইজনের এক সঙ্গে বেড়ে ওঠার যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র কবি এঁকেছেন নিখিলেশের জবানীতে তার একটি অংশ এই :

> এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নিচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন

ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেন না ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধে দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্য দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে-আবদারের বাহক ছিলুম আমি,—আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হ'ক কাজ উদ্ধার করে আনতুম।.........তারপরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে—কত ঝগড়াও হয়েছে, বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা, সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে, আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে, মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না—কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে, সেই সম্বন্ধের শাখা-প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে।

চারুবাবুর কাছে শুনেছি কবি তাঁকে বলেছিলেন ঘরে-বাইরের মেজোরাণীতে তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেন তাঁর স্বর্গতা ন-বৌঠাকরুণকে।

এর প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে সন্দীপকে তেমন সুঅঙ্কিত মনে হয় না—সে যেন অনেকগুলো গরম মতের সমাহার। তার মানবিকতা অনেকটা রূপ পেয়েছে গ্রন্থের শেষের দিকে যেখানে তার কিছু কিছু দুর্বলতা আর বিমলার উপরে শুধু তার সম্মোহন বিস্তার নয়, তার প্রতি তার অকৃত্রিম আকর্ষণও প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে নিখিলেশের গৃহ ত্যাগ করে যাবার কালে সে বিমলার ছয়-হাজার টাকার মোহর ও বহু টাকার অলংকারগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

তবু সন্দীপ একজন রক্তমাংসের মানুষের চাইতে একজন মতবাদীই হয়েছে বেশি। আধুনিক য়ুরোপের এক ধরনের নির্জলা বাস্তববাদ কবি তার মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রমথ চৌধুরী এই গল্পটিকে বলেছিলেন রূপক—তাঁর মতে নিখিলেশ হচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ হচ্ছে আধুনিক য়ুরোপ আর বিমলা হচ্ছে আধুনিক ভারতবর্ষ—প্রাচীন ভারতবর্ষ আর আধুনিক য়ুরোপ এই দুয়ের আকর্ষণে পড়ে বিমলা বেচারীকে অনেক নাকানি-চুবানি খেতে হলো। কিন্তু কবি বলেছেন ঘরে-বাইরে উপন্যাসের মধ্যে কোনো জ্ঞানকৃত রূপকের চেষ্টা নেই। তাছাড়া, নিখিলেশকে ঠিক প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না—সে বরং একালেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদের প্রতীক। নর-নারী, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে

সবার জীবনের তুল্য মূল্যবোধ বিশেষভাবে একালের চিন্তা। তবে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এই চিন্তা বীজ আকারে ছিল বলা যায়।

## জাপান যাত্রা

উইলিয়ম পিয়র্সন, সি. এফ. এন্‌ড্রুজ ও মুকুলচন্দ্র দে-কে সঙ্গে নিয়ে কবি কলকাতা থেকে ১৯১৬ সালের ১লা মে তারিখে জাপান যাত্রা করেন। সেখান থেকে তিনি যান আমেরিকায়। জাপানের পথেই কবি কলকাতায় ফেরেন ১৯১৬ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। 'জাপান যাত্রী'তে জাপানের অভিমুখে যাত্রা ও জাপান-সন্দর্শন দুয়েরই কথা বলা হয়েছে।

কবির এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে সাহিত্য বলা হবে, না তত্ত্বালোচনা বলা হবে, সেই কথার উত্তরে তিনি বলেন :

> নাই বললুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নিচে শ্যামল-ঐশ্বর্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোতে উদাসী হয়ে চলেছে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্ছে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হ'ত তাহলে এই আমিকে সরে দাঁড়াতে হ'ত।
>
> ....কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেছে সেও সেই দ্রষ্টা আমি। সেখানে যা বলছে সেটা উপলক্ষ্য, যে বলছে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেছি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি।....বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখছি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক করে বলতে পারি তাহলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুশি হয়ে উঠবে।

এই যাত্রায় কবি যা-সব দেখলেন, অর্থাৎ দেখলেন ও অন্তরে উপলব্ধি করলেন, তার কিছু কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

জাহাজে অনেকগুলি মাদ্রাজি ডেক-প্যাসেঞ্জার ছিল। তাদের সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন :

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচানো কারো সাধ্য নয়। কোনোমতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্ছে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্ছে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে, বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই।

....মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে ; কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই। এইজন্যে সম্পর্কবিচার ও জাতিবিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম-ভারত মুসলমানের কাছে থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেন না, প্রণাম-নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি—নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি ; ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেইজন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না।

যাত্রার কয়েকদিনের মধ্যেই কবির জাহাজ ঝড়ে পড়ে। ঝড় কড়া রকমেরই ছিল, কিন্তু কাপ্তেন বললেন—ছোটো ঝড় সামান্য ঝড় ; জাপানী মাল্লাদের মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়নি।

ঝড়ের ও ঢেউয়ের ঝাপটায় আর ক্যাবিনের গুমটে অবস্থা যখন অত্যন্ত অসহ্য হলো তখন কবি আপন মনে শান্তিলাভ করতে চেষ্টা করলেন :

....কিন্তু, মানুষের মধ্যে শরীর-মন-প্রাণের চেয়েও বড়ো একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নিচে যেমন শান্ত সমুদ্র, সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

রেঙ্গুনে বৌদ্ধমন্দির সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা

স্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য নেই, কারুকার্যের ঠেসাঠেসি, ভিড়, সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো, এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না,—এ যেন ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো, তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা-খুশি-তাই এসে পড়েছে, ভাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই।

ব্রহ্মীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

‥ এখানকার এই রঙিন মেয়েরাই সবচেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েছে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

এই যন্ত্রযুগে বন্দরগুলো দেখতে কি বিকটাকার হয়েছে, সে সম্পর্কে কবির বর্ণনা এই :

একে দেখে মনে হয় যে, এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের, দানব জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার লেজের আয়তন দেখলেই শরীর আঁতকে ওঠে। তার পরে, সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখি হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয়নি, সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বললে যা বোঝায় তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ংকর স্থূল, তার থাবা যেখানে পড়ে সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে, চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ লেজটি যখন নড়তে থাকে তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হ'তে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তারপরে কেবলমাত্র তার বিপুল এই দেহটা রক্ষা করবার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা-থাবা জিনিস খাচ্ছে তা নয়, সে মানুষ খাচ্ছে—স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

এ-সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন :

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব জন্তুগুলো টিকল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁস্‌ফাঁস্‌টা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি,

শ্রী দেখি নে, তখন বেশ বুঝতে পারা যায়, বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই, বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে একদিন তাকে হার মেনে তলিয়ে যেতে হবেই।

সাঙ্ঘাইয়ে জাহাজের ঘাটে চীনা মজুরদের সুগঠিত দেহ ও কর্মতৎপরতা দেখে কবি গভীর আনন্দ লাভ করেন :

…এমন শরীরও কোথাও দেখিনি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলই ঢেউ খেলাচ্ছে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত করছে যে, সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।…এ কথা জোর করে বলতে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না, কেন না, শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁত সংগতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ।

চীনা জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবি বলেছেন :

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে।

কিন্তু সমসাময়িক কালের শক্তিমন্ত চীনকে অন্তত চীনের বর্তমান নেতাদের, দেখা যাচ্ছে অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী—তিব্বত ও ভারতের প্রতি ব্যবহারে তারা সেই গর্হিত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। বলাবাহুল্য এটি এই শক্তিমান জাতিরও জন্য শুভসূচক নয়।

জাপানে পৌঁছে জাপানীদের সৌন্দর্যবোধ ও সংযমবোধ দেখে কবি খুব মুগ্ধ হন। জাপানীদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, তাদের বাগানে, তাদের প্রায় আসবাবহীন ঘরে, তাদের চিত্রশিল্পে কবি তাদের সেই সৌন্দর্যবোধের ও সংযমের পর্যাপ্ত পরিচয় পান। জাপানের নারীরাও কবির গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। জাপানীদের বিখ্যাত চা-পান-অনুষ্ঠানের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।

কিন্তু জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়ো রকমের দুর্বলতাও কবির চোখে পড়ে। সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

জাপান য়ুরোপের কাছে থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে,

কিন্তু, আমি যতটা দেখেছি তাতে আমার মনে হয়, য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে সাধনা অমৃতলোককে মানে এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেছে, সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানি সভ্যতার সৌধ একমহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জার্মানির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে, নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো কবে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্মটা কি।

জাপানে ও আমেরিকায় কবি যেসব বক্তৃতা দেন সেসব সংগৃহীত হয় 'ন্যাশন্যালিজম' ও 'পার্সোন্যালিটি' তাঁর এই দুইটি গ্রন্থে। দুটিই প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে।

## 'ন্যাশন্যালিজম্' ও 'পার্সোন্যালিটি'

রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশন্যালিজম্' বইখানিতে তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে; 'ন্যাশন্যালিজম্ ইন্ ওয়েষ্ট', 'ন্যাশন্যালিজম ইন্ জাপান' আর 'ন্যাশন্যালিজম্ ইন্ ইণ্ডিয়া'। এর শেষে যোগ করা হয়েছে নৈবেদ্যের "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে" শীর্ষক সনেটটির ইংরেজি অনুবাদ।

আমরা দেখেছি আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ গ্রন্থে কবি আমাদের দেশের সমাজ আর য়ুরোপের 'নেশন' এই দুয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দুয়েরই ভালো আর মন্দ দুই দিকেরই কথা তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছেন, আর তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে: 'সমাজ' বলতে যা বোঝায় তাই আমাদের দেশের জন্য বেশি

প্রয়োজনীয়। 'ন্যাশন্যালিজম্ ইন্ ওয়েষ্ট' প্রবন্ধে কবি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, একালে পশ্চিমের সংঘবদ্ধ 'নেশন' মানবসভ্যতার জন্য কি ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা বলেন—তা যারা শক্তিমান তাদের জয় হবে আর যারা দুর্বল তারা হেরে যাবে, বিধ্বস্ত হবে, এই তো বৈজ্ঞানিক সত্য, তাঁদের কথার উত্তরে, কবি বলেছেন :

No, for the sake of your own salvation, I say, they shall *live*, and this is truth. It is extremely bold of me to say so, but I assert that man's world is moral world, not because we blindly agree to believe it, but because it is so in truth which would be dangerous for us to ignore. And this moral nature of man cannot be divided into convenient compartments for its preservation. You cannot secure it for your home consumption with protective Tariff walls, while in foreign ports making it enormously accommodating in its free trade of license.

ইয়োরোপে যে মহাযুদ্ধ চলেছিল তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কবি বলেন :

Has not this truth already come home to you now when this cruel war who has driven its claws into the vitals of Europe? When her hoard of wealth is bursting into smoke and her humanity is shattered into bits on her battle-fields? You ask in amazement what has she done to deserve this? The answer is that the west has been systematically petrifying her moral nature in order to lay a solid foundation for her gigantic abstractions of efficiency. She has all along been starving the life of the personal man into that of the professional.

য়ুরোপে 'নেশন'-এর অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কবি যেসব কথা বলেছেন সেসবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু জগতের দুর্বল ও বঞ্চিত জাতিদের প্রতি শক্তিশালী য়ুরোপীয় জাতিদের আচরণ যে একালে অমানুষিক হয়েছে আর তার ফলে তাদেরও অন্তর-প্রকৃতির দুর্গতি ঘটেছে—কবির এই

নির্দেশের সত্যতা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না। বিশ্বের মানুষের কল্যাণ সম্বন্ধে কবির এই যে গভীর বোধ এইটি একালের ইতিহাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। আমরা দেখেছি এই চেতনায় কবি প্রথম পূর্ণভাবে উদ্বোধিত হন তাঁর নৈবেদ্য কাব্যে। তাঁর অব্যবহিত পূর্বে টলস্টয় বিশ্বমানবের কল্যাণ সম্বন্ধে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

'ন্যাশন্যালিজম ইন ওয়েস্ট' প্রবন্ধটি 'ন্যাশলিজম' গ্রন্থে সব চাইতে শক্তিশালী।

'ন্যাশন্যালিজম্ ইন্ জাপান' প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কবি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন একালে জাপানের নব অভ্যুদয় জগতে কেমন এক বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে।

তারপর কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের পার্থক্য কোথায়। এই সম্পর্কে জাপানের শিল্পবোধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করেছেন। জাপানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি এই :

> You have realized nature's secrets, not by methods of anaytical knowledge but by sympathy.
>
> Dominating nature from outside is a much simpler thing than making her your own in love's delight, while is a work of true genius.
>
> The genius of Europe has given her people the power of organization, which has specially made itself manifest in politics and commerce and in co-ordinating scientific knowledge. The genius of Japan has given you the vision of beauty in nature and the power of realizing it in your life.
>
> The idea of 'maitri' is at the bottom of your culture, maitri with men and maitri with nature.

কিন্তু এই উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে কবি নির্দেশ করেন এই নব অভ্যুদয়ে বিপদ কিভাবে জাপানের জন্য দেখা দিয়েছে সেই দিকেও :

> What is dangerous for Japan is, not the imitation of the outer features of the west, but the acceptance of the motive force of western nationalism in her own.

তার কারণ, কবির মতে, ইয়োরোপের নতুন লক্ষ্য হচ্ছে: Help yourself, and never mind what it costs to others.

এই সময়ে চীনের নব মুক্তিলাভ হয়েছিল। কিন্তু শৃঙ্খলা তখনো সেখানে স্থাপিত হয়নি। এই চীনের উপরে চলেছিল জাপানের জবরদস্তি—কবির সেটি আদৌ ভালো লাগেনি। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রবীন্দ্র-জীবনীতে পাওয়া যাবে।

'ন্যাশন্যালিজম্ ইন্ ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে কবি বলতে চেষ্টা করেছেন ভারতের একালের বিশেষ পরিস্থিতির কথা। য়ুরোপে যেমন নেশন এক অমানবিক ব্যাপার হয়ে জগতে অনর্থ ঘটাচ্ছে, তেমনি ভারতে সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা কালে কালে এক অনড় দশায় পৌছে ভারতীয়দের জন্য এক মহা বিপত্তির কারণ হয়েছে। কবি মন্তব্য করেছেন, এর ফলে শিক্ষিত ভারতীয়দের অনেকে, are taking the very immobility of our social structure as the signs of their perfection. কবি মনের মুক্তিলাভের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন, কেননা, মনের মুক্তিলাভ না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্যকার মুক্তি এনে দিতে পারে না। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা বলেন, সুইটজারল্যাণ্ডে তো বহু জাতি তবু তাদের স্বাধীনতা পুরোপুরিই লাভ হয়েছে, তাঁদের কথার উত্তরে কবি বলেছেন: সুইটজারল্যাণ্ডে বহু জাতির এক জাতি হবার বড় রাস্তা খোলা রয়েছে, কেননা, সেখানে বিভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে সহজেই বিবাহাদি হ'তে পারে, কিন্তু ভারতে মিলন সাধনের সেই সব পথ আজও বন্ধই রয়েছে—our social restrictions are still tyrannical.

ন্যাশন্যালিজম্ বইখানির অনেক চিন্তাই কবির বিভিন্ন বাংলা রচনায় পাওয়া যায়। তবে সেইসব চিন্তা এই প্রবন্ধগুলোর ভিতরে আরো সংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে তাদের কার্যকারিতা বেড়ে গেছে।

'পার্সোন্যালিটি' গ্রন্থে ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে:

1 What is Art? 2. The world of Personality. 3. The Second Birth. 4. My School. 5. Meditation. 6. Woman.

কবি "আমি আছি" বলতে যা বুঝেছেন, অর্থাৎ বিশ্বজগতের মধ্যে আনন্দময় বেদনাময় "আমি আছি"র বোধ, ইংরেজিতে তাকেই তিনি বলেছেন পার্সোন্যালিটি। বলাকার বহু কবিতায় কবির এই আনন্দময় ও বেদনাময় "আমি আছি"র সঙ্গে আমাদের বার বার পরিচয় হয়েছে।

নেশন-এর ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত একালের সভ্যজগৎ কবির মতে একটা অস্বাভাবিক অবাস্তব জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অস্বাভাবিক ও অবাস্তব দশা থেকে মুক্তির পথ কবি দেখেছেন পার্সোন্যালিটির, অর্থাৎ সব মানুষেরই মূল্যের, স্বীকৃতির ভিতর দিয়ে। পার্সোন্যালিটি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোয় কবি সেই অশেষ মানবিক মূল্যের সন্ধান করেছেন।

'What is Art' প্রবন্ধটিতে কবি আর্টের কোনো সংজ্ঞা দেননি, কেননা দেওয়া কঠিন। সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে Art প্রধানতঃ সচেতন প্রয়াসের ব্যাপার হয়ে পড়ে। কিন্তু সচেতন প্রয়াসের সঙ্গে Art অচেতন বোধেরও প্রশস্ত ক্ষেত্র। কবির কিছু কিছু উক্তি আমরা উদ্ধৃত করছি :

> This building of man's true world—the living world of truth and beauty,—is the function of the artist.
>
> In these large tracts of fabulousness Art is creating its stars,—stars that are definite in their forms but infinite in their personality.
>
> Art is calling in the children of the immortal.

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিকে বলা যেতে পারে কবির "আমার জগৎ" প্রবন্ধটির পুনর্লিখিত রূপ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধের কথাগুলোও তাঁর শান্তিনিকেতন ও অন্যান্য বাংলা রচনায় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ প্রবন্ধে কবি নারীর এক গৌরবময় ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তাঁর উক্তির একটি অংশ এই :

> ....Nature into which we are born, is merely an imperfect truth, like the truth of the womb. But the full truth is that we are born in the lap of the infinite personality. Men have seen the absurdity of today's civilization, which is based upon nationalism,—That is to say, on economics and politics and its consequent militarism. Men have been losing their freedom and their humanity in order to fit themselves for vast mechanical organisations. So the next civilization, it is hoped, will be based not merely upon economical and political competition and exploitation but upon world

wide social co-operation, upon spiritual ideals of reciprocity, and not upon economic ideals of efficiency. And then women will have their true place.

কবির অনেক কথা যে জাপান ও আমেরিকার রাজনীতিকদের ও তাঁদের অনুবর্তীদের ভালো লাগেনি তা সহজেই বোঝা যায়। এত শীগ্‌গির ভালো লাগলে কবির কথাগুলো মূল্যহীন হ'ত। তবে কবির বাণী যে ওসব দেশের অনেকের মর্মস্পর্শ করেছিল তাও মিথ্যা নয়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রবীন্দ্র-জীবনীতে পাওয়া যাবে।

কবির এই পরম অর্থপূর্ণ 'জাতীয়তা'-বিরোধী চিন্তা তাঁর অনেক স্বদেশীয়েরও অসন্তোষ উৎপাদন করেছিল। স্বদেশে তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আর বিদেশে ছিলেন 'গদর'দল। বলা বাহুল্য, তাঁরা কবিকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন।

## কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ১৩২৪ সালের ভাদ্রে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, আর ঐ বৎসরেই (২২ আগস্ট, ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরীতে ও আলফ্রেড থিয়েটার গৃহে এক বিরাট জনতার সামনে পঠিত হয়েছিল।

এই অবিস্মরণীয় রচনাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে:

এই বৎসর আষাঢ় মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তন চেষ্টার ফলে, "নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত" হয়। "কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই কথা জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্ণমেণ্ট টাউন হলে এই সভা হইতে দিবেন না, কেবল মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সভা হইতে দিতে পারেন না, অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না, কেহ

সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন ; জনশ্রুতি, এইজন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল।

...."দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" গানটি এই সময় রচিত ও রামমোহন লাইব্রেরির সভার সর্বপ্রথম সাধারণ্যে গীত হয়, গানটি প্রবাসীতে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা সমূহের অন্যতম। তাঁর মনীষা আর সাহিত্যিক শক্তি দুয়েরই অনন্যসাধারণ পরিচয় এতে বর্তমান। ইংরেজ সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টি আব বলদর্পিতা এতে যেমন কবির কঠোর ও নিপুণ সমালোচনার বিষয় হয়েছে তেমনি নিপুণভাবে কিন্তু গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দেশে শুভ সংকল্পের একান্ত অভাব আর চেতনার জড়তার ব্যাপকতা।

কবির এমন রচনার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ হয়েছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

বারবার পাঠ না করলে এই রচনাটির মর্যাদা পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। আমরা সংক্ষেপে এর পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—অর্থাৎ যে ধারা মান্ধাতার আমল থেকে চলে এসেছে তাই-ই চলবে, তার আর অদল-বদল হ'তে পারে না—এই মনোভাব। সূচনায় কবি চিৎপুর আর চৌরঙ্গি কলকাতারই এই দুই অঞ্চলের মধ্যেকার পার্থক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখিয়েছেন চিরকাল চিৎপুরের লোক নানা অসুবিধা সয়েই গেল ব'লে তাদের এক রকমের ভাগ্য হয়েছে আর চৌরঙ্গির লোক সয়ে যায় না ব'লে তাদের অন্য রকমের ভাগ্য হয়েছে। এই সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে কবি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের-'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে

শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

এই কথাটাই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে কবির মূল্য বক্তব্য। কবি অবশ্য জাতীয় মনোভাবে মারাত্মক ত্রুটির কথা এর পূর্বে তাঁর জাতিকে বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেই বহুবার বলা সত্য এবার কবির বিশ্বব্যাপক চেতনায় ও বেদনায় আরো অর্থপূর্ণ রূপ পেল।

সেই সঙ্গে কবি ইংরেজ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই বড়ো কথাটি যে, ইংরেজ ভারত শাসনে যে সংকীর্ণ দৃষ্টির ও জবরদস্তির পরিচয় দিচ্ছে তাতে তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের ও একালের সভ্যতায় তার মহৎ দায়িত্বের প্রতি সে সমূহ অবিচার করছে।

কবির কিছু কিছু বাণী আমরা উদ্ধৃত করছি:

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, "তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না। আর যাই হ'ক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।

কত অনিচ্ছা, কত ভুল, কত বিফলতা অতিক্রম করে তবে ইংরেজ ও অন্যান্য প্রতীচ্য জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মকর্তৃত্বে, তার নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রে কবি মন্তব্য করেছেন:

........আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

মানুষের সুবিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন:

এর চেয়েও একটা বড় কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে,

রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ব বোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না জড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি, তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশংকা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

অচলায়তনে আমরা দেখেছি ভারতীয় ঐতিহ্যের দুর্বল দিক সম্বন্ধে কবির অধৈর্য। সেই সৃষ্টিধর্মী অধৈর্য 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের সর্বত্র আমাদের চোখে পড়ছে। পূর্বে সমাজ ও রাষ্ট্র-বিষয়ক রচনায় কবির প্রধান বক্তব্য ছিল—রাষ্ট্র নয় সমাজ ভারতীয় জীবনে বেশি অর্থপূর্ণ। কিন্তু 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দুয়েরই সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনের জন্য তিনি অপরিহার্য জ্ঞান করেছেন আত্মকর্তৃত্ব। বলা যায় কবির প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি তার পূর্বের প্রবণতা অনেক পরিমাণে হারিয়েছে তাঁর এই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে।

আমরা জানি ধর্ম চিরদিনই কবির চিন্তায় মহামূল্য। কিন্তু ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এই দুইটি যে এক বস্তু নয়, এদের পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের যে পুরোপুরি অবহিত হওয়া চাই, সে সম্বন্ধে কবির উক্তি এই:

> ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নিদয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হ'ক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে

দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হ'ক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

কবি বলেছেন এই মুক্তিবিরোধী ও দাসত্বপন্থী ধর্মতন্ত্র আমাদের দেশে সর্বত্র প্রভাব বিস্তার ক'রে বসেছে। কবি একে বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'দুড়িতন্ত্র'। এ-সম্বন্ধে কবির একটি তীব্র শ্লেষপূর্ণ উক্তি এই :

···অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমনকি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই দুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁধে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের ভারি গর্ব, বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতে পড়ে না, বলেন, ওই কাঁধে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

ভারতের প্রতি ইংরেজের সবচাইতে বড়ো দায়িত্ব সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" এ কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল, সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টিম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের

পরমায়ু না হলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়-বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছুই হইতে পারে না।[১]

দেশের মঙ্গল-ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কবি জরাবিহীন জাগ্রত ভগবানের কাছে এই চিরস্মরণীয় প্রার্থনা করেছেন :

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলায় মুখ লুকাইয়া আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ-তাপ-বিপদ-মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চ ললাটে মহোজ্জ্বল, অতি দূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল জরা-জর্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্য ভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায়, ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা, তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত, লজ্জিত।.........যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া

উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষ,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাত সূর্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্য-সম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগ-যুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উদ্ভাসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

লেখাটির উৎপত্তিমূলে মুখ্যতঃ ছিল একটি বিশেষ কালের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু লেখকের সত্যদৃষ্টি ও জীবনধর্মিতার গুণে অপরিমেয় শাশ্বত সম্পদে এটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

## পলাতকা

পলাতকা মুদ্রিত হয় ১৩২৫ সালের আশ্বিনে। প্রভাতবাবু বলেছেন, এর কবিতাগুলো লেখা হয় ১৩২৪ সালের চৈত্রে ও ১৩২৫-এর বৈশাখে। এই কবিতাগুলো একই সঙ্গে গল্প ও কবিতা। বেশ কিছুকাল ধরে নির্জনতা-প্রিয় কবির কেটেছে নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার কাজে, নানাজনের সঙ্গে মেলামেশায়। নির্জনতা কবির প্রিয় হলেও সজনতাও তাঁর অপ্রিয় নয়, কিন্তু সজনতার মাত্রা কবির জন্য বোধহয় বেশি হয়েছিল। অন্তত তাঁর পলাতকার কবিতাগুলোয় নিঃসঙ্গতার দিকে কবির প্রবণতা লক্ষণীয় হয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের সমাজে নারীর প্রতিকূল ভাগ্যও কবির অন্তরে নতুন বেদনার সঞ্চার করেছে। এই দিক দিয়ে সবুজপত্রের ছোটো গল্পগুলোর সঙ্গে পলাতকার অনেক কাহিনীর মিল রয়েছে।

যা তুচ্ছ পলাতকা কাব্যে তা কবির মনোযোগ কিছু বেশি আকর্ষণ করেছে এই অভিযোগ করেছেন কোনো কোনো সমালোচক—তাঁদের মধ্যে টমসন

সাহেব বোধহয় অগ্রগণ্য। কিন্তু তাঁদের এই মত বিচারসহ নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা তুচ্ছ সাহিত্যের উৎকৃষ্ট বিষয় হতে তার সত্যকার বাধা নেই, কেন না, সাহিত্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য সাহিত্যিকের উপরে তুচ্ছ-অতুচ্ছ সব ঘটনারই প্রতিক্রিয়া আর ভাষায় তার প্রকাশ। সেই প্রকাশের দিক দিয়ে পলাতকার অনেক কবিতায় চমৎকারিত্বের অভাব ঘটেনি। পলাতকার কাহিনীগুলো যথেষ্ট চিত্তগ্রাহীও। একই সঙ্গে তাদের জীবনধর্মিতা ও সরলতা তাদের সেই আকর্ষণের ক্ষমতা বাড়িয়েছে।

এর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কবিতা বোধহয় এইগুলো: 'পলাতকা', 'ফাঁকি', 'ভোলা', 'ছিন্নপত্র', 'শেষ গান'।

নির্জনতা নিঃসঙ্গতা, এসব কবির কতো অন্তরের সামগ্রী সেকথাটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে এর 'মালা' কবিতাটিতে। কবি 'রানী'র হাতের বিজয়মালা পেয়েছেন কিন্তু তাতে তাঁর অন্তরাত্মার তৃপ্তি নেই,—তাঁর অন্তরাত্মা চায় রানীর বরণমালা। বিজয়মালা 'তৃষ্ণা বাড়িয়ে চলে', কিন্তু বরণমালা 'বুকের মাঝে আলো করে থাকে'। পলাতকায় কবির সৃষ্টিশক্তির কোনো নতুন বিজয় লক্ষণীয় হয়নি। তার তাতে ভাঁটাও ধরেনি।

## "বিশ্বভারতী"

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পরে অনেকগুলো গুজরাটি ছেলে কবির শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যার্থী হয়ে আসে। এর ফলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকতা ঘোচাবার তাগিদ কবি অনুভব করেন।

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হয়। ১৯১৯ সালের সূচনায় কবি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন। সেখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি কলিকাতায় ফেরেন মার্চের মাঝামাঝি। আর ২৭ মার্চ তারিখে কলকাতার এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে Centre of Indian Culture সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতেই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা প্রথম ব্যক্ত হয়। কবির বক্তব্য অংশত এই:

"মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালী উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই

উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের সে মন আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টানদের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলায়েও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলায়ও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে ; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনায় নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

······বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাযে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসাধারার নির্ঝরিণী-তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল হইবে না।

····সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশের কেলবমাত্র কেরানীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্র সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষযোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুরঘানি, কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানেও শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই।

....ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে কবি ব্যক্ত বলেন ভারতীয় জীবনের বৈচিত্র্যের কথা। বিশ্বভারতী সম্বন্ধে তাঁর এই পরিকল্পনায় ব্যক্ত হয়েছে সমস্ত বৈচিত্র্যকে নিয়ে ভারতীয় একত্ব উপলব্ধির সমস্ত প্রয়োজনের কথা। কবির এই মহৎ পরিকল্পনা আজও যোগ্যরূপ পায়নি। বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হয় ৩ জুলাই ১৯১৯।

## স্যর উপাধি বর্জন

যদ্ধের ভিতরে ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতসচিব মন্টেগু ঘোষণা করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য নীতি হচ্ছে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যে নতুন শাসন-সংস্কার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১২ জুলাই ১৯১৮। কিন্তু তার পূর্বেই প্রকাশিত হয় Sedition Committee-র বা রৌলট কমিটির রিপোর্ট তাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের বা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের এক ভীষণ চিত্র আঁকা হয়। ভারতীয় সদস্যদের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্যক্তির স্বাধীনতা অপহারক রৌলট বিল ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে আইনে পরিণত হয়।

এর বিরোধিতায় দেশময় হরতাল শুরু হলো। এই ব্যাপক বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ সর্বত্র তৎপর হলো, আর পঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগে একটি নিরুপদ্রব জনসমাবেশের উপরে হলো সৈনাধ্যক্ষ ডায়ারের ও তার দলের গুলীবর্ষণ ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯। ফলে ৩৭৯ জন লোক সেখানে নিহত হয়—আহত হয় এর চাইতে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, পঞ্জাবের বহু স্থানে চলে জনসাধারণের উপরে সৈন্যদলের অবর্ণনীয় অপমান ও অত্যাচার। ভারত যে পরাধীন তা যেন আগুনের অক্ষরে তার ললাটে দেগে দেওয়া হলো। অথচ যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল। এর জ্বালা দেশের সবারই অনুভূত হলো

দুর্বিষহ। কবির অসহ্য বেদনা রূপ পেল তাঁর বৃটিশ সরকারের দেওয়া স্যর উপাধি বর্জনে। এ সম্পর্কে তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পত্রের কিছু অংশ এই।

কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গবর্নমেণ্ট যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে।

....যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল এবং যাহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহনন ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ, নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না।

....এখানকার ইংরেজ চালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে,....যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্নমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম নিয়মের আনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকু মাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতংকে নির্বাক হইয়াছে তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয় নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ, ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই পত্র প্রকাশিত হয় ২রা জুন ১৯১৯। প্রভাতবাবু বলেছেন :

তখনো ভারতরক্ষা আইন বলবৎ। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, তিনি তাঁহার এই পত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে চরম শাস্তিও পাইতে পারেন কারণ, ঠিক এই সময়ে পঞ্জাবে এর চেয়ে অনেক কম সরকার-বিরোধী কাজ বা কথার জন্য অনেকের যাবজ্জীবন দীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

কবি সুন্দরের উপাসকরূপে সুপরিচিত। কিন্তু সেই সুন্দরের অন্য নাম যে ছিল অভয় ও আত্মমর্যাদাবোধ তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ কবির এই পত্র।

মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে কবি তাঁকে এই পত্রখানি পড়ে শোনান।

## লিপিকা

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে লিপিকার সমস্ত রচনা ১৩২৪ থেকে ১৩২৯-এর মধ্যে সেই সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই দিনে এই রচনাগুলো সাধারণতঃ কথিকা নামে পরিচিত ছিল। কথিকা অর্থাৎ ছোটো কথা অথবা ছোটো গল্প। আসলে এগুলি তাইই—তবে সেই গল্প বলা হয়েছে অনেকটা নতুন কৌশলে। গল্পের সব পল্লবিত অংশ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে প্রধানতঃ তার রূপ-রেখাটি। সেই রূপ-রেখাটি পরিবেশন করা হয়েছে বাছাই-করা আর ব্যঞ্জনাভরা শব্দে।

এর এই রূপটি কবির একটি বিশিষ্ট দান। সমগ্রের বাহুল্যবর্জিত বোধ আর সেই বোধের প্রকাশ বিশিষ্ট শব্দে—বিশিষ্ট গদ্য-ছন্দেও—এই এতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি কথিকা উদ্ধৃত করা যাক।

### বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে, অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারিনে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখ-দুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতি দিনের সুরের মিল কোথায়। গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য, অবহেলা, অপমান, অবসাদ, তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার শরাঘাত অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়!

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোনো রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠন তলে তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যে কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে। সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে। বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

চিন্তার বা উপলব্ধির দিক দিয়ে তেমন কোনো নূতনত্ব এগুলোতে নেই। চিন্তারও উপলব্ধির নতুন নতুন শিখর আরোহণ—বলাকার যুগেই এটি শেষ হয়ে গেছে মনে হয়। কিন্তু এর রূপটি বা ধরনটি নতুন, আর অনেক ক্ষেত্রে পরমহৃদ্য হয়েছে।—কবির চিন্তা ও উপলব্ধি পূর্বের মতোই সরস রয়েছে, অথচ প্রকাশ হয়েছে আরো মিতভাষায়, বোধ হয় সেই কারণে।

এর কয়েকটি রচনা খুব শ্লেষাত্মক।

এর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো উৎকৃষ্ট গদ্য কবিতার নিদর্শন। গদ্য কবিতা সম্বন্ধে কবির বক্তব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যে।

এর প্রথম দিকের কয়েকটি লেখায় কবির নতুন বৌঠাকুরুণের স্মৃতি-রূপ

পেয়েছে। কিন্তু কবি দেখছেন সেদিনে যা ছিল শোক আজ তাই হয়েছে শান্তি।—বলাকার একটি কবিতায়ও কবি এই ধরনের কথা বলেছেন।

এর কোনো কোনো কবিতায় দেখা দিয়েছে রূপকথার বিশিষ্ট ছাঁদ—যেমন 'সুয়োরাণীর সাধ' কবিতাটিতে।

এর শ্লেষাত্মক রচনার মধ্যে খুব বিশিষ্ট হচ্ছে 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত', আর 'তোতাকাহিনী'। 'ঘোড়া'য় কবি বিদ্রূপ করেছেন ইংরেজের ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের ধরন, আর তোতাকাহিনীতে বিদ্রূপ করেছেন দেশের ব্যয়বহুল কিন্তু অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাপদ্ধতি। কবির মিতভাষার গুণে তাঁর শ্লেষ খুব শাণিত হয়েছে।

## শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালে। লেখা হয় ১৩২৮-এর মাঝামাঝি। এই কাব্য সম্বন্ধে কবি তাঁর পশ্চিমযাত্রীর ডায়রিতে লেখেন:

> ....কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে, কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ—সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা, জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়।....
>
> ....আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে

সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।...

'শিশু'র কবিতাগুলোর সঙ্গে 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলো মিলিয়ে পড়লে সহজেই চোখে পড়ে 'শিশু'র কবিতার মতো 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলো নয়—শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো বরং চিন্তাপ্রধান। প্রভাতবাবু শিশু ভোলানাথে পেয়েছেন 'বৈদান্তিকের নিরাসক্ত মনের পরিচয়। এর প্রথম দুটি কবিতা থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু কবি যে মুক্তি কামনা করেছেন তা প্রকৃতই বৈদান্তিকের মুক্তি নয়, কেননা, সেই দৃষ্টিতে শিশুও তো মায়া। কবি সহজভাবে মুক্তি চেয়েছেন বস্তুভারের দারুণ গ্রাস থেকে জগতের চিরন্তন আনন্দধারার মধ্যে—শিশুতে যার অপূর্ব প্রকাশ।

## গান

কবি তাঁর গান সম্বন্ধে ১৩২৪ সালে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রী'তে লেখেন ঃ

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধরে খুব কষে গানই লিখছি। ...গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় তেমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।

এর কারণ হচ্ছে, বিশ্বকর্মার লীলা-খেলার প্রচেষ্টার মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে শুকনো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেল, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হল কেবল তাই দেখেই বলি, যথেষ্ট হয়েছে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হলদে হয়ে গেল, বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি, ঘাসে ঘাসে অতি ছোটো ছোটো বেগনি ফুলে হলদে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে, কে না দেখে তার খেয়াল নেই। এটা হল রূপের লীলা, কেবলমাত্র হয়ে ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি

মঞ্জরী তুলে ধরে আমি বলি বাহবা। কেন বলি? ও তো খাবার জিনিস নয়, বেচবার জিনিস নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ ক'রে রাখবার জিনিস নয়। তবে ওতে আমি কী দেখলুম যাতে আমার মন বললে "সাবাস"! বস্তু দেখলুম? বস্তু তো একটি মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তবে? আমি দেখলুম রূপ। সে কথাটার অর্থ কী? রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে, "এই দেখো, আমি হয়ে উঠেছি।" যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে "তাই তো বটে, তুমি হয়েছ, তুমি আছ" আর এই ব'লেই যদি সে চুপ ক'রে যায়, তাহলেই সে রূপ দেখলে; হয়ে-ওঠাকেই চরম ব'লে জানলে।"

১৩৩৮ সালে কবির গান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখি (প্রবাহিণী, গীত-মালিকা, কেতকী, শেফালী ও বসন্ত অবলম্বনে এটি লেখা, গীতবিতান তখন পুরোপুরি বেরোয়নি) তাতে তাঁর গানগুলোতে 'রূপে'র যে বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে অর্থাৎ কবিতারূপে সে সবের যে মূল্য ও মর্যাদা, তার কথাই বলতে চেষ্টা করি। সেই লেখাটি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে। বলা বাহুল্য লেখাটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মতো বিরাট বিষয় সম্পর্কে আংশিক আলোচনা মাত্র।*

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতির কবি তাঁর গভীর আত্মিক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-পরায়ণও বটেন। কোনো বিশেষ মতবাদে পৌঁছানো অবশ্য কখনো তাঁর কাম্য হয়ে ওঠেনি, তবু নিজে যখন জীবনের পথে সত্যকার চলা চলতে চাচ্ছেন তখন তাঁর চারপাশের লোকের চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি সহজেই যে তাঁর ভাবনার বিষয় হবে এ স্বাভাবিক। এই গান-গুলোর ভিতরে সেই বিচার-বিশ্লেষণের ভাব নেই বললেই চলে। তাঁর নিজের বিশেষ একটি ভাব-মুহূর্ত, প্রকৃতির বিশেষ একটি রূপ, এই-সবই

---

*সৌভাগ্যক্রমে লেখাটি কবির ভালো লেগেছিল। একটি পত্রে (শান্তিনিকেতন, ১৬ অক্টোবর, ১৯৩৪) তিনি লেখেন: ...আমার গান সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধ পূর্বেই পড়ে আমি বিশেষ-ভাবে খুসি হয়েছিলুম। তার কারণ আমার পাঠকেরা আমার গানকে কাব্যের সম্পূর্ণতা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখে। সুরের একান্ত আশ্রিত সে রকম কবিতাও আমার আছে—সুর থেকে বিচ্ছিন্ন তার বৈধব্য দশায় সে শ্রীহীন এবং প্রায় নিরর্থক। কিন্তু আমার বিস্তর গান আছে তা কাব্য, বাইরে থেকে সুর যোজনা না করলেও সুর আছে তার অন্তর্নিহিত।

আমার নিজের বিশ্বাস কাব্য হিসাবে আমার অধিকাংশ কবিতার চেয়ে সেগুলি শ্রেষ্ঠ। বারো ঘণ্টা ধরে যাত্রা দেখার রুচি আমাদের,, দশ বারো লাইনের পাত্রে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণেই ধরতে পারে এ কথাটা আমাদের মন মানে না। সমালোচকদের মধ্যে আপনিই প্রথম সাহিত্যে এই লিরিকগুলির যথার্থ স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।....

আশ্চর্য হাল্কা হাতে এঁকে এঁকে তিনি চলেছেন। বাংলা ভাষা এক অদ্ভুত সৌন্দর্য-মাখা সংকেত-প্রাণ ভাষা হয়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

তাঁর এই সব গানের সম্পর্কে বাংলার বাউল সঙ্গীতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অবন্ধন-প্রিয় বাউলের কেমন একটি বিশেষ ঝোঁক এক সুস্পষ্ট তত্ত্বের পানে। এইসব গানের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিতান্তই অ-রূপের রূপের শিল্পী ঃ

পরাণ আমার বাঁধন হারায়
নিশীথ রাতের তারায় তারায়
আকাশ আমায় কয় কী যে কয় কেইবা জানে।

অথবা—

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে?
কোন রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পুরে॥
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা—
সাঁঝ সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে॥

এই সব গানের রচয়িতা যে ভক্ত বা সত্যান্বেষী নন তা নয়, কিন্তু বিশেষ-ভাবে তিনি শিল্পী, তাঁর ভক্তের অতলস্পর্শ ও রঙীন হৃদয়, তীক্ষ্ণ সত্যদৃষ্টি, এ-সব তাঁকে সাহায্য করেছে এই অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য লাভে।

এই সব গানের সব চাইতে বড়ো সংগ্রহ প্রবাহিণীতে গানগুলোকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে—গীতগান, প্রত্যাশা, পূজা, অবসান, বিবিধ ও ঋতুচক্র। কিন্তু এই ধরনের বিভাগের চাইতে রচনার ক্রম-অনুসারে সাজালেই হয়তো পাঠকদের বেশি উপকার হতো। সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম ভাবের খেলা, ঘাত-প্রতিঘাত, এ-সব গানে এতো বেশি যে, তারই জন্য কোনো ধরনের শ্রেণী বিভাগ ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রত্যাশা বিভাগ থেকে একটি গান নেওয়া যাক :

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥
আমার এ-দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে,

আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্‌না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথখোঁজা এই হল সারা
এখন দিগ্‌বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি ॥

এতে শেষের চরণে প্রত্যাশার কথা আছে বটে, কিন্তু এই কবিতার রস হয়ত প্রত্যাশারই রস নয়।

কবির এই-যে সব কথা :

আমার এ-দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্‌না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।

অথবা—

আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণায় আলো বাজে।

এ-সবে প্রত্যাশার চাইতে কেমন এক অ-প্রত্যাশার সৌন্দর্য উপভোগই আমাদের বেশি ক'রে চোখে পড়ে। 'প্রত্যাশা' বিভাগের অন্য একটি কবিতা থেকে এ-কথাটি আরো ভালো বোঝা যাবে :

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না ॥
তারে মানা করে কে আমার মন মানে না ॥
কেউ বোঝে না তারে
সে-যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না ॥
তার খেয়া গেল পারে
সে-যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা

ওই এগিয়ে গেল কারা
আনমনা-মন সে-দিক-পানে দৃষ্টি হানে না।

'অ-প্রত্যাশা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতি-শব্দরূপে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে—নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এই দুয়েরই জন্য একটুখানি ভূমিকার হয়তো প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যেকেরই মনের হয়তো এই দুইটি দিক আছে—একদিকে আমরা দশের সঙ্গে যুক্ত—সেখানে ভালো-মন্দের লড়াই, সঞ্চয়-ক্ষয়, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, এ-সবের আর অন্ত নেই, আর একদিকে আমরা নিতান্ত নিঃসঙ্গ—সেখানে শুধু নিঃসীম আকাশ আমাদের বন্ধু আর কেউই নয়। সাধারণ মানুষ এই নিঃসঙ্গতা বা নিঃসীমতা কেমন এক ভীতির চক্ষে দেখে, কিন্তু প্রতিভাবান এতে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক গোপন পুলকও অনুভব করেন।

এই নিঃসঙ্গতা ও নিঃসীমতার রস রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায়ও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তা যেন এক সহজ মহিমা লাভ করেছে এই সব গানে। এমন কি, নিঃসঙ্গতাই এই সব গানের প্রধান সুর বা রস বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এক-সময়ের পরমপ্রিয় ফরাসী-ভাবুক আমিয়েলও ( Amiel ) নিঃসঙ্গতা-রসিক। তিনি সময় সময় হয়েছেন নিঃসঙ্গতার রসে একেবারে বুঁদ। তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় Mrs. Humphry Ward তাঁর এই মানসিক লক্ষণের নাম দিয়েছেন intoxication of the infinite অসীমের মাদকতা। রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গতার প্রেমিক, কিন্তু এর ভিতরে বুঁদ হয়ে যাওয়া, এটি তাঁতে হয়নি। বুঁদ হয়ে যাবার জন্য কেমন এক আগ্রহ সময় সময় তাঁর ভিতরে জেগেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের রস তাঁর জন্য মধুর রয়ে গেছে। 'অনন্ত' সমুদ্রের কূলে হাওয়া খাওয়া তাঁর খুব হয়েছে, সময় সময় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার দুঃসাহসও তাঁতে জেগেছে, কিন্তু একটুখানি সাঁতার দিয়ে আবার কূলে উঠে সে-সমুদ্রের পানে তিনি চেয়ে দেখেছেন।

'অনন্ত'-সরোবরে 'আমিত্ব'-কমলের এম্‌নি এক পরম নিগূঢ় রূপ আর একজন কবির ভিতরে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—তিনি ইয়োরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে।

বলেছি, নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথের এইসব গানের প্রধান সুর। এ-কথাটি অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। একটি গান নেওয়া যাক :

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কিগো বাসা আমায় একটি ধারে॥
আমি ভৈরব ধ্বনি কানে,
আমি ভৈরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে।
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে-সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে।

এখানে কবি আর তাঁর প্রেমাস্পদের কথা আছে বটে, কিন্তু এই কবিতার শেষের ক'টি চরণের যে আবেদন :

( আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে-সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পূরে।
আমার দিন ফুরা'বে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে )

—আর এই ক'টি চরণেই হয়তো এই কবিতার বিশেষ সৌন্দর্য ফুটেছে—সেটি হয়তো নিঃসঙ্গতারই আবেদন। মিলন, মিলনের-আশা, এ-সব যে কবির অবাঞ্ছিত তা বলবো না, কিন্তু শুধু নিঃসঙ্গতারই মাধুর্য তাঁর জন্য কম নয়। এই ধরনের আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে :

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে॥
যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়,
যেখানে ওই গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়,
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে-ফুল এ নয়,
বাতায়নের পাতা হতে যে ফুল দোলে
সে-ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে
সেইদিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হলো কেন জানি।
সে কি শোনে আকাশ কোণে ভোরের আলোর কানাকানি॥
ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে
অলস পাখা উঠল জেগে
লাগল তারে উঁদাসী ঐ নীল গগনের পরশখানি॥
আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হলো আকাশ মাঝে।
যায়নি কারো সন্ধানে সে, যায়নি যে সে কোনো কাজে।
গানের ভরা উঠল ভরে
চায় দিতে তাই উজাড় করে
নীরব গানের সাগর মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী॥

মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি॥
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা
না জানার পথে ওদের নাইরে মানা,
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি॥

গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন-দ্বারে ॥

না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখি পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ৷

এ-সব কবিতা সম্পর্কে কেউ যদি বলেন, এ-সবে বিরহের প্রকাশ বড়ো মধুর হয়েছে, তাহলে সে-কথার প্রতিবাদ না ক'রে শুধু এই কথাটি বলবো —এ-সব কবিতায় অনুভাবকের নিজের ব্যক্তিত্বেরই যে এক গূঢ় মধুর আস্বাদ আছে তার পানে চোখ না রাখলে কবিতাগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে। অন্যের জন্য কবি আকুল যতখানি তার চাইতে 'নিজের'ই মনোহারিত্বে মগ্ন তিনি বেশি।

কিন্তু কাব্যের রস-আস্বাদনে কোনো সূত্রের সাহায্য একান্তভাবে গ্রহণ করা বিড়ম্বনা বৈ আর কি! অতএব 'নিঃসঙ্গতা', 'বিরহ' ইত্যাদি কথা থাকুক।

অন্যান্য বহুভাবের কবিতাও প্রবাহিণী, গীতমালিকা প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেমন—প্রেমের কবিতা :

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥
আকুল আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো ॥

এস এস বিনা ভূষণেই
দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ঐ তব রূপ
অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো
শুধু হাসিখানি আঁখি-কোণে হানি
উতলা হৃদয় ধাঁধিয়ো ॥

অথবা-

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া ॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি ॥
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া ॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥

কিন্তু এ-সব গানের প্রিয়া—আর সুফী কবিদের মাশুক (beloved) হয়তো একই দেশের মোহিনী। অপূর্বভাবে এরা মানবী, আর অপূর্বতর ভাবে এরা মানসী।

প্রবাহিণীর একটি কবিতায় প্রকাশ-ভঙ্গীর সৌন্দর্য অত্যদ্ভুত। চিন্তাধারা সুপরিচিত, কিন্তু নতুন প্রকাশ-ভঙ্গিমার জন্য এ কতো নতুন :

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে-জল 'মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না তাকে ॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে,
আকাশপুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে
মাটি পায় না তাকে ॥
শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যথা-বহ্নি-জ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তারে দিগ্‌বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে।
তখন চোখের জলে নামে সে যে চোখের জলের ডাকে,
মাটি পায় রে তাকে ॥

এই গানগুলোতে কিন্তু একটি খুব চোখে পড়বার মতো ব্যাপার এই যে, যে-মাটির প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এতো বেশি একান্তভাবে সেই মাটির মহিমা সম্বন্ধে গান তাঁর খুব কম। "এইত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" অথবা "যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" প্রভৃতি মাটির মহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি সুন্দর কবিতা এই সব সংগ্রহে আছে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম। কেউ কেউ বলতে পারেন, ঋতু সম্বন্ধে তাঁর যে অজস্র গান সে-সব তো মাটিরই মহিমার গান। কিন্তু বাস্তবিক হয়তো তা নয়। ঋতুর যত সমারোহ সে মাটির সমারোহ এ-কথা কবি ভালো করেই জানেন, তিনি নিজেও বসে আছেন মাটিরই উপরে, কিন্তু এই সমারোহ তাঁর চোখে সার্থক হয়েছে কোন্ সুদূর 'থেকে আসা আলোর ধারায়, আর সেই সুদূরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি প্রায় নির্নিমেষ।

প্রবাহিণীর 'পূজা' বিভাগের কবিতাগুলোর চাইতে গীতিমাল্যের অনেক কবিতা আমাদের ভালো লাগে বেশি, পূজার ভাবটি সেখানে যেন আরো নিবিড়, তবু এ বিভাগেও কয়েকটি ভারি সুন্দর কবিতা আছে :

তোমায় কিছু দেবো বলে চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥
যখন তোমার পেলাম দেখা
অন্ধকারে একা একা
ফিরিতেছিলে বিজন গভীর বন--
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধূলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে
তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরে আপনি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥
দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব
নানা ভাষায় নানান কলরব।
ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে

আঘাত করে বারে বারে
কত যে শাপ কত যে ক্রন্দন :
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপনাকে দিই পায়ে
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥

তোমার দ্বারে কেন আসি
ভুলেই যে যাই—
কতই কি চাই
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই ॥

সে সব চাওয়া সুখে-দুখে
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে
গভীর বুকে
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই ॥

বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে
ফেটে যাবে ঝরে যাবে দখিন-বায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে
ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে—
প্রাণের স্রোতে
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই ॥

এই সব গানের অল্প কয়েকটিতে তত্ত্বচিন্তা সুস্পষ্ট, কিন্তু সেগুলোর আলোচনা এই সম্পর্কে না হওয়াই ভালো। মোটের উপর এই সব গান নিতান্তই ক্ষণিকের গান—এক-একটি আদি-অন্ত-বিবর্জিত মুহূর্ত রূপে-রসে পরমক্ষণের মতো চিকমিক ক'রে উঠে কোন্ অতলে গিয়ে জমছে। কবির সেই সব বিচিত্র ভাব মুহূর্তের বিস্তারিত আলোচনা এক অসম্ভব ব্যাপার। হয়তো তা অপ্রয়োজনীয়ও। কেননা, সে-সবের একান্ত প্রতীক্ষা রসিক পাঠকের অতন্দ্রিত রসবোধের। মাত্র দুটি কবিতা উদ্ধৃত হচ্ছে। যথাক্রমে তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'অবসান' ও 'সন্ধ্যাদীপ' :

কোথা হতে শুনতে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে যাই ॥

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
হায়, তারা নাই তারা নাই ॥

কত দিনের কত ব্যথা
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যেদিকে
সেদিক পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই ॥

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু রাজটিকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা ॥

আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখির কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব
ক্ষণিক মরিচীকা ॥

ঋতু বর্ণনায় এই ভাব-বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত বর্ণনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

এই গানগুলোতে ঋতু-বর্ণনার যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বস্তু সেটি হচ্ছে কবির নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও বর্ণন-ভঙ্গী। ঋতুর সহজ সরল বর্ণনা এ-সব আদৌ নয়। তাঁর এই নতুন মনের উপরে ঋতুর বিভিন্ন রূপের ছায়াপাত, প্রভাব, কেমন হয়েছে, এ-সব তারই বর্ণনা মুখ্যত, অথচ ঋতুর বিভিন্ন ভাবও ফুটেছে সুন্দর। নিদাঘ সম্পর্কে দুটি কবিতা নেওয়া যাক:

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥

তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥
বুঝি না কিছু না জানি
মর্মে আমার মৌন তোমার কি বলে রুদ্র বাণী।
দিগদিগন্ত দহি
দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥
সারা হয়ে এল দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে
শান্ত হইয়া রবে
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে ॥

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।
খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা ॥
যদি ঝরে পড়ে পড়ুক পাতা,
ম্লান হয়ে যাক মালা গাথা,
থাক জনহীন পথে পথে মরীচিকা-জাল-ফেলা ॥
শুষ্ক ধূলায় খসে-পড়া ফুলদলে
ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি কর মরুসম
তবে তাই হোক হে নির্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন মেলা ॥

নিদাঘের "দারুণ দাহনবেলা" দুটিতেই ফুটেছে, কিন্তু নূতন বর্ণনা-ভঙ্গীর জন্য শেষোক্ত কবিতাটি আমাদের মর্ম স্পর্শ করে বেশি।

ঋতু-সম্পর্কিত এই সব গানে ছন্দোগতি খুবই লক্ষ্যযোগ্য। এই ছন্দোগতিই বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ঋতুর ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশে।

নিদাঘের দাহনে ধরণীর অসহায়তার ছবি আমরা দেখেছি, কালবৈশাখীর হঠাৎ প্রচুর বর্ষণে তার যে ছবি তা ফুটেছে অন্য একটি গানে:

পুব-সাগরের পার হতে কোন এল পরবাসী
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি ॥
সহসা তাই কোথা হতে
কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসি ॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু
ডমুরু-রব হয়েছে ঐ শুরু
তাই শুনে আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী ॥

এর পরই বর্ষার বিপুল ও বিচিত্র আয়োজন। বর্ষা আরম্ভ হয়নি, শুধু রসপুষ্ট গাছপালার মাথার উপর দিয়ে বাতাসের বেগে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, তার ছবিটি এই :

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়,
আয় আয় আয়
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই
যাই যাই যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়
আয় আয় আয়।
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
যাই যাই যাই।
মেঘের পানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায় ॥

বর্ষার সূচনা হয়েছে। বর্ষণোন্মুখ অত্যন্ত কালো মেঘ, তার কোলে কোলে বিদ্যুতের চমক—এর এই মোহন মূর্তি কবি এঁকেছেন :

কাঁপিছে দেহলতা থরথর।
চোখের জলে আঁখি ভরভর ॥

দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর।
তোমার আঁখি 'পরে ভরভর ॥

যে কথা ছিল তব মনে মনে,
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া স্বপনে যে মরি মরি,
আঁধার কাননের মরমর।
বাদল নিশীথের ঝরঝর ॥

এই দুটি কবিতায় সারাদিন ঝরঝর বৃষ্টির ছবি আঁকা হয়েছে—অথচ দুটিতে পার্থক্য যথেষ্ট :

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
দিঘির কালো জলের 'পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব-মর্মরের মত,
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে।
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা
সারা বেলা ধরে ঝর ঝর ঝর ধারা
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা ॥

ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার-আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা ॥

'কেতকী'র কয়েকটি গানে বর্ষার প্রবল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন :

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ, সকল ধরা
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।
ঝর ঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

অথবা—

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখি পাতে।
তোমার ভবনতলে, হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে।
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুৎ-ঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো।
প্রভু করো দয়া দেহ দেখা দুখরাতে ॥

কিন্তু সাধারণতঃ তাঁর এইসব গানের আবেদনে কোনো প্রবলতা নেই। সেই প্রবলতার অভাবই এ-সবের এক বিশেষ সৌন্দর্য—যেন নিস্তরঙ্গ জলে একরাশি কুমুদ।

অপর একটি কবিতায় বর্ষার দুর্যোগ দুর্দিন এ-সবের ছবি আঁকা হয়েছে সুন্দর, কিন্তু তার আবেদনে কোনো প্রবলতা নেই বললেই চলে :

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা

হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ।।

ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে

জনহীন অসীম প্রান্তরে,

রজনী আঁধারা ।।

অধীরা যমুনা তরঙ্গ আকুলা রে, তিমির দুকূলা রে।

নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,

চঞ্চলা চপলা চমকে, নাহি শশিতারা ।।

দীর্ঘ বর্ষাযাপনের পরে শরৎ-বধূর প্রসন্ন নয়ন উন্মীলনের ছবিটি বড়ো মনোরম :

এবার অবগুণ্ঠন খোলো খোলো।

গহন মেঘমায়ার বিজন বনছায়ায়

তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।

শিউলি-সুরভি রাতে

বিকশিত জ্যোৎস্নাতে

মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো ।।

বিষাদ অশ্রুজলে

মিলুক শরমহাসি

মালতী বিতানতলে

বাজুক বঁধুর বাঁশি।

শিশিরসিক্ত বায়ে

বিজড়িত আলোছায়ে

বিরহ-মিলনে-গাঁথা

নব প্রণয়-দোলায় দোলো ।।

প্রথম শরতের কালো মেঘ ও উজ্জ্বল রৌদ্রের গানটিতে কবি জীবন-সম্বন্ধেও একটি বড়ো ও ভা'লো কথা বলেছেন, কিন্তু সে-সব মনে না এনেও এর রচনা-মাধুর্যে কতো মুগ্ধ হওয়া যায় :

শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে

সজল বিলোল আঁচল মেলে ।।

পুব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেলো চলে,"

শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেলো বলে,"

বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে ॥
কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও যে হলো সাথিহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ-মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।"

শরতের শিশির ও রৌদ্রের ঐশ্বর্য 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' শীর্ষক সুপরিচিত গানটিতে এক চমৎকার রূপ লাভ করেছে। প্রবাহিণীর গান-গুলোতে কিন্তু শরতের আকাশ-বাতাসের চাঞ্চল্য, উদাস ভাব, এ-সবই বেশি পরিস্ফুট—সে-উদাসভাবে যেন কি এক জাদু আছে :

তোমরা যা বল তাই বল, আমার লাগে না মনে।
আমায় যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥
এই পাগল হাওয়া
কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে।
সে-গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ঐ আকাশ-ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন করে লাগে আজি আমার নয়নে ॥

হেমন্ত ও শীতের বর্ণনা এই সব গানে তেমন নেই। তার বড়ো কারণ হয়ত এই যে, বাংলাদেশে এ দুয়ের যা রূপ তা হচ্ছে সঞ্চয়ের রূপ :

"আয়রে মোরা ফসল কাটি……"

কিন্তু কবির এই সব গানের যা রূপ তাকে বলা যায় অপচয়ের রূপ—চঞ্চল সৌন্দর্যের সঙ্গে মুহূর্তের জন্য চোখোচোখি। বসন্তের রূপ-বৈচিত্র্য এই সব গানে ফুটেছে বেশি। পৌষের পাতা-ঝরা শীর্ণশাখায় বসন্তের যে আগমনী বাজছে কবির কানে তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে এইভাবে :

সব দিবি কে সব দিবি পায়!

আয় আয় আয়!

ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়

আয় আয় আয়!

আসবে যে সে স্বর্ণরথে

জাগবি কারা রিক্তপথে

পৌষ রজনী তাহার আশায়

আয় আয় আয়!

ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,

হায় হায় হায়!

তার পরে তার যাবার বেলা

হায় হায় হায়!

চলে গেলে জাগবি যবে

ধন-রতন বোঝা হবে,

বহন করা হবে যে দায়!

হায় হায় হায়॥

বসন্তের ঝরা-পাতার গানটি বড়ো মর্মস্পর্শী :

ফাগুনের শুরু হতেই শুক্‌নো পাতা ঝরল যত

তারা আজ কেঁদে শুধায়,

"সেই ডালে ফুল ফুট্‌ল কিগো?

ওগো কও ফুট্‌ল কত।"

তারা কয়, "হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি

মধুরের সুদূর হাসি—হায়,

ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত।"

তারা কয়, "আজ কি তবে এসেছে সে

নবীন বেশে?

আজ কি তবে এতক্ষণে জাগল বনে

যে গান ছিল মনে মনে?

সেই বারতা কানে নিয়ে যাই চলে এই বারের মত॥"

ঝরে-পড়ার আনন্দ নয়, কেমন এক বেদনা-কাতর তৃপ্তি রয়েছে এই সব পাতার

সুখে—বেদনা, ঝরে পড়ার জন্যে, আর তৃপ্তি, সুন্দরের আগমন ঘটবে এই ভরসায়।

বসন্তের বহু রূপ কবি এঁকেছেন। যেমন, ফাল্গুনের ডালপালা ও রঙীন ফুলের উৎসবের গান :

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে!
ও চাঁপা, ও করবী।
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ মাঝে
জানি না-যে জানি না-যে॥
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
ও চাঁপা, ও করবী।
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না-যে জানি না-যে॥
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না-যে জানি না-যে॥

ফাগুন-পূর্ণিমা গান

ভাঙল হাসির বাঁধ
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুল বনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ॥

ঘুমের আঁচল আকুল হ'ল
কী উল্লাসের ভরে !
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে !
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে বলে কে ঐ ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ ॥

বসন্তের এই সমারোহের ভিতরে মেঠো ফুলটির কথা কবি ভোলেননি :

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌ল বনের ঘাসে।
ও মোর পথের সাথি পথে পথে
গোপনে যায় আসে ॥

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি
ফুটেছে সেই আশে।
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।
ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে।
ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে
নাই বা নিলে তুলে।

সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে ॥

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ॥

ক্ষণস্থায়ী বসন্তের বিদায়ের রূপটি কবি এঁকেছেন এইভাবে :

না যেয়ো না যেয়ো না কো।
মিলনপিয়াসী মোরা –
কথা রাখো কথা রাখো।
আজো বকুল আপন-হারা, হায়রে—
ফুল ফোটানো হয়নি সারা,
সাজি ভরেনি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখ চেয়ে কোন্ বেদনায়, হায়রে—
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী!
পথিক, তারে ডাকো ডাকো ॥

এমনি কতো মুহূর্ত অপরূপ হয়ে আছে এই সব গানের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের দান দেশের কাব্যরসিকরা শ্রদ্ধায় ও আনন্দে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বার্ধক্যের 'নিরাসক্ত যৌবনে'র এই দানও কালে কাব্য হিসাবে পরম আদরে গৃহীত হবে সন্দেহ নেই। এই সব গানের পদগুলো যেন সৌন্দর্য ও আনন্দের অফুরন্ত উৎস। রূপের এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা এই সব গানেই লাভ হয়েছে বিশেষভাবে।

আর একটি গান উদ্ধৃত করবো। যে নিঃসঙ্গতা-প্রীতি এই সব গানের প্রধান সুর বলেছি তা হয়তো তেমন নেই এই গানটিতে। তা না থাকুক। কবি স্থির হয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখছেন, আমাদের সকলেরই জন্যে এ-দেখা সার্থক হোক :

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মা
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে,

মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি।
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী।
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে, ঢেউ দিয়ে তাই দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই, করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সেত নয় অরূপ মাধুরী॥

## মুক্তধারা

'মুক্তধারা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের বৈশাখে। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি বেরিয়েছিল।

একটি পত্রে ডঃ কালিদাস নাগকে কবি লেখেন :

'আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি···তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেন না, যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। অ মার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে, মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে ; কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে,

"মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।...

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ'।

কবির 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সঙ্গে এর কিছু কিছু যোগ আছে। তবে 'মুক্তধারা' বিশেষভাবে যান্ত্রিক সভ্যতা ও শাসন সম্বন্ধে কবির প্রতিবাদ—উৎকট যান্ত্রিকতার অস্বাভাবিকতা মানুষকে বন্দী রাখতে পারবে না কবির এই প্রত্যয় এতে রূপ পেয়েছে। কবির বহু লেখায় তাঁর এই চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ কবিকে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল, 'মুক্তধারা' লিখবার প্রেরণা তিনি পান ভারতবর্ষে মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলন থেকে। বলা যেতে পারে উত্তরকূট হচ্ছে ইংলণ্ড, শিবতরাই হচ্ছে ভারতবর্ষ, উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ হচ্ছে বৃটিশ জাতির অন্তর্নিহিত উদার বিচারবুদ্ধি—ভারতের কল্যাণ যার অভীপ্সিত, আর উত্তরকূটের নাগরিকরা হচ্ছে স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা অন্ধ ইংরেজ, সর্বসাধারণ যাদের কবি অন্যত্র 'ছোটো ইংরেজ' বলেছেন।

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কবির শ্রদ্ধা ও সমালোচনা দুই-ই রূপ পেয়েছে এই নাটকে। মহাত্মা গান্ধীর আত্মিক শক্তির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা কবির ছিল। কিন্তু জনসাধারণকে মহাত্মা গান্ধী যেভাবে চালিত করেছিলেন কবির দৃষ্টিতে তা ছিল সমূহ বিপদসংকুল। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবি যেসব বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখেন সেসবের সঙ্গে আমাদের পরে পরিচয় হবে। 'মুক্তধারা'য় কবির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে রাজা রণজিৎ ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর নিম্নবর্ণিত কথপোকথনে :

রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছ, রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পারনি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি, আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে ?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয়নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামাঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য ?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন ? সরো না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারিনে।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গানগুলো যে তার বিশিষ্ট সম্পদ তা আমরা দেখেছি। 'মুক্তধারা'র ভৈরবপন্থীদের গান অথবা জপমন্ত্রও খুব বিশিষ্ট। এর কিছু কিছু সংলাপও তাই। তবে সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে প্রায়শ্চিত্তের মূল্য মুক্তধারার চাইতে বেশি এই আমাদের মনে হয়েছে।

# রক্তকরবী

গ্রন্থ পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে :

'রক্তকরবী' ১৩৩৩ সালে ( ১৯২৬ ডিসেম্বর ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই নাটকটি সম্পর্কে কবি তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে ( ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ ) মন্তব্য করেছেন :

> নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য যেখান থেকে নির্বাসিত সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি, ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যেমন 'মুক্তধারা'য় তেমনি 'রক্তকরবী'তে কবি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন বিরাটকায় যন্ত্র মানুষের জন্য একালে কতো অনর্থকর হয়েছে সেই ব্যাপারটি। বলা

যেতে পারে মুক্তধারায় কবি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রধানত যান্ত্রিকতার রাজনৈতিক অনর্থের দিকে, আর রক্তকরবীতে প্রধানত তার অর্থনৈতিক অনর্থের দিকে। কবির জীবিতকালে রক্তকরবী অভিনীত হয়নি। নন্দিনীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এমন কাউকে পাননি ব'লেই নাকি কবি এর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেননি। কবির মৃত্যুর পরে এটি কুশলী-নট শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় অভিনীত হয়—এর অভিনয় সাফল্যমণ্ডিতও হয়। তবে এই নাটক মঞ্চে যে রূপ পায় তা দেখে সকলে খুশি হতে পারেননি। তাঁদের ধারণা, কবির নাটকের মূল ভাব অভিনয়ে পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। কবি নিজে অবশ্য তাঁর নাটকগুলোতে অনেক বার অনেক অদলবদল করেছিলেন। কিন্তু সে-অধিকার অন্যেরও আছে তা স্বীকার করা কঠিন।

এই নাটকটির মূল্য নিরূপণ সহজসাধ্য নয় আদৌ। শ্রমিকদের দুঃস্থ ও শ্রীহীন জীবন এতে অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। তেমনি সাফল্যের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে ধর্মধ্বজী কেনারাম গোঁসাইয়ের চিত্রও। কিন্তু এর যে প্রধান তিনটি চরিত্র—রাজা, নন্দিনী ও রঞ্জন—এদের সম্বন্ধে কবির ধারণা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হলেও এদের মানবিক রূপ সুব্যক্ত হয়েছে কি-না সে-সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। আমাদের ধারণা এটি কবির একটি শক্তিশালী চিন্তাপ্রধান নাটক রূপেই গণ্য হবে, যদিও নন্দিনী ও রঞ্জনকে রক্ত-মাংসের তরুণ-তরুণী রূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা কবি যথেষ্ট করেছেন।

নাটকটির শেষে কবির এই আশা ব্যক্ত হয়েছে: একালের বৃহৎ যান্ত্রিকতা যে মানুষের যৌবন-শক্তিকে ভয়ংকরভাবে বিনষ্ট করছে সেই চেতনার উদ্রেক হবার পরে একালের যান্ত্রিক সভ্যতার রূপ বদলাবে।

## পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ১৩৩১-'৩২ সালে। এই সময়ে কবি দক্ষিণ-আমেরিকার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে যাত্রা করেছিলেন। তিনি দেশে ফেরেন ১৯২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী।

কবির 'পূরবী' কাব্যের শেষের দিকের অনেকগুলো কবিতা এই দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রায় রচিত।

'পূরবী' কাব্যের যুগ থেকে কবির শেষ বয়সের সমস্ত রচনাকে আমরা "শেষ রাগিণীর বীন" অধ্যায়ের অন্তর্গত ক'রে দেখছি। এই অধ্যায়ের অন্য নামও দেওয়া যেতে পারে—"বিচিত্রের দূত আমি"। জীবনের এই অপরাহ্ণ বেলায় নিজের সম্পর্কে কবি তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেন সেটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

> জীবনের মাঝমহলে, যে কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল। সব জড়িয়ে ভেবেছি, এইবার আসা গেল পাকা-পরিচয়ের কেনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করত "তোমার বয়স কত ?" তাহলে আমার গোড়ার দিকের ছত্রিশটা বছর সরিয়ে রেখে বলতুম, আমি হচ্ছি বাকিটুকু। অর্থাৎ, আমার বয়স হচ্ছে কুষ্ঠির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে গম্ভীর লোকে খুশি হল। তারা কেউ বললে, "নেতা হও", কেউ বললে "সভাপতি হও", কেউ বললে, "উপদেশ দাও"। আবার কেউ বা বললে, "দেশটাকে মাটি করতে বসেছ।"...
>
> এমন সময় ঘাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে খেতে একটা জরুরি কথা ভাবছি।
>
> ভাবনাটা একদমে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে চলে গেল। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ঐ ছেলেটা এই অপরাহ্ণের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে। কোনো একটা অন্যমনস্কতার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায়নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ঐ ছেলে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েছে দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অমনি করেই নগ্ন হয়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হয়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল, সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ, আজও যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেমনি করে এসে লাগত তাহলে ঠকতুম না। তাহলে আমার জীবন-ইতিহাসের মধ্যযুগে তাকালে যুগান্তর-অবতারণায়

যে-সব আয়োজন করা গেছে তার ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়ত। আর বাদশাই-কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়িরূপে দখল করে বসবার সময় পেতুম।······

আজ মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেককাল তার দিকে চোখ পড়েনি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল পালানো লক্ষ্মী-ছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এমন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোনো দিকটায়। সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষে বেলাকার?

বলা যেতে পারে কবির শেষ বয়সের রচনায়, বিশেষ ক'রে, তাঁর শেষ বয়সের কাব্যে এই তাঁর মুখ্য বক্তব্য হয়েছে। তাঁর ভিতরে আমরা এতোদিন দেখে এসেছি একই সঙ্গে কবিকে ও মনীষীকে—শুধু সৌন্দর্যের রূপদানে নয়, শুভ চিন্তায় আর শুভ-সাধনায়ও যাঁর সুগভীর অনুরাগ। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের রচনায় তিনি বলছেন তিনি রূপের দ্রষ্টা, রূপের মহিমার উদ্‌গাতা কবি-শিল্পী—সে-ই তাঁর সত্যকার পরিচয়; তাঁর বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও তিনি বলেন, সেটি আসলে তাঁর কাজ-কাজ খেলা। শেষ বয়সে কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর গান আর চিত্র। মিথ্যা নয়, কিন্তু গদ্যে এই যুগে বিশেষ মূল্যবান রচনাও তাঁর আছে। তবু কবি সে-সবের মূল্য তেমন স্বীকার করছেন না। কবির এই মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পরে পরে আসবে।

এই ডায়ারি থেকে কবির আরো কিছু কিছু বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি:

যেযুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করেনি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেত না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েছে। এখন হতে আমরা তথ্য-বুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাব, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাব না।······

ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ, তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামি জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বিঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে।······

বড়ো জিনিস যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্মকভাবে থাকতেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি, নিজের কল্পনা-শক্তি দিয়ে নিজেই প্রাণ জুগিয়ে চলতে হয়। কেন না, বড়ো জিনিসের সঙ্গে তার যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেমনি তাদের প্রাণ দেয়। এই সব মন্তব্য কবি করেন ম্যাক্‌সিম গোর্কীর টলস্টয়ের চরিত-আলোচনা-সম্পর্কে। · ···

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুলছে। ঐ ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে ; চারিপাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ করবার মতো কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তার সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিস ভিড় করত তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাকত একটি আসবাবমাত্র হয়ে। তার ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হত, সে আপনার সব কথা বলতে পারত না।

কাব্য, সংগীত প্রভৃতি অন্য সমস্ত রসসৃষ্টিও এইরকম বস্তু বাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ স্ফূর্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তারা রস চায় না, মদ চায় ; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমকলাগা। ( পৃঃ ৩৯৮, ১৯ খণ্ড )

গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের ছুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্ত-কাল সেই তোরণের নিচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত "এটার মানে কী হল ?" সাফ জবাব পাওয়া যেত "কিছুই না"। "তবে" ? "আমার খুশি।" রূপেতেই খুশি—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

কিন্তু মেজাজের এই রঙিন খেলার মধ্যে উপলব্ধির অদ্ভুত গভীরতা নিজেকে

কখনো কখনো জানান দেয়—তাতেই সৃষ্টি হয় উঁচুদরের গীতিকাব্য। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমস্ত খেয়ালিত্ব সত্ত্বেও বিশেষভাবে জীবনধর্মী।

একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি, বিদায়ের গোধূলি-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সঙ্গে করে যেতে হবে। সেই জন্যেই সকাল-বেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, "তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক ক'রে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধূর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলি রাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধূর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যেদিক থেকে আসছে সেই দিকে কান পাতো—আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলালোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল করে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।"

কবি যেদিনে বলতে পেরেছিলেন :

অস্ত্রে দীক্ষা দেহ' রণগুরু।

তোমার প্রবল পিতৃ-স্নেহ ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

সেদিনেও অকৃত্রিম বেদনায় ও অনুরাগেই সেসব কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আজ সেসব ভাব তাঁর কাছে এতটা অর্থহীন মনে হচ্ছে কেন? এর কারণ সম্পর্কে এই সব কথা ভাবা যেতে পারে :

১। কবির মেজাজ অসাধারণভাবে পরিবর্তনশীল। এইকালে প্রকৃতির অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যের দিকে তাঁর কর্ম ও চিন্তাক্লান্ত মন নতুন ক'রে আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই আকর্ষণের প্রবলতা ব্যক্ত হয়েছে কবির এই উক্তিতে। এর বেশি মূল্য তাঁর এই উক্তিকে না দেওয়াই সঙ্গত। কবির ভোলার শক্তি যে অসামান্য, আর নিজের লেখার প্রতি প্রায়ই যে তাঁর মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়, একথা তিনি বলেছেন তাঁর 'লেখন' সম্পর্কে।

২। য়ুরোপের বিদ্বৎ-সমাজের সমাদর কবিকে গভীর আনন্দ দান করেছিল। সেই সমাদরকে কবি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বহুবিড়ম্বিত জীবনে বিধাতার অভাবনীয় করুণারূপে। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে কবি উপলব্ধি করলেন

য়ুরোপ-আমেরিকার সমাদর খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কবির প্রতি তাঁর দেশের এক শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তিদের প্রতিকূলতাও পূর্বের মতোই তীব্র ছিল। কবি তাই পরম আশ্রয়রূপে গণ্য করেছিলেন তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যবোধকেই, ও তারই প্রেরণায় তাঁর রূপসৃষ্টিকে—যা ছিল তাঁর জন্য একান্ত সহজাত।

৩। কবির বিনয় আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বৃদ্ধকালে তাঁর বিনয় প্রায় আত্ম-অবিশ্বাসের রূপ নিয়েছিল। কবির যে বিবেকের দংশনের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি গীতিমাল্যে ও গীতালিতে তার জন্যও এই ধরনের আত্ম-অবিশ্বাস প্রশ্রয় পেয়ে থাকবে।*

কিন্তু প্রকৃতির প্রতি ও তাঁর সৌন্দর্যবোধের প্রতি তাঁর এই বর্ধিত অনুরাগ কাব্যের ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ কতোটা হয়েছিল?

তার পরিচয় আমরা পাবো এই পর্যায়ের কাব্যগুলোর আলোচনা কালে।

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তীরে দেখতে পাচ্ছি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল, ক্ষণে ক্ষণে, ঘাটেও নামতে হয়েছে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে বসতে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম, শত্রুরা ভাবে,অহংকারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রশি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেছি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছে, সে কোনো কৈফিয়ত দিলে না।

... ... ... ...

আকস্মিক হচ্ছে সীমার বাইরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্তা নিয়ে সে আসে, তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তার মুক্তি। বিশ্বের সর্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আনতে গেলে চিত্তকে প্রাণবান করে রাখা চাই, অর্থাৎ তাকে উৎসুক করে তুলতে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বৃদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ, প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট করে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর করে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন বলে গৌরব করেন।......

* ১৯২৪ সালের মে মাসে দেওয়া শান্তিনিকেতন ভাষণে কবির এমন আত্ম-অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খণ্ড। ১৯১ পৃঃ দ্রঃ।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান।শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষা প্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাশ হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে সেখানেই শিক্ষাপ্রণালী বলে গণ্য হয়েছে।

... ... ...

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে মানুষ ছোটো করে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুভব হচ্ছে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, "তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্যে প্রাণ দেওয়া চলে।" মানুষ যেখানে আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজেকে সাধারণের সামিল করে অলস হয়ে বসে থাকে, প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, "তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েছি, তুমি অসাধারণ।" সূর্যের আলো, বৃষ্টির জল যেমন নির্বিচারে সর্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত করে তোলে। যে-ভূমি রিক্ত তারও সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তার কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবি, মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে-মূল্য দেয় সে মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানাদিকে পূর্ণ হয়ে ওঠে; তার কর্মের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

... ... ...

নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়। নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম,

সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো ; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের ঝংকার—সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

... ... ...

আধুনিক কলারসজ্ঞ বলেছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিতপটুত্বে বিরল রেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভার-পীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বারবার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরল রূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে ; আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে বারেবারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তরবর্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ। আজকের দিনের ভার-জর্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্যে নয়, মুক্তি যে আত্মপ্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করাতে হবে। কেননা, আজ মানুষ যেরকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনোদিনই ছিল না।

.... ... ...

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবানকে চাই নে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেনে, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাই নে, কেবল এইটুকু বলে রাখি, বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না। সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান ব'লে নয়, রূপবান ব'লে। সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ ব'লে, সুপ্রত্যক্ষ ব'লে।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের বাহিরে ব্যাপ্তি—অতীতে-ভবিষ্যতে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে, বাহিরে-অন্তরে আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে-পরিমাণে সামনে ধরতে পারে, "আছে" ব'লে মনের সায় সেই

পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়, তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে আমরা দেখলাম, মনীষা, শুভসাধনা, এসবকে কবি যতই অবিশ্বাস করুন, এসবের সঙ্গে তাঁর মনের সহজ যোগ প্রবল। তবে তাঁর গভরচনায়ও ক্লান্তি আর উদ্দীপনার কিছু অভাব, ক্রমেই বেশি করে চোখে পড়বে।

# পূরবী

গ্রন্থ-পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে:

'পূরবী' ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী' ও 'পথিক'। ১৩২৪—১৩৩০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

'পূরবী'র প্রথম কবিতাটি এক হিসাবে পূরবীর উৎসর্গ-পত্র। এতে কবি তাঁর জীবনের সর্বস্তরের অকৃত্রিম সঙ্গীদের কথা স্মরণ করেছেন:

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো,
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিল তুলি,
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নয় সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।

'পূরবী' আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ করা হয় বিজয়ার করকমলে। এঁর কথা পরে আসবে।

'পূরবী'র কবিতাগুলো যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন অনেকেই বার্ধক্যে উপনীত কবির প্রতিভার এক নতুন ছটা অনুভব ক'রে চমৎকৃত হয়েছিলেন। চারুবাবু 'পূরবী'র কবিতাগুলো সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

কবির এই দ্বিতীয় যৌবন প্রথম যৌবন অপেক্ষা মহত্তর ও মহিমময়, তাঁহার এই দ্বিজত্ব শরতের পরিণতি এবং বসন্তের প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য দ্বারা

মণ্ডিত।···পূরবীর মধ্যে চিরতরুণ চিত্তের তারুণ্য ও রসানুভূতি এবং ভাবুক বৃদ্ধ দার্শনিকের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাসম্ভূত প্রজ্ঞা একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, এইসব কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞা ভাব-চাঞ্চল্যকে নিয়মিত করিয়াছে। অনুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলনে যেসব কবিতার জন্ম হয় সেসব কবিতাই কালের ভাণ্ডারে স্থায়ী হয়।

কিন্তু কবির দ্বিতীয় যৌবন প্রকৃত প্রস্তাবে এসেছিল বলাকার যুগে। আর কবির রচনায় রসানুভূতি ও প্রজ্ঞার মিলন আমরা লক্ষ্য ক'রে আসছি বহুকাল পূর্বে থেকে। 'পূরবী'তে কবি একটি নতুন তারুণ্য উপলব্ধি করেছেন, মিথ্যা নয়; প্রতিভাবানদের জীবনে তারুণ্য বারবার দেখা দেয়; কিন্তু 'পূরবী'তে কবির যে তারুণ্য দেখা দিয়েছে তা থেকে কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক কবিতা আমাদের লাভ হলেও যেসব কবিতার সামনে আমরা বিস্মিত হয়ে বলে উঠি—অপূর্ব! তেমন কবিতা কি পূরবীর যুগে আমাদের লাভ হয়েছে?

অবশ্য কাব্যের ক্ষেত্র রসের ক্ষেত্র। সেই 'ফুলের বনে' কোনো 'নিকষ' নিয়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু জীবনে তারতম্য আমাদের করতেই হয়। পূরবীর কবিতাগুলো নিয়ে যাঁরা উৎফুল্ল হতে চান তাঁরা হোন; তাঁদের সঙ্গে তর্ক করবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মতও যে পোষণ করা যেতে পারে সেই দিকটার কথা আমরা উল্লেখ করলাম।

শুধু পূরবীর কবিতা নয়, পূরবীর কাল থেকে কবির শেষ বয়সের প্রায় সব কবিতার উপরেই মোটের উপর কবির বার্ধক্যের ক্লান্তির, চিন্তা-প্রাধান্যের, স্বদেশ ও বাইরের জগৎ দুয়েরই জন্য দুর্ভাবনার ছায়া পড়েছে। এই কালেও কিছু কিছু কবিতা আমরা পাই যা উপভোগ্য—স্মরণীয়ও—যথেষ্ট দক্ষতাও সেসবে লক্ষণীয়—কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাল—উপলব্ধিতে ও রূপে যা অপূর্ব এমন কবিতা সৃষ্টির কাল—সৃষ্টির নতুন নতুন শিখর আরোহণের কাল কবি পশ্চাতে ফেলে এসেছেন, বারবার এই আমাদের মনে হয়েছে।

অবশ্য সাহিত্যরসিকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের কাছে চিন্তার জটিলতা, প্রকাশের দক্ষতা, এসব সাহিত্যের প্রাণ-সম্পদের তুল্য। কিন্তু তাঁদের বিচার দুর্বল। এসব সাহিত্য মূল্যবান নিঃসন্দেহ, কিন্তু এসবের চাইতেও সাহিত্যে বেশি মূল্য বীর্যের—রচনায় আন্তর উদ্দীপনার—সেই বীর্য বা উদ্দীপনা কঠিন মননের সঙ্গে যুক্ত—আর তা শান্ত-অশান্ত দুই-ই হ'তে পারে। সেই আত্মিকতেজ—আন্তর-যৌবন—কবি যে এই যুগে হারিয়ে ফেলেছেন ঠিক তা নয়, তবে মন গেছে

তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির অমৃত আনন্দ-রূপের মধ্যে সমাহিত হতে ও সেইভাবে আত্মস্থ হতে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তার ফল তেমন ভালো হবার কথা নয়, কেননা, প্রকাশ এর ফলে ব্যাহত হবারই কথা। সুপ্রকাশ পূর্ণাঙ্গ জীবনের ভূমিকাতেই সম্ভবপর।

পূরবীর ২ নম্বর কবিতা 'বিজয়ী'। আধুনিক বস্তুবাহুল্যবিলাসী শক্তিদৃপ্ত সভ্যতার সুনিশ্চিত পরাভব কালধর্মে ঘটবে, কবি যেন তা প্রত্যক্ষ করছেন।

৩ নম্বর কবিতাটি হচ্ছে 'মাটির ডাক'। মাটি, জল, ফুল, ফল, আকাশ, আলো, এসবের সঙ্গে কবির যে চিরদিনের আত্মীয়তা সেটি এইকালে কবি নতুন ক'রে প্রবলভাবে অনুভব করেন—সেকথা আমরা জেনেছি। তাঁর সেই চেতনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতাটিতে :

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,<br>
যাই চলে যাই মুক্তি সুখে,<br>
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,<br>
আজ ধরণী আপন হাতে<br>
অন্ন দিলেন আমার পাতে,<br>
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।

৪ নম্বর কবিতাটি হচ্ছে বিখ্যাত 'পঁচিশে বৈশাখ'। জন্মকালে জল-স্থল-আকাশের মধ্যে কবি যেমন একটি নতুন আবির্ভাব হয়ে এসেছিলেন, তিনি কামনা করেন, তাঁর জন্মদিনে তেমনি একটি অম্লান চেতনা তাঁর মধ্যে সূচিত হোক :

হে নূতন,<br>
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন<br>
সূর্যের মতন।<br>
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,<br>
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—<br>
সেই মতো, হে নূতন,<br>
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।<br>
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,<br>
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।

চেতনার নব নব স্ফুরণ কবি নিজের অন্তরে ও সবার জন্যে চেয়েছেন। এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ চাওয়া।

৫ম কবিতা হচ্ছে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'। তাঁর অকালমৃত্যুতে কবি খুব ব্যথিত হন। তাঁর সেই বেদনা ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে এই শোকগাথায়। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু একজন অসাধারণ সৌন্দর্য-উপাসক কবি ছিলেন না, যা মহৎ, যা শোভন সেসবের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সুগভীর। কবি তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন :

অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ,
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ,
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল।

৬ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'শিলঙের চিঠি'। দুটি ছোটো মেয়ে কবিকে অনুরোধ জানায় শিলঙের বর্ণনা দিয়ে কবিতায় তাদের চিঠির উত্তর দিতে। কবি তাদের অনুরোধ রক্ষা করে এই কবিতাটি লিখে পাঠান। এটি একটি উপভোগ্য ছড়া। এর কয়েকটি ছত্র এই :

তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ু ষাট দিয়েছি শোধ করি।
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় করনি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয়নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।

৭ নম্বর কবিতার নাম 'যাত্রা'। আশ্বিনের রাত্রিশেষে অসংখ্য শিউলিফুল ঝরে পড়ছে। তারা যেন মরণকূলের উৎসবে দলে দলে ছুটে চলেছে। কবিকেও তারা বলছে—চলো, চলো। কবির চোখে মরণতীর্থের এক অপূর্ব শোভা ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন :

……"যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে,
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,

ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ—লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্তে্যর দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।...
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে।"

কবির জীবনে অনেক ব্যর্থতা লাভ হয়েছে ; কিন্তু কবি আশাবাদী, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যর্থতা সার্থকতার পথাভিসারী হবে এই তাঁর আশা ও বিশ্বাস।

৮ নম্বর কবিতা 'তপোভঙ্গ'। এটি খুব প্রসিদ্ধ। শীতের রিক্ততার পরে বসন্তে ধরণী অপূর্বভাবে শোভাময়ী হব। বৃদ্ধ কবিও তেমনি অন্তরে অন্তরে আনন্দের এক নতুন প্রবল হিল্লোল অনুভব করছেন। তাঁর ভিতরে যে কবি আছে সে চিরদিন আনন্দের উপাসক। সে যেন ভোলানাথ মহেশ্বরের-কবি। ভোলানাথ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরূপেই পরিচিত কিন্তু সেই ভোলানাথও উমার তপস্যার আকর্ষণে বৈরাগীবেশ ঘুচিয়ে বিচিত্র বরবেশে সজ্জিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই সজ্জার উপকরণ জুগিয়েছিল তাঁর কবি অর্থাৎ কবি কালিদাস। আমাদের কবি বলছেন, ভোলানাথ বৈরাগীরূপে যতই নিজেকে পরিচিত করুন, অনিন্দিত বরবেশই—তাঁর বিশিষ্ট বেশ, আর তাঁর সেই অনিন্দিত বেশ দেখে তাঁর কবি চির-উল্লসিত।

এই কবিতায় বৃদ্ধ কবির অন্তরের নতুন আনন্দচ্ছটা মাঝে মাঝে খুব লক্ষণীয় ভাষা পেয়েছে। এর একটি বিখ্যাত স্তবক এই :

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি।

তপস্যা দীর্ঘকাল কবির মনকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবি জানেন তিনি বিশেষভাবে আনন্দের উপাসক। এর পূর্বে উৎসর্গের, 'নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়,' শীর্ষক কবিতায় সেকথা তিনি বলেছেন।—এই কবিতায় বৈরাগ্যে বিশেষ-আস্থাবানদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এইভাবে:

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে.
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

কবির ফিরে-পাওয়া যৌবনের ঝলক উপভোগ্য হয়েছে এতে। প্রতীচ্য-প্রাচ্য-দিউয়ানে গ্যেটের যৌবনের নতুন বোধ স্মরণীয়।

৯ নম্বর কবিতা 'ভাঙা মন্দির'। ভাঙা মন্দিরে পুণ্যলোভীর ভিড় আর নেই; সেই মন্দির জীর্ণ ও দীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কবি বলছেন, এই জীর্ণ মন্দিরের ভগ্ন ভিত্তি ঘিরে যে বহু বন্য গাছের ফুল পাতার ভিড় জমেছে এতে তার এক নতুন সার্থকতা লাভ হয়েছে।

অর্থাৎ, বৃদ্ধ স্খলিতশক্তি কবি যে নতুন ক'রে প্রকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন এতে তিনি গভীর আনন্দ অনুভব করেছেন।

১০ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'আগমনী'। এটি বসন্তের আগমনী। বাইরে যেমন বসন্তের স্পর্শে নানা কুঁড়ি নানা ফুল ফুটে উঠেছে বৃদ্ধ কবির মনেও তেমনি নতুন আনন্দ-শিহরণ জেগেছে। এই বসন্তের দিনে কবি দীর্ঘজীবনের সব চিন্তা-ভাবনা, সব কাজ ভুলে বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবুন, তার সঙ্গে প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ুন, এই তিনি চাচ্ছেন:

গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,

বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি॥

১২ নম্বর কবিতা 'গানের সাজি'।

গান কবির এক অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁর সেই সব গানে তাঁর মনের অগণিত আনন্দ-বেদনা রূপ পেয়েছে। তারই ইঙ্গিত কবি এই কবিতায় করেছেন।

কবির ধারণা, একদিন তাঁর এইসব গানও বিলীন হয়ে যাবে, অর্থাৎ লোকেরা এইসব গানের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু তার আগে আজ কবি চাচ্ছেন তাঁর সেই বিচিত্র রূপের বিচিত্র রসের গানগুলোকে তাঁর জীবন-দেবতার পায়ে নিঃশেষে নিবেদন করতে:

একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে ঝরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে।

১৩ নম্বর কবিতা 'লীলা-সঙ্গিনী'।

এই লীলা-সঙ্গিনী কবির কৈশোরের ও যৌবনের জীবন-দেবতা। বিচিত্র মূর্তি ধরে দীর্ঘদিন কবির সঙ্গে তিনি খেলা করেছিলেন—কবির প্রথম জীবনের কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই জীবন দেবতারই বিচিত্র রূপ ফুটেছে। সেই জীবন-দেবতার বিচিত্র লীলা-রসে ভরপূর তাঁর সে মুহূর্তগুলি তারই মূল্য কবির কাছে সব চাইতে বেশি।

কবি বলছেন, লীলা-সঙ্গিনী জীবন-দেবতা আজ অবেলায় তাঁকে আহ্বান করেছেন:

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,

আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

কবি তাঁকে প্রশ্ন করছেন :

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ- াতে
নীরবে লভিব তারে ?

কিন্তু কবি মৃত্যুকে ভয় করেন না আদৌ কেন না তিনি জানেন :

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

কিন্তু কবির এমন প্রবল প্রত্যয়ের উপরেও অন্ততঃ কিছু কালের জন্য সংশয়ের ছায়াপাত ঘটেছিল—তার পরিচয় আমরা পাবো।

১৪ নম্বর কবিতা 'শেষ অর্ঘ্য'। এটি একটি সনেট।

সৌন্দর্যের মোহন স্পর্শ দেহে-মনে নিয়ে কবি জীবনের যাত্রাপথে বেরিয়েছিলেন। তিনি দেখছেন জীবন-সায়াহ্নেও সেই সৌন্দর্যের অপরূপ স্পর্শ, অপরূপ ইঙ্গিত তাঁর শ্রেষ্ঠ পাথেয় হয়েছে :

যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা,
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

'অশ্রুর অর্ঘ্যে' কবি পরমমোহনকে খুঁজতে চলেছেন, কেন না, তিনি জানেন, তাঁর অনেক সাধই সফল হয়নি।

১৫ নম্বর কবিতা 'বেঠিক পথের পথিক'। মানুষের জন্য সুনির্ধারিত যেসব পথ রয়েছে সেসব পথে কবি চলেননি। তিনি চলেছেন তাঁর অন্তরের তাগিদে। সেই নির্দেশ যে খুব স্পষ্ট কিছু তা নয়, কিন্তু সেই নির্দেশ প্রবল, আর তাঁর জন্য মনোহর :

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরাণ হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

অজানা মনোহরের নির্দেশে কবি পথ চলেছেন বলে কবি নিজেকে বলেছেন 'বেঠিক পথের পথিক'। বন্ধুর মধ্যে প্রিয়ার মধ্যে কবি যে কেমন ক'রে সেই অজানা মনোহরের স্পর্শ পেয়েছেন তা স্পষ্ট ক'রে বলবার সাধ্য তাঁর নেই :

চরণে তাহার পরাণ বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই ;

আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা-অচেনার মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

১৬ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'বকুল বনের পাখি'। ছেলেবেলায় কবি যেমন বনের পাখির মতো সহজ আনন্দে গান গেয়ে ফিরতেন, রবির আলোর কোলেতে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি, প্রাণকাড়া চাঁপার গন্ধে তিনি সাড়া দিতেন, সেই সহজ-আনন্দ-ভরা জীবন তিনি পুনর্বায় চাচ্ছেন। যেসব খ্যাতি তাঁর লাভ হয়েছে, যেসব প্রকাণ্ড কর্মের বাঁধনে তিনি বাঁধা পড়েছেন, সেসবের সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মার সত্যকার যোগ নেই। তাই কবি বকুল বনের পাখিকে মিনতি জানাচ্ছেন :

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে ॥

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', 'দিয়েছ আমার' পরে ভার তোমার স্বর্গটি রচিবার'—এসব যে কবির বিশিষ্ট উক্তি তা আমরা জেনেছি ; তার সঙ্গে এও আমরা জানতে পেরেছি যে, 'বৈরাগ্য,' 'নির্বাণ', এসবেরও প্রতি কবির অনুরাগ অপ্রবল ছিল না। এইকালে সেই অনুরাগ যথেষ্ট প্রবল হয়। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্র রূপের ক্ষেত্র, অপরিমিত ভাবাবেগ তার জন্য ক্ষতিকর।

১৭ নম্বর কবিতা হচ্ছে সুবিখ্যাত 'সাবিত্রী'। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে উল্লিখিত হয়েছে এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল হারুনা-মারু জাহাজে এক দুর্যোগের কালে। এর পরের ছয়টি কবিতাও হারুনা-মারু জাহাজে লেখা।

সাবিত্রী হচ্ছে সূর্যের স্তোত্র অথবা আলোকের স্তোত্র। প্রাণের বিচিত্র প্রকাশের মূলে আলোকের শক্তি রয়েছে একথা কবি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তেও বলেছেন :

……সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে।

আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় 'মেঘে মেঘে পত্রে-পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায়-রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এতো রং এতো রূপ এতো ভাব এতো রস। ঐ যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হলো। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে?

'সাবিত্রী' কবিতাতেও এসব কথা ব্যক্ত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে কবি চেয়েছেন তাঁর জীবনে চরম শান্তির অভিষেক হোক সূর্যের অগ্নি উৎসধারে :

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি উৎসধারে।

কবি নির্বাণ চাচ্ছেন। কিন্তু সেই নির্বাণ হোক সূর্যের তেজে পূর্ণ, এও চাচ্ছেন। তেজ কবির চিরদিনের প্রার্থিত সামগ্রী। কবি একীভূত হতে চাচ্ছেন সেই তেজ বা প্রাণের সঙ্গে।

১৮ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'পূর্ণতা'।

কবি বলেছেন, যারা আমাদের পরমপ্রিয় মৃত্যুর পরে তাদের কথাও আমাদের স্মৃতিতে ম্লান হয়ে আসে। তবু তাদের কথা আমরা যে একেবারে ভুলে যেতে পারি—তা নয়। বরং সেই স্মৃতি এক নতুন ভঙ্গীতে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার ক'রে চলে :

তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ যে গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

১৯ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'আহ্বান'।

সচেতনতার মূল্য কবির কাছে অপরিসীম। জীবন মূল্যবান হয় তারই ছোঁয়ায়। একথা কবি বলাকার কয়েকটি কবিতায় এবং আরো কিছু কিছু লেখায়ও বলেছেন। কবির এই সচেতনতা লাভ হয় তাঁর জীবন-দেবতার স্পর্শে অর্থাৎ তাঁর প্রতিভার সক্রিয়তার মুহূর্তে।

'আহ্বান' কবিতায় কবি বলেছেন, এমন স্পর্শ মাঝে মাঝে তিনি অনুভব করেছেন এবং যখন সেই স্পর্শ লাভ করেছেন সেই মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বকে ধন্য মনে করেছেন :

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে জীবন-দেবতার বা প্রতিভার স্পর্শ কবি অনুভব করছেন না যদিও তারই একান্ত প্রতীক্ষায় তিনি আছেন :

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।

কবির একান্ত কামনা তাঁর জীবনদেবতার স্পর্শ শেষবারের মতো তাঁর সঙ্গীতে লাভ হোক এবং তার ফলে তাঁর জীবন চরম সার্থকতায় মণ্ডিত হোক।

কিন্তু কবি অনুভব করছেন তাঁর জীবন-দেবতার সেই অনুগ্রহ তাঁর লাভ না হবার সম্ভাবনাই বেশি, আর সেজন্য তাঁর জীবনের পূজা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

কবি প্রশ্ন করেছেন, তাঁর জীবনের পরিচয় মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে ?

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবন মহত্তর পরিণতির পথে চলবে এ বিশ্বাস গ্যেটেরও ছিল। ( দ্রঃ কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। )

২১ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'লিপি'।

জীবনস্মৃতিতে তাঁর বালককালের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন :

……প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার মনে হইত যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।

এই "লিপি" কবিতায়ও তাঁর তেমন অনুভূতির কথাই তিনি বলেছেন :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যূষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে॥

কবি বলেছেন, প্রতিদিন জগতে যে অপরিসীম বিস্ময় ব্যক্ত হচ্ছে সেই অপূর্ব বিস্ময়ের লিখনের পাঠ উদ্ধার করতে জগতের শিল্পীরা ও কবিরা ব্যস্ত রয়েছে।

তাদের চেষ্টার আর শেষ হচ্ছে না। কবির কামনা, সেই পরম বিস্ময়ের দোলা লেগে তাঁর ছন্দ চিরদিন আন্দোলিত হয়ে চলুক।

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছেন :

এই চিঠি পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত ; যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দু'জনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি উৎসের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনই সেই বীজ পেল তার বাণী ; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। জীব ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনই তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাকবিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান, টনটন করে উঠল ; দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায় ; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেন না এই চিঠিলিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা, এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না সেই উত্তাপ কখন আকাশপথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায় ; মনে ভাবি, একেবারেই গেল বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্ এক আর জন্মের চেনা মুখ খুঁজছে।

কবিতাটির শেষ কয়টি ছত্রে কবি বলেছেন, স্বর্গের সঙ্গে মিলনের সুধার জন্য বসুধার অন্তরে যে নিত্যক্ষুধা রয়েছে তাঁর কবিতার সুরে সেই ক্ষুধার জ্বালা প্রকাশ পাক। অন্যকথায়, স্বর্গের অমৃতের জন্য, অর্থাৎ সুন্দর ও মহৎ জীবনের জন্য। প্রবল কামনা কবির ছন্দে নিত্য জাগুক এই কবির কামনা।

২২ নম্বর কবিতা 'ক্ষণিকা'।

কিশোর বয়সে যাঁরা ছিলেন কবির সঙ্গী ও সঙ্গিনী এই ক্ষণিকা কবিতায়

তাঁদের স্মৃতি রূপ পেয়েছে মনে হয়। * তাঁরা কেউই বড়ো কিছু ছিলেন না, কিন্তু কবি দেখছেন তাঁদের ক্ষীণ পদধ্বনি তাঁর গানের ছন্দ অধিকার করেছে।

এঁদের সম্বন্ধে কবি 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছেন।

…কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। তারা মস্ত বড়ো কিছুই নয়, তারা দেখা দিয়েছেন কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তারা স্থায়ী কীর্তি রাখবার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই। তারা চলতে চলতে দুটো কথা বলেছে, সব কথা বলবার সময় পায়নি; তারা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধবার চেষ্টা করেনি, তারই ঢেউয়ের উপর নৃত্য করে চলে গেছে, তারই কলস্বরে সুর মিলিয়ে, হেসে চলে গেছে, তারই আলোর ঝিলিমিলির মতো। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফলিয়েছে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিল ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোরবেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হতেই অস্ত গেল। মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ, বোধ হল, তাদের ভুলেই গেছি। তার পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারই চিরকালের ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে-না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই।

২৩ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'খোলা'। পূর্ববর্তী ক্ষণিকার সঙ্গে এর ভাবের মিল রয়েছে। কবি দেখছেন তরুণ বয়সে ভাবের খেলায় মগ্ন হয়ে যেমন তাঁর দিন কাটতো কোনো দায়িত্বের ভার গ্রহণের কথা কখনো তাঁর মনে হত না। এই বৃদ্ধ বয়সে তেমনি ধারা আনন্দ বিভোর জীবন তাঁর জন্য ফিরে এসেছে :—

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি

লুকোচুরির ছলে?

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি

শুকনো পাতার তলে?

---

* দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী; তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৯৬—১৯৭।

যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে॥

কবি অনুভব করছেন জীবন-বিধাতা তাঁর কাছ থেকে পূজা-আরতি চান না, তিনি চান, তাঁর ( কবির ) চিত্ত আনন্দে ভরপুর থাকুক।

অন্যভাবে বলা যায়, এইকালে ভগবানের আনন্দরূপের দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে—তাঁর মনীষী ও তপস্বী রূপের দিকে তেমন নয়।

এর পরের অনেকগুলি কবিতা আণ্ডেস জাহাজে লেখা—সেই জাহাজে ক'রে কবি ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ-আমেরিকায় যান। এই জাহাজে কবির শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবু এতে ২৩টি কবিতা তিনি লেখেন।

আণ্ডেস জাহাজে লেখা প্রথম কবিতা হচ্ছে 'অপরিচিতা'।

অপরিচিতা কে? কবির সমসাময়িক পাঠক-সমাজকে কবি অপরিচিতা বলেছেন, মনে হয়—কবির ভাবের সঙ্গে এঁদের সত্যকার যোগ ঘটেনি, অথবা কবির বাণী অবধান করবার সময় এঁদের হয়নি, এই কবির বক্তব্য। তবে কবি যখন থাকবেন না সেদিন হয়তো কবির বাণী সম্বন্ধে এঁরা অবহিত হবেন এমন ধারণা কিছু পরিমাণে কবি পোষণ করেন :

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা,
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা ;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান।

দ্বিতীয় কবিতা 'আনমনা'। এই আনমনাও কবির পাঠক-সমাজ। পাঠক-সমাজ যতদিন আনমনা ততদিন কবি তাঁদের কাছে তাঁর বাণীর মালাখানি আনবেন না, কেননা আনলে তাঁর বার্তা ব্যর্থ হবে, পাঠক-সমাজেরও মন জানা

হবে না।—প্রকৃতির বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য ও ভাব সম্বন্ধে পাঠকরা যখন কিছু সচেতন হবেন সেদিন কবি তাঁর ছন্দে গাথা বাণী তাঁদের কাছে মন্দ-মৃদুল তানে পাঠ করবেন।

তৃতীয় কবিতা 'বিস্মরণ'।

কবির বাণী একদিন পাঠকদের ভালো লেগেছিল। আজ যদি তাঁরা সেই বাণী ভুলে গিয়ে থাকেন, কবি বলছেন, তাতে ক্ষতি নেই—কবির বাণীর মাধুরী হয়তো তাঁদের জন্য সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি।—আর যদি লুপ্ত হয়ে গিয়েই থাকে তবে যাক না :

শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে॥

কবির "যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" শীর্ষক গানের এই দুটি লাইন এই সম্পর্কে স্মরণীয় :

সেদিন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।

আণ্ডেজ জাহাজে লেখা চতুর্থ কবিতা হচ্ছে সুবিখ্যাত 'আশা'। এটি পূরবীর ২৭ নম্বর কবিতা। এই কবিতাটির কবিকৃত আবৃত্তি রেকর্ড করা হয়েছে।

কবির এই কালের যে বিশেষ চিন্তা :

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয়,
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।

* * *

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়।

সেটি এই কবিতায় একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। কবিতাটি খুব চিত্তগ্রাহী। কবি মস্ত বড়ো কিছু কামনা করেন না। তিনি কামনা করেন, 'একটুকু বাসা,' 'আপনার···খেয়ানের ভাষা,' আর 'কিছু ভালবাসা'। মনে হয় এসব যৎসামান্য আর সহজলভ্য, কিন্তু আসলে তা নয় :

একটুকু সুখ গানে সুরে ফুলের গন্ধে মেশা
গাছের ছায়ায় স্বপ্ন দেখা অবকাশের নেশা,

মনে ভাবি চাইলে পাব, যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।

কিন্তু কবির এই যুগের চিন্তায় মোটের উপর কিঞ্চিৎ ভাবাতিশয্য ও একদেশদর্শিতা ঘটেছে। এই কবিতারই দুটি বিখ্যাত চরণ নেওয়া যাক:

আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

সাধারণভাবে একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিচার করে দেখলে এর ত্রুটি ধরা পড়ে। উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে ফুলের গুচ্ছের গূঢ় যোগ রয়েছে, কেননা, পাহাড়ে থেকেই উৎপত্তি হয়েছে স্রোতোধারার—যা ফুল ফোটাবার সহায়। অন্য কথায়, পাহাড় আর ফুলের গুচ্ছ দুইই লক্ষযুগের "স্বপ্নের" ব্যাপার। কিন্তু ফুলের গুচ্ছই কবির দৃষ্টি বেশি অধিকার করেছে।

এর ২৮ নম্বর কবিতা 'বাতাস'।—বাতাস প্রভাতের গোলাপের ঘুম ভেঙে তাকে জাগায় প্রভাতের আলোকের অভ্যর্থনার জন্যে, পাখির কুলায় দুলিয়ে দিয়ে তাকে আকাশের সীমাহীন বাণীর কথা বলে, নদীর বুকে জাগায় সাগরের ছন্দ, অরণ্যকে দেয় বসন্তের সংবাদ। কবিও বাতাসেরই মতো।

....আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ,—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

২৯ নম্বর কবিতা 'স্বপ্ন'।

কবির মুখ্য বক্তব্য:

কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা।
স্বপ্ন শুধুই মর্ত্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে—অসীম পথের পথ্য তাই।

বলা বাহুল্য ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই ধরনের কথা কবি বলতে চাননি। বাস্তব জগতের তুলনায় ভাবের জগৎও যে কত সত্য সেই কথা তিনি একটু জোর দিয়ে বলেছেন।

৩০, ৩১ ও ৩২ নম্বর কবিতা হচ্ছে তিনটি সনেট।—তিনটিই সমুদ্র সম্পর্কে। সমুদ্রের যে নিরন্তর গর্জন ও আন্দোলন, কবি তা দেখছেন শুধু সমুদ্রে নয়, নিঃসীম

আকাশে আর মানুষের চিত্তের গহনেও। কবির মনে হয়েছে, এই গর্জন ও অস্থিরতা রূপহীনতার রূপলাভের আকুলতা। কত রূপময় দ্বীপ ও বন সমুদ্র-গর্ভে ডুবে গেছে, কত প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জ্যোতিহীন হয়ে অতলে অন্তর্হিত হয়েছে, কত রূপময় ও ভাষাময় আকাঙ্ক্ষা রূপ ও ভাষা হারিয়ে প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে মূর্তি ধরে উঠবার প্রয়াস পাচ্ছে—সমুদ্রের নিরন্তর গর্জনে ও আকুলতায় সেইসব আকুলতারই প্রতিরূপ।

৩৩ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'মুক্তি'।

মুক্তিকে কবি বলেছেন পরিপূর্ণতার সুধা—ভাবের তন্ময়তায় তার সাক্ষাৎ মেলে :

মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির-নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

এই সময়ে কবি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন—বিছানা ছাড়া তাঁর আর গতি রইল না। কবি তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'তে লিখেছেন :

> শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। বিদ্রোহের চেষ্টা করতে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে, মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে তখন তাকে পরাভূত করতে পারিনে, কিন্তু তাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তো কেউ কাড়তে পারে না—আমার হাতে তার একটা উপায় আছে, সে হচ্ছে কবিতা লেখা।...কয়দিন রুদ্ধকক্ষে সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম...।

এই অবস্থায় কবি লেখেন 'ঝড়' ও 'পদধ্বনি'—দুটিতেই মৃত্যুর সামনে কবির অভীতি প্রকাশ পেয়েছে। ঝড়-এ কবি মৃত্যুকে ভেবেছেন পরিত্রাতা—নতুন পথের দিশারি :

আবেশের রসে মত্ত
আরাম শয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—

কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়।"

'পদধ্বনি'তে আশংকিত মৃত্যুর রূপ আঁকা হয়েছে এইভাবে :

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশংকার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে,
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।

কিন্তু মৃত্যুকে কবি ভয় করেন না। বন্ধু মৃত্যুকে তিনি প্রশ্ন করছেন :

হে বিবহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে
আতংকিত নিশীথ বেলাতে ?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে ?

৩৬ নম্বর কবিতা 'প্রকাশ'।

কার প্রকাশের কথা কবি বলেছেন—বিশ্বমানবের, না, তাঁর দেশের ? দুইই হ'তে পারে।

সত্যকার প্রকাশ বলতে কবি বোঝেন 'সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ।' "বাহির দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল"—এটি প্রকাশের সত্যকার রূপ নয়। সত্যকার প্রকাশের এই রূপ কবি এঁকেছেন :

আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা

তখন হবে চুপ।

এখন দুঃখ সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

৩৭ নম্বর কবিতা 'শেষ'।

কবি অশেষের কাছে তাঁর এই শেষ অবসান—কামনা করছেন ঃ

বধূ যথা গোধুলির শেষ ঘট ভ'রে,
বেণুছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।

৩৮ নম্বর কবিতা বিখ্যাত 'দোসর'।

দোসর বলতে কবি বুঝেছেন জীবনদেবতা অথবা প্রেরণা। কবি দোসরের নিবিড়তর সান্নিধ্য চাচ্ছেন ঃ

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

৩৯ ও ৪০ নম্বর কবিতায়ও কবির চিন্তা চলেছে মৃত্যুকে ঘিরে।

৪১ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'কৃতজ্ঞ'।

লোকান্তরিত প্রিয়জনের কথা কবির মনে পড়েছে। কবি দেখছেন, কাল-ধর্মে পূর্বস্মৃতি অনেক ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু তবু প্রথম জীবনের প্রেম তাঁর জীবনে কী মহাসম্পদ এনে দিয়েছে ঃ

সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো তবে।
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে

গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ, রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো।

৪২ নম্বর কবিতা 'দুঃখ-সম্পদ'।

কবি বলেছেন, দুঃখের দিনে যন্ত্রণায় যখন তাঁর চিত্ত ভরে ওঠে :

তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর মাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

কবির অন্তরের এই গোপন অমরাবতীর কথা তাঁর শেষ কবিতায়ও ব্যক্ত হয়েছে।

৪৩ নম্বর কবিতা 'মৃত্যুর আহ্বান'।

মৃত্যুকে কবি দেখেছেন নতুন এক যাত্রারম্ভ রূপে :

দুয়ার রহিবে খোলা, ধরিত্রীর সমুদ্র পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

পূর্বেও অনেক লেখায় কবির এই চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

৪৪ নম্বর কবিতা 'দান'।

কবি বলেছেন, প্রেমের দান অমূল্য—যে দেয় ও যে নেয় দুজনের কাছেই। যে দেয় সে দিয়েই কৃতার্থ, আর যে প্রেম গ্রহণ করে তার ব্যবহারে কোনো বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

এর এইসব চরণ :

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কি আছে এই ভবে।

কোন্ খনিতে কোন্ ধনভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে ;
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।

হাফিজের "প্রিয়ার গণ্ডের কালো তিলের জন্যই সমরকন্দ ও বোখারা দান করে দেব" স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪৫ নম্বর কবিতা 'সমাপন' পূর্ববর্তী 'মৃত্যুর আহ্বানে'র সঙ্গে পঠনীয়। ৪৬ নম্বর কবিতা 'ভাবীকাল' কবির বিখ্যাত "১৪০০ সাল"-এর সঙ্গে তুলনীয়। ৪৭ নম্বর কবিতা 'অতীতকাল' ও '১৪০০ সাল'-এর সঙ্গে তুলনীয়।

৪৮ নম্বর কবিতা 'বেদনার লীলা'। কবি তাঁর গানগুলি সম্বন্ধে বলেছেন :

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে ;—
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে ;—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।

এইটি আণ্ডেজ জাহাজে লেখা শেষ কবিতা।

এর পর কবি উপনীত হল আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসে। তার শহরতলীর একটি সুন্দর উদ্যান-বাটিকায় তাঁর বাসের ব্যবস্থা হয়—এখানে প্রায় দুই মাস তিনি কাটান। এখানে কবির সেবাযত্ন করেন শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। তাঁর সেবায় কবি গভীর প্রীতি লাভ করেন ও তাঁর উদ্দেশে কয়েকটি কবিতা লেখেন। 'পূরবী'-কাব্য কবি উৎসর্গ করেন এই ভিক্টোরিয়াকে—তাঁর বাংলা বা ভারতীয় নাম তিনি দিয়েছেন বিজয়া।

বুয়েনোস এয়ারিসে লেখা প্রথম দুইটি কবিতা হচ্ছে 'শীত' ও 'কিশোর প্রেম'। দুইটিতেই পুরাতন প্রেমের স্মৃতি মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় কবিতা, অর্থাৎ পূরবীর ৫১ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'প্রভাত'। কবির সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেছে—অতি নিবিড় আনন্দে তিনি প্রভাত যাপন করছেন :

স্বর্ণসুধা ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যে আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।

কবির অপরিসীম আলোক-প্রীতি লক্ষণীয়। ৫৩ নম্বর কবিতা 'অতিথি'। এটি একটি সনেট। বিজয়াকে লক্ষ্য ক'রে কবি লেখেন :

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্য সুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে, যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমাদের যে জানি মোরা জানি,
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"

৫৪ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'অন্তর্হিতা'। অনুকূল মুহূর্ত এসেছিল কিন্তু অবসাদে ও আলস্যে তার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়নি—এই ছবি এতে আঁকা হয়েছে। এই ধরনের ছবি পূর্বেও কবি এঁকেছেন।

৫৫ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'আশঙ্কা'। এই কবিতাটি 'বিজয়া'র উদ্দেশ্যে লেখা—এই মনে হয়। বিজয়ার অন্তরে কবির জন্যে যে অনুরাগের শিখা জ্বলেছিল কবি তা বুঝতে পেরেছিলেন :

দেখেছিলেম স্বপ্ন আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর-তলে।

বিজয়ার প্রীতি কবিরও অকাম্য ছিল না :

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি বুঝলেন :

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোর আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।

তাই কবির সিদ্ধান্ত দাঁড়াল :

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাতে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে ;

তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থে বিজয়া-সম্বন্ধে কবির এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে :

যদি বা ফেরবার জাহাজ পাওয়া গেল কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাহেবের (এল্‌ম্‌হার্স্টের) সঙ্গে তাঁর ছিল একটু রেষারেষির সম্পর্ক, কারণ সাহেব সর্বদা আমার কাছাকাছি থাকত, সেটা সে সইতে পারত না। অবশেষে সে ভাবলে সাহেব আমাকে নিজের স্বার্থের জন্য এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, গেল সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে। স্প্যানিসরা ভাবপ্রবণ জাত, ওদের সামলানো

বড় কঠিন, তবে এই জাতই আবার পারে আবেগের উদ্দীপনায় আত্মোৎসর্গ করতে। এই বিদেশিনীর মধ্যে দেখেছিলুম সেই অনুরাগের আগুন।

কবির যে সংযমের পরিচয় আমরা এখানে পেলাম তাঁর যৌবনের কবিতায়ও তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

৫৬ নম্বর কবিতা 'শেষ বসন্ত'। বিজয়ার সান্নিধ্যে কবি তাঁর জীবনের শেষ বসন্ত যাপন করছেন, মনে হয় এই কবি বলেছেন। প্রেমের দাহ, আঁখিজল, এসব কবির কাম্য নয়, কবি কামনা করেন কিছুক্ষণের প্রীতিময় সান্নিধ্য:

পাতার আড়াল থেকে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

মনে হয় বিজয়ার নবীন জীবনের চাঞ্চল্য-রূপ পেয়েছে এই মোহন ছত্রগুলোয়:

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে —
সহসা চকিত করো ত্রাসে।

ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

কবির 'শেষ বসন্তের' এসব অভাবিত কাব্যকুসুম বটে।

৫৭ নম্বর কবিতা 'বিপাশা'। এটিও বিজয়াকে লক্ষ্য ক'রে লেখা মনে হয়। বিজয়া কবির জন্যে হয়েছেন 'বিপাশা' অর্থাৎ পাশমুক্তির হেতু। কবি দেখছেন বিজয়ার দেহে-মনে নিত্য চঞ্চলতার ঢেউ খেলে, তার গতি ঝরণাধারার মতো সর্বদা মুক্ত। কবি তার সেই মুক্ত রূপই দেখতে ভালবাসেন - সে যদি তটের শরণ না নেয় তবে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। কবি বিজয়াকে সাবধান করছেন এই বলে:

যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে;
ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।

সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিঘ্নটিকে।
গন্ধ তোমার হ'ক না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন, চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।

আর নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে।

প্রেম, সৌন্দর্য, এসব আমাদের বন্ধনের কারণ না হোক, একথা কবি বহুভাবে বলেছেন।

৫৮ নম্বর কবিতা 'চাবি'।

কবির মনটি যে আর দশজন মানুষের মনের মতো নয়, তা অনেকখানি স্বতন্ত্র—এই কথা কবি এতে বলেছেন।

কবির মনটি যেন বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্য—শুধু তার বাহিরের ঘরে অতিথিদের জন্যে নানামতো সজ্জা প্রস্তুত আছে, কিন্তু তার নীরব নির্জন অন্তঃপুর তালাবদ্ধ—তার চাবি দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পথিকরা মাঝে মাঝে সেই দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, "খুলে দাও", কিন্তু কবি সেই দ্বার খুলবার উপায় জানেন না। (বহু আত্মীয় ও অনুরাগীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও কবি যে অনেকখানি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন তা যথার্থ। তবে বড় মনের এটি হয়তো একটি লক্ষণ।)

এই অন্তঃপুরেও শেফালি ফোটে, পাখি তার উদাসীন প্রেয়সীকে ডাকে, কিন্তু এই অন্তঃপুরের নির্জনতা দূর হয় না। কবি একা দূরে চেয়ে তারই প্রতীক্ষা করছেন :

যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি, বক্ষে নিয়ে তুলে,

শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন বাণী,
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান,
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায়নি সন্ধান।

কে এই পথিক ? হয়তো কবির প্রতি বিশেষ অনুকূল "পষ্টারিটি"।

৬০ নম্বর কবিতা 'প্রভাতী'। পূর্বের 'প্রভাতে'র সঙ্গে তুলনীয়।

আনন্দময় প্রভাতে কবি কালো কাজল আঁখি চপল ভ্রমরকে ডাকছেন তাঁর অন্তরের আনন্দ-মধু নিঃশেষে গ্রহণ করতে।

এই ভ্রমর কে ? কবির পরম-সার্থকতা-দাতা জীবনবিধাতা মনে হয়। তিনি মৃত্যুরূপীও হ'তে পারেন। (তুলনীয় ঃ চৈতালির উৎসর্গ)।

চারুবাবু চপল ভ্রমর বলতে বুঝেছেন দরদী সমঝদার। কিন্তু তাঁকে কি কবি বলতে পারেন 'এস এ বক্ষ মাঝে' ?

৬১ নম্বর কবিতা 'মধু'।

কবি বলেছেন, তিনি মৌমাছির মতো বসন্তের পুষ্পবনের মধুটুকু মাত্র গ্রহণ করতে চান না। মৌমাছি কবির দৃষ্টিতে একদেশদর্শী।

চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়েনি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।
তাঁর মন বরং শুধু ওড়বার সুখ চায়—
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার.
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

এই জন্যই সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের পরম রসিক হয়েও সেসবের প্রতি কবি কোনোদিন অন্ধ আসক্তি অনুভব করেননি। অন্ধ আসক্তির সঙ্গে যেন তাঁর প্রকৃতিগত বিরোধ। গ্যেটেরও স্বভাবতঃ মুক্তির দিকে গতি ছিল, তবে আসক্তিও তাঁতে প্রবল ছিল। ফাউসট নিজের সম্বন্ধে বলছে :

হায়, আমার মধ্যে রয়েছে দুইটি মন,
একটি কেবলই বিরুদ্ধাচরণ করে অন্যটির।
একটি নিগূঢ় আসক্তিতে
জড়িয়ে ধরেছে জগৎ সংসারকে,
অপরটি ধূলি-কুয়াশার স্তর সবলে ভেদ করে'
মাথা তুলতে চায় নির্মল আকাশে।

দেখা গেছে প্রবল প্রেমাবেগের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পরে গ্যেটে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তার কারণ, মনকে বশে আনতে তাঁকে খুব বেগ পেতে হ'ত। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে ততটা বেগ পেতে হ'ত না।

৬৭ নম্বর কবিতা হচ্ছে 'কঙ্কাল'।

মাঠের একপাশে পশুর কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখে কবি বলছেন :

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।

কিন্তু এই নিয়তি কবি স্বীকার করেন না :

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

এর কিছু কাল পরে লেখা 'পৃথিবী' কবিতায় কবি চেতনাবান মানুষেরও জন্যে এমন নিয়তি প্রায় মেনে নেন।

৭৩ নম্বর কবিতা 'বনস্পতি'।

কবি বনস্পতির এই রূপ এঁকেছেন :

ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

একই সঙ্গে এমন দৃঢ় ও নমনীয় বনস্পতি দিগঙ্গনার হাতে কি বিষম লাঞ্ছনা ভোগ করে তার এই ছবি কবি এঁকেছেন :

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তাপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব॥

কিন্তু মহৎ বনস্পতির এমন 'লাঞ্ছনা' বনস্পতির ও দিগঙ্গনা দুয়েরই জন্য অসার্থক।

দিগঙ্গনা বনস্পতির মধ্য দিয়ে যে মহৎ সার্থকতা লাভ করতে পারে তার এই ছবি কবি এঁকেছেন :

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।
তাহার গৌরবে লহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

প্রেমের এই সার্থকতার চিত্র কবি বহুভাবে এঁকেছেন। উদ্দাম ভোগ কবির চোখে অসার্থক।

৭৫ নম্বর কবিতা 'মিলন'।

বুয়েনোস এয়ারিস ত্যাগ করে জাহাজে কবি চারটি কবিতা লেখেন—'মিলন' চার প্রথমটি।

পরমপ্রীতিপাত্রীর সঙ্গে কবির গভীর আনন্দে দিন কেটেছিল। সেই সংযত আনন্দের এই অবিস্মরণীয় রূপ কবি এঁকেছেন :

সেখানে বসেছিনু আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময় ;

কিন্তু এই আনন্দ যত সংযতই হোক এরও অন্তরে ছিল আগুন—কবি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন :

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী;
বুঝিনু যবে দোঁহে পরাণ-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

৭৮ নম্বর কবিতা 'বদল'। ফিরতি জাহাজে লেখা—এটি শেষ কবিতা। এর পরে পূরবীর শেষ কবিতা 'ইটালিয়া' —ইতালির প্রতি কবির প্রীতি নিবেদন।

'বদল' কবিতাটিও বিজয়ার স্মৃতির সঙ্গে কিছু সম্পর্কিত মনে হয়।

সুন্দরী নারী তার ডালিভরা হাসির কুসুম আনলে আর কবি আনলে তার

দুঃখ-বাদলের ফল ; অর্থাৎ বহু-অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবন। কবি নারীকে বললে, যদি তোমার ফুলের সঙ্গে আমার ফলের বদল করি তবে কার হার হবে বলো। অর্থাৎ ফুলের দ্বারা কবি কিছুটা প্রলুব্ধ হয়েছে।

নারী খুশি হয়ে রাজী হলো। কবি নারীর মুখপানে চেয়ে দেখলে—'নিদয়া সে মনোহরা'।

কবির ও নারীর ফল ও ফুল বদলাবদলি হলো।

নারী হেসে বললে, আমার জয় হলো—ব'লে সে ত্বরিত পদে দূরে চলে গেল। কবি দেখলে সমস্ত দিনের প্রবল দহনে ফুলগুলি সন্ধ্যাবেলায় ঝরে গেছে।

নারীর মাধুর্য যতই মনোহর হোক কঠোর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবন তার চাইতে মহত্তর, সেই মাধুর্যের সঙ্গে সেই জীবনের বদল হ'তে পারে না, অর্থাৎ এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে জীবন-সম্বন্ধে সাবধান হবার কথা ভাবতে হয়—এই কি কবি বলতে চান?—এই ধরনের কথা কবি ছিন্নপত্রাবলীতে বলেছেন। বনস্পতি কবিতায়ও এর ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। তবে এই কবিতায় দেখা যাচ্ছে 'নিদয়া মনোহরা'র কাছে কবি হার মানলে। তাতেই অবশ্য জীবনের রস উছলে উঠলো।

বিজয়া-সম্পর্কিত কয়েকটি কবিতা 'পুরবী'র খুব বিশিষ্ট কবিতা। প্রেমের বা প্রীতির অকৃত্রিমতা আর চেতনার প্রাখর্য দুই-ই সেসবে লক্ষণীয় হয়েছে।—এই সম্পর্কে গ্যেটের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে : সাময়িক কবিতাই আদি ও সব চাইতে অকৃত্রিম কবিতা।

বিজয়া ও রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্পর্ক তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে। গ্যেটে ও মারিয়ানা ফন্ ভিলেমার-এর প্রীতির সম্পর্কের সঙ্গে। (দ্রঃ—কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড,—প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান)। আমরা পরে পরে দেখবো বিজয়ার প্রভাব কবির রচনার ওপরে বেশ পড়েছে।

# লেখন

'লেখন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি 'প্রবাসীতে' ১৩৩৫ সালে যা লেখেন তার কিছু অংশ এই :

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলাম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখা চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর একদিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে ; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই।......

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেন না তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্যবস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হইনি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এই রকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে

লাগল তখন আমি অনুরোধ-নিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি :

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিককালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়ো ফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।……

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে. যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়ত সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

কবির 'কণিকা'র কবিতাগুলোর সঙ্গে তাঁর 'লেখনে'র কবিতার মিল রয়েছে। তবে পার্থক্যও এই দুই গ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে। 'কণিকা'র কবিতা মুখ্যতঃ জ্ঞানগর্ভ আর 'লেখনে'র কবিতাগুলোর রূপের দীপ্তি সহজেই চোখে পড়ে, কবি প্রিয়ংবদা দেবীর মতে—'এক-একটি সু-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে।'

এর কয়েকটি কবিতা আমরা উদ্ধৃত করছি :

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা॥

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর
আয় গহ্বর ছেড়ে
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর,
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
বুঝি হল পথ ভুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে?"

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

অবকাশ কর্মে খেলে আপনারি সঙ্গে,
সিন্ধুর স্তব্ধতা খেলে সিন্ধুর তরঙ্গে॥

# নটীর পূজা

'নটীর পূজা' প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। এর দ্বিতীয় সংস্করণে 'সূচনা'য় উপালি-চরিত্রের অবতারণা করা হয়। উপালি বৌদ্ধভিক্ষু, মালিনীর কাশ্যপের প্রতিরূপ—রাজগৃহের নটী শ্রীমতীকে তিনি জানিয়ে যাচ্ছেন যে, ভগবান তাকে দয়া করেছেন—সে ভাগ্যবতী।

এতে প্রধান চরিত্র দুইটি—রাজবাড়ির নটী শ্রীমতী আর মহারাজ বিম্বিসারের মহিষী লোকেশ্বরী। রাজকুমারী রত্নাবলীকেও একটি প্রধান চরিত্র ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। তাহলে প্রধান চরিত্র দাঁড়ায় তিনটি।

মহারাজ বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের একান্ত ভক্ত। একদা রাজোদ্যানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ ক'রে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সেইখানে চৈত্য স্থাপন ক'রে বুদ্ধপূজার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই নাটকের আরম্ভকালে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁর সিংহাসনলোলুপ পুত্র অজাতশত্রুর হস্তে সমর্পণ ক'রে নগরী থেকে দূরে বাস করছেন। অজাতশত্রু বুদ্ধদ্বেষী দেবদত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর রাজ্য থেকে বুদ্ধপূজা নির্মূল করতে তৎপর হয়েছেন। মহারাজ বিম্বিসারের অন্য পুত্র চিত্রও সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন। এমনিভাবে সন্তান হারিয়ে ও মহিষীর গৌরব হারিয়ে রানী লোকেশ্বরী বুদ্ধ-অনুশাসিত ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ হয়েছেন। কিন্তু রানীর চরিত্রে কবি ফুটিয়েছেন একটি প্রবল অন্তর্বিরোধ। তিনি একসময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। আজকার দুর্দিনে তাঁর অতীত শ্রদ্ধায় আর বর্তমান বিদ্বেষে একটা প্রবল সংঘর্ষ বেধেছে তার অন্তরে। কুমারী রত্নাবলীর অন্তরে প্রবল ঈর্ষা জেগেছে এই দেখে যে পতিতা শ্রীমতী বুদ্ধের অকৃত্রিম ভক্তরূপে রাজবাড়ির অনেকের গভীর সম্ভ্রম অর্জন করেছে।

রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধপূজা নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, তাই অশোকচৈত্যে তাঁর পূজা আর হ'তে পারবে না। কিন্তু আজ বসন্তপূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন, অশোকচৈত্যে পূজা নিবেদন করবার জন্য শ্রীমতী বৌদ্ধ ভিক্ষুকের দ্বারা আদিষ্ট

হয়েছে, তাই রাজার আদেশ, রাজকুমারীদের ঈর্ষা-বিদ্রূপ, সব শান্তভাবে উপেক্ষা ক'রে সে সেই পূজা নিবেদনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

শ্রীমতীকে লাঞ্ছিত করবার জন্য রাজকুমারী রত্নাবলী রাজার কাছ থেকে এই আদেশ আনিয়েছে যে, শ্রীমতীকে আজ অশোক বেদীর সামনে নাচতে হবে। শ্রীমতী শান্তমনে সেই আদেশ শিরোধার্য করলে। কিন্তু সবাই তাকে গভীর ধিক্কার দিচ্ছে এমন গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হবার জন্যে। রানী লোকেশ্বরী তার জন্যে বিষ এনেছেন যা গ্রহণ ক'রে সে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবে। কিন্তু শ্রীমতী নাচের ছলে পূজা নিবেদনের জন্যেই কৃতসংকল্প।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি অতি করুণ এবং অতি উচ্চাঙ্গের আত্মনিবেদনের ভাবে পূর্ণ। শ্রোতাদের ওপরে সহজেই সেই ভাব গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কবির 'রাজা'র সঙ্গে এর তুলনা চলে।

এটি লেখা হয়েছিল কবির ১৩৩৩ সালের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে। মনে হয় কবি তাঁর জীবনের মর্মকথা এই নটীর পূজার শেষ অঙ্কে নিবেদন করেছেন। বিচিত্র রূপ ও রস তাঁর চিত্তকে মুগ্ধ করে, নিজেকে তিনি জানেন বিচিত্রের দূত-রূপে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি অনন্তের—পরম একের—প্রেমে নিবেদিতচিত্ত, সেই প্রেমে সব রূপ-রসকে অবলীলাক্রমে তিনি আহুতি দিতে পারেন। নটীর যে গান:

আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

এটি কবিরও অন্তরাত্মার গান।

# নটরাজ

গ্রন্থ-পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে :

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' নামে ইহা অভিনীত হয়। অভিনয় হইতে দেখা যায়, ইহার কবিতাংশ সম্পূর্ণ নূতন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ঋতুরঙ্গ মুদ্রিত হয়।

এর ভূমিকায় কবি লেখেন :

নৃত্য-গীত ও আবৃত্তিযোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম।

দেখা যাচ্ছে এই যুগে কবি মুক্তির সন্ধান করেছেন বিশেষভাবে গভীর ভাবাবেগের ভিতরে (অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে)। সমসাময়িক জীবনে বস্তুর সমারোহ কবির এই মনোভাবের মূলে অনেকখানি। বলাবাহুল্য, মুক্তি বলতে শুধু গভীর ভাবাবেগই (লীলারস উপলব্ধির আনন্দই) বোঝায় না। নটরাজের প্রথম কবিতাটিতে কবি সেকথা বলেছেন :

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ-না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আমরা দেখেছি কবি লীলাবাদী যত জীবনবাদী তার চাইতে বেশি। তাই জীবনের দুঃখ নিয়ে সংগ্রাম করবার কথা বারবার তিনি বলেছেন। কিন্তু এই যুগে লীলারসের দিকে তিনি বেশি ঝুঁকেছেন।

নটরাজে বিভিন্ন ঋতু সম্বন্ধে যেসব গান আছে সেসবের সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা এর পূর্বে 'গান' পরিচ্ছেদে করেছি।

## জাভাযাত্রীর পত্র

'যাত্রী' গ্রন্থখানির 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এইবার তার অবশিষ্ট অংশ 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক্। এর রচনাকাল ১৯২৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে।

এই যাত্রায় যাঁরা কবির সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই ভ্রমণের একটি পূর্ণাঙ্গ ও মনোজ্ঞ পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে।

'জাভাযাত্রীর পত্রে'র প্রথম পত্রে কবি অবতারণা করেছেন একালের য়ুরোপের যে শ্রেষ্ঠ সাধনা, অর্থাৎ বিজ্ঞান সাধনা, তার কথা। এ-সম্বন্ধে কবির কিছু কিছু মন্তব্য এই :

> য়ুরোপ সর্বদেশ সর্বকালকে যে স্পর্শ করেছে সে তার কোন্ সত্য দ্বারা? তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার করে কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তার চাওয়ার অন্ত নেই, তার পাওয়াও সেই পরিমাণে।.......

বিজ্ঞান যে বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকলরকম দুঃখ-দৈন্য-পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়ছে, মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।

কিন্তু এমন অমিতশক্তি বিজ্ঞান মানুষের জন্যে ভয়ের কারণ হয়ে উঠলো তার প্রয়োগের দোষে। কবির উক্তি এই :

……বড়োকে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোটো, যেই চুরি করতে শুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়।…এই বিজ্ঞানই কর্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেইখানেই সে হল যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে—সে সত্যকে জেনেছিল কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি ভাবছেন ভারতবর্ষ একদিন তার বিদ্যা যেভাবে বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা :

তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞানধর্ম বিস্তার করেছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্যসম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের এই সর্বত্র প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সংগীতে সাহিত্যে; তাই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত ক'রে নগ্ন ক'রে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু ক'রে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব করে, এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ ক্লশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।

এর তৃতীয় পত্রে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে মানুষের যে বিঘ্নবিপত্তিবিজয়ী অমিতবিক্রম রূপ তার দিকে :

বুনো হাতি মূর্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতোটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা বলে উঠল, "আমি এর পিঠে চড়ে বেড়াব।" এই প্রকাণ্ড দুর্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁ গাঁ করে শুঁড় তুলে আসতে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায়

কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতে পেরেছে, এইটেই আশ্চর্য। তারপরে "পিঠে চড়ব" বলা থেকে আরম্ভ ক'রে পিঠে চড়ে বসা পর্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসেনি—পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা, কত অপঘাত মানুষের সংকল্পকে বিদ্রূপ করেছে তার সংখ্যা নেই; সেটা গণনা ক'রে ক'রে মানুষ বলতে পারত, এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলেনি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চড়ে ফসল খেতের ধারে লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো।… …

যেদিন সাড়ে তিন হাত মানুষ স্পর্ধা ক'রে বললে, "এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব" সেদিন দেবতারা হাসলেন না, তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হয়েছে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা করা শুরু হল। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ ক'রে উঠছে; বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তরসাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্ছে, "মা ভৈঃ।"

এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণে বা বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে কবি মাদ্রাজ থেকে প্রথম উপনীত হন মালয় উপদ্বীপের সিঙ্গাপুরে। মালয় উপদ্বীপ, বালিদ্বীপ, জাভাদ্বীপ ও সিয়ামের বিভিন্ন স্থান তিনি পরিদর্শন করেন। সর্বত্রই প্রাচীন ভারতের বহু চিত্তাকর্ষক নিদর্শন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সহজেই তিনি বোঝেন কালে কালে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

তাঁর ১০ সংখ্যক পত্রের একটি অংশ এই:

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কিরকম জড়িয়ে গেছে ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধরেছে; তার ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্ এক রাজার অন্ত্যেষ্টিসৎকার দেখতে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা—আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না, উৎসবের ভাবটা ঠিক আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়, সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা আমাদেরই মতো, মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে, ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে, হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী ক'রে বিড়্ বিড়্ শব্দে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে। আবৃত্তিতে ও

অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হ'লেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, এরা 'গায়ত্রী' শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ বা কিছু কিছু টুকরো জানে। মনে হয়, একসময়ে এরা সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম পেয়েছিল, তার দেবদেবী, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পুরাণ, স্মৃতি সমস্তই ছিল। তারপরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ভারতবর্ষ চলে গেল দূরে - হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা হ'ল নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে কষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তার যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিল একথা সে ভুললে।

জাভাদ্বীপের বিখ্যাত বোরোবুদুর স্তূপ দেখে কবি তেমন খুশি হ'তে পারেননি। তিনি লিখেছেন :

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি; তার গড়ন আমার চোখে কখনোই ভালো লাগেনি। আশা করেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখলে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু, মন প্রসন্ন হল না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো যে, যত বড়োই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েছে। এটা যেন কেবলমাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধের জাতক-কথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখলে অনেক ভালো জিনিস পাওয়া যায়। পাথরের খোদা জাতকমূর্তিগুলি আমার ভারী ভালো লাগল—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই।

কিন্তু তিনি মুগ্ধ হন এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আর বিশেষ ক'রে এইসব দেশের মেয়ে-পুরুষ সবার নাচ দেখে। কবি ১১ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন :

এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেলবন যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে—তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে-পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে

তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধহয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল, এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।......

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু, বিশুদ্ধ নাচও আছে। পরশু রাত্রে সেটা গিয়ান্‌য়ারের রাজবাড়িতে দেখা গেল। সুন্দর সাজ-করা দু'টি ছোটো মেয়ে—মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে দু'জনে মিলে নাচতে লাগল। এই বাদ্য সংগীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সংগীতের ছেলেখেলা বলে ঠেকে। কিন্তু সেই জিনিসটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ, বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসংগীতে যেন পাওয়া যায়। রাগরাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না, যে-অংশে মেলে সে হচ্ছে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো-বড়ো ঘণ্টা এদের এই সংগীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সার্ট বাজনার যে নূতন রীতি হয়েছে এ সেরকম নয়। অথচ, য়ুরোপীয় সংগীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বরসমাবেশ কানে আসছে, তার সঙ্গে নানাপ্রকার যন্ত্রের নানারকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হয়ে উঠছে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, তবু শুনতে ভারী মিষ্টি লাগে। এই সংগীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাচ শান্তিনিকেতনের নাচের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করেছে—একথা বলেছেন প্রতিমা দেবী।

এই অঞ্চলের লোকদের অন্ধ সংস্কার সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছেন :

....(এদের) জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে

তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র, এক কন্যা, তাহলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন করে সে শ্মশানে যায়, পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন-পিছন বহন করে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনোরকম করে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধরে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পূজার্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়। সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকলরকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে করে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে। তবুও এইগুলো'কে প্রধান করে দেখবার নয়।

এই যাত্রায় কয়েকটি কবিতা তিনি লেখেন। সেসবের মধ্যে 'সাগরিকা' (মহুয়ায় প্রকাশিত) আর 'বোরোবুদুর' (পরিশেষে প্রকাশিত) বিখ্যাত।

## যোগাযোগ

'যোগাযোগ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে।

বিচিত্রা পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫)। প্রথম দুই সংখ্যায় এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। তৃতীয় সংখ্যা থেকে এর নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। এর নামকরণ সম্বন্ধে কবি লেখেন :

……সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনই দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা, বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু

'ওথেলো' নাটকের যদি ওই নাম হত পছন্দ করতুম না। কেননা, এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই।

....এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা।...

গল্প জিনিসটাও রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই। কেননা, ও-নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয়নি।

কিন্তু কবি যাই বলুন 'তিন পুরুষে'র নামও বেমানান হতো না—তিন পুরুষের অর্থ শুধু তিন পুরুষের কাহিনী নয় তিন পুরুষের চেহারাও—যেমন মহাভারত বলতে শুধু বিচিত্র কাহিনী আমাদের মনে পড়ে না মহাভারতের নানা চরিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

তবে এই উপন্যাসে তিন পুরুষের চরিত্র আঁকা হয়নি। দুই পুরুষের অর্থাৎ মধুসূদন ঘোষালের পূর্বপুরুষের আর মধুসূদনের চরিত্র এতে ফুটেছে। মধুসূদনের সন্তানের সম্ভাবনার সংবাদ আমরা পেয়েছি, কিন্তু সে বিচিত্র যোগাযোগের ফলে সেই সম্ভাবনা দেখা দিল, তার পরিণত রূপ আর কবির আঁকা হয় নি—যদিও সেই রূপ আঁকার কথা কবি যে ভেবেছিলেন তার ইঙ্গিত রয়েছে।

এতে প্রধান প্রধান চরিত্র হচ্ছে—কুমু বা কুমুদিনী (গ্রন্থের নায়িকা), তার ভ্রাতা ও গুরুস্থানীয় বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায়, কুমুর স্বামী ধনপতি ও রাজা-উপাধিধারী মধুসূদন ঘোষাল, মধুসূদনের অনুগ্রহজীবনী বিধবা ভ্রাতৃজায়া শ্যামা, মধুসূদনের ছোটো ভাই নবীন আর নবীনের স্ত্রী নিস্তারিণী (প্রধানত মোতির মা নামে পরিচিতা)। আরও বহু চরিত্র এতে আছে, যেমন, বিপ্রদাসের জ্ঞাতিভ্রাতা নবগোপাল, তাদের বংশের প্রাচীন কর্মচারী ও শুভার্থী কালু মুখুজ্যে, নবীনের বালকপুত্র হাবুল, ইত্যাদি। কিন্তু তারা বিশিষ্ট চেহারা নিয়ে দাঁড়ালেও এই উপন্যাসে তেমন উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করতে পারেনি।

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী কুমু-চরিত্রটি সম্বন্ধে কবিকে কিছু বিস্তারিতভাবে

লিখতে অনুরোধ করেন। উত্তরে কবি যে পত্রখানি লেখেন ( ১৪ ভাদ্র, ১৩৩৫ ) সেটি আমরা রবীন্দ্র-জীবনী ( চতুর্থ খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ ) থেকে উদ্ধৃত করছি। এতে প্রসঙ্গত 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি সম্বন্ধে এবং তার নায়ক মধুসূদন সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হয়েছে :

সেকালের বোনেদীঘরের মধ্যে কুমুর জন্ম। বোনেদীঘর সাধারণতঃ আপন পাকা দেয়ালের মধ্যে আপন সাবেক কালকে বেষ্টন করে রাখে। সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু সে আপন আভিজাত্য রীতির দায়িত্ব প্রাণপণে স্বীকার করে, যে-কোনো ব্যবহার তার কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কুলগৌরবের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জন করে! কিন্তু এই বেষ্টনের বাইরে যে সব পরিবর্তন দ্রুতবেগে ঘটেছে তার মধ্যে আভিজাত্যের দায়িত্বগৌরব নেই—তাই তার ভাষায় ভাবে কামনায় কর্মে ভ্রষ্টতার, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম বংশের সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে জন্মেছে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসম্ভ্রমের একটা বাঁধা রীতি ছিল।...বাইরের সমাজ যে কতই পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইএর স্নেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী —এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তার স্বাভাবিক ধ্যান-প্রবণতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। যে যৌবনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে অন্তরে নিজের অগোচরেও আকর্ষণ করেছে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠা করেছে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। এমন কুমু আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন—স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান স্বার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির জোরে তাই হতে পারত—হয়তো স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে সে সোনা করে তুলত, কিন্তু মধুসূদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে— এইখানেই ট্রাজেডি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আমলের কৃতী পুরুষ—ধন ও বাহ্য মান উপার্জনে সিদ্ধিলাভেই তার একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্মানী ছিল, কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাঁকে লিপ্ত হয়ে তাদের আত্মসম্ভ্রমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে ধনের গৌরবকেই সে সব চেয়ে বড়ো বলে দাম্ভিকতায় স্ফীত হয়েছিল—এমন অবস্থায়

কুমু তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না—তাতে তার আত্মসম্মানে নিরতিশয় ঘা দিলে—এতবড়ো অসম্মানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য—এ যেন দেবতার অবমাননা—নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধান হল। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই।

কুমুর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় যে পরিবেশে তা বাইরের জগতের তুলনায় অনেকটা বিভিন্ন, কুমু তাই যে সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে ওঠে তাও অনেকটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির চিত্তাকর্ষক নিঃসন্দেহ, কিন্তু অনেকখানি অবাস্তব। স্বামী সম্বন্ধে তার অন্তরের গোপনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় তাতেও অবাস্তবতার অংশই বেশি। এ-সবের সঙ্গে তার চরিত্রে ছিল একটি অপূর্ব সৌকুমার্য, মধুসূদনের অদ্ভুতভাবে স্থূল প্রকৃতির সংস্পর্শে তা এমনি আহত হলো যে, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা তার পক্ষে আর সম্ভবপর হলো না। এই দিক দিয়েই কুমু একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি—নারীপ্রকৃতির একটি বিশিষ্ট সৌকুমার্য আমরা তাতে পাচ্ছি। উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখি কুমুর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে মোতির মা তাকে প্রশ্ন করছে: তুমি কি বড়ঠাকুরকে ভালবাসতে পারবে না মনে কর? তার উত্তরে কুমু বলেছে:

> পারতুম ভালবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়ঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে! আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারিদিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে, যা কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুমু তার সমস্তভাগ্য-বিড়ম্বনার ঊর্ধ্বে মাথা তুলে চলতে পারলে:

> মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?

এর পর থেকে সে একটি বাস্তব মানুষ হয়ে উঠল।—আমরা দেখেছি বহুদিন থেকে আমাদের দেশে নারীর লাঞ্ছিত জীবনের কথা কবির ভাবনার বিষয় হয়েছে। সবুজপত্রের ছোটো গল্পগুলোয় তিনি তো রীতিমতো নারী-বিদ্রোহ প্রচার করেন। কুমুর মধ্যেও কবি নারীর একটি নতুন জন্মলাভের ছবি এঁকেছেন।

নারী কারও পত্নী বা মাতা হয়েই গৌরবের ভাগিনী হবে না, জন্মসূত্রেই সে মহাগৌরবান্বিতা এবং দুর্দিনে সেই গৌরব তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে মনে হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এই কবির একটি বিশিষ্ট বক্তব্য।

অবশ্য নারীজীবনের সুপরিণতি সম্বন্ধে অন্য ভাবনাও এতে আছে। সেটি প্রকাশ পেয়েছে মোতির মার মনোভাবে। সে নারীর বধূ-জীবনকেই তার শ্রেষ্ঠজীবন মনে করে। সে স্বামী-পুত্রকে নিয়ে সুখী আর সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর সমাদরও সে পেয়েছে।—তার স্বামী নবীন সুরুচিসম্পন্ন আর বুদ্ধিমান। দাদার খামখেয়ালিতে সে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করে, কিন্তু প্রতিকূল বাতাসেও পাল খাটাতে সে জানে। সে অনেকটা 'গোরা'র মহিমের মতো।

শ্যামাতেও নারীজীবনের একটি বিশেষ দিক কবি দেখাতে চেয়েছেন মনে হয়। সে প্রণয়-বঞ্চিতা আর সেই বঞ্চনা তার জন্য দুর্বিষহ। অতি অশোভন প্রণয়ও সে জীবনে স্বীকার ক'রে নিলে। এই দিক দিয়ে তার প্রকৃতি কুমুর প্রকৃতির বিপরীত। কিন্তু সেই অশোভনতা ও অসম্মানের দাহের দিকটারও আভাস কবি দিয়েছেন।

মধুসূদনের অদ্ভুতভাবে স্থূল ও অহমিকাপূর্ণ চরিত্রের মূলে রয়েছে তার বংশের প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতি, বিশেষ ক'রে চাটুজ্জ্যে জমিদারদের হাতে, যাদের কন্যাকে সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীরূপে পেতে পেরেছে। সেই কন্যার রূপ ও চরিত্র তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তারও তলদেশ থেকে তার বংশের প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতি বারবার নিজেকে জানান দিচ্ছে।

মধুসূদনের মতো এতোটা 'বাস্তব' চরিত্র কবি আর আঁকেননি। কিন্তু তাহলেও মধুসূদন কি কবির একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি?

আমাদের ধারণা মধুসূদন রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাকে বলা যায় না। তার বড়ো কারণ, তার জীবনে কোনো বড়ো দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়নি। তার চরিত্র যথেষ্ট বীভৎস ও কিছু পরিমাণে কৌতুকাবহ, কিন্তু একই সঙ্গে বীভৎস ও চিত্তাকর্ষক সে হ'তে পারেনি; যেমন শেক্‌সপীয়রের ম্যাকবেথ বা শাইলক হ'তে পেরেছে। তার বংশের লাঞ্ছনার স্মৃতি তার চরিত্রে কিছু পরিমাণে মহত্ত্বের স্পর্শ দিতে পারতো; কিন্তু সেই গৌরব থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে তার ধনের গর্ব। সেই গর্ব তাকে অনেকখানি খেলো করেছে।

বিপ্রদাস চরিত্রটির প্রতি কবি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তাতে শ্রদ্ধেয় অনেক কিছু আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রে অবাস্তবতার পরিমাণ বেশি

রয়ে গেছে। যে পরিবারে তার জন্ম তার আভিজাত্য তাকে অনেক উঁচুদরের সম্পদ দিয়েছে। কিন্তু তবু তার জগৎ বেশির ভাগ স্বপ্নের জগৎই রয়ে গেল, কেন না, তা থেকে পুরোপুরি উদ্ধার লাভের চেতনার পরিচয় আমরা তার মধ্যে পেলাম না। যা শোভন ও মহৎ তার প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধা যেমন গভীর, যা হীন ও নীচ তার প্রতি তার বিতৃষ্ণাও তেমনি প্রবল ; তবু তার সংযমের বাঁধ যেন কিছুতেই ভাঙতে পারে না। কিন্তু এতোখানি স্বাভাবিক মহত্ত্ব নিয়েও তার অবাস্তব অবস্থার চোরাবালিতে দিন দিন সে তলিয়ে যাচ্ছে অথচ উদ্ধারের পথ তার জন্যে দেখা যাচ্ছে না। এও এক রকমের বাস্তবতা। কিন্তু এ বাস্তবতা—আমাদের চিত্তকে তেমন আকর্ষণ করতে পারে না। বোধহয় তার কারণ এটি আসলে জীবনধর্মী নয়—বিগত যুগের একটি স্বপ্নমণ্ডিত ব্যাপারই তার চাইতে বেশি।

এই যুগে কবির সৃষ্টিধর্ম যে কিছু ম্লান হয়েছে তার একটি প্রমাণ—তিনি স্মৃতির জগতে কাটাচ্ছেন অনেকটা সময়।

বাস্তব সম্বন্ধে হয়তো তীক্ষ্ণতর বোধের পরিচয় কবি তাঁর যোগাযোগে দিয়েছেন, তবু সৃষ্টি হিসাবে 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'র মর্যাদা—তার চাইতে অনেক বেশি এই আমাদের ধারণা হয়েছে।—সৃষ্টির জন্যে বাস্তব এক বড়ো উপকরণ। কিন্তু তবু তা উপকরণই। মহৎ সৃষ্টির মূলে জীবন-জিজ্ঞাসু মহৎ বা বৃহৎ চিন্তা অথবা প্রবণতা।

## তপতী

'তপতী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে।

কবির নবযৌবনের 'রাজা ও রাণী'র এটি পরিণত রূপ। 'রাজ ও রানী'র অনেক আপত্তিকর অংশ এতে বর্জিত হয়েছে।

এর এই পরিবর্তিত রূপ দেখে কবি খুশি হয়েছিলেন। একটি পত্রে এটিকে তিনি বলেন তাঁর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটক।

এর দুটি নূতন চরিত্র নরেশ ও বিপাশা-এর চরিত্র সম্পদ বাড়িয়েছে।

কিন্তু রাজা বিক্রমের সমস্ত মোহ, দুর্বলতা ও অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রানী সুমিত্রার মার্তণ্ডমন্দিরে অগ্নিতে প্রবেশ একালের রুচির পক্ষে একটি অ-সাধারণ ব্যাপার হয়েছে।

কবির 'যোগাযোগ' উপন্যাসের অল্প কিছুদিন পরেই এটি লেখা হয়। নারীর ব্যাপক অবমাননা ও লাঞ্ছনা এইকালে কবিকে খুব পীড়া দিয়েছিল। সেই অবমাননার ও লাঞ্ছনার প্রতিকার কবি খুঁজে পেয়েছিলেন নারীর অনমনীয় মর্যাদাবোধে আর নিজেদের অন্তরাত্মার সুচিতা রক্ষার জন্যে চরম আত্মত্যাগে!

যোগাযোগের কুমুর সংকল্প অবশ্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, কিন্তু তপতীর সুমিত্রার স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ একালের জন্যে মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই কঠোর হয়েছে, বিশেষ ক'রে রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় ও দুর্বলতায় রানীর মর্মবেদনা কত দুঃসহ হয়েছে তা জানবার পর্যাপ্ত সুযোগ যখন রাজাকে দেওয়া হয়নি। রানীর ভয়াবহ আত্মনিধন শুধু যে রাজার মোহকে কঠিন আঘাত দিলে তাই নয়, রাজার জীবন ও জগৎকে অর্থহীন ক'রে দিলে, কেন না, রাজা রাণীকে ভালোবাসত। অন্য কথায়, রানীর আত্মনিধন সদর্থক যতটা হ'ল নঙর্থক হ'ল তার চাইতে অনেক বেশি।

# শেষের কবিতা

'শেষের কবিতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে। 'যোগাযোগ' রচনাকালেই কবি লেখেন 'শেষের কবিতা' যদিও এই দুইটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু, বিশেষ ক'রে রচনারীতি, স্পষ্টতঃ বিভিন্ন ধরনের। কবির এই ক্ষমতায় শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশ বিস্ময় প্রকাশ করলে কবি বলেন:

> অসুবিধা হবে কেন? আমি যে সারাদিন ওদের দেখতে পাই, কথাবার্তা বলি ওদের সঙ্গে। কাজেই লিখতে বাধে না। কুমুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন বিপ্রদাস মধুসূদন ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেরই মুখের কথা আপনিই আমার কলমে এসে যায়। আবার অমিট্ রায়দের নিয়ে যখন পড়ি তখন সিসি লিসি কেটি ওদের ফ্যাশনেবল্ সমাজ, সমস্ত অ্যাটমস্-ফিয়ারটা মাথার মধ্যে জ'মে ওঠে। এর মধ্যে লাবণ্য, লাবণ্যর মাসী একেবারে অন্য জাতের মানুষ। লাবণ্যর সঙ্গে যেন আমার চেনাশোনা আছে খুব যেন তাকে দেখেছি। †

পাণ্ডুলিপিতে কবি প্রথমে এর নাম দেন মিতা। † রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৯-২০

যোগাযোগে বিবাহিত জীবনের খুব একটা গুরুগম্ভীর দিকের অবতারণ। কবি করেছেন এবং নারীর পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহ সমর্থন করেছেন তার 'আত্মা'কে বাঁচাবার জন্যে। 'শেষের কবিতায়' কবির অঙ্কনের বিষয় হয়েছে বিবাহের পূর্বে নরনারীর জীবনে আধুনিক কালে (অবশ্য এটি আমাদের দেশের 'প্রাগ্রসর' সমাজের আধুনিক কাল) অনুরাগ ও মনোনয়ন ঘটিত যেসব সমস্যা দেখা দেয় সই সব। কবি বিবাহের ব্যাপারে মোটের উপর সবর্ণতা অবশ্য প্রাচীন অর্থে নয় আধুনিক অর্থে, অর্থাৎ দৈনন্দিন চালচলন ও রুচির সমজাতীয়তা প্রশস্ত বিবেচনা করেছেন। সেজন্য দেখা গেল 'অমিট রায়ে'র বিয়ে শেষপর্যন্ত হলো 'কেটি মিত্তিরে'র সঙ্গে। লাবণ্য ও কেটি মিত্তিরের পার্থক্য সম্বন্ধে অমিতের বক্তব্য এই:

কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।

লাবণ্যও অমিতের নতুন নতুন চিন্তা ও অনুভূতির ঔজ্জ্বল্যে যত খুশি হোক শেষপর্যন্ত বিয়ে করলে শোভনলালকে কেন না তাতে সে পেয়েছিল নিষ্ঠা—প্রতিদিনের জীবনে নির্ভরযোগ্যতা। লাবণ্যর সঙ্গে অমিতের সম্পর্কসম্বন্ধে অমিতের আর একটি বিখ্যাত উক্তি এই:

যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ, যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।

প্রেমসম্বন্ধে এই মনোভাব যে যথেষ্ট রোমান্টিক, অর্থাৎ প্রতিদিনের জীবনে যা ঘটে সেসবের সঙ্গে এর মিল যে বেশ কম, সেসম্বন্ধে কবি সচেতন। কিছু সাধারণ ও সুপরিচিত না হলেও এরও মূলে যে সত্য আছে সে কথাও তিনি বলেছেন অমিতের মুখে:

"গল্পের বই থেকেই রোমান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি? কিছুতেই না। আমার রোমান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোমান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক। তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোমান্সের

পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হ'ক আমার লাবণ্যর, জয় হ'ক আমার কেতকীর আর সব দিকে থেকেই ধন্য হ'ক অমিত রায়।

তবুও বলতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গী অ-সাধারণ। কবিও সে বিষয়ে সচেতন। অমিত যতীকে বলছে :

> দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়।

'শেষের কবিতা' সম্পর্কে প্রভাতবাবু মন্তব্য করেছেন :

> 'শেষের কবিতা' ও তৎপরবর্তী উপন্যাস, গল্প ও নাটক পড়িতে পড়িতে আর একটি কথা মনে হয়—মাটির সঙ্গে কবির স্বাভাবিক বন্ধন যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে। পদ্মার চর হইতে অনেক দূরে, এমন কি, 'গোরা'র পরিবেশ হইতেও বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর দূরাগত হইলেও দুর্বোধ হয় নাই। কিন্তু 'শেষের কবিতা' ও পরবর্তী যুগের কাহিনীগুলিতে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি শিল্পী—পায়ের তলার সহজ মৃত্তিকার স্পর্শ যেন ক্ষীণ। তাঁহার গল্পের নায়ক-নায়িকারা সাধারণের নাগালের বাহিরের লোক, তাহাদের সংলাপ, তাহাদের ভাবভঙ্গী, তাহাদের চালচলন সবই অ-সাধারণ অপূর্ব অ-ভাবিত।

'শেষের কবিতা'র অমিত রায় সিসি লিসি প্রভৃতি পাত্রপাত্রীরা ফ্যাশনেবল্ সমাজের, তাই তাদের ভাবভঙ্গী কথাবার্তা এসব অ-সাধারণ, অপূর্ব, অ-ভাবিত, মিথ্যা নয় ; কিন্তু এসব শেষের কবিতার বাইরের ছটা—সেই ছটায় অবশ্য সেই দিনের পাঠকসমাজ, বিশেষ ক'রে তরুণসমাজ, চমৎকৃত হয়েছিল। এর ভিতরের কথাটি একটি সুপরিচিত কাণ্ডজ্ঞানের কথা--বিবাহের ক্ষেত্রে সবর্ণতার স্মরণীয় মূল্যের কথা।

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের কথা যত মূল্যবান হোক লোকদের তা তেমন খুশি করতে পারে না—তারা খুশি হয় বরং অ-ভাবিতের দেখা পেলে। লাবণ্য ও অমিতের মতো লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন প্রকৃতির পাত্রপাত্রীর বিবাহ যদি কবি ঘটাতেন আর

তারপর তাঁর কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাতেন একটি অঘটনের দ্বারা তবে তাতে হয়তো অনেক বেশি পাঠক খুশি হ'ত।

লাবণ্য ও অমিত রায়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিবাহবন্ধনবিহীন প্রীতির সম্পর্ক যা দাঁড়াল তা যত অ-সাধারণ হোক তাকেও কবি-জীবনে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ জ্ঞান করেছেন—কেতকী ও লাবণ্যের সম্পর্কসম্বন্ধে অমিত যতীকে বলছে:

> কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে (কেতকীকে) বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।

এই ধরনের প্রেমসম্পর্কে গ্যেটে বলেছেন:

> পবিত্র বন্ধনে ধরা দিতে চাও না—তাহলে হে যুবক, অভ্যস্ত হও সংযমে। এইভাবেই রক্ষা পাবে তোমার স্বাধীনতা, আর প্রেমহীন হবে না তোমার অন্তর।

কবির জীবনে এমন সম্পর্ক আমরা দেখেছি তাঁর ও বিজয়ার ভিতরে।

শেষের কবিতায় কবি যেসব চরিত্রের অবতারণা করেছেন তাদের মধ্যে লাবণ্য সুচরিতা ও ললিতাদের গোত্রের। অমিত রায়, কেতকী ও সিসি লিসিরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে নতুন সৃষ্টি। অমিত রায়ের তারুণ্য ও বুদ্ধির দীপ্তি খুব চোখে পড়ে—সেদিনে তো সবারই খুব বেশি চোখে পড়েছিল। সেই দিনে তরুণ সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে, অসহিষ্ণুতা ও ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিলেন কবি তার এক মনোজ্ঞ সাহিত্যিক রূপ এঁকেছেন অমিত রায়ের চরিত্রে। তার প্রতি কবি একই সঙ্গে কৃপালু ও শ্রদ্ধালু—কৃপালু তার কিছু বাড়াবাড়ির জন্যে, আর তার মতো প্রাণ ও বুদ্ধি-দীপ্ত তারুণ্য ছিল চিরদিন কবির প্রীতির ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। শেষ পর্যন্ত অমিত রায়কে লাবণ্য স্বামিত্বে বরণ করলো না—এটিকে কেউ কেউ ভাবতে পারেন সেদিনের তারুণ্যের মূল্য সম্বন্ধে কবির অনেকখানি অনাস্থা। কিন্তু আসলে বিবাহের ব্যাপারে সবর্ণতার মূল্যের উপরেই কবি বেশি জোর দিলেন। অমিত তার পরাভব যে অনেকটা সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিলে এতে পরিচয় পাওয়া গেল সমস্ত বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত সে নয়।

কেতকী প্রথমে আমাদের সামনে এলো উৎকট 'আধুনিকতা' ও মাত্রাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য নিয়ে। কিন্তু অচিরে বোঝা গেল তার সব ঔদ্ধত্যের মূলে প্রেমের ক্ষেত্রে পরাভব—অমিত যে তার কথা ভুলে নতুন ক'রে লাবণ্যের অনুরাগী হয়েছে সেই ব্যাপারটি। লাবণ্য যখন অমিতকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তখন অমিত

তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বললে—সেদিনের কেতকী আর আজকার কেতকী তো একই মানুষ নয়। তার উত্তরে লাবণ্য এই অপূর্ব উক্তি করলে :

তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।

কেতকীর প্রতি সমবেদনা ও কর্তব্যও লাবণ্যকে তার শেষ সংকল্প গ্রহণ করতে সাহায্য করলো।

শেষের কবিতার যেভাবে পরিসমাপ্তি ঘটলো তা থেকে বোঝা গেল আমাদের একালের উগ্রভাবে আধুনিকারাও কবির প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়'ন। শেষের কবিতা কবির খুব একটি জনপ্রিয় রচনা। খুব সুখপাঠ্যও এটি! কিন্তু এর তেমন উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার করা কঠিন, কেন না, এর আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে অপেক্ষাকৃত কম, বুদ্ধির কাছেই বেশি।

## মহুয়া

'মহুয়া' প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে।

কবির 'মিতা' বা 'শেষের কবিতা'র সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় এবং তারও পূর্বে 'পূরবী'তে প্রেমসম্বন্ধে কবির চিত্তে যে নতুন ভাব তরঙ্গ খেলে তারই এক বিশিষ্ট রূপ দেখা যাচ্ছে কবির 'মহুয়া' কাব্যেও।

মহুয়ার কবিতাগুলো সম্পর্কে কবি বলেছেন :

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

নিছক গীতিকাব্য ও প্রণয়ের প্রসাধনকলা বলতে কবি যা বুঝেছেন তারই পরিচয় মহুয়ায় বেশি।

এর অনেকগুলো কবিতা বসন্ত-বর্ণনা। সেসম্বন্ধে কবি বলেছেন :

······নব বসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

'পূরবী' কবি উৎসর্গ করেছিলেন বিজয়াকে। কিন্তু মহুয়ার কবিতাগুলোর লক্ষ্য প্রেম—কোনো প্রেমপাত্রী মুখ্য নয়। এর উৎসর্গপত্রটি এই :

শুধায়ো না কবে কোন গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি?
জানি না তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখনি।

কিন্তু কবি তাঁর কোন গান কবে কাকে দান করেছিলেন সেসম্বন্ধে কৌতূহল অসার্থক নয়, এবং যথেষ্ট সার্থক, কেন না, গানের রূপ বুঝতে তা বিশেষ সহায়তা করে। তবে এই বিষয়টি বেশ জটিল, কেন না, কাব্য একই সঙ্গে বিশেষের ও নির্বিশেষের কথা। 'মহুয়া'র কবিতাগুলো নির্বিশেষের কথা কিছু বেশি হয়েছে!

এই কাব্যের সূচনায় কবি প্রেমের দেবতা মদনের বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। এই বোধনমন্ত্রটি বিখ্যাত—'মহুয়া' কাব্যের বিশিষ্টভাব এতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের সঙ্গে যেসব রূঢ়তা, মূঢ়তা ও স্থূলতার যোগ রয়েছে সেসব দগ্ধ হয়ে যাক, প্রেমের দিব্য দীপ্যমান দাহ :

উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।

এই কবি 'মহুয়া' কাব্যে বিশেষভাবে চেয়েছেন—অন্যান্য বহু প্রেমের কবিতায়ও চেয়েছেন। এর বিপরীত চাওয়া ডি. এইচ. লরেন্সের। প্রেমের রূঢ়তা, মূঢ়তা ও স্থূলতা পুরোপুরিই তিনি চেয়েছেন, সেই সঙ্গে অবশ্য চেয়েছেন তার দিব্য দীপ্যমান দাহও।

কিন্তু কাব্যে এই দুয়ের মধ্য পন্থাই বেশি সার্থক পন্থা বলে মনে হয়। নাম করতে হ'লে বলা যায়, বিদ্যাপতি প্রেম-বর্ণনায় সেই সার্থক পন্থার কবি। তাঁর

প্রেমিক-প্রেমিকা 'কত মধুযামিনী রভসে' যাপন করলে, তবু তাদের অন্তর তৃপ্ত হ'ল না।

'মহুয়া' কাব্যে প্রেমের বিচিত্র রূপ আঁকার দিকেও কবি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন, কিন্তু একটি বিশেষ রূপ—প্রেমের বীর্যবত্তার রূপ, সূচনায় যার স্তব করা হয়েছে।—সেইটিই মহুয়ার কবিতাগুলোতে মুখ্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজন কবি অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, নারী এযুগে যখন পুরুষের সমান মর্যাদা পেয়েছে তখন বীর্যবত্তা নারীরও শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল হওয়া চাই। কেন না, আত্মার বা ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয় চারিত্রিক বীর্যে। অবশ্য নারীর এই আন্তর বীর্যবত্তার সঙ্গে তার মাধুর্যেরও যোগ ঘটা চাই। মহুয়ায় নারীর মাধুর্যের দিকটা বেশি রূপ পায়নি, তবে ক্বচিৎ কখনো যা পেয়েছে তা বিশিষ্ট।

এর শুভযোগ কবিতাটির শেষের স্তবকটিতে একটি চমৎকার বসন্ত-বর্ণনা আমরা পাচ্ছি:

······যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে
পলাশের কুঁড়ি
একরাতে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি,
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।

এর অনেকগুলো কবিতা 'শেষের কবিতা'র জন্যে লেখা হয়েছিল। তার একটি 'নির্ঝরিণী'। তার এই ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন:

> 'শেষের কবিতা' গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র-আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে তার ঝরনার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে, যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে

উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায় তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে।

মানুষের সত্যকার পরিচয় সাধারণতঃ অজ্ঞাত—সে জনতার অংশ মাত্র। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টির সামনে সেই মানুষের ব্যক্তিত্ব তার ভালো-মন্দ সব নিয়ে প্রকাশিত হয়—অপূর্ব হয়ে দেখা দেয়। এ-কথা কবি বলেছেন তাঁর বহু লেখায়। মহুয়ায় 'প্রকাশ' কবিতাটির কয়েকটি ছত্রে প্রেমিকের সেই ব্যক্তিত্বের এই রূপ কবি এঁকেছেন ঃ

> ··· অগোচর দুঃখভার
> বহিয়া চলেছি পথে, শুধু আমি অংশ জনতার।
> উদ্ধার করিয়া আনো
> আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
> যেথা আমি একা
> সেথায় নামুক তব দেখা।
> সে-মহানির্জন
> যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
> সেইখানে আনো আলো,
> দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
> যাক লজ্জা ভয়,
> আমার সমস্ত হ'ক তব দৃষ্টিময়।

এর 'অসমাপ্ত' কবিতায় কবি বলেছেন মানুষ সাধারণতঃ অসমাপ্ত, সুন্দর তার দ্বারে বারবার কম্পিত ছায়ারূপে আসে। কিন্তু মানুষের সমাপ্তি লাভ হয় প্রেমে ঃ

> আমার বক্ষের কাছে
> পূর্ণিমা লুকানো আছে,
> সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
> দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
> পূর্ণ হবে প্রিয়তম,
> আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।

অচেনাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে অতি প্রবল। কিন্তু সেই অচেনাকে জানবার শক্তি আমরা লাভ করি প্রবল প্রেমের বলেই। 'অচেনা' কবিতাটির একটি অংশ এই ঃ

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী,
দণ্ড বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে.
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে
ছিন্ন হবে ডোর
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

অচেনা 'শেষের কবিতা' থেকে নেওয়া।

এর 'পথের বাঁধন' ও শেষের কবিতা থেকে নেওয়া; কবিতাটির বিশেষ চটুল ভঙ্গিমা 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মতবাদ ও চরিত্রের সঙ্গে খুব সুসঙ্গত হয়েছিল। কিন্তু সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কবিতাটি তার সেই জৌলুস অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে।—শেষের কবিতার কবিতাগুলো মহুয়ায় মোটের উপরে সুসমঞ্জস হয়নি। তার কারণ দুয়ের মধ্যে ভাবের একটি বড়ো অমিল রয়েছে। মহুয়ার প্রেম মুখ্যতঃ মিলন-মূলক, কিন্তু 'শেষের কবিতা'র সমাপ্তি ঘটেছে বিচ্ছেদে।

এর 'দূত' কবিতাটি বিশেষভাবে চিন্তাপ্রধান। প্রেম সবার জন্যে স্বর্গের দান, সেজন্য শুধু প্রেমপাত্রে কেন্দ্রীভূত হ'লে তার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়, এই কবির বক্তব্য। কবিতা হিসাবে এটিকে ভালো বলা কঠিন, কেন না, এই চিন্তার—Idea র—অতিরিক্ত সম্পদ এতে নেই।

এর 'পরিচয়' কবিতাটিও Idea-প্রধান, তবে কিছু বিশিষ্ট রূপও তাতে ফুটেছে। পুরুষের প্রেমের প্রতীক্ হচ্ছে কদম্বফুল—

নৈরাশ্যজয়ী সে-ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

কিন্তু নারীর প্রেমের প্রতীক্ কেতকী ফুল—তার অন্তরে অপূর্ব সমৃদ্ধি, কিন্তু কাঁটায় তা বেষ্টিত। প্রেমিক কৌতূহলী হয়ে হাত বাড়িয়ে সেই ফুল গ্রহণ করলো; কিন্তু:

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান।

উপমাটি অপূর্ব।

'দায়মোচন' কবিতায় কবি বলেছেন: প্রেমিক বা প্রেমিকা পরস্পর সম্বন্ধে কোনো দায়দাবি রাখে না, কেন না, জীবন ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্ষণকালের জন্যে তারা যে অন্তরে প্রেমের প্রভাব অনুভব করতে পেরেছিল সেই অনুভব অমূল্য:

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

নারীর বীর্যবত্তার রূপ কবি এঁকেছেন 'সবলা' কবিতায়:

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতঃ?
সঙ্কোচনের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো—
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
দৈবাগত দিনে।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।

এটি প্রচারধর্মী। কিন্তু জীবনধর্মী ও বীর্যবন্ত সেই প্রচার—তাই রসোত্তীর্ণ হ'তে এর বাধা হয়নি।

'বরণ' কবিতায় নায়িকা বলছে দময়ন্তী একদিন দেবতাদের ছেড়ে মানুষকে পতিত্বে বরণ করেছিল, কিন্তু এই কবিতার নায়িকা চায় মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে তাকেই পতিত্বে বরণ করতে। সেই দেবতাকে চেনা কঠিন, কেন না, যারা দেবতা নয় তাদেরই ভিড় সর্বত্র। তাদেরও মধ্যে থেকে নায়িকা তার দেবতাকে বেছে নিতে পারছে:

বহে গেল জনতার ঢেউ,
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।
একা আমি দেখেছি তোমারে
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্ত্যের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে।

'স্পর্ধা' কবিতায় শ্লথপ্রাণ দুর্বলের ক্লেদমন প্রেম নিবেদনের ওপরে কবি ঘৃণার তীব্র কশা হেনেছেন:

জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিয়ে সম্মান।

'আহ্বান' কবিতায় নারী তার প্রিয়তমকে ডেকে বলছে:

শোনো শোনো আছে প্রয়োজন একান্ত আমারে তব।
আমি নহি তোমার বন্ধন ;—
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে—উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন ; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে উধ্বর্-পানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্গম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,
শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তর মুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রাখে সে যে অক্ষয় সম্পদরাশি।

জীবনসঙ্গিনীর এই সার্থক রূপ কবির রচনায় বারবার ফুটেছে।

'মহুয়া' 'মহুয়া'—কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা—নারীর মাধুর্য আর বীর্যবত্তা। দুই-ই এতে চমৎকার রূপ পেয়েছে। এর ছন্দ সহজ সরল কিন্তু গম্ভীর। প্রেমের এমন আনন্দময় উন্মাদনার দিক কবির কাব্যে কমই আঁকা হয়েছে। এটি কবির শেষ বয়সের একটি স্মরণীয় কবিতা।

প্রথমে এটি একটি দীর্ঘমাত্রায় চতুর্দশপদী ক।বতা ছিল। পরে এর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তিত রূপেই এর প্রকাশ পূর্ণতর হয়েছে। কবিতাটির শেষ কয়েকটি ছত্র এইঃ

তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্য মত্ততারি।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে * যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

মহুয়ার 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে ১৭টি কবিতা রয়েছে। তাদের নাম, 'শ্যামলী. 'কাজলী', 'হেঁয়ালী' 'খেয়ালী , 'কাকলী', ইত্যাদি। নারীর মাধুর্যময় ব্যক্তিত্বের বিচিত্র রূপ আঁকতে কবি চেষ্টা করেছেন। নারীর 'হেঁয়ালী' রূপের কিছু পরিচয় এই :

---

* 'রচনাবলী'তে বঁধুরে আছে—বোধহয় ছাপার ভুলে।

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায়।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায়;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায়।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তারপরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ;
আপনার অভিমানে করে খান খান।

মহুয়ার একেবারে শেষের দিকের 'অবশেষ' কবিতাটিতে এমন একটি সুর বাজছে যা মোটের ওপরে মহুয়ার সুর নয়। এতে দেখা যাচ্ছে কবি আর বাইরে ছুটতে চাচ্ছেন না, কেনা না, সেই বাইরে ছোটা তাঁর মনে হচ্ছে বৃথা:

সারাটা বেলা সাগর-ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানারঙের শামুক-ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ-পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়,
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়।

তাই কবি সন্ধ্যার আঁধারে একলা বসে আপন ধ্যানের ধনগুলির ধূলা মুছে উজ্জ্বল করতে চাচ্ছেন ঃ

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বলে বাতি,
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপন মনে
মুছিবি তার ধূলি,
গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।

কবির সেই ধ্যানের ধনগুলির সঙ্গে আমাদের নতুন ক'রে পরিচয় হবে তাঁর এই কালেরই বনবাণীর কবিতাগুলোয়।

# বনবাণী

'বনবাণী' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে।

এর জন্য যে ভূমিকাটি কবি লেখেন ভিয়েনায় ১৯২৬ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে, সেইটিই এর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। সেই ভূমিকার প্রথম অংশটি এই :

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবনজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই; অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন।—'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে-ফলে-পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের অঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

এই ভূমিকার শেষের অংশে বিবৃত হয়েছে এইকালে বাইরের জগতে বিচিত্র ভাব ও কর্মের কোলাহলে কবির অন্তরে যে অশান্তি জেগেছিল, তিনি অনুভব করছিলেন, তার অপনোদন হ'তে পারবে তাঁর শান্তিনিকেতনের চিরপরিচিত গাছগুলোর নীরব সান্নিধ্য লাভ করে :

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব। আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম প্রৈতির বন্ধবিহীন

প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে-ফুলে। মুক্তির জন্য প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছে সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধ রাত্রে তারার আলোয় ওদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়—তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ—অন্তরে অন্তরে—একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,—তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরণা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আপনলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,—আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

এই ভূমিকার আর একটি অংশ এই :

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন—দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' শুনেছিলেন, "যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমতঃ প্রৈতিযুক্তঃ—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে চিরদিন কবি গভীর আনন্দ অনুভব করেছেন—তার

বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি। ছিন্নপত্রাবলীতে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি: "যখন ভাল করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপফুল আমার কাছে সেই ভূয়ামন্দের মাত্রা…" ইত্যাদি (২৭৩ পৃঃ, প্রথম খণ্ড) এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁর সেই সীমাহীন আনন্দ একটি স্মরণীয় রূপ পেয়েছে তাঁর বনবাণীর কবিতাগুলোর মধ্যে।

এর চামেলি-বিতান কবিতাটির একটি অংশ এই:

ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব সেই মোর জয়।
… … …
তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।

তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুমি আমার অজানা।

সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

প্রকৃতিতে—জড়ে ও জীবে—এই সীমাহীন আনন্দে কবি পেয়েছেন মুক্তির স্বাদ। তাঁর 'নটরাজে'ও আমরা দেখেছি, গভীর ভাবাবেগে—তাঁর ভাষায় অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে—তিনি মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করেছেন। চারুবাবু যেন বলতে চেয়েছেন বনবাণীর কবিতাগুলোর মধ্যে ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির উপলব্ধির চরম উৎকর্ষ ঘটেছে।—বনবাণীর কবিতাগুলোর মধ্যে কবির ভাবাবেগ যে খুব লক্ষণীয় হয়েছে তা মিথ্যা নয়। তবু এটি তাঁর একটি mood-এর

ভাব-মুহূর্তের পরিচায়ক, তার বেশি নয়, কেন না— এর পরেও তাঁকে আমরা দেখব সন্দেহে আন্দোলিত।

গভীর ভাবাবেগে এক ধরনের মুক্তি আমরা অনুভব করি বটে, কিন্তু মানুষের সত্যকার মুক্তি যতটা লাভ হ'তে পারে তা জ্ঞানেই বা জ্ঞানের সাহায্যেই, অন্য কথায়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সম্যক্ চেতনার ভিত্তিতেই। ভাবাবেগ মোটের উপরে জীবনের পাশ কাটানো বা পাশ কাটবার চেষ্টা।

# সাহিত্যের পথে

'সাহিত্যের পথে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালে।

এর প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি, 'বাস্তব', সবুজপত্রে প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায়, আর শেষেরটি, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪১ সালের ভাদ্র-সংখ্যায়। এর পরিশিষ্টের লেখাগুলো কবির শেষ বয়সে অনেক সাহিত্য-সভায় দেওয়া ভাষণ। এর 'সাহিত্য' 'তথ্য ও সত্য' আর 'সৃষ্টি' এই তিনটি ভাষণ কবি ১৩৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন। এর 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' ( দুটিই ১৩৩৪ সালে লেখা ) সেইদিনে যথেষ্ট বাদানুবাদের কারণ হয়েছিল। এর 'সাহিত্য-সমালোচনা' লেখাটিতে ১৩৩৫ সালে সেই দিনের সাহিত্যক্ষেত্রে নবীনে-প্রবীণে যে লক্ষণীয় মতভেদ দেখা দিয়েছিল তার একটা সম্‌ঝোথার চেষ্টা আছে। এর 'পঞ্চযোধর্ম' লেখাটিতে ( ১৩৩৬ সালে লিখিত ভাষণ ) ব্যক্ত হয়েছে সেইদিনের কোনো কোনো তরুণ সাহিত্যিকের কবির প্রতি রূঢ় উক্তির বেদনাময় প্রতিবাদ।

লোকশিক্ষার দায়িত্ব সাহিত্যের নেই, সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি—এই মতের উপরে কবি এই সব লেখায় যথেষ্ট জোর দিয়েছেন। একালের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর মতভেদ দেখা যাচ্ছে। তবে কবির স্বপক্ষে এই বলা যায় যে, লোকশিক্ষার কাজ সাহিত্য করে অপ্রত্যক্ষভাবে, পাঠকদের অন্তরে নতুন চেতনার সঞ্চারের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষভাবে লোকশিক্ষার কাজে অগ্রসর হলে সাহিত্য মর্যাদাহীন হয়। কবির কাজ তাঁর 'বেদনাময় চৈতন্য'-কে রূপ দেওয়া, কবির এই উক্তি সাহিত্যক্ষেত্রে পাকা কথা।

সাহিত্য মুখ্যত নব নব বেদনার ও চেতনার বাণী—সেইজন্যই তা জীবনে অশেষ-অর্থ-ভরা।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কবি সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব সারগর্ভ উক্তি করেন তাঁর সেই সব চিন্তাই কিছু ভিন্ন বেশে 'সাহিত্যের পথে'র বিভিন্ন লেখায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কবি তাঁর বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্তসার দিতে চেষ্টা করেছেন বইখানির ভূমিকাস্বরূপ লেখা উৎসর্গ-পত্রে। তা থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি:

> মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।
>
> জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে, আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে।
>
> ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।
>
> বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে-যায় না।···
> ····একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ুদত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত ধারণায় ধরা গেল না।
>
> তখন মনে এল, এতদিন যা উলটো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুকে বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জায়গায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা-না-বলি তাতে কিছু আসে-যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।
>
> সাহিত্যের বাইরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে 'ওথেলো' নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে

উদ্‌বেজিত করেছিল যে, সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি।……দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেন না, সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ; কেবল অনিষ্টের আশংকা এসে বাধা দেয়। সে আশংকা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতো-ভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্য এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে ; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।

সেই দিনে সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্ন বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে সম্বন্ধে এই ভূমিকায় কবি এই মন্তব্য করেছেন :

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

কিন্তু এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেন না, এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাতলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দ-সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব-ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু, মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।

'সৃষ্টি' লেখাটিতে এক জায়গায় কবি বলেছেন : সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কিরকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে

দেন। ······মেনকা উর্বশী এরা হলো······পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও?······কিন্তু স্বর্গ তো পরিশ্রম ক'রে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয়নি! স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে-হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে। তুমি মুক্তিকামী, মুক্তি চাও?······মুক্তি তো বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। মুক্তি যে সৃষ্টি। মেনকার কবরীতে যে-পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পরিপূর্ণ মূর্তিটি দেখতে পাবে। বিধাতার রুদ্ধ আনন্দ ঐ পারিজাতের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে—সেই অপরূপ আনন্দরূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে সম্পূর্ণ হয়েছে।

গ্যেটেও তাঁর প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ানে 'হুরী' সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলেছেন। তবে অন্যত্র (স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী-তে) বলেছেন:

···পার্থিব বস্তুর সহায়তায় অপার্থিব ভাবপ্রকাশ অবাঞ্ছিত এক্ষেত্রে রূপ পরিকল্পনা নয়, রূপবিহীনতাই শ্রেষ্ঠ ভাবদ্যোতক।

# রাশিয়ার চিঠি

'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, সুরেন্দ্রনাথ কর, প্রমুখ কবির প্রিয়জন ও সহকর্মীকে লেখা চোদ্দখানি চিঠি স্থান পেয়েছে আর সেসবের সঙ্গে একটি উপসংহার যোগ করা হয়েছে। এর পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে এই তিনটি প্রবন্ধ—গ্রামবাসীদের প্রতি, পল্লীসেবা ও কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রিক মত।

পরিশিষ্টের শেষ প্রবন্ধটি ১৩৩৬ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়; আর উপসংহারটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এর বৈশাখে। চিঠিগুলি প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালের শেষ পাঁচ মাসে।

কবি রাশিয়ায় যান ১৯৩০ সালে—১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কোতে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তিনি পরিদর্শন করেন। এই যাত্রায় যাঁরা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর্যনায়কম ও অমিয় চক্রবর্তী।

কবি যখন রাশিয়ায় যান সে সময় বাংলাদেশে চলেছিল বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—তার উল্লেখ চিঠিগুলোতে আছে। সেই সব দাঙ্গা সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের ঔদাসীন্য—অনেকের মতে উস্কানি—কবির গভীর মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল, কেন না, তিনি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই পরিস্থিতির সামনে দেশের লোকের অসহায়তা। দেশের বহু ব্যাপক অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, ইংরেজের দীর্ঘ শোষণজনিত অর্থনৈতিক অন্তঃসার শূন্যতা, এসব রাশিয়ার ব্যাপক নবপ্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েই কবির চোখে পড়েছিল—সমস্ত বইখানিতে দেশের এই সমূহ দুর্দশা ও বিপত্তির জন্য কবির অন্তর্ভেদী বিলাপ যত প্রকট হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। এর পূর্বে কবির বহু রচনায় আমরা দেখেছি দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রচলনের দিকে তাঁর পক্ষপাত। সেই পক্ষপাত রাশিয়ার পত্রে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

রাশিয়ার বিপুল নবপ্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে কবি কার্পণ্য করেননি, সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রচেষ্টায় যেসব বড়ো রকমের ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েছে তারও উল্লেখ তিনি করেছেন। তিনি তাঁর বিশেষ প্রীতিজ্ঞাপন করেছেন সমবায় নীতির প্রতি। পত্রগুলোর কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।......
......তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেছি—মনে হয়েছে, এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র

জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মানুষের মনুষ্যত্ব নয়।……তাই ভাবতুম যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুখ-সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হ'তে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাইনি, অথচ, অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ-কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিকার আসে।……

……রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলেছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতোকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত – ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে এ দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়—মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে—সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই।……

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই, তা বলিনে—গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে। ( পত্র—১ )।

……এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সব প্রথমেই মনে হয়, কি অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে-প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কতদিকে

কত মহল, কত দরজায় পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্‌সো—আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে, ভয়-ভাবনা-সংশয় কিছুই মনে নেই।......

এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেককাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলছে। খ্যাত-অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে, কিন্তু এক-একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক-একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত (পত্র - ৩)।

এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারে সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করবার কিংবা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না—সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পঙ্‌ক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখে নি—প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে।......

ওদের দৈনিক কার্যপদ্ধতি হচ্ছে এই রকম—সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তারপর পনেরো মিনিট - ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। আটটায় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্যন্ত ক্লাস চলে, শেখার বিষম হচ্ছে—ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ,

ছুতোরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই। প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ীর দল) কারখানা হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। (পত্র—৬)।

··· রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল, সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিকসম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও অল্প কয়বৎসরের মধ্যেই যে-উন্নতি লাভ করেছে দেড়-শ বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষাসম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পায়নি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।

নিজেকে এ-প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করেছি—এতবড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভবপর হ'ল কী করে। মনের মধ্যে এই উত্তর পেয়েছি যে, লোভের বাধা কোনোখানে নেই। শিক্ষার দ্বারা সব মানুষই যথোচিত সক্ষম হয়ে উঠবে; এ-কথা মনে করতে কোথাও খটকা লাগছে না। দূর এশিয়ায় তুর্কমেনিস্তানবাসী প্রজাদেরও পুরোপুরি শিক্ষা দিতে এদের মনে একটুও ভয় নেই, প্রত্যুত প্রবল আগ্রহ আছে। তুর্কমেনিস্তানের প্রথাগত মূঢ়তার মধ্যেই সেখানকার লোকের সমস্ত দুঃখের কারণ, এই কথাটা রিপোর্টে নির্দেশ করে উদাসীন হয়ে বসে নেই।

······আর একটা তর্কের বিষয় হচ্ছে ডিক্‌টেটর্‌শিপ অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যাপারে নায়কতন্ত্র নিয়ে। কোনো বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি নিজে পছন্দ করি নে। ক্ষতি বা শাস্তির ভয়কে অগ্রবর্তী করে অথবা ভাষার ভঙ্গীতে বা ব্যবহারে জিদ প্রকাশের দ্বারা নিজর মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ার একনায়কতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তাছাড়া, সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে· এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।······

ডিকটেটর্‌শিপ একটা মস্ত আপদ, সে-কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে-কথাও আমি বিশ্বাস করি। এর নঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ। কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হলো শিক্ষা, জবরদস্তিতে একবারে উলটো।.....

.. আধুনিককালে ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয় ধনীকে যে প্রবল শক্তির অধিকার দিচ্ছে তাতে সর্বজনের সম্মান ও আনন্দ থাকতে পারে না। তাতে এক পক্ষে অসীম লোভ, অপর পক্ষে গভীর ঈর্ষা, মাঝখানে দুস্তর পার্থক্য। সমাজে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। এই প্রতিযোগিতা নিজের দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর; এবং বাহিরে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। তাই চারিদিকে সংশয় হিংস্র অস্ত্র শানিত হয়ে উঠছে, কোনো উপায়েই তার পরিমাণ কেউ খর্ব করতে পারছে না। বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। বায়ু-মণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে ব'লেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ সমষ্টির বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে।......সেই ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনোই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরিণী পার করে, দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা; কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হ'তে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেই দিনই রোগীর শুভদিন।

আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না ব'লে মানব-প্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।...

....আমি যখন ইচ্ছা করি যে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করি নে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম বা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে-প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা

বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানব-প্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়। (উপসংহার)।

# কবির আঁকা ছবি

ছবি আঁকার দিকে তরুণ বয়সেই কবির মন গিয়েছিল—তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তার উল্লেখ আছে।

কিন্তু ছবি আঁকায় তিনি বিশেষভাবে মন দেন শেষ বয়সে।

তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে—১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। এর পর য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে এবং আমেরিকায় তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী হয়, আর একজন প্রতিভাবান চিত্রকররূপে তিনি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমাদৃত হন।

আমাদের দেশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও যামিনী রায় কবির চিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যামিনী রায়ের মতে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে, "তবে নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়েছে। তিনি কবির ছবির প্রশংসা করেছেন তাঁর সরলতার জন্যে, ছন্দোবোধের জন্যে—সে বস্তু দুইটির অভাব বাংলাদেশের আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি সতেজ শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে কারবার করেছেন।....রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সব চাইতে বিস্ময়কর তাঁর কল্পনার বিরাটত্ব। সর্বত্রই দেখি, তিনি বৃহৎকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।"

আমি নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছে কবির ছবি সম্বন্ধে কিছু জানতে চেয়েছিলাম বোধহয় ১৯৩৫ সালে। তিনিও কবির ছবির সবল ব্যঞ্জনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, এই দিক দিয়ে কবি আমাদের দেশের চিত্রাঙ্কনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

আমাদের দেশে কবির চিত্রকলার সমাদর হতে যে দেরি হবে যামিনী রায়কে লেখা একখানি পত্রে কবি সে কথা বলেন। তার কারণ, কবির মতে "চিত্রদর্শনের

যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয় নি।"

শিল্পাচার্য যামিনী রায়কে লেখা অপর একখানি পত্রে কবি তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সেই চিঠিখানির অনেকটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

……ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হোলো ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানারকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মর্মকে অধিকার করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি, আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনোও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর অর্থাৎ যদি সে কোনোও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলেই—আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখার রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন

তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী।...পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না, দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানাকাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে, 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।'

সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা এই তিন বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের মতো এমন উচ্চাঙ্গের সাফল্য লাভের দৃষ্টান্ত জগতে নেই বলেই আমাদের ধারণা। - বলা যায় সাহিত্যে ও সংগীতে তিনি একই সঙ্গে রূপের ও অরূপের প্রেমিক, কিন্তু চিত্রে তিনি বিশেষভাবে রূপের প্রেমিক—সহজভাবে প্রাণোচ্ছল, জটিল, কুটিল, বিরাট, ভয়াল, এমন বিচিত্র রূপ তাঁর তুলিকায় ধরা পড়েছে। সে-সবের অনেকগুলোরই তাৎপর্য আমরা বুঝি না, কিন্তু তাদের চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়—উপেক্ষা করবার জো নেই। প্রাণের প্রাচুর্য, বিশেষ ক'রে তার আবেগ, কবির ছবিগুলোতেই যেন বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

কবির শেষ জীবনের অনেক কবিতায় আবেগের কিছু কমতি ঘটেছিল। দেখা যাচ্ছে, এইকালে সেই আবেগ প্রধানত ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর ছবিগুলোতে। শেষ বয়সের ছবিই কবির মুখ্য সৃষ্টি হয়েছিল—তাঁর চোখ ও মন দুই-ই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল সেইদিকে।

## পরিশেষ

'পরিশেষ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে।

এর পূর্ব বৎসরে কবির বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হলে মহাসমারোহে তাঁর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কবি যে প্রতিভাষণ দেন তার শেষের দিকে তিনি বলেন :

অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানাপর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এই সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকী যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে,

আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য - সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

'পরিশেষের' অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৮ ও ১৩৩৯ সালে লেখা। এর কয়েক বৎসর পূর্বে লেখা কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। বলা যায় পরিশেষের কবিতাগুলোর মধ্যে কবির মুখ্য মনোভাব হচ্ছে অনেকটা হিসাব-নিকাশের মনোভাব—কবি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য সাধনার দিকে তাকিয়ে তার একটা মোটামুটি মূল্যায়নের চেষ্টা করছেন। তার ফলে খুব চোখে পড়বার মতো কবিতা এতে নেই বললেই চলে - কেবল ১৩৩৩ সালে রচিত 'বুদ্ধজন্মোৎসব' ছাড়া। তবে উপভোগ্য কবিতার সংখ্যা এতে কম নয়, কেন না, উদ্দীপনায় বা আবেগের গাঢ়ত্বে কমতি ঘটলেও কবির প্রকাশের দক্ষতায় ভাটা পড়েনি।—এর পূর্বে আমরা বলেছি, এই যুগে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছে জগৎ ও জীবনের আনন্দরূপের দিকে। যেখানে তিনি সংকল্পপরায়ণতার পরিচয় দিচ্ছেন। যেমন, ১৯২৭ সালের ১লা জুলাইতে লেখা 'মুক্তি' সনেটে, সেখানেও সহজ আনন্দের অশেষ বীর্যবত্তার কথা বলেছেন ঃ

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না ভুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা—'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায় ;—দ্বিধাশূন্য সরলতা গাঁথুক
শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

এতে নতুন কালের রুচি ও প্রবণতাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা কয়েকটি কবিতা আছে। 'লেখা' কবিতাটিতে নতুন সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কবি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, যদিও সেই নতুন অনভিজ্ঞ ও দর্পিত ঃ

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ'ক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব খেলা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।

'পরিশেষে'র গোড়ার দিকে বিখ্যাত 'পান্থ' কবিতায় কবি বলেছেন, তিনি সাধক বা গুরু নন। মুক্তি কোথায়, মুক্তি কাকে বলে, তাও তিনি জানেন না! তবে তিনি দেখেছেন তিনি চিরপথিক, এই বিশ্বের তরঙ্গনৃত্যছন্দে তাঁর চিত্ত যখন নৃত্য করে তখন তিনি অনুভব করেন—সেই ছন্দেই তাঁর বন্ধন আর সেই ছন্দেই তাঁর মুক্তি। বিশ্বের যিনি মহাপথিক তাঁর উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন:

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম,
তীর্থ তব পদে পদে;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

কিন্তু এর পরের কবিতায় তিনি বেদনা বোধ করেছেন জীবনের অপূর্ণতার জন্যে আর কামনা করেছেন মুক্তি :

অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

গতির তরঙ্গিত প্রবাহ চিরদিন কবিকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি কামনা করেছেন মুক্তিও। মুক্তি বলতে কবি অনেক সময়ে বুঝেছেন জীবনের মহৎ পরিণতি, কখনো কখনো বুঝেছেন গভীর ভাবাবেগ।

## পারস্যে

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে :

'পারস্যে'র প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩৩৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা প্রবাসীতে 'পারস্য-যাত্রা' নামে বাহির হয় ২ হইতে ১১ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। অবশিষ্ট অংশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৪০-এর বৈশাখ-সংখ্যা পর্যন্ত বিচিত্রা মাসিকপত্রে 'পারস্যভ্রমণ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এতে পারস্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস বহু আক্রমণকারীর হাতে যুগে যুগে পারস্যের নিদারুণ লাঞ্ছনা ভোগ, সেই সব দুর্দিন কাটিয়ে উঠবার তার অমেয় শক্তি, এসব সম্বন্ধে কবি অনেক কথা বলেছেন, আর বিশেষ ক'রে বলেছেন পারস্যে ও ইরাকে যে বিপুল ও আন্তরিক সমাদর তাঁর লাভ হয়েছিল তার কথা। আমরা এর কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। রাশিয়ার চিঠির মতো 'পারস্যে' গ্রন্থেও দেখা যাচ্ছে দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য কবি মর্মাহত।

এইবার মকব্বার দিয়ে পারস্যে প্রবেশ। ··করাচি থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যোমতরী জাস্কে পৌঁছল।······

এখানকার রাজকর্মচারীর দল সম্মান সম্ভাষণের জন্যে এলেন। বাইরের বালুতটে আমাদের চৌকি পড়েছে। যে দুই-একজন ইংরেজি জানেন তাদের সঙ্গে কথা হল। বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ করে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত।······

এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কী রকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম, পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে, সকলেই ভোগ করছে সমান অধিকার, ধর্ম-হিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই। ডাক্তার মহম্মদ ইশা খাঁ সাদিকের রচিত আধুনিক পারস্যের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখিত আছে—অনতিকাল পূর্বে ধর্মযাজকমণ্ডলীর প্রভাব পারস্যকে অভিভূত করে রেখেছিল। আধুনিক বিদ্যাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের প্রবলতা কমে এল। এর পূর্বে নানা শ্রেণীর অসংখ্য লোক, কেউ-বা ধর্ম-বিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা ধর্ম-প্রচারক, কোরাণপাঠক, সৈয়দ - এরা সকলেই মোল্লাদের মতো পাগড়ি ও সাজসজ্জা ধারণ করত।······এখন যে খুশি মোল্লার বেশ ধারণ করতে পারে না। বিশেষ পরীক্ষায় পাস ক'রে অথবা প্রকৃত ধার্মিক ও ধর্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদের সম্মতি অনুসারে তবেই এই সাজ ধারণের অধিকার পাওয়া যায়।······

অন্ততঃ একবার কল্পনা ক'রে দেখতে দোষ নেই যে, হিন্দুভারতে যত অসংখ্য পাণ্ডা-পুরোহিত ও সন্ন্যাসী আছে কোনো নতুন আইনে তাদের উপাধি-পরীক্ষা আবশ্যিক ব'লে গণ্য হয়েছে।

বোগদাদে ব্রিটিশদের আকাশ-ফৌজ আছে। সেই ফৌজের খ্রীস্টান ধর্মযাজক আমাকে খবর দিলেন এখানকার কোন্ শেখদের গ্রামে তাঁরা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ করছেন। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা যারা মরছে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে মার খাচ্ছে; এই সাম্রাজ্যনীতি ব্যক্তিবিশেষের সত্তাকে অস্পষ্ট করে দেয় বলেই তাদের মারা এত সহজ। খ্রীস্ট এই সব মানুষকেও পিতার সন্তান বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কাছে সেই পিতা এবং তাঁর সন্তান হয়েছে অবাস্তব, তাঁদের সাম্রাজ্যতন্ত্রের উড়ো জাহাজ থেকে চেনা

গেল না তাঁদের, সেইজন্য সাম্রাজ্য জুড়ে আজ মার পড়ছে সেই খ্রীস্টানদেরই বুকে।

এই ব্যোমবাহনে চড়ে মনের একটা সংকোচ বোধ না করে থাকতে পারি নে। অতি আশ্চর্য এ মন্ত্র, এর সঙ্গে আমার ভোগের যোগ আছে, কিন্তু শক্তির যোগ নেই। ........

এই ব্যোমতরীর চারজন ওলন্দাজ নাবিকের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। বিপুল বপু, মোটা মোটা হাড়, মূর্তিমান উদ্যম। যে-আবহাওয়ায় এদের জন্ম সে এদের প্রতিক্ষণে জীর্ণ করেনি, তাজা রেখে দিয়েছে। মজ্জাগত স্বাস্থ্য ও তেজ কোনো একঘেয়ে বাঁধা ঘাটে এদের স্থির থাকতে দিল না। বহু পুরুষ ধরে প্রভূত বলদায়ী অন্নে এরা পুষ্ট, বহু যুগের সঞ্চিত প্রচুর উদ্‌বৃত্ত এদের শক্তি। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ পুরো পরিমাণ অন্ন পায় না। অভুক্তশরীর বংশানুক্রমে অন্তরে-বাহিরে সকল রকম শত্রুকে মাশুল দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত। মনেপ্রাণে সাধনা করে তবেই সম্ভব হয় সিদ্ধি। কিন্তু আমাদের মন যদি-বা থাকে প্রাণ কই? উপবাসে ক্লান্তপ্রাণ শরীর কাজ ফাঁকি না দিয়ে থাকতে পারে না, সেই ফাঁকি সমস্ত জাতের মজ্জায় ঢুকে তাকে মারতে থাকে। (১)

... .... ... ....

সম্মানের সমারোহ এসে অবধি নানা আকারে চলেছে। এই জিনিসটাকে আমার মন সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না, নিজের মধ্যে আমি এর হিসাব মিলিয়ে পাইনে। বুশেয়ারের এই জনতার মধ্যে আমি কেই-বা। আমার ব্যক্তিগত ইতিহাসে ভাষায় ভাবে কর্মে আমি যে বহুদূরের অজানা মানুষ। য়ুরোপে যখন গিয়েছি তখন আমার কবির পরিচয় আমার সঙ্গেই ছিল। একটা বিশেষ বিশেষণে তারা আমাকে বিচার করেছে। বিচারের উপকরণ ছিল তাদের হাতে। এরাও আমাকে কবি বলে জানে, কিন্তু সে-জানা কল্পনায়, এদের কাছে আমি বিশেষ কবি নই, আমি কবি। অর্থাৎ কবি বলতে সাধারণতঃ এরা যা বোঝে তাই সম্পূর্ণ আমার পরে আরোপ করতে এদের বাধেনি। কাব্য পারসিকদের নেশা, কবিদের সঙ্গে এদের আন্তরিক মৈত্রী। আমার খ্যাতির সাহায্যে সেই মৈত্রী আমি কোনো দান না দিয়েই পেয়েছি। (৩)

... .... .... ...

অবশেষে হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম।...ভিতরে গিয়ে বসলুম।

সমাধিরক্ষক একখানি বড়ো চৌকো আকারের বই এনে উপস্থিত করলে। সেখানি হাফেজের কাব্যগ্রন্থ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, কোনো একটি বিশেষ ইচ্ছা মনে নিয়ে চোখ বুজে এই গ্রন্থ খুলে যে কবিতাটি বেরবে তার থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ণয় হবে। কিছু আগেই গবর্ণরের সঙ্গে যে বিষয় আলোচনা করেছিলুম সেইটেই মনে জাগছিল। তাই মনে মনে ইচ্ছা করলুম ধর্মনামধারী অন্ধতার প্রাণান্তিক ফাঁস থেকে ভারতবর্ষ যেন মুক্তি পায়। যে পাতা বেরল তার কবিতাকে দুই ভাগ করা যায়। ইরানী ও কয়জনে মিলে যে তর্জমা করেছেন তাই গ্রহণ করা গেল। প্রথম অংশের

প্রথম শ্লোকটি মাত্র দিই। কবিতাটিকে রূপকভাবে ধরা হয় কিন্তু সরল অর্থ ধরলে সুন্দরী প্রেয়সীই কাব্যের উদ্দিষ্ট।

প্রথম অংশ। মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয় জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।

দ্বিতীয় অংশ। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি—এও কি হবে সম্ভব। অহংকৃত ধার্মিকনামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।

বন্ধুরা প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সংগতি দেখে বিস্মিত হলেন।

এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাবে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি, আমি পলাতক; ছুটি নিয়েছি, অবাধ-প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ কত শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে-মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক। .... চা খাওয়া হলে পর এখানকার গানবাজনার কিছু নমুনা পেলুম। একজনের হাতে কানুন, একজনের হাতে সেতারজাতীয় বাজনা; গায়কের হাতে তাল দেবার যন্ত্র বাঁয়া-তবলার একত্রে মিশ্রণ। সংগীতের তিনটি ভাগ। প্রথম অংশটা চটুল, মধ্য অংশ ধীরমন্দ সকরুণ, শেষ অংশটা নাচের তালে। আমাদের

দিশি সুরের সঙ্গে স্থানে স্থানে অনেক মিল দেখতে পাই। বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐক্য দেখেছি এখানকার সংগীত কাব্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। (৪)

.... ... ... ...

আশ্চর্যের কথা এই যে, আরবের হাতে, তুর্কির হাতে, মোগলের হাতে, আফগানের হাতে পারস্য বারবার দলিত হয়েছে তবু তার প্রাণশক্তি পুনঃপুনঃ নিজেকে প্রকাশ করতে পারলে। আমার কাছে মনে হয় তার প্রধান কারণ আকেমেনীয়, সাসানীয়, সাফাবি রাজাদের হাতে পারস্যের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য বারংবার সুদৃঢ় হয়েছে। পারস্য সম্পূর্ণ এক, তার সভ্যতার মধ্যে কোনো আকারে ভেদবুদ্ধির ছিদ্র নেই। আঘাত পেলে সে পীড়িত হয়, কিন্তু বিভক্ত হয় না। রুশে-ইংরেজে মিলে তার রাষ্ট্রিক সত্তাকে একদা দুখানা করতে বসেছিল। যদি তার ভিতরে ভিতরে বিভেদ থাকত তা হলে য়ুরোপের আঘাতে টুকরো টুকরো হতে দেরি হত না। কিন্তু যে মুহূর্তে শক্তিমান রাষ্ট্রনেতা সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসে ডাক দিলেন, অমনি সমস্ত দেশ তাঁকে স্বীকার করতে দেরি করলে না; অবিলম্বে প্রকাশ পেলে যে পারস্য এক।

... ... ... ...

নানাপ্রভাব চারিদিক থেকে আসে, জড়বুদ্ধি তাকে ঠেকিয়ে রাখে, সচেতন বুদ্ধি তাকে গ্রহণ করে আপনার মধ্যে তাকে ঐক্য দেয়। নিজের মধ্যে একটা প্রাণবান ঐক্যতত্ত্ব থাকলে বাইরের বহুকে মানুষ একে পরিণত করে নিতে পারে। পারস্য তার ইতিহাসে, তার আর্টে বাইরের অভ্যাগমকে আপন অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

পারস্যের ইতিহাসক্ষেত্রে একদিন যখন আরব এল তখন অতি অকস্মাৎ তার প্রকৃতিতে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটল। এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, বলপূর্বক ধর্মদীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনো আরব গ্রহণ করেনি। আরব শাসনের আরম্ভকালে পারস্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রে বাস করত এবং শিল্পরচনায় ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচিকে বাধা দেওয়া হয়নি। পারস্যে ইসলামধর্ম অধিবাসীদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রমে ক্রমে সহজে প্রবর্তিত হয়েছে তৎপূর্বে ভারতবর্ষেরই মতো পারস্যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল কঠিন, তদনুসারে শ্রেণীগত অবিচার ও অবমাননা জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই

পীড়ার কারণ হয়েছিল। স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরপূজার সমান অধিকার ও পরস্পরের নিবিড় আত্মীয়তা এই ধর্মের প্রতি প্রজাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধর্মের প্রভাবে পারস্যে শিল্পকলার রূপ পরিবর্তন করাতে রেখালংকার ও ফুলের কাজ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তারপরে তুর্কিরা এসে আরব সাম্রাজ্য ও সেই সঙ্গে তাদের বহুতর কীর্তি লণ্ডভণ্ড করে দিল, অবশেষে এল মোগল। এই সকল কীর্তিনাশার দল প্রথমে যত উৎপাত করুক ক্রমে তাদের নিজেদেরই মধ্যে শিল্পোৎসাহ সঞ্চারিত হতে লাগল। এমনি করে যুগান্তে যুগান্তে ভাঙচুর হওয়া সত্ত্বেও পারস্যে বারবার শিল্পের নবযুগ এসেছে। (৬)

আজ সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পারসিক সংগীত শুনলুম। একটি সুর বাজালেন আমাদের ভৈরোঁ রামকেলির সঙ্গে প্রায় তার কোনো তফাত নেই। এমন দরদ দিয়ে বাজালেন, তানগুলি পদে পদে এমন বিচিত্র অথচ সংযত ও সুমিত যে আমার মনের মধ্যে মাধুর্য নিবিড় হয়ে উঠল। বোঝা গেল ইনি ওস্তাদ কিন্তু ব্যবসাদার নন। ব্যবসাদারিতে নৈপুণ্য বাড়ে কিন্তু বেদনাবোধ কমে যায়, ময়রা যে কারণে সন্দেশে রুচি হারায়।........কয়েকজন মোল্লা এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্যপথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে।

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আলো পাব কী উপায়ে, তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে, কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিকআলো জ্বেলে। সেই সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যয় যথেষ্ট, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি তারা বলে দরজা খুলে দাও। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচার-বিচারের কড়াকড়ি, সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উত্তম ফুরোয়নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না। (৭)।

আজ অপরাহ্ণে আমার নিমন্ত্রণ এখানকার (বোগদাদের) সাহিত্যিকদের তরফ থেকে।····· আমার পালা উপস্থিত হতে আমি বললুম, আজ আমি একটি দরবার নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। একদা আরবে পরম গৌরবের দিনে পূর্বে পশ্চিমে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূভাগ আরব্যের প্রভাবের অধীনে এসেছিল। ভারতবর্ষে সেই প্রভাব যদিও আজ রাষ্ট্রশাসনের আকারে নেই, তবুও সেখানকার বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে অধিকার করে বিস্তার আকারে ধর্মের আকারে আছে। সেই দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে আমি আপনাদের বলছি আরবসাগর পার করে আরব্যের নববাণী আর একবার ভারতবর্ষে পাঠান—যাঁরা আপনাদের স্বধর্মী তাঁদের কাছে আপনাদের মহৎ ধর্মগুরুর পূজ্যনামে, আপনাদের পবিত্রধর্মের সুনাম রক্ষার জন্য। দুঃসহ আমাদের দুঃখ, আমাদের মুক্তির অধ্যবসায় পদে পদে ব্যর্থ; আপনাদের নবজাগ্রত প্রাণের উদার আহ্বান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে, অমানুষিক অসহিষ্ণুতা থেকে, উদার ধর্মের অবমাননা থেকে মানুষে মানুষে মিলনের পথে, মুক্তির পথে নিয়ে যাক হতভাগ্য ভারতবর্ষকে। এক দেশের কোলে যাদের জন্ম অন্তরে-বাহিরে তারা এক হোক। (১০)।

আজ একজন বেদুয়িন দলপতির তাঁবুতে আমার নিমন্ত্রণ আছে।······

আমরা গিয়ে বসলুম একটা মস্ত মাটির ঘরে। বেশ ঠাণ্ডা। মেঝেতে কার্পেট, একপ্রান্তে তক্তপোশের উপর গদি পাতা। ঘরের মাঝখান বেয়ে কাঠের থাম, তার উপরে ভর দিয়ে লম্বা লম্বা খুঁটির'পরে মাটির ছাদ। আত্মীয়বান্ধবেরা সব এদিকে ওদিকে, একটা বড়ো কাঁচের গুড়গুড়িতে একজন তামাক টানছে। ছোটো আয়তনের পেয়ালা আমাদের হাতে দিয়ে তাতে অল্প একটু করে কফি ঢাললে, ঘন কফি, কালো তেতো। দলপতি জিজ্ঞাসা করলেন, আহার ইচ্ছা করি কি না। "না" বললে আনবার রীতি নয়: ইচ্ছা করলেম, অভ্যন্তরে তাগিদও ছিল। আহার আসবার পূর্বে শুরু হল একটু সংগীতের ভূমিকা গোটাকতক কাঠির উপরে কোনোমতে চামড়া-জড়ানো একটা তেড়াবাঁকা একতারা যন্ত্র বাজিয়ে একজন গান ধরলে। তার মধ্যে বেদুয়িন তেজ কিছুই ছিল না। অত্যন্ত মিহিচড়া গলায় নিতান্ত কান্নার সুরে গান। একটা বড়ো জাতের পতঙ্গের রাগিণী বললেই হয়। অবশেষে সামনে চিলিমচি ও জলপাত্র এল। সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে

বসলুম। মেঝের উপর জাজিম পেতে দিলে। পূর্ণচন্দ্রের ডবল আকারের মোটা মোটা—রুটি হাতাওয়ালা অতি প্রকাণ্ড পিতলের থালায় ভাতের পর্বত আর তার উপর মস্ত এবং আস্ত একটা সিদ্ধ ভেড়া। দু'তিনজন জোয়ান বহন করে মেঝের উপর রাখলে। পূর্ববর্তী মিহি-করুণ রাগিণীর সঙ্গে এই ভোজের আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। আহারার্থীরা সব বসল থালা ঘিরে। সেই এক থালা থেকে সবাই হাতে করে মুঠো মুঠো ভাত প্লেটে তুলে নিয়ে আর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ঘোল দিয়ে গেল পানীয়রূপে। গৃহকর্তা বললেন, আমাদের নিয়ম এই যে, অতিথিরা যতক্ষণ আহার করতে থাকে আমরা অভুক্ত দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু সময়াভাবে আজ সে নিয়ম রাখা চলবে না। তাই অদূরে আর একটা প্রকাণ্ড থালা পড়ল।……

এরা মরুর সন্তান, কঠিন এই জাত, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নিয়ে এদের নিত্য ব্যবহার। এরা কারো কাছে প্রশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না, কেননা, পৃথিবী এদের প্রশ্রয় দেয়নি। জীববিজ্ঞানে প্রকৃতি কর্তৃক বাছাইয়ের কথা বলে, জীবনের সমস্যা সুকঠোর করে দিয়ে এদেরই মাঝে যথার্থ কড়া বাছাই হয়ে গেছে, দুর্বলেরা বাদ পড়ে। যারা নিতান্ত টিঁকে গেল এরা সেই জাত। মরণ এদের বাজিয়ে নিয়েছে। এদের যে এক একটি দল তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এদের মাতৃভূমির কোলের পরিসর ছোটো; নিত্য বিপদে বেষ্টিত জীবনের স্বল্পদান এরা সকলে মিলে ভাগ করে ভোগ করে। এক বড়ো থালে এদের সকলের অন্ন, তার মধ্যে শৌখিন রুচির স্থান নেই; তারা পরস্পরের মোট রুটি অংশ করে নিয়েছে, পরস্পরের জন্য প্রাণ দেবার দাবি এই এক রুটি ভাঙার মধ্যেই। বাংলাদেশের নদীবাহুবেষ্টিত সন্তান আমি, এদের মাঝখানে বসে খাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে তৈরি মানুষ আমরা উভয়ে। তবুও মনুষ্যত্বের গভীরতর বাণীর যে ভাষা সে-ভাষায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়। তাই এই অশিক্ষিত বেদুয়িন দলপতি যখন বললেন, আমাদের আদিগুরু বলেছেন, যার বাক্যে ও ব্যবহারে মানুষের বিপদের কোনো আশংকা নেই সেই যথার্থ মুসলমান, তখন সে-কথা মনকে চমকিয়ে দিলে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ চলছে এ-পাপের মূল রয়েছে সেখানকার শিক্ষিত লোকদের মনে। এখানে অল্পকাল পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোনো কোনো শিক্ষিত মুসলমান গিয়ে

ইসলামের নামে হিংস্র ভেদবুদ্ধি প্রচার করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বললেন, আমি তাঁদের সভ্যতায় বিশ্বাস করি নে, তাই তাঁদের ভোজের নিমন্ত্রণে যেতে অস্বীকার করেছিলেন ;·······

তার পরে যখন আমাদের মোটর চলল, দুইপাশের মাঠে এদের ঘোড়-সওয়াররা ঘোড়া ছোটাবার খেলা দেখিয়ে দিলে : মনে হল মরুভূমির ঘূর্ণী হাওয়ার দল শরীর নিয়েছে। ····· ···

······আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে, বেদুয়িন-আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু বেদুয়িন-দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না ! তিনি হেসে বললেন, তার একটু বাধা আছে। আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্যে মহাজনেরা যখন আমাদের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পণ্য নিয়ে আসে তখন অনেক সময় বিজ্ঞ চেহারার প্রবীণ লোককে উটের পরে চড়িয়ে তাদের কর্তা সাজিয়ে আনে।

# মানুষের ধর্ম

১৯৩০ সালের মে মাসে কবি অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেন—বক্তৃতার বিষয় ছিল The Religion of Man. সেই বিষয়টিই বাংলায় কিছু ভিন্ন বেশে দাঁড় করানো হয়। 'মানুষের ধর্ম' নাম দিয়ে—১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বক্তৃতাগুলো দেন।

ধর্ম সম্বন্ধে কবি নানা সময়ে নানাভাবে আপনার চিন্তা প্রকাশ করেছেন। সে সবের সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু পরিচয় হয়েছে। তাঁর সেই সব চিন্তা অনেকটা সংহত রূপ পেয়েছে তাঁর 'মানুষের ধর্ম' ভাষণগুলোয়। তবে ধর্ম সম্বন্ধে কবির সব বক্তব্য যে এতে রূপ পেয়েছে তা নয়। এর পরিচয় নিতে চেষ্টা করা যাক :

'মানুষের ধর্ম' তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে কবি দেখাতে চেষ্টা করেছেন প্রকৃতিতে মানুষের বিবর্তন যেভাবে সংসাধিত হয়েছে তাতে পশু

ও মানুষের ভিতরে বড়ো রকমের পার্থক্য কী ঘটেছে। কবির কিছু কিছু উক্তি এই :

মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে। একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে-সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, সেদিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, সেদিকে বিশ্বমানব।

·· মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে যে মৃত্যুহীন, সেইদিকে তার তপস্যা শ্রেষ্ঠকে আবিষ্কার করে। সেইদিক আছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে-পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর। মানবদেহে বহুকোটি জীবকোষ; তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জন্ম, স্বতন্ত্র মরণ। অণুবীক্ষণযোগে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের চারিদিকে ফাঁক। একদিকে এই জীবকোষগুলি আপন আপন পৃথক জীবনে জীবিত, আর একদিকে তাদের মধ্যে একটি গভীর নির্দেশ আছে, প্রেরণা আছে, একটি ঐক্যতত্ত্ব আছে, সেটি অগোচর পদার্থ, সেই প্রেরণা সমগ্র দেহের দিকে, সেই ঐক্য সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত। মনে করা যেতে পারে, সেই সমগ্র দেহের উপলব্ধি অসংখ্য জীবকোষের অগম্য, অথচ সেই দেহের পরম রহস্যময় আহ্বান তাদের প্রত্যেকের কাছে দাবি করছে তাদের আত্মনিবেদন।····

·· ·· শোনা যায়, প্রতি সাত বছর অন্তর মানুষের দেহে এই জীবকোষগুলির পরিবর্তন ঘটে। তারা বিদায় নেয়, অর্থাৎ তাদের পৃথক সত্তা থাকে না। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সত্তা সমস্ত দেহের আয়ুর অন্তর্গত, অর্থাৎ যেটা তাদের স্ব-দৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক সেই সত্তা সমস্ত দেহের জীবন প্রবাহে থেকে যায়।

দেহে কখনও কখনও কর্কট রোগ অর্থাৎ ক্যান্সার জন্মায়; সেই

ক্যান্সার একান্তই স্বতন্ত্র, বলা যেতে পারে তার মধ্যে দেহাত্মবোধ নেই। সমগ্র দেহের সে প্রতিকূল। দেহের পক্ষে একেই বলা যায় অশুভ·······

······জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নিচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানলা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকী আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না।······

······নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভূতি দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে-পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি। খাড়া হওয়া মানুষের কাছে নিকটের চেয়ে দূরের দাম বেশি। অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে তার মন হয়েছে প্রবৃত্ত। এই দৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয় সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতও পেয়েছে মুক্তি। পায়ের কাছ থেকে হাত যদি ছুটি না পেত তাহলে সে থাকত দেহেরই একান্ত অনুগত, চতুর্থ বর্ণের মতো অস্পৃশ্যতার মলিনতা নিয়ে।······

···· দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানা-শোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এইটেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ।

বিষয়কে বড়ো করে পায় বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো ক'রে, সত্য ক'রে পায় বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।.......

.......জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, "অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি।" সেইদিন থেকে মানুষের ইতিহাসে নানাভাবে নানারূপে নানাভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলল "আমি কী।" ঠিক উত্তরটিতে তার আনন্দ, তার গৌরব। জন্তুর উত্তর পাওয়া যায় তার দৈহিক যথাযোগ্যতায়। সনাতন গণ্ডারের মতো স্থূল ব্যবহারে গণ্ডার যদি কোনো বাহ্য বাধা না পায় তাহলে আপন পার্থক্য সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, মানুষ কী করে হবে মানুষের মতো তাই নিয়ে বর্বরদশা থেকে সভ্য অবস্থা পর্যন্ত তার চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত নেই।....

......যাকে সে পূজা করে তার দ্বারাই সে প্রমাণ করে তার মতে নিজে সে সত্য কিসে, তার বুদ্ধি কাকে বলে পুজনীয়, কাকে জানে পূর্ণতা বলে। সেইখানেই আপন দেবতার নামে মানুষ উত্তর দিতে চেষ্টা করে, "আমি কী—আমার চরম মুল্য কোথায়।" বলা বাহুল্য, উত্তর দেবার উপলক্ষে পূজার বিষয় কল্পনায় অনেক সময়ে তার এমন চিত্ত প্রকাশ পায় বুদ্ধিতে যা অন্ধ, শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার এখানেও তাই। এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।

..... মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে-মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে-জ্ঞানে কর্মে কর্মে। ...

.......ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের সামনে দুই ব্রাহ্মণ তর্ক তুলেছিলেন, সামগানের মধ্যে যে রহস্য আছে তার প্রতিষ্ঠা কোথায়।

দালভ্য বললেন, "এই পৃথিবীতেই"। স্থূল প্রত্যক্ষই সমস্ত রহস্যের চরম আশ্রয়, বোধ করি দালভ্যের এই ছিল মত।

প্রবাহণ বললেন, "তাহলে তোমার সত্য তো অন্তরাল হল, সীমায় এসে ঠেকে গেল সে।

ক্ষতি কী তাতে। ক্ষতি এই যে, সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়: কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠেসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না! বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবাহণ রাজা; তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। ..

ঋজু হয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে ভারাকর্ষণের বিরুদ্ধে মান বাঁচিয়ে চলতে হয়! পশুর মতো চলতে গেলে তা করতে হত না। মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলাতেও তার নিয়ত চেষ্টা, পদে পদে নিচে পড়বার শংকা। এই মনুষ্যত্ব বাঁচানোর দ্বন্দ্ব মানবধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের। মানুষের ইতিহাসে এই পশুও আদিম। সে টানছে তামসিকতার মূঢ়তার দিকে। পশু বলছে, "সহজধর্মের পথে ভোগ করো।" মানুষ বলছে, "মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো।" যাদের মন মন্থর, যারা বলে যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তুধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে; তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। তারা পূর্বসঞ্চিত ও ঐশ্বর্যকে বিকৃত করে নষ্ট করে।

....চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য সকল প্রাণী, বাইরে থেকে জীবিকার অর্থ খুঁজে খুঁজে। মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যাকে অনুভব করলে যিনি নিহিতার্থো দধাতি, যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। সেই অর্থ এই যে মানুষ মহৎ, মানুষকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে মহৎ, তবেই প্রমাণ হবে যে, সে মানুষ; প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে, কেননা, তিনি চিরন্তন মানব, সার্বজনীনমানব; তিনি মৃত্যুর অতীত, তাঁকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে সে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে সকল কালের হয়ে

আপনারই অন্তরতম বেদীতে। আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। শেষকালে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে সে বলে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। মানুষের দেবতা মানুষের মনের মাধুর্য, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মাধুষকে পাই – অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি বলতে চেষ্টা করেছেন মনের মানুষ ব্রহ্ম, এসব বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে মানবিক শ্রেষ্ঠ গুণাবলী – মানবব্রহ্ম – " আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে-কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি"—

…জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্ম চ, আমাদের ঋতং সতং আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।…

…বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে-জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতে পারে যার উপলব্ধি জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত। আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে সে বিরাজ করে না। কিন্তু যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতি মানবিক বলব, কী করে। - …

‥ মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে—মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে অর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা মুক্তাত্মানঃ সর্বমেববিশন্তি। মানুষ হয়ে জন্মলাভ ক'রে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনায় কবি বলেছেন ব্রহ্মকে মানবব্রহ্ম, মনের মানুষ, এমনতর কথা বলায় কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলতে পারেন :

……তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তাহলে পূজাং ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলী-

করণ। এমন অভিযোগের উত্তরে কবি বলেছেন: একেবারে উলটো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেননা মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা—আহারে-বিহারে, আচারে-বিচারে, ভোগে নৈবেদ্যে-মন্ত্রে, তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পুজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেই জন্যেই কথিত আছে, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছতে পারি।

কবির সমর্থিত এই সোঽহং-তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্মে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব-প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে-অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে-আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন, তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম, যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া—যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান। সোঽহম্ মন্ত্র সম্বন্ধে কবি আরো বলেছেন:

সোঽহম্ মন্ত্র মুখে আওড়িয়ে তুমি দুরাশা কর কর্ম থেকে ছুটি নিতে। সমস্ত পৃথিবী রইল পড়ে, তুমি একা যাবে দায় এড়িয়ে। যে ভীরু চোখ বুজে মনে করে, "পালিয়েছি" সে কি সত্যই পালিয়েছে। সোঽহম্ সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে যতটুকু মুক্ত হচ্ছে সেই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে না দিতে পারে। বুদ্ধদেব আপনার মুক্তিতেই সত্যই যদি

মুক্ত হতেন, তাহলে একজন মানুষের জন্যেও তিনি কিছুই করতেন না। দীর্ঘজীবন ধরে তাঁর তো কর্মের অন্ত ছিল না। দৈহিক প্রাণ নিয়ে তিনি যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন তাহলে আজ পর্যন্তই তাঁকে কাজ করতে হত আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। কেন না, যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশ্বকর্মা।

The Religion of Man বক্তৃতামালা সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে কবির যে আলাপ-আলোচনা হয় সে সম্বন্ধে তিনি ( কবি ) বলেছেন ঃ

গত বৎসর ( ১৯৩০ ) গ্রীষ্মে আবার যখন জার্মানিতে যাই, বার্লিনের অদূরে Kaputh-এ আইন্‌স্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দুদিন' আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট্ বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, আর The Religion of Man নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে, তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যান-ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে, মন-বুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শ ভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐ প্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়, নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানের ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্ম পথে বা ধর্মসাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইন্‌স্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনাও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে,সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সীমান্ত-চুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে। *

* রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৮ পৃঃ দ্রঃ।

The Religion of Man-এ বা মানুষের ধর্মে কবি ব্রহ্মের মানবিক বোধের উপরে সব চাইতে, অর্থাৎ তাঁর অন্যান্য লেখায় যতটা জোর দিয়েছেন তার তুলনায় বেশি জোর দিয়েছেন। ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে বা জীবনের পরম সত্যকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করবার সেইটিই শ্রেষ্ঠ পথ। এই দিক দিয়ে এই রচনাটি জগতের উদার মানবিক চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান।

কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার যত তার চাইতে মরমী ব্যাপার বেশি, কবি যেমন নৈবেদ্যে বলেছেন ঃ

সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির গৌরব।
সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জন মাঝে যায় অভিসারে
পূজার সুবর্ণথালি ভরি উপহারে।
তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে,
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া
একাকী বসিয়া আছ ভরি তার হিয়া।

জগতে যাঁরা মহামানব বা মহাভক্ত রূপে পূজিত তাঁদের ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বা পরমসত্যের বোধ বহুল পরিমাণে মরমী। সেই দুর্জ্ঞেয় মরমী বোধ জগতে যুগে যুগে নতুন নতুন প্রেরণার ও কর্মের জন্মদান করেছে। শুধু বুদ্ধি ও যুক্তি-গ্রাহ্য মানব-কল্যাণ বোধের সেই শক্তি আছে কিনা আজো তা পরীক্ষা সাপেক্ষ। তবে মানুষের এই সম্ভাবনার কথা একালের অনেক মনীষী ভাবছেন।

আমরা দেখব কবির জীবনের অন্তিমে পরমেশ্বরের বা পরমসত্যের মরমী বোধ তাঁর ভিতরে প্রবল হয়েছে।

# পুনশ্চ

‘পুনশ্চ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসে, তাতে ‘পরিশেষ’ থেকে তেরোটি কবিতা এতে যোজিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ‘পুনশ্চ’ কাব্য দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে।

এর ভূমিকায় কবি বলেন :

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, ‘লিপিকা’র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।……

……গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ও প্রকাশ-রীতিতে যে একটি সসজ্জ-সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।

গদ্যকাব্যের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কবি অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে কিছু দীর্ঘ আলোচনা করেন। তার কিছু কিছু অংশ এই :

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে ( আট পৌরে জীবনযাত্রাকে ) সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ি চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই

আছেন কাঁকন পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম।--এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকেও বলব স্পর্ধা।····

······যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে।

······এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে-মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা; সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকী শাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যিকা রীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি যে উচ্চ আশা পোষণ করেছিলেন তা সিদ্ধ হয়েছে বলা যায় না। সিদ্ধ না হওয়ার বড় কারণ মনে হয় এই—কবি এই পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন অবেলায়, যখন তাঁর শক্তিতে ভাঁটা পড়েছে—যখন মুখ্যতঃ সৌন্দর্যের, শান্তির, অতলে নিমজ্জিত হয়ে কঠোর বাস্তবের আঘাত তিনি অন্ততঃ কিছুটা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। কবির শেষ বয়সের একটি পত্রে আছে:

"মনে যে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়েছে তার ধাক্কা খেয়ে মনে করি ব্যক্তিগত

জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য আছে তারি চারিদিকে কাব্যের প্যাটারন গেঁথে একাধিপত্য করি নিজের মনোজগতে - সাহায্য করবে চারিদিকের গাছপালা, ঋতুপর্যায়। একে কি বলবে আত্মকেন্দ্রিক জীবন—ঠিক তা নয়, এর কেন্দ্র সেই বিরাটের মধ্যে, যা সমস্ত মলিনতা, জটিলতা, আবিলতার মধ্যে থেকে তাকে অতিক্রম করে বিরাজ করে—একে বলবে মিষ্টিক ; যদি বলো এই হচ্ছে এস্কেপিজম্ প্রতিবাদ করব না। ইতি ১৮।৯।৩৬।

কবির এই মনোভাবকে এস্কেপিজম্ বলা না গেলেও কাজে সেই ধরনেরই কিছু এটি হয়েছে। তার ফলে এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত রচনায় আটপৌরে জীবনের চারিত্রশক্তির অসদ্ভাব হওয়াই স্বাভাবিক।

পুনশ্চের খুব বিখ্যাত ও বিশিষ্ট কবিতা হচ্ছে 'শিশুতীর্থ'—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ম্যুনিকে যীশুখৃষ্টের জীবনলীলার অভিনয় দেখে কবি প্রথমে ইংরেজিতে এটি লেখেন—তার নাম দেন 'The child'. বলা বাহুল্য এর অন্তরে রয়েছে সমৃদ্ধ জীবনবোধ - কোনো ধরনের জীবন-বিমুখতা নয়।

এর আর একটি বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে 'বাঁশি'। কিন্তু শিশুতীর্থের উৎকর্ষ তার লাভ হয়নি। কবিতাটির প্রথম দিকে কঠোর বাস্তবতার একটা অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে, কিন্তু শেষের দিকে ভাবাবেগ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বাঁশির সুর কনিষ্ঠ কেরানিকেও মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে সেই সুর শুনে আকবর বাদশাহের মন ও মেজাজের অধিকারী সে হয় একথা বল্লে এতটা বাড়িয়ে বলা হয় যে রচনা আটপৌরে জীবনের সংশ্রব শূন্য হয়ে পড়ে। পুনশ্চের শেষের দিকের অনেকগুলো কবিতা 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলোর সঙ্গে তুলনীয় ; কিন্তু 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলোর চাইতে উচ্চতর, এমন কি তুল্য, সার্থকতা সে সবের লাভ হয় নি। হয়ত 'কথা ও কাহিনীর সমৃদ্ধ জীবন বোধ তার মুখ্য কারণ—তার সঙ্গে পদ্যছন্দেরও শুভযোগ ঘটেছিল। 'পুনশ্চ' কাব্যের শেষ কবিতাটি হচ্ছে ১লা আশ্বিন। তার শেষের ক'টি ছত্র এই :

মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার<br>
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।<br>
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী,<br>
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে,<br>
নির্মল এই শরৎ রৌদ্রালোকে,<br>
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

কবি যে বিজয় চাচ্ছেন তা তাঁর জন্যে যত সত্যই হোক পাঠকদের অন্তরে তার সঞ্চারিত হবার সামর্থ্য যে আছে তা মনে হয় না।

মোট কথা কাব্যের গদ্যিকা রীতি সম্বন্ধে খুব আশান্বিত আমরা হতে পারিনি। লিপিকার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো গদ্যে লেখা হলেও আসলে কবিতা গীতিকবিতা —গদ্যের আটপৌরে জীবনের ব্যাপার সে সব নয়।

† দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য,—শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত, ২১০ পৃঃ

# কালের যাত্রা

গ্রন্থ পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে :

'কালের যাত্রা' বাংলা ১৩৩৯ সালের [ ইং ১৯৩২ ] ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহার পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। বর্তমান সংস্করণে 'কালের যাত্রা'র পরিশিষ্টরূপে 'রথযাত্রা নাটিকাটি প্রবাসী হইতে মুদ্রিত হইল।

'কবির দীক্ষা'র পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় 'শিবের ভিক্ষা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই নাটিকাটি শরৎচন্দ্রকে তাঁর সপ্তপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কবি উপহার দেন। উৎসর্গ পত্রে লিখিত হয়েছিল :

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করছি। আশা করি, আমার এ-দান তোমার অযোগ্য হয় নি। বিষয়টি এই – রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই

সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনী মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমরা 'রাশিয়ার চিঠি'তে দেখেছি, জনসাধারণের দুঃসহ ভাগ্য পরিবর্তের জন্য একালে রাশিয়ায় যে ব্যাপক চেষ্টা চলেছে সেটি কবিকে কত আনন্দিত করেছে। 'কালের যাত্রা' নাটিকায় সেই অবমানিত জনসাধারণের দশার পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজনের কথাই কবি বলেছেন। এতে পুরোহিত ও সৈন্যদের অনড় মনোভাব, একালে বৈশ্যশক্তির প্রভাববৃদ্ধি, নারীদের অন্ধ আচার-পূজা—এসবও স্বল্প পরিসরে সুচিত্রিত হয়েছে। জীবনের জটিল পরিস্থিতিতে কবির কি কাজ সে কথার অবতারণাও এতে করা হয়েছে—যেমন করা হয়েছে ফাল্গুনীর ভূমিকায়। জনসাধারণের প্রাধান্য লাভের অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা যা আছে তার কথাও কবি বলেছেন। এই ছোট নাটকটি বেশ চিন্তাসমৃদ্ধ।

# দুই বোন

'দুই বোন' ১৯৩৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। একটি পত্রে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে কবি লেখেন :

'দুই বোন' গল্পটা সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েছ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি। সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া কেউ বা দুইয়ের মিশোল। বাংলা দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্যন্তই মাতৃ-অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। বিবাহে যাবার আগে বর বলে যায়, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে—Alma Mater-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রীর মতোই। ......অল্প স্ত্রীই এমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র

রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে। সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন করে তোলে।

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদ মস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোইবাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ্য স্ত্রী, পুরুষ সেই-খানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়।.... মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্বল্য পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই।

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্যস্নেহসতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটল। অপর পক্ষে অতি-নির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণযাত্রার মোটর-রথের সোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীতজাতীয় মেয়েও নিশ্চয়ই আছে যারা অতিলালন-অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্মি সেই জাতের। শুরুতেই চালককে নিয়ে গুরুকে নিয়ে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে সে এমন পুরুষকে পেলে যার চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই। যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই- যে তার যথার্থ জুড়ি।

ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠলো। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। উপসংহারে বলে রাখি, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে, প্রিয়া আছে। কোনটা মুখ্য, কোনটা গৌণ কোনটা এগিয়ে আছে, কোনটা পিছিয়ে তাই নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য।

এতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে কবির মন বেশি গেছে, ফলে চরিত্রগুলো Type জাতীয় হয়েছে বেশি—মানবিক হয়েছে কম। শশাঙ্কের আবেগের উদ্বেলতাকে কবি অনেকটা অকালে দমিয়ে দিয়েছেন।

শর্মিলার জীবনব্যাপী প্রয়াসের ব্যর্থতার বেদনা অবশ্য পাঠকদের মর্ম স্পর্শ করে

# মালঞ্চ

'মালঞ্চ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে। 'দুই-বোনের' মতো এই ছোটো উপন্যাসটিও মুখ্যতঃ মনস্তাত্ত্বিক। তবে এতে দাম্পত্য সম্বন্ধের আরো জটিলতার দিকে কবি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

আদিত্য ও তার স্ত্রী নীরজার জীবন তাদের সচ্ছল সংসারে দশ বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তার পরে প্রসবকালে অস্ত্রাঘাতে নীরজা হয়ে পড়ল চিররুগ্‌ণ। তাদের ছিল ফুল সরবরাহের বড কারবার। আদিত্যকে তার কাজে সাহায্য করবার জন্য আনা হলো সরলাকে—সে আদিত্যের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া আর দীর্ঘদিনের পরিচিতা দুজ.ন একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে বললে চলে।

আদিত্য ও সরলার মধ্যে ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু সে-প্রীতি ছিল আত্মভোলা। তাদের দুইজনের পরস্পরের প্রতি ভাব ছিল যেন দুই কর্মানুরাগী সহোদরের ভাব।

কিন্তু তার স্বামীর সঙ্গে সরলার এত মিলমিশ রোগশয্যাশায়িনী নীরজার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করলো। সেই ঈর্ষা তার মধ্যে দিন দিন কঠিন হয়ে উঠতে লাগল—চেষ্টা করেও নীরজা সেই ঈর্ষার হাত থেকে নিজেকে নিষ্ক্রান্ত করতে পারলে না। নীরজার এই ঈর্ষায় আদিত্যের ও সরলার অন্তরের সুপ্ত প্রেম আর সুপ্ত রইল না। আদিত্যের ধারণা হলো সেই প্রেমকে জীবনে অস্বীকার করা অন্যায় হবে, বিশেষ করে নীরজার আয়ুষ্কাল যখন নিঃশেষিত হয়ে এসেছে।

নীরজাও চাইলে স্বামীর প্রতি তার এতদিনের প্রাণঢালা ভালোবাসাকে ঈর্ষার কালিমায় লিপ্ত হতে দেবে না। কিন্তু নীরজার চেষ্টা ব্যর্থ হলো—বিকট ঈর্ষার দ্বারা কবলিত হয়ে সে প্রাণ ত্যাগ করলে।—ঈর্ষার এমন রূপ কবি আর আঁকেননি।

আদিত্য ভেবেছিল তার স্ত্রীর অন্তিমকাল যখন ঘনিয়ে এসেছে আর তার দীর্ঘদিনের পরিচিত সরলার প্রতি তার অন্তরে যখন অকৃত্রিম প্রেম দেখা দিয়েছে তখন সরলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা তার পক্ষে দোষাবহ নয়। কিন্তু

কবি দেখালেন, জীবন, বিশেষ করে দাম্পত্য সম্বন্ধ, বড় জটিল। স্ত্রী গতায়ু হয়ে তার প্রেমের নতুন সার্থকতার পথ মুক্ত করে দিয়ে গেল আদিত্যের মনে। এমন ধারণা ঠাঁই পেলেও দেখলে সে তার স্ত্রীর অন্তিমকালের তীব্র ঈর্ষার বেদনা তার জন্য কী এক ভয়াবহ স্মৃতি হয়ে রইল।

দাম্পত্য অপরাধের প্রতি—অথবা লোভের প্রতি কবি সাধারণত কঠিন শাস্তি বিধান করেছেন।

# বাঁশরি

'বাঁশরি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

এই নাটিকাটির দুইটি বিভাগ - এক বিভাগের প্রধান ব্যক্তি নবীন সাহিত্যিক ক্ষিতীশ, অপর বিভাগের প্রধান ব্যক্তি সন্ন্যাসী পুরন্দর, রাজা সোমশংকর, আর সুষমা। এই দুই বিভাগের যোগসূত্র হচ্ছে বাঁশরি। ক্ষিতীশ উপলক্ষ্য হয়েছে সেই সময়ের অতি-আধুনিক সাহিত্যের কোনো কোনো প্রবণতা সম্পর্কে কবির তীব্র বিতৃষ্ণার, আর পুরন্দর প্রভৃতির সাহায্যে কবি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন মহৎব্রতে আত্মবিসর্জনের এক ধরনের চিত্রের।

বাঁশরি'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রভাতবাবু বলেছেন:

>……বাঁশরি সোমশংকরকে ভালোবাসিয়াছিল যৌবনের সমস্ত আবেগ দিয়া। সে জানিত সোমশংকর একদিন তাহারই হইবে। কিন্তু হঠাৎ সন্ন্যাসী পুরন্দর আসিয়া সোমশংকরকে তাহার কাছ হইতে যেন ছিনাইয়া লইয়া গেলেন এবং তাহার বিবাহ দিলেন সুষমার সঙ্গে। সুষমা পুরন্দরের হাতে গড়া—ভিতরে ভিতরে সে তাঁহাকেই প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিল—সে কথা পুরন্দরের অজানিত ছিল না। কিন্তু আজ দেশোদ্ধারের মহৎ আদর্শের জন্য পুরন্দর ক্ষত্রিয় সোমশঙ্করকে ব্রতী করিলেন। তিনি জানিতেন বাঁশরি সোমশঙ্করকে তাঁহার আদর্শের দিকে পৌছিতে দিবে না। এই নিদারুণ ঘটনার অভিঘাতে বাঁশরী ক্ষিতীশকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইল। ক্ষিতীশের প্রতি প্রেম বা অনুরাগবশত যে সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে তাহা নহে, কেবল আপন মনের ক্ষোভকে শমিত করিবার জন্য তাহার এই আত্মঘাতের

আয়োজন। এমন সময়ে সোমশঙ্করের সহিত বাঁশরীর সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত কথা বলিয়া বাঁশরী বুঝিল সোমশঙ্কর এখনো তাহাকে ভালোবাসে—কিন্তু সে ভালোবাসার দাহ নাই, তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম, মহৎ আদর্শ সফল করিবার জন্য সুষমাকে তাহার প্রয়োজন। কারণ সুষমা পুরন্দরের দ্বারা মহৎ আদর্শে দীক্ষিত, তাহার পক্ষে সোমশঙ্করের কঠিন ব্রতে সহায়ক হওয়া সম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে এইটেই 'বাঁশরি'র সঙ্গত ব্যাখ্যা মনে হয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে এই সব কথা ভাববার আছে: (১) চরিত্র বলতে যা বোঝায় এক বাঁশরি ভিন্ন আর কেউই এই নাটকে সেই সম্পদের অধিকারী হয় নি। সুষমা যে সুন্দরী তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তার চারপাশের লোকদের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে, কিন্তু তার বিদ্যার, বিশেষ করে বুদ্ধির, কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না—বরং বেশি করে পাওয়া যায় পুরন্দরের প্রভাবের দ্বারা সে যে আচ্ছন্ন সেই ব্যাপারটি। (২) রাজা সোমশঙ্করও তথৈবচ। সন্ন্যাসী পুরন্দর বলছে, সে, অর্থাৎ সোমশঙ্কর, এক মহাব্রতে দীক্ষিত হয়েছে যার জন্য কোনো ত্যাগই তার পক্ষে দুরূহ নয়। সোমশঙ্করের কথা এই গুরুবাক্যেরই প্রতিধ্বনি, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। (৩) সন্ন্যাসী পুরন্দর অবশ্য খুব ফলাও খ্যাতি প্রতিপত্তির অধিকারী, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে জাঁকালোই দেখায়—কবি বলেছেন ঠোঁটে রয়েছে তার অনুচ্চারিত অনুশাসন, কিন্তু কথাগুলো তার পরিচিত সুভাষিতের অতিরিক্ত কিছু নয়—ভক্তদের বিস্মিত করবার জন্য সে সব অবশ্য যথেষ্ট।

বাঁশরি অবশ্য খুব প্রাণবন্ত, সোমশঙ্করকে সে যে জীবনে লাভ করতে পারলে না সে জন্য তার অন্তর্দাহ প্রবল। সে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তাও সহজেই বোঝা যায়। সেই বাঁশরিও শেষ পর্যন্ত পুরন্দরের বাক্যে ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত হলো। কিন্তু একে সত্যকার ত্যাগ ব্রতে দীক্ষার দৃষ্টান্ত হিসাবে না দেখে "বিলিতি বাঙালি মহলে" "সন্ন্যাসী-বাবা"দের সম্মোহনের এক দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখলেই আসল ব্যাপারটি দেখা হবে মনে হয়।

কবি আদর্শবাদী নিঃসন্দেহ। কিন্তু বাস্তবের বোধ রহিত যে আদর্শবাদ তা কোনো দিন তাঁর সমর্থন পায় নি। কাজেই সন্ন্যাসী পুরন্দরের প্রচারিত বুলি সর্বস্ব আদর্শবাদকে কবির দৃষ্টিভঙ্গির তরফ থেকে বিদ্রূপাত্মক ভিন্ন আর কিছু ভাবা কঠিন।

নবীন লিখিয়ে ক্ষিতীশ কবির কঠিন বিদ্রূপের পাত্র হয়েছে। মানুষ হিসাবে তাকে খুবই খাটো করে আঁকা হয়েছে। সমসাময়িক অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে হয়ত এমন ধারণাই কবির হয়েছিল।

## বিচিত্রিতা

গ্রন্থ পরিচয়ে কবির বিচিত্রিতা কাব্যখানি সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

বিচিত্রিতা ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত একত্রিশখানি চিত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের একত্রিশটি কবিতা রচিত। গ্রন্থে কবিতার সহিত চিত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্র রচনাবলীতে চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই।

কবির অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আর যাঁদের আঁকা চিত্র এতে স্থান পেয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনয়নী দেবী প্রভৃতি। গ্রন্থ পরিচয়ে চিত্র ও চিত্রকর—সূচী দেওয়া হয়েছে।

এর উৎসর্গ পত্রের সূচনায় লেখা হয় : পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ। উৎসর্গ-পত্রটি রচনা করা হয় পদ্যে, তাঁর শেষ দুটি স্তবক এই :

চিরবালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহার তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালকজন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তার ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।

কবিতাগুলো যে চিন্তাপ্রধান তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা, সুস্পষ্ট বিষয় অবলম্বন করে সেসব লেখা। বিষয়গুলি কবিত্বপূর্ণ—তাই এই কাব্যের অনেক কবিতাই উপভোগ্য। তবে বিশিষ্ট কবিতার সংখ্যা এতে কম। 'স্যাকরা' কবিতাটি এর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা মনে হয়। গঠনের দিক দিয়ে কবিতাটি খুব লক্ষনীয়ঃ

কার লাগি এই গয়না গড়াও
যতন ভরে।
স্যাকরা বলে, একা আমার
প্রিয়ার তরে।
শুধাই তারে, প্রিয়া তোমার
কোথায় আছে।
স্যাকরা বলে, মনের ভিতর
বুকের কাছে।
আমি বলি, কিনে তো লয়
মহারাজাই।
স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে
আগে সাজাই।
আমি শুধাই, সোনা তোমার
ছোঁয় কবে সে।
স্যাকরা বলে, অলখ ছোঁওয়ায়
রূপ লভে সে।
শুধাই, এ কি একলা তারি
চরণ তলে।
স্যাকরা বলে, তারে দিলেই
পায় সকলে।

"তারে দিলেই পায় সকলে" কথাটি লক্ষণীয়। শিল্পে "বিশেষ" খুব অর্থপূর্ণ—ভালো শিল্পীর হাতে সেই "বিশেষ" সহজেই মেলে "বিশ্বে"র দ্যুতি।

শুধু চিন্তা নয় চিন্তার প্রকাশও এতে খুব বিশিষ্ট হয়েছে।

# 'চার অধ্যায়'

'চার অধ্যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালে।

'চার অধ্যায়ে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে যা বলেন তা নিয়ে খুব সমালোচনা হয়। সেই ভূমিকাটি 'চার অধ্যায়' গ্রন্থের অচ্ছেদ্য অংশ অবশ্য নয়, কিন্তু তা হলেও গুরুত্বপূর্ণ। সেটি এখন গ্রন্থ পরিচয়ে স্থান পেয়েছে। সেই ভূমিকাটির কিছু কিছু অংশ এই :

> একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচলা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।
>
> তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী।......
> শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।
>
> এমন সময়ে লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন।...... এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে মণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম সেই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন, 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয় তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই। নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

'চার অধ্যায়' উপন্যাসটির, বিশেষ করে তার ভূমিকায়; যেসব সমালোচনা হয় সে সম্পর্কে কবি বলেন:

আমার 'চার অধ্যায়' গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচোনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা সেটা রাষ্ট্র চেষ্টা আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এই জন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্য ভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্ত ভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি।

সেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যান বস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসার ও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক

সংরাগ আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

গল্পের উপক্রমনিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাব বিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুন। তা হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে কথা মানি।

বিভীষিকা পন্থার বা বিপ্লব পন্থার সঙ্গে মানবিকতার বিশেষ করে প্রেমিক প্রেমিকার জীবনের সহজ পরিণতির যে বিরোধ সেইটি 'চার অধ্যায়ে' আঁকা হয়েছে তীক্ষ্ণ রেখায়—তীব্র বেদনার রঙে। অন্তু বলছে, প্রেম বর্বর। সে বর্বরতা তাকে আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু বর্বরতার সঙ্গে তার অন্তর প্রকৃতির স্পষ্ট বিরোধও। সেই বিরোধ তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তেজস্বিনী এলা শেষের দিকে বিপত্তির বিচিত্র আঘাতে অনেকটা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ভেঙে পড়লেও তার জীবন ও চরিত্র আমাদের মনে দাগ কাটে।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে'র চাইতে 'চার অধ্যায়' শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বেশি শক্তিশালী। এর চরিত্রগুলো সহজেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

জ্ঞানগর্ভ উক্তিও এতে সুপ্রচুর। গায়ের জোরের দিক দিয়ে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে যে অসমকক্ষের লড়াই বেধে গিয়েছিল তার পরিণতি সম্বন্ধে অন্তুর মুখে কবির এই দুটি উক্তি অবিসম্মরণীয়।

…গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হ'য়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান

করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাজয়ের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশে যাব আমরা।

…তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো—আমি সেই পেট্রিয়ট নই; পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষ রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।

কবির আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ রয়েছে স্বাধীনতা লাভের পরে এতদিনেও সুসংহত জাতীয় জীবন গড়ে তোলায় আমাদের অক্ষমতা। অবশ্য ভগ্নোৎসাহ হলে চলবে না। সমস্যা যে কঠিন তাই বুঝতে হবে। আর এজন্য চাই একই সঙ্গে অবিচলিত সত্যদৃষ্টি, আশা আর কার্যোদ্যম।

এর ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিও খুব চোখে পড়বার মতো, শুধু তার অসাধারণ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও জ্ঞানবত্তার জন্য নয়, তার প্রতিপক্ষ ইংরেজের যা ভাল আর যা মন্দ দুয়েরই সম্বন্ধে তার ভাবাতিশয্যবর্জিত ধারণার জন্য।

বিভীষিকা-পন্থীদের সম্বন্ধে কবির দরদ আর বিভীষিকা পন্থা সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দুই-ই নিঃশেষে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর এই 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটিতেই, একথা বলা যেতে পারে।

# শেষ সপ্তক

'শেষ সপ্তক' প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের পঁচিশে বৈশাখে—কবির ৭৪ তম জন্মদিনে।

পুনশ্চের মতো এই কাব্যও গদ্যিকা রীতিতে লেখা। এতে অনেকখানি জায়গা দখল করেছে কবির পুরাতন স্মৃতি।

সুদূর চিরদিনই কবিকে মুগ্ধ করেছে। সেই সুদূর অনায়ত্ত অনন্ত কবির মনোযোগ কিছু বেশি আকর্ষণ করেছে এই কাব্যে।

কিন্তু এমন আকর্ষণ কাব্যের ক্ষেত্রে যে আশানুরূপ সুফল ফলাতে পারে না আমাদের সেই ধারণা আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। এমন অনুভবে কবি তৃপ্ত তা বুঝতে পারা যাচ্ছে, কিন্তু কবির সেই তৃপ্তি তেমন রূপ ধরে উঠতে পারছে না আমাদের সামনে।

এর তেত্রিশ নম্বর কবিতাটি 'কথা ও কাহিনী'র সুবিখ্যাত 'বন্দীবীরে'র সঙ্গে পঠনীয়। প্রায় একই বিষয় নিয়ে লেখা এই দুটি কবিতা! আর সেই বিষয়টি এক অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী—তাই সহজেই আমাদের মনোযোগ গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তবু এই দুটির মধ্যে বন্দীবীরের প্রতি আমাদের পক্ষপাত। শেষ সপ্তকের এই কবিতায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে শিখতরুণ বলছে :

…সত্যে আমার শেষ মুক্তি, আমি শিখ।

আর বন্দীবীরে বন্দার ছেলে বলছে :

গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়…।

বন্দীবীরের উক্তিতে শিখের শিখত্বের পরিচয় বেশি। দুটিতেই মহিমার স্পর্শ দিয়েছে অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগ। কিন্তু সেই সাহস ও আত্ম-ত্যাগের মহিমা বেশি ফুটেছে বন্দীবীরের সমৃদ্ধতর বাস্তবতার ভূমিকায়।

উপভোগ্য কবিতা ও চরণ এই কাব্যে সুপ্রচুর, কিন্তু বিশিষ্ট কবিতা এতে কম।

নিজের পরিচয় সম্বন্ধে ৪১ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন :

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মত না হ'ক
গিরিনদীর মতো।
আমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজো সে সংকোচ করে না।
.... .... ....
যারা আমার মুল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামি সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।
আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এস আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।

বলাবাহুল্য এটিও কবির একটি mood বিশেষভাবের মুহূর্ত, কেননা, এই কালেও শুধু চটুল তিনি নন, গম্ভীরও তিনি যথেষ্ট। তবে চটুলতায়, অন্য কথায় সহজ জীবনবোধে, তাঁর যে বিশেষ আনন্দ তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

## বীথিকা

'বীথিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের ভাদ্র মাসে।

এর প্রথম কবিতাটি, 'অতীতের ছায়া,' এক হিসাবে এর ভূমিকা। কবি বলছেন:

মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—
দিবালোক অবসানে তারালোক জ্বালি
ধ্যানে যেথা বসেছে সে
রূপহীন দেশে,
যেথা অস্তসূর্য হতে নিয়ে রক্তরাগ
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ
তার তুলি
ম্রিয়মান জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি,
নিমীলিত বসন্তের ক্লান্তগন্ধে যেখানে সে
গাঁথিয়া অদৃশ্যমালা পরিছে নিবিড় কালোকেশে;
যেখানে তাহার কণ্ঠহারে
দুলায়েছে সারে সারে
প্রাচীন শতাব্দীগুলি শান্ত চিত্তদহন বেদনা
মাণিক্যের কণা।
সেথা বসে আছি কাজ ভুলে
অস্তাচলমূলে
ছায়াবীথিকায়।

কবি বলছেন এই ছায়াবীথিকায়, গোধূলির ধূসর আবরণে, রূপময় বিশ্বধারা তাঁর চোখে অবলুপ্তপ্রায় হয়েছে। কিন্তু তিনি দেখছেন—

এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময় ;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন ;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল মাঝে তারি ফলশস্য ফলিছে নিয়ত।

অন্য কথায় জীবনের অন্তিমে কবি কর্মহীন হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সামনে উন্মুক্ত দেখছেন চিন্তা-জগৎ। সেই চিন্তা-জগৎ অশেষ সম্ভাবনাময়। জীবনে যত দুঃখ কবি সয়েছেন তার উত্তাপ বর্জিত হয়ে তিনি সেই চিন্তা-জগতে আপনার মনে মনে নানা মূর্তি গড়ে যাবেন এই আশায় যে অজানা ভবিষ্যতে তার কিছু না কিছু ফল প্রসূ হবে।

কিন্তু কবি যত অনাসক্তভাবে সবকিছু দেখতে চেয়েছেন তা পুরোপুরি সম্ভবপর হয়নি।

তাছাড়া কাব্যে অনাসক্তভাবে দেখার সত্যকার অর্থ কী? সংকীর্ণ অর্থের রাগ-দ্বেষ-বর্জিত হয়ে দেখা, কিন্তু মহৎ রাগদ্বেষ-বর্জিত হয়ে নয়। সেই মহৎ রাগদ্বেষের জন্য প্রয়োজনীয় যে জীবনের উত্তাপ তার কিছু অসদ্ভাব এইকালে কবিতে ঘটেছে। ফলে তাঁর একালের কবিতায় কখনো কখনো তীক্ষ্ণ বোধের দীপ্তি আমরা পাচ্ছি, কিন্তু চিত্ত-বিমোহন পূর্ণাঙ্গ মহৎ কবিতা পচ্ছিনা বল্লেই চলে।

প্রতিদিনের জীবনে মানুষের এক ধরণের পরিচয়, কিন্তু অনন্তের মধ্যে, 'অজানার তীরে,' তাকে দাঁড় করিয়ে দেখলে তাকে ভিন্ন কিছু, অপরূপ কিছু, বলে মনে হয়। এই কথা কবি বলেছেন কয়েকটি কবিতায়। 'দুই সখী' তার একটি।

কিন্তু 'দুই সখী'র পূর্ববর্তী 'বাধা' কবিতাটিতে কবি এঁকেছেন এর চাইতে পরিচিততর ছবি। নারী প্রিয়তমের কাছে আত্মনিবেদন করতে গিয়ে ব্যাহত হয়ে ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করতে চাচ্ছে; কিন্তু তার আত্মনিবেদন সত্যকার আত্মনিবেদন হয়ে উঠছে না—

পূর্ণ করি নারী তার জীবনের থালি
প্রিয়ের চরণে প্রেম নিঃশেষিয়া দিতে গেল ঢালি,
ব্যর্থ হল পথ খোঁজা,—
কহিল, "হে ভগবান, নিষ্ঠুর সে এ অর্ঘের বোঝা ;
আমার দিবস রাত্রি অসহ্য পেষণে
একান্ত পীড়িত আর্ত, তাই সান্ত্বনার অন্বেষণে
এসেছি তোমার দ্বারে ; এ প্রেম তুমিই লও প্রভু।"

যেমন তুষাররাশি গিরিশিরে লগ্ন রহে,
কিছুতে স্রোত না বহে,
আপন নিষ্ফল কঠিনতা
দেয় তারে ব্যথা,
তেমনি সে নারী
নিশ্চল হৃদয়ভারে ভারী
কেঁদে বলে, "কী ধনে আমার প্রেম দামী
সে যদি না বুঝেছিল, তুমি অন্তর্যামী,
তুমিও কি এরে চিনিবে না।
মানব জন্মের সব দেনা
শোধ করি লও প্রভু, আমার সর্বস্ব রত্ন নিয়ে।
তুমি যে প্রেমের লোভী মিথ্যা কথা কি এ।"
"লও লও" যত বলে খোলে না যে তার
হৃদয়ের দ্বার।
সারাদিন মন্দিরা বাজায়ে করে গান,
"লও তুমি লও, ভগবান।"

'দুই সখী'র সঙ্গে তুলনায় 'বাধা' আমাদের চোখে সার্থকতর কবিতা। কবিতায় ঘটে জানা ও অজানার মধ্যে সেতু বন্ধন'; কিন্তু সেই সেতুটি অপেক্ষাকৃত সুগম হওয়া চাই। অবশ্য কাকে বলা হবে সুগম, কাকে বলা হবে না, তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তর্ক এড়িয়ে সহজ বুদ্ধিতে যা বোঝা যায় তার কথা আমরা বলছি।

এর অপ্রকাশ কবিতাটিতে কবি চেয়েছেন নারীর অসংকোচ—সজ্জিত লজ্জার

খাঁচা থেকে মুক্তি। আর 'গরবিনী' কবিতায় গর্বিত আধুনিকরা কবির কঠিন তিরস্কার ভাজন হয়েছেন।

এর কয়েকটি কবিতায় পুরাতন সুখ-স্মৃতি কবির মুখ্য অবলম্বন হয়েছে। সে সবের হাল্‌কা ছন্দ লক্ষণীয়। কবির কয়েকটি সুপরিচিত গানও এতে স্থান পেয়েছে।

'ছুটির লেখা' কবিতাটিতে কবি তাঁর এই কালের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন :

এ লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার লাগি,
রিক্ত ঘরে একলা এযে দিন কাটাবার ;
আটপহুরে কাপড়টা তার ধূলায় দাগি,
বড়ো ঘরের নেমন্তন্নে নয় পাঠাবার।

আরো বলেছেন :

সব নিয়ে যে দেখলে তারে পায় যে দেখা,
বিশ্ব মাঝে ধুলার 'পরে অলজ্জিত,
নইলে সে তো মেঠো পথে নীরব একা
শিথিল পেল অনাদরে অসজ্জিত।

## পত্রপুট

'পত্রপুট' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের পঁচিশে বৈশাখে যে কবিতাটি থেকে এর নামকরণ হয়েছে তার কিছু কিছু অংশ এই :

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারিদিকে চিরকাল ধ'রে
আমি বনস্পতির এরা কিরণ পিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল।
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে
আলোকে তেজোরস,
নিহিত করেছে সেই অলক্ষ্য অপ্রজ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়
এই জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে।

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।
এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে,
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।
এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
প্রাণলীলার প্রথম ঐন্দ্রজাল আদিযুগের;
অনন্ত পুরাতনের আত্মবিলাস
নব নব যুগলের মায়ারূপের মধ্যে।
এরা স্পন্দিত হয়েছে পুরুষের জয়শঙ্খধ্বনিতে
মর্ত্যলোকে যার আবির্ভাব
মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্ঘারিত করবার জন্যে
দুর্দাম উদ্যমে,
জল-স্থল আকাশপথে দুর্গম জয়ের
স্পর্ধিত যার অধ্যবসায়।

কবির শেষ বয়সের গন্থিকা রীতি মিতভাষিনী হয়নি—এইটি এর একটি বড় দুর্বলতা মনে হয়।

'পত্রপুটে' কবির তিনটি বিখ্যাত কবিতা স্থান রেখেছে—পৃথিবী (৩নং কবিতা) 'অন্ত্যজ' বা ব্রাত্য (১৫নং কবিতা) আর 'আফ্রিকা' (১৬নং কবিতা)।

'পৃথিবী' কবিতাটির উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। পৃথিবীর আনন্দমূর্তি আর দুঃখমূর্তি দুয়েরই সঙ্গে কবির আকৈশোরের পরিচয়। কিন্তু এই কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর নির্মম দুঃখমূর্তি—জীবনের ব্যর্থতার মূর্তি—কবির চোখে প্রায় একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই কবিতাতে কবি বলেছেন:

জীবনের কোনো একটি ফলবান খণ্ডকে যদি জয় করে থাকি পরমদুঃখে····

ইত্যাদি।

কিন্তু জীবনের একান্ত ব্যর্থতার চিত্রই কবি এতে রূপায়িত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

'অন্ত্যজ' কবিতায় নিজেকে কবি বলেছেন অন্ত্যজ—ব্রাত্য—মন্ত্রবর্জিত,

কেননা জীবনে কোনো গুরু বা শাস্ত্র তাঁকে পরিচালিত করেনি,—এমন কি যাঁকে সকলে বলে ঈশ্বর তাঁরও পূজার সুর লাগেনি তাঁর কণ্ঠে :

শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
'তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয়নি আমার জীবনে।
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে,—

.... ... ... ...

সকল বেড়ার বাইরে,
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর জনার মিলন বিরহের ...
বেদনা বন্ধুর পথে।

তাহ লে কার পূজা তিনি সারা জীবন করেছেন ? কবি বলেছেন :

ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজার
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল,
এক সূর্য্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন ক্ষুধায় ফিরেছি,
সে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।

তারা বীর, তারা তপস্বী তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।

আর এর সঙ্গে তাঁর অন্তরে স্থান পেয়েছে ভালোবাসা যা আনন্দ দিয়েছে গতি দিয়েছে তাঁর জীবনে :

আমার ভালোবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে ;
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রী লোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে
সিসুগাছের কাঁপনলাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না বদল করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

অর্থাৎ ঈশ্বরের মরমী উপলব্ধি নয় তাঁর মানবিক উপলব্ধি আর প্রেমের মধুময় তেজোময় আকর্ষণ কবির মতে তাঁর জীবনের পাথেয় হয়েছে। বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক সাধনার সাফল্য সম্বন্ধে যে নৈরাশ্য কবির গীতিমাল্যেও গীতালিতে আমরা দেখেছি তা একটা চরম রূপ লাভ করেছে তাঁর পৃথিবী আর অন্ত্যজ কবিতায়।

কিন্তু আমরা কবির জীবনের অন্তিমে দেখব ঈশ্বর সম্বন্ধে মরমীবোধ তাঁর

অন্তরে প্রবল হয়েছে—সেই উপলব্ধির উপরেই একান্তভাবে তিনি নির্ভর করছেন।

'আফ্রিকা' কবিতাটিতে যুগে যুগে আফ্রিকার দুর্ভাগ্যের কথা সভ্য জাতিদের তার প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের কথা এক অসাধারণ বীর্যবন্ত ভাষা পেয়েছে—আফ্রিকার নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে যেন এক অপূর্ব দেবরোষ রূপলাভ করেছে কবির বাণীতে।

পত্রপুটের বারো নম্বর কবিতাটিও লক্ষণীয়। এক তীব্র আত্মধিক্কার এতে রূপ লাভ করেছে—কবি দেখেছেন "মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে যে উদ্ধার করে জীবনকে সেই রুদ্রমানবের আত্মপরিচয় বঞ্চিত ক্ষীণ পাণ্ডুর" তাঁর জীবন অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছে চলে।—সমসাময়িক কালের নানাভাবে বিপন্ন জাতীয় জীবন এবং তার সামনে তাঁর অনেকখানি অসহায়তা কবির এমন কঠিন আত্মধিক্কারের কারণ হয়ে থাকবে।

পত্রপুটের শেষ কবিতায় কবি বলেছেন—

> এইবার থামো তুমি :
>
> বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি
>
> যত উর্ধ্বে তোল তারো চেয়ে আরো উর্ধ্বে ধায়
>
> গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা।··· ··· ···· ···
>
> ···· ··· ····ভুলে গেছ নির্বাক দেবতা
>
> বেদীতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
>
> কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।
>
> ···········তোমার বীণার শত তারে
>
> মত্ততার নৃত্য ছিল এতক্ষণ ঝংকারে ঝংকারে
>
> বিরাম বিশ্রামহীন,—প্রত্যক্ষের জনতা তেয়াগি
>
> নেপথ্যে যাক সে চলে স্মরণের নির্জনের লাগি
>
> ল'য়ে তার গীত অবশেষ, কথিত বাণীর ধারা
>
> অসীমের অকথিত বাণীর সমুদ্রে হ'ক সারা।

# শ্যামলী

শ্যামলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসে।
এর খুব বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে 'আমি' :

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে এ যে তত্ত্ব কথা
' এ কবির বাণী নয় '
আমি বলব এ সত্য, '
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে!
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

.... ... ....

পণ্ডিত বলেছেন,—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার ;
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ;
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,...

সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে।
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর,"
"আমি ভালোবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে।
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন "বলো, আমি ভালোবাসি ?"

মানুষ ও ভগবানের এই সম্পর্কের কথা কবি বারবার বলেছেন।

শ্যামলীতে কবির চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও দীপ্তি বেশ চোখে পড়ে। এর 'অমৃত' কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে নারীকে যে প্রণয়ী জাগাতে চাইলে ভালোবাসা আর বিত্ত দিয়ে সে তাকে জাগাতে পারলে না; তাকে জাগাতে পারলে সে যে তাকে আহ্বান করলে দুঃসাধ্যের সাধনে।

# খাপছাড়া ও ছড়ার ছবি

খাপছাড়া প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের মাঘ মাসে। কবি নিজেই বহু রঙিন ছবিতে ও রেখাচিত্রে এটি চিত্রিত করেছিলেন।

ছড়ার ছবি বেরোয় ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে। এটি চিত্রিত করেছিলেন নন্দলাল বসু।

খাপছাড়া উৎসর্গ করা হয় রাজশেখর বসুকে। উৎসর্গ পত্রে কবি বলেন—

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের,
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে সিদ্ধের।

.. ...

যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক।

তাহলে জিজ্ঞাসা করবো—
.. বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবীভূতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।

খাপছাড়া থেকে আমরা দুটি কবিতা উদ্ধৃত করছি:

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গালপাট্টা।

শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে
বর হেসে কয়—'ঠাট্টা'।

আধা রাতে গলা ছেড়ে
মেতেছিনু কাব্যে,
ভাবিনি পাড়ার লোকে
মনেতে কী ভাববে।
ঠেলা দেয় জানলায়,
শেষে দ্বার ভাঙাভাঙি,
ঘরে ঢুকে দলে দলে
মহা চোখ রাঙারাঙি—
শ্রাব্য আমার ডোবে
ওদেরই অশ্রাব্যে।
আমি শুধু করেছিনু
সামান্য ভনিতাই
সামলাতে পারল না
অরসিক জনে তাই—
কে জানিত অধৈর্য
মোর পিঠে নাববে।

ছড়ার ছবির ভূমিকায় কবি লেখেন:

এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়।

রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলে-মেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষায় ঘরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল-এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গীতে এর সজ্জার কাব্য-সৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ার গভীর কথা হালকা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।···

·······ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে যারা পদাতিক, যারা রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে ঘাটে যাবার পায়ে চলার চিহ্ন ধুলোর উপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়। এর 'যোগীনদা' ছড়াটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হচ্ছে :

যোগীনদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইল খাঁয়ে,
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে।
বেড়িয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
"জুলুম তোদের সইব না আর" হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ঐ ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, "কোথায় টুনু, কোথায় গেল খোঁকি।"
"ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষ্মীছাড়া"
হাঁক দিয়ে তাঁর ভারি গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।
চারিদিকে তাঁর ছোটো বড়ো জুটত যত লোভী
কেউ বা পেত মার্বেল, কেউ গণেশ মার্কা ছবি।···

আপনসৃষ্টি নাতনিও তাঁর ছিল অনেকগুলি,
পাগলি ছিল, পটলি ছিল, আর ছিল জঙ্ঘুঁলি।
কেয়া-খয়ের এনে দিত, দিত কাসুন্দিও,
মায়ের হাতের জারকলেবু খোগীনদাদার প্রিয়

তখনো তাঁর শক্ত ছিল মুগুর ভাঁজা দেহ,
বয়স যে ষাট পেরিয়ে গেছে বুঝত না তা কেহ।
ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বলে,
মুখ যেন তাঁর পাকা আমটি, হয়নি সে থল্‌থলে।
চওড়া কপাল, সামনে মাথায় বিরল চুলের টাক,
গোঁফ জোড়াটার খ্যাতি ছিল, তাই নিয়ে তাঁর জাঁক

# প্রান্তিক

প্রান্তিক প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসে।

কবি ১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও এক সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হন। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্যলাভ করেন এবং 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছড়ার ছবির' ভূমিকা লেখেন। প্রান্তিকের প্রথম কবিতাটি তিনি লেখেন ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত লেখা প্রান্তিকের তেরোটি কবিতায় কবি রূপ দিতে চেষ্টা করেন এই মৃত্যুপথ-যাত্রায় তাঁর যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই সব। বলা বাহুল্য সেই অ-সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা অন্যের পক্ষে বোঝা সুসাধ্য নয় আদৌ।

প্রথম কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে এই অসুস্থতার সময়ে কবি তাঁর চিত্তাকাশে একই সঙ্গে আলোক আর আঁধারের সঞ্চার অনুভব করেন ঃ

গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদী পথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায়—সেইমতো জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তঃশীলা
জ্যোতিধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঁধার অনেকটা পথ ছেড়ে দিলে। কবি লিখছেন:

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সুক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

২নং ও ৩নং কবিতা ২৯।৯।৩৭ তারিখে লেখা। ২ নম্বর কবিতায় কবি চেয়েছেন মরণের প্রসাদবহ্নিতে যত কামনার আবর্জনা, ক্ষুধিত অহমিকার উঞ্ছবৃত্তি—সঞ্চিত জঞ্জাল, সব দগ্ধ হয়ে যাক, আর আলোকের দানে ধন্য হোক। ৩ নম্বর কবিতায় তিনি অনুভব করেন—

অকস্মাৎ মহা—একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতা
মাঝে মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই
লজ্জা শুধু যেথা সেথা যার তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।

কবি বুঝলেন—

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরোচিতে হবে
নূতন জীবনছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

৪ নম্বর কবিতায় (এটি লেখা ১।১০।৩৭ তারিখে) কবি বলছেন, তাঁর জীবনের যে জ্যোতির্ময় আদিমূল্য, সংসারের বিচিত্র প্রলেপে, বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে সেই প্রথম রূপ তাঁর জীবনে লুপ্ত প্রায় হয়েছে ; এই কালে কবি উপলব্ধি করেন :

প'রের মুখের মূল্য হতে মুক্ত, সব চিহ্ন মোছা
অসজ্জিত আদিকৌলীন্যের শান্ত পরিচয় বহি
যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সংগীত মন্দিরে
একাকীর একতারা হাতে। ......................
..........যে-প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয়হুংকারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙা পরম বিস্ময়ে
শুকতারানিমন্ত্রিত আলোকের উৎসব প্রাঙ্গণে।

৫ নম্বর ও ৬ নম্বর কবিতা লেখা হয় ৪।১০।৩৭ তারিখে। ৫ নম্বর কবিতায় কবির এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে:

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসর পাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।

৬নং কবিতায় কবি নূতন আগ্রহে বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি বলতে যা বোঝায় তার সহজ উপলব্ধিই মুক্তি। সংসারের কাছে তিনি এই প্রার্থনা জানিয়েছেন:

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও, পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

৭ নম্বর কবিতায় (এটি লেখা ৭।১০।৩৭ তারিখে) কবি নতুন উদ্দীপনায় বলেছেন :

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম জাগা পাখি
যে-সুরে ঘোষণা করে আপনাতে আনন্দ আপন।

নানাভাবে দুঃখ, বঞ্চনা, অযাচিত প্রেমের অমৃতরস, তাঁর জীবনে লাভ হয়েছে, কিন্তু সব মিলে তাঁর জীবন ধন্য হয়েছে।

কল্পনায়
বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যের ছলনায়, জয়ে পরাজয়ে
[illegible]

প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টিরহস্যের
যে-প্রকাশ পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্‌বারিত
আমার জীবন রচনায়, তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণ ক্ষণে
অপরূপ অনির্বাচনীয়।

কবি তাঁর জীবনকে বলছেন :

হে জীবন অস্তিত্বের সারথি আমার,
বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার, আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয় যাত্রায়।

৮ নম্বর কবিতা লেখা হয় ৯।১০।৩৭ তারিখে। তাতে কবি তাঁর এই কালের দশা বিবৃত করেছেন এই ভাবে :

এতকাল
যে-সাজে রচিয়াছিনু আপনার নাট্য পরিচয়

… …চিহ্নিত করিয়াছিনু আপনারে
নানা চিহ্নে, নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে,
মুছিল তা, আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা
আমারে করিল স্তব্ধ, সূর্যাস্তের অন্তিম সৎকারে
দিনান্তের শূন্যতায় ধরার বিচিত্র চিত্রলেখা
যখন প্রচ্ছন্ন হয়, বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে।

৯ নম্বর কবিতা লেখা হয় ৮।১২।৩৭ তারিখে। ৮ নম্বর কবিতায় কবির যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে, ৯ নম্বর কবিতায় প্রায় সেই ধরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে—

এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

১০ নম্বর কবিতা লেখা হয় ৮।১২।৩৭ তারিখে। বলা যেতে পারে এই যাত্রায় কবির বিশিষ্টতম অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতাটিতে। কবি বলেছেন, মৃত্যু দূত যখন অকস্মাৎ এসে তাঁকে প্রলয়ংকরের বিরাট প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন—আলোকের দেখা পান নি :

দেখি নি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি, দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া।

যদিও আলোকের জন্যই ছিল তাঁর জীবন ব্যাপী অন্তরতম কামনা :

সেই আলোকের
সামগান মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের কবিত্ব মর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে এরি লাগি সেধেছিনু তান।

কবির ধারণা তিনি যে মৃত্যুপথ থেকে ফিরে এলেন তার কারণ—

বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি,

কিন্তু কবি অন্তরে এই আশা পোষণ করছেন—

আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘডালি পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।

১১ ও ১২ নম্বর কবিতা ১৮।১২।৩৭ তারিখে লেখা। আর ১৩ নম্বর কবিতা ১৮।১২।৩৭ তারিখে লেখা। এই কবিতাগুলোয় কবির মুখ্য বক্তব্য এই :

শেষের অবগাহন সাঙ্গ করো কবি, প্রদোষের
নির্মল তিমিরতলে। ভৃতি তব সেবার শ্রমের
সংসার যা দিয়েছিল আঁকড়িয়া রাখিয়ো না বুকে ;
এক প্রহরের মূল্য আরেক প্রহরে ফিরে নিতে
কুণ্ঠা কভু নাহি তার ; বাহির-দ্বারের দক্ষিণা
অন্তরে নিয়ো না টেনে··· ··· ··· ··· ···· ···
··· ·· ··· ··· ···· ফল যদি ফলায়েছ বনে
মাটিতে ফেলিয়া তার হক অবসান।··· ··· ···
···· ···জীবনের যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে ; এ জনমে
শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।

কবির পরম অবলম্বন হয়েছে এই উপলব্ধি :

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়,
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে-আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে ; দূর যুগান্তর হতে
মহাকালযাত্রী মহাবাণী পুণ্যমুহূর্তেরে তব
শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান ; তোমার সম্মুখদিকে
আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।

এর ১৪ ও ১৫ নম্বর কবিতা কয়েক বৎসর পূর্বের লেখা। দুটিই উপভোগ্য কবিতা। ১৫ নম্বর কবিতায় কবি উল্লসিত হয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই কালের অবসন্ন চেতনার সামনে শরৎ কী অভিনব আনন্দমূর্তি নিয়ে এসেছে :

পল্লবে-পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে,
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
.......চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

১৬ নম্বর কবিতাও কয়েক বৎসর আগেকার লেখা। এতে কবি বর্ণনা করেছেন, যুগে যুগে কত কীর্তি ধূলিলীন হয়েছে—কিন্তু তবু এই অনিত্যের বুকে বসে তিনি অনুভব করছেন—

অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

১৭ নম্বর কবিতাটি লেখা হয় ২৫।১২।৩৭ তারিখে। প্রলয়ংকর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া পুরোপুরিই এর উপরে পড়েছে। একান্ত ক্ষোভে কবি বলেছেন :

মহাকালসিংহাসনে—
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও ; শক্তি দাও মোরে ;
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিৎ বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে না স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠে ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

প্রান্তিকের ১৮ নম্বর বা শেষ কবিতাটিও লেখা হয় ২৭।১২।৩৭ তারিখে। এটি সুপ্রসিদ্ধ—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে, কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত (১৯৩৭?) বর্ষামঙ্গলের এক পাণ্ডুলিপিতেও কবির এই ভাব ব্যক্ত হয়।

'দানবদের' বিরুদ্ধে কি ধরণের প্রস্তুতির কথা কবি ভেবেছিলেন? অহিংস না সহিংস?

হয়তো অনমনীয় সংকল্প গ্রহণের কথাই কবি মুখ্যত ভেবেছিলেন।

## সেঁজুতি

সেঁজুতি (সাঁজবাতি) প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসে।

প্রকাশনার দিক দিয়ে এটি প্রান্তিকের পরবর্তী। কিন্তু এর 'জন্মদিন', 'মায়া' ও 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই তিনটি কবিতা ভিন্ন আর সব কবিতাই প্রান্তিকের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর, অর্থাৎ কবির সংকটাপন্ন রোগ ভোগের পরে রচিত কবিতাগুলোর পুর্ববর্তী।

এর 'জন্মদিন' কবিতাটি প্রান্তিকের সুরে বাঁধা। এমন কি আত্ম-প্রত্যয়ের সুর এই কবিতায় প্রবলতর :

ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে, তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লানস্পর্শ লেগে,
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পরপারে।

বিশ্ব প্রকৃতির, মাটির ফলজল পত্রপুষ্পের, আনন্দরূপে কবির গভীর সন্তোষ—বলা যেতে পারে এই সেঁজুতিরও প্রধান সুর :

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা—
ঐখানে মোর বাসা
সে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ঐ মন্ত্র পড়ে দক্ষিনে বাতাস।

অথবা

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

এর 'তীর্থযাত্রিণী' কবিতাটিতে বৃদ্ধাস্খলিতশক্তি তীর্থযাত্রিণীর জীবনের ব্যর্থতার ছবি বড়ো করুণ করে আঁকা হয়েছে। এইকালে কবি আত্ম-প্রত্যয়ের কথা উদ্দীপনার সঙ্গে বলেছেন আবার কখনো কখনো ব্যর্থতার ছবিও এঁকেছেন।

এর ১৩৪৪ সালের ২২ বৈশাখে লেখা 'জন্মদিন' কবিতাটি খুব উপভোগ্য। ব্যাপক খ্যাতির কৌতুককর বিড়ম্বনা আর প্রকৃতির সহজ চিত্ত-বিমোহন আবেদন দুই-ই উপভোগ্য রূপ পেয়েছে এতে :

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো তাদের দলে লও এ মানুষটাকে।
সজনে পাতার মতো যাদের হালকা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

... ... ...

ভোরবেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে
ঠেকল যখন সবপ্রথমের চেনাশোনার দেশে,
নামল ঘাটে যখন তারে সাজ রাখেনি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগল আকাশ থেকে—
যেমন করে লাগে তরীর পালে
যেমন লাগে অশোকগাছের কচি পাতার ডালে।

নাম-ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুল শাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।

এর 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, মহাতপস্বী মহাকাল এক অভাবিত কল্পনাতীত আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছে :

যার পরিচয় কারো মনে নাই,
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
তারি সত্যের অপরূপ রসে
চমকিবে মন অদ্ভুত পরশে,
মৃত পুরাতন জড় আবরণ
মুহূর্তে যাবে ভাগি,
যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

এটি কবির বৃদ্ধবয়সের একটি বিশিষ্ট চিন্তা। তাঁর 'মানুষের ধর্মে' 'ঐ মহামানব আসে' শীর্ষক কবিতাটিতে এইভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এর 'নিঃশেষ' কবিতাটিতে কবি তাঁর নিঃশেষিত শক্তি বৃদ্ধকালের এই ছবি এঁকেছেন :

শরৎবেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণ বেগ ;
ক্লান্তি আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
অঞ্জলি তব বৃথা তুলিয়াছ যে তরুণী বনভূমি।
শান্ত হয়েছে দিকহারা তার ঝড়ের মত্ত লীলা,
বিদ্যুৎপ্রিয়া স্মৃতির গভীরে হল অন্তঃশীলা।
... ... ... ..
তবু যদি চাও শেষদান তার পেতে,
ঐ দেখো ভরা খেতে

পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষ তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে।
সে কথা স্মরিয়ো, চলে যেতে দিয়ো তারে,
লজ্জা দিয়ো না নিঃস্ব দিনের নিঠুর রিক্ততারে।

## শাপ মোচন

'শাপমোচন' কবিতা আকারে পুনশ্চে প্রকাশিত হয়। এটি এর বর্তমান নাট্যরূপ পায় ১৩৩৯ সালের চৈত্রে।

এর ভূমিকায় কবি বলেছেন :

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।

১৯৩৪ সালের অক্টোবরে এটি মাদ্রাজে যেভাবে অভিনীত হয় তাতে আরও অনেক নতুন গান সংযোজিত হয়েছিল।

বহু সুন্দর গান এর উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে; কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসাবে রাজা'র মূল্য এর চাইতে বেশি।

## চণ্ডালিকা

'চণ্ডালিকা' নাটিকাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে। এর ভূমিকায় কবি লেখেন :

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।

গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথপিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালাল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধ মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালীর বশীকরণ বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

মূল উপন্যাসে আরও আছে :

রাত্রে এইভাবে বিফল মনোরথ হয়ে প্রকৃতি পরদিন ভোরে উঠে তার ভালো কাপড় যা ছিল পরে আনন্দের ভিক্ষায় যাবার পথের পাশে দাঁড়াল। ব্যাপার দেখে লোকেরা নিন্দা করতে লাগল। আনন্দ পালিয়ে এলেন আশ্রমে এসে ব্যাপারটি প্রভু বুদ্ধের কাছে বিবৃত করলেন। প্রকৃতিও তাঁর পিছনে পিছনে এসে হাজির হয়েছিল। বুদ্ধদেব প্রকৃতিকে বললেন, তুমি আনন্দকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে তোমার বাপমায়ের অনুমতি নিয়ে এসো। প্রকৃতি বাপমায়ের অনুমতি নিয়ে এলো। তখন প্রভু বুদ্ধ বললেন তুমি যদি আনন্দকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তো আনন্দের মতো গৈরিক বসন তোমাকে পরতে হবে। প্রকৃতি রাজী হলো। এর পর তার মস্তক মুণ্ডন করে তাকে গৈরিক বসন পরানো হলো আর সর্বদুর্গতি শোধনকারিণী মন্ত্রের দ্বারা তার সব পাপ প্রবৃত্তি দূরীভূত করা হলো। এই ভাবে সে হলো ভিক্ষুণী। (গ্রন্থ পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

এই নাটকে প্রকৃতি, প্রকৃতির মা, বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ, বে ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বে

চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যে তা কমই চোখে পড়ে ; কেন না প্রবৃত্তির উদ্দামতা চিত্রিত করতে তিনি যথেষ্ট অনিচ্ছুক। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই ব্যাপারটা কিছু বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে এই ধারণাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

তবে প্রবৃত্তির উদ্দামতা যা এতে চিত্রিত হয়েছে তা প্রধানত আভাসে ইঙ্গিতেই।

এই নাটকের বড়ো সম্পদ, 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা,' 'ফুল বলে ধন্য আমি' 'দোষী করো দোষী করো'—শীর্ষক কয়েকটি গান।

গান রচনায় কবির শক্তি এইকালেও যে অম্লান ছিল 'চণ্ডালিকা তার পর্যাপ্ত পরিচয় বহন করেছে।

এটি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয় চার বৎসর পরে।

# বিশ্ব পরিচয়

'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থাকারে বেরোয় ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে।

এর দীর্ঘ উৎসর্গ-পত্রে (গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।) কবি যা লেখেন তার কিছু কিছু অংশ এই :

> শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথমপরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি।
>
> ... ... ... ... ...
>
> আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর ; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত (ঘোষ) মহাশয়। আমি জানি তার পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দুই একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত। ... ... ....

তারপর বয়স তখন হয়তো বারো হবে ··· ··· পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষ-চক্রের দূরত্বমাত্রা প্রদক্ষিনের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তার পরে বয়স আরও বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাজে বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছ্র তার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষালাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয়। তার সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। ····

···· কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়। যখন ক্লাশে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্যসাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিই নি, হিসাবের বাইরেও তারা এক রকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এইরকম পড়ে যাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে। ···· ··· ···

······জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার

প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে। ……… … পাণ্ডিত্য বেশি নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম ক'রে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী নিছক ভোগ করবার নয় তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞানের গভীরতা নয় অনুরাগও যে এক মহা সম্পদ করিব এই কথা বহুমূল্য।

বিশ্বপরিচয় খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

# কালান্তর

কালান্তর প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখে।

এই প্রবন্ধ সংগ্রহের অনেকগুলো লেখা সবুজ পত্রের যুগের। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত লেখাও এতে স্থান পেয়েছে। কবির শেষ বয়সের সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তার একটি বড় সংগ্রহ এই গ্রন্থটি। এর লেখাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথম প্রবন্ধ কালান্তর ১৩৪০ সালে লেখা। ভারতে—অথবা জগতে—সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে একটা কালান্তরের অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ও রুচির সূচনা হয়েছে তারই চিত্র কবি এতে এঁকেছেন। সেই ছবিটি আঁকতে গিয়ে স্বভাবতই ভারতের অতীত যুগ বা পরম্পরাগত জীবনধারা, মুসলমান যুগ, ইংরেজ যুগ, সবেরই কথা এসে পড়েছে। অতীত ও মুসলমান যুগের কথা কবি অবশ্য বলেছেন সংক্ষেপে কেন না তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য বর্তমান অর্থাৎ ইংরেজের আমলে ভারতের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেইটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। ভারতের অতীত বা পরম্পরাগত মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

> ······যে জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মানকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল।

ভারতে আগত মুসলমানদের সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে

সংঘর্ষ বাহ্য এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা মতের।

অবশ্য ভারতের প্রাচীন ভাবধারা ও মুসলমান যুগ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার আছে—যেমন প্রাচীন ভারতে বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধমত দেখা দিয়েছিল আর মুসলমানদের যুক্তিবাদ রামমোহনের প্রতিভার লালনের সহায় হয়েছিল—তবে সে সমস্ত প্রভাব অতিক্রম করে চিন্তা ও আচারের ক্ষেত্রে একটা স্থবির ও অনড় মনোভাবই যে দেশের সমাজে দেখা দিয়েছিল কবির এই উক্তি যথার্থ বলেই স্বীকার করতে হবে।

আমাদের এই অনেকটা অনড় মনোভাবের প্রভাব কি ধরনের হলো সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

যদিও আমাদের চারিদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে—আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ। মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে যা অহেতুক আগ্রহে নিকটতম দূরতম অনুতম বৃহত্তম প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান, সমস্তকেই অধিকার করতে চায়, এইটে দেখিয়েছে যে জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও ফাঁক নেই সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

শুধু বিশ্ব জগতের প্রতি একটা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, মানুষের অধিকার সম্বন্ধেও সে নতুন চেষ্টা এই প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে সূচিত হলো—সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

……নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধে পংক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোনো মুনি-ঋষির অনুশাসন ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিশেষ সৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারাযোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমদের চিন্তায় ও ব্যবহারে

রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

সেই সামনে চলার তাগিদ ও উদ্দীপনা খুব নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' লেখাটিতে। কবি শ্লেষের ব্যবহারও এতে যথেষ্ট করেছেন। এর উপসংহারে কবি বলেছেন :

…………যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমর গুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।

নবপর্যায় বঙ্গ দর্শনের যুগে প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরব ঘোষণা থেকে কবির এ অনেক দূর সরে আসা।

'লোকহিত' লেখাটিতে কবির মুখ্য বক্তব্য : নিম্ন শ্রেণীয়দের শক্তিশালী করাই আসল কাজ, তাতেই তাদের অসম্মান ঘোচানো যাবে, তাদের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। তাদের শক্তিশালী করার সত্যকার পথ হচ্ছে—

…………তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

জনসাধারণকে লিখতে পড়তে শেখানো আজও খুব প্রয়োজনীয় কাজ জ্ঞান করা হয়, কিন্তু তারও চাইতে বেশী মূল্যদেওয়া হয় তাদের শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রতিবিধান করার কাজকে।

'লড়াইয়ের মূল' লেখাটিতে কবির বক্তব্যের চুম্বক এই :

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—এই কারণে তখনকার মত কিছু শাস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোটে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

..........এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহের দিনরাত আমদানি রপতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছে। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকী নাই। এখন রাগে তার শরীর গসগস করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

.........আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাবেই—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতি প্রচার হয় য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মন-পণ্ডিত যে তত্ত্ব আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে।

'ছোটো ও বড়ো' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। ১৩২৪ সালের প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল।

এতে ইংরেজ শাসকদের তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন—ছোটো ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ। ইংলণ্ডে যে ইংরেজদের বাস, তার ঐতিহ্যে যারা লালিত সেই ঐতিহ্যের দ্বারা যারা অনুপ্রাণিত তাদের তিনি বলেছেন বড়ো ইংরেজ আর যে ইংরেজের বাস ভারতবর্ষে, দীর্ঘ দিন সেখানে কাটিয়ে নানা অভিজ্ঞতার ফলে সংকীর্ণ দৃষ্টির ও কড়া মেজাজের অধিকারী হয়েছে, তাদের তিনি বলেছেন ছোটো ইংরেজ। কবির মূল বক্তব্য এই :

.......বড়ো ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার

রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। যে সৃজনধর্মী, য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিন্তাকে প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সুযোগ পাইল। সে দেখিল অপমানিত মনুষ্যত্বের প্রতিকূলে স্বাজাত্যের আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্যোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যহ বুঝিতেছে যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইজন্য তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন রুদ্র তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি নাও বঝিয়া থাকে একদিন সে বুঝিবেই,....

কিন্তু ছোটো ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আরেক পিঠে আমোদ। যে পিঠে আপিস সে পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে পিঠে আমোদ সে পিঠটা চাঁদের পশ্চাদ্দিকের মতো বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর রুটিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ী লোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে।

ছোটো ইংরেজ যে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে নানা জটিল বাধার সৃষ্টি করে চলবে কবির এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে।

বড়ো ইংরেজ সম্বন্ধে কবির শ্রদ্ধা তাঁর শেষ জীবনে যে অনেক পরিমাণে বিচলিত হয়েছিল 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তার পরিচয় আমরা পাব।

বিভীষিকা-পন্থা পরে যে অবাঞ্ছিত রূপ নেয় কবি সেজন্যও তাঁর গভীর বেদনা ব্যক্ত করেছেন।

উপসংহারে কবি বলেছেন ;

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি

যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া ভয় পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া ভয় দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তার জিত হইবে না, যে মরিতে পারিবে তারই জয় হইবে। সেদিন দুঃখ দেয় যে মানুষ তার পরাভব হইবে, দুঃখ পায় যে মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আত্মার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার ভার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অনুগ্রহের উপরে হইবে না।

জগতের সভ্য জাতিদের চিন্তা-ভাবনা কবির আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি থেকে আজও অবশ্য বহু দূরে। তবে যুদ্ধের দ্বারা যে কোনো স্থায়ী সুফল লাভ হয় না এ বিষয়ে অনেকে সচেতন হয়েছে।

'বাতায়নিকের পত্র' নামের লেখাগুলোয় চণ্ডী পূজা সম্পর্কে কবি এই মন্তব্য করেন যে তাতে শুভ সাধনের শক্তির নয় খামখেয়ালী শক্তির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। কবির এই মন্তব্যের প্রতিবাদ হয়। তার উত্তরে 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে কবি বলেন :

> ………সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উলঙ্গ নিদারুণতার ভাব নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে—'বাতায়নিকের পত্রে' আমি তারই উল্লেখ করেছি।
>
> কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন কি, ভূমিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়।—
>
> স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

কালান্তরের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন, 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা', 'সমাধান', 'চরকা', 'স্বরাজ সাধন', মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে লেখা। মহাত্মাজীর যে প্রধান নির্দেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তির

জন্য দেশের সবাইকে চরকা কাটতে হবে, বিদেশী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলে জাতির আত্মশুদ্ধি সাধন করতে হবে, এই সবকে কবি জ্ঞান করেন অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং দেশের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর। কবির সুবিখ্যাত 'সত্যের আহ্বান' থেকে তার কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি :

……সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্টক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ড ক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না।……

……পোলিটিক্যাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিক্যাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে, এর পিছনে দেশ বলে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আরেক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি করাত এবং কলকব্জা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা অনেক সাধনা অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ দেখেছি সে বাহ্যত স্বাধীন, কিন্তু পোলিটিক্যাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে, তখন তার ঝড়ঝড় মড়মড় শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ঝাঁকনির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়ি-দড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক স্ক্রু আলগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ গাড়িও গাড়ি, কিন্তু যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিত মতো ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো একটা প্রবৃত্তির বাহুবন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্যে তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে। এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেঁকসই জিনিস। অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত: এই গড়াপেটার কাজটাই কি সবচেয়ে দরকার নয়?……

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো একটা বাহ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ পূর্বেই বলেছি মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না, তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অন্তঃকরণে—সেই অন্তঃকরণের কাছে তার পূরো দাবি, জড় অভ্যাসপরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি, চিন্তা করো না, কর্ম করো তাহ'লে যে মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। ......

.......অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এইরকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়, কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম" এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না।......

.. ....স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, মন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। ·.····

......বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আহ্বানে কর্মের সুবিধার জন্য নিজেকে ক্লীব করে দিলে, আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উল্টো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা

কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্ম-প্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করতে পারে।.......

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাইনে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে। যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়। স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধা শক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে।.......

......যে কলের দৌরাত্ম্যে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত, মহাত্মাজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধবাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্য ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ পাব।

শুধু দেশের বহুকালের চিত্তের বন্ধনের মুক্তির দিকটা নয়, একটা নতুন আন্তর্জাতিক সম্ভাবনার কথাও কবি ভাবছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই :

......কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারতরাষ্ট্রশাসনে একটা মূল-নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসমস্যাকে বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে—যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্যায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব করেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।... ... ... আজ এই বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোন প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন

কোন বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছিনে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমারা ছেড়ে দেব। সকালবেলার পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার দুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিত্ত আমাদের চিত্তে তার ডাক পাঠিয়েছে, আমাদের চিত্ত আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক—কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ।.......

'সমস্যা' প্রবন্ধটিতে কবি সবিস্তারে বলতে চেষ্টা করেছেন আমাদের জাতীয় জীবনে শতধা বিচ্ছিন্নতা কি মারাত্মকভাবে প্রকট হয়ে আছে। কবির উক্তির একটি অংশ এই :

......কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে, যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া, যার ডান-চোখে বাঁ চোখে ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায় ; যার তর্জনীটা কড়ে আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয় ; যার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অন্য দেহটা জুতো জামা 'পরে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মতো জুতো-জামা-লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ ক'রে দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে।

আমাদের এই বহুকালের দুর্গতির জন্য মুখ্যত দায়ী আমাদের অবুদ্ধি এই

কবির মত—

······বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্ন কালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে।···· ···· ···· ···· সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে—সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরে থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য ······আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। ···· ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে, য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।

'সমাধান' প্রবন্ধে কবি বলেছেন ঃ

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত ব'লে ঠেকে যে এ'কে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস, বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।

মহাত্মাজির সঙ্গে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যে কেনো কোনো ক্ষেত্রে বড় রকমের সে সম্বন্ধে তিনি 'চরকা' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

যে-কারণ ভিতরে থাকতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনীষীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি, অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃ প্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল।

কবির প্রতিবাদ যে খুব অর্থপূর্ণ ছিল স্বরাজ লাভের পরেও আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতায় তা প্রমাণিত হয়েছে। তবে তৎসাময়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

সাধন ভিন্ন আরো যে একটি বড় ভূমিকা চরকায় ছিল—অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভে চরকার বা বিকেন্দ্রী কৃত উৎপাদন-শক্তির ভূমিকা—তার দিকে কবির দৃষ্টি সেদিন তেমন আকৃষ্ট হয় নি। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন একালের মহাকায় ও মহাশক্তি রাষ্ট্রের দিনে একটি বড় প্রশ্ন।†

কালান্তরের প্রথম প্রবন্ধটিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কবি বলেছেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই দলই অনড় ধর্মমত ও আচারের দ্বারা চালিত। এই সমস্যার সমাধান কিসে সে সম্বন্ধে তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' লেখাটিতে বলেছেন :

> মনের পরিবর্তনের, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দু-মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে-অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনোরকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে - ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাই বদলে ফেলতে হবে তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই, কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা-মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব ; যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনো যোগ্য মীমাংসা না হওয়াতে দেশ বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এই বিভক্ত অংশদ্বয়ের মধ্যে আজও কোনো সত্যকার সমঝোথা দেখা দেয়নি।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম-সম্পর্কিত অনড়ভাব কিছু কিছু বদলে চলেছে। কিন্তু কবি যাকে বলেছেন শুভবুদ্ধি পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে আজও তা লক্ষনীয়ভাবে অনুপস্থিত। কালে হয়ত এই অবস্থারও উন্নতি হবে! কিন্তু শুধু কালের উপরে নির্ভর না করে এর জন্য

† দ্রঃ 'ব্যক্তির স্বাধীনতা'—শাশ্বত বঙ্গ।

হিন্দু ও মুসলমান দুই দলেরই যোগ্যভাবে সচেষ্ট হওয়া সমীচীন। কিন্তু সেইটিই হচ্ছে না—সে জন্য কোনো চেষ্টাই দেখা দিচ্ছে না।

কালান্তরের খুব একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ হচ্ছে 'নারী'।

নারীকে কবি বলেছেন মানুষের দৃষ্টিতে পুরাতনী—নর-সমাজে আদ্যাশক্তি—সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে; প্রাণকে পোষণ করে।

নারীর স্বভাব সম্বন্ধে কবি আরও বলেছেন:

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপনতার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদি প্রাণের সহজ প্রবর্তন নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহৈতুক রহস্যে নিহিত।

নারী ও পুরুষের জীবনে সার্থকতা লাভ সম্পর্কে কবি বলেছেন:

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনুগত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্যশালী করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে প্রকৃতির কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা।

কিন্তু কবির মতে পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। অতি দীর্ঘকাল মানব-সভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা।" কিন্তু—

…কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে-ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে-মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি কেবল ঘরের লোককে নয় সকল লোককে রক্ষার জন্যে কায়মনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে—তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে, ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে, প্রভাবশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে, রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রজ্জুবদ্ধ করে। এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প।...... ব্যক্তি হননকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতার নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি এই আশা পোষণ করেছেন:

সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আশক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, জ্ঞানের জড়তা এবং সকলপ্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে।

নারী সম্বন্ধে কবির এই চিন্তা তাঁর অন্যান্য লেখায়ও কিছু কিছু ব্যক্ত হয়েছে। রায়তের কথা লেখা হয় ১৩৩৩ সালে। সবুজ-পত্র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথা গ্রন্থের ভূমিকারূপে এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এতে কবির মুখ্য বক্তব্য এই:

একথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে যোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু অতবড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশু বুদ্ধি নয়।........ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই

অধিকারের কিছু বাকি থাকবে। তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললেম .... .... ....রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, একথা খুবই সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা পাওনায় জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা। সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ।

## প্রহাসিনী

'প্রহাসিনী' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের পৌষ মাসে। এর ভূমিকাস্থানীয় কবিতাটিতে কবি বলেছেন :

ধূমকেতু মাঝে মাঝে হাসির ঝাঁটায়
দ্যুলোক ঝাঁটিয়ে নিয়ে কৌতুক পাঠায়
বিস্মিত সূর্যের সভা ত্বরিতে পারায়ে—
পরিহাসচ্ছটা ফেলে সুদূরে হারায়ে,
সৌর বিদূষক পায় ছুটি।
আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

এতে অনেক উপভোগ্য চরণ আছে। তার কিছু কিছু আমরা উদ্ধৃত করছি :

প্রমাণ গিয়েছি রেখে, এ কালিনী রমণীর
রমণীয় তালে বাঁধা ছন্দ এ ধমনীর

কাছে পাই হারাই যা তবু তারি স্মৃতিতে
স্বরসৌরভ জাগে আজো মোর গীতিতে।

... ... ...

পাক-প্রণালীর মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত ব'লে দাবি নাহি করে মুচিটা;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

... ... ...

অন্তরে তার যে মধুমাধুরী পুঞ্জিত
সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মত্ত মধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে।
দাদামশায়ের মন ভুলাইল নাতিত্বে
প্রবাসবাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে,
সে কথাটি কবি গাঁথি রাখে এ ছন্দে সে।

... ... ...

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত—
মালতীজড়িত রক্তিম বেণীভঙ্গিমা?
দ্রুত-অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝংকৃত?
শুভ্র শাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত?
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত?
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে?

# আকাশ প্রদীপ

'আকাশ-প্রদীপ' প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের বৈশাখে। এর অনেকগুলো কবিতায় কবির বাল্যস্মৃতি রূপ পেয়েছে।

এর 'শ্যামা' ও 'কাঁচা আম' এই দুটি কবিতায় কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি রূপ পেয়েছে। 'শ্যামা' বোধ হয় কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে কবির সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কবিতা। তার একটি অংশ এই:

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত দল। আমি মুখচোরা ছেলে
একপাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা,
পরিবেষণের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী-তা।
দেখেছিনু,দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি, তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

এর 'পাখির ভোজ' আর 'নামকরণ'ও খুব বিশিষ্ট কবিতা। তবে 'পাখির ভোজে' যে অপূর্ব রূপ এঁকেছেন তা শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যাবার উপক্রম করেছে অরূপে। 'নামকরণে' প্রীতিপাত্রীকে কবি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অনুচ্ছ্বাসিত কিন্তু প্রগাঢ় প্রীতি নিবেদন করেছেন এই ভাবে:

বসন্তের শেষ মাসে শেষ শুক্লতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,

উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতি তৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরল রসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

## নবজাতক

'নবজাতক' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের বৈশাখে। এর—ভূমিকায় কবি উল্লেখ করেন :

……এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।

মননজাত অভিজ্ঞতার কথা কবির শেষ বয়সের কাব্যে যে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়েছে তা বোঝা যায় সহজেই। কিন্তু সেটি কাব্যের একটি উপাদান। একটি বিশিষ্ট উপাদান বলেও তা স্বীকৃতি পেতে পারে। কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তারই উপরে নির্ভর করে না। সেটি যার উপরে নির্ভর করে সংক্ষেপে বলা যায় সেটি কবির আন্তর যৌবন—কবির প্রাণধর্মের এক বিশেষ পরিচয়। সেই পরিচয় নবজাতকের কবিতাগুলোর মধ্যে তেমন যে পাওয়া যায় তা নয়। নবজাতকের পরে সানাইতে বরং তার পরিচয় রয়েছে। সানাই আলোচনাকালে তা আমরা দেখব। নবজাতকের দুইটি কবিতা কিছু বিশিষ্ট মনে হয়েছে—'রোম্যান্টিক' আর 'অবর্জিত।'

'রোম্যান্টিক' কবিতায় কবি স্বীকার করেছেন তিনি রোম্যান্টিক :

মোর উত্তরীয়ে
রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।

বসন্তমনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে
ছন্দ তাহে থাকে,
তার ফাঁকে ফাঁকে।
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মূলতান
মনের রহস্য নিজ রাগিনীর পায় যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
কিন্তু শুধু রোম্যান্টিক তিনি নন:
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ'
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেখানকার দেনা
শোধ-করি—সে নহে কথায় তাহা জানি —
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমনী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরীয় ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ;
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

যিনি এত সজাগভাবে রোম্যান্টিক তিনি আসলে হয়তো রোম্যান্টিক নন। উপসংহারে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো।

'অবর্জিত' কবিতাটির কিছু অংশ আমরা গ্রন্থের সূচনায় উদ্ধৃত করেছি। এর এইসব লাইন অপূর্ব ঃ

কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়—
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।

অথবা—

ভাবী কালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাথায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

কবির আত্ম-প্রত্যয় আর আত্ম-সমালোচনা দুইটি আমাদের মনে দাগ কাটে। এতে মাঝে মাঝে কবির আত্ম-সমালোচনা কড়া ধরণের হয়েছে। কিন্তু সেটি কবির বিনয়ের রকমফের এই ভাবে দেখাই ভালো।

## সানাই

'সানাই' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ মাসে। এর-প্রথম কবিতাটির নাম 'দূরের গান'। তার দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলেছেন ঃ

দিগন্তের নীলিমার স্পর্শ দিয়ে ঘেরা
গোধূলি লগ্নের যাত্রী মোর স্বপনেরা।
নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে ;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।

'নিকটতমা'কে অজানার অতিদূর পারে'র সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে দেখা কবির শেষ বয়সের কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই প্রবণতা অবশ্য চিরদিনই

তাঁর ভিতরে দেখা গেছে। কিন্তু নিকটতমাকে নৈকট্যের আলোকেও তিনি কম দেখেন নি—তার ফলেই কিছু কিছু উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা তিনি লিখতে পেরেছেন। সানাইয়ের অনেক কবিতায়, বিশেষ করে এর শেষের দিকের' অনেকগুলো গানে 'নিকটতম'র রূপ চমৎকার ফুটেছে। কবির বয়স এই সময়ে উনআশি বৎসর। এই বয়সে এমন সরস প্রীতির কবিতা খুব কম কবিই লিখতে পেরেছেন। গ্যেটে তাঁর প্রতীচ্য প্রাচ্য দিউয়ানের কবিতাগুলো লিখেছিলেন পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে; আর চুয়াত্তর বৎসর বয়সে লিখেছিলেন ম্যারীনবাড গাথা। ম্যারীনবাড গাথা অবশ্য পুরোপুরি প্রেমের কবিতা—প্রেমের দাহ তাতে প্রবলভাবে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের সে রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাকে তিনি যৌবন কাল থেকেই এড়িয়ে চলেছেন—তাঁর যৌবনের অপূর্ব রচনা 'নিষ্ফল কামনা' এই সম্পর্কে স্মরণীয়। কবি যে সে সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন তা বোঝা যায় শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত কবির এই উক্তিটি থেকে:

যাকে তোমরা ভালোবাসা বল, সে রকম ক'রে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি। আমি বৃহৎ সংসারে বাস করেছি প্রিয়জনের অন্ত ছিল না, আর আজ তো আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়ে তোমরা যারা পর তারাই আমার বেশি আপনার হয়ে উঠেছ। কিন্তু একথা ঠিক, বন্ধুবান্ধব, সংসার, স্ত্রী-পুত্র কোনো কিছুই কোনো দিনই আমি তেমন করে আঁকড়ে ধরিনি। ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম—তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসার আমার সম্ভব হয়েছে। তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তাহলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। কোনো বন্ধনই আমায় শিকল হয়ে বাঁধেনি কোনোদিন। চিরদিন আমি মনে মনে উদাসী।

সানাইয়ের বিশিষ্ট কবিতাগুলোর কিছু কিছু অংশ এই:

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ডালে।
তেমনি তুমি যাবে জানি,
ঝলক দেবে হাসিখানি,
অলক হতে খসবে অশোক নাচের তালে।
ভাসান খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে,
একলা ঘাটে রইব চেয়ে।

অস্তরবি তোমার পানে
রঙিন রশ্মি যখন ঢালে
কালিমা রয় আমার রাতের অন্তরালে।

(বিদায়)

... ... ...

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে,
অতল বিরহ তার যুগ-যুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য অশান্তের
সীমানার ধারে ;
ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া,
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল সাথে।
অবশেষে রজনী প্রভাতে,
জানে না তো কখন ভুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি।

(সার্থকতা)

... ... ....

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র নিয়ম ভাঙা।

... ... ...

পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা,
নাচেতে কাজ নাই,
যে চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।

... ... ...

ভিজে শাড়ি হাঁটুর 'পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।

( মুক্তপথে )

ওগো মোর নাহি যে বাণী
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোক হারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথপানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।

( বাণীহারা )

... .... ... ...

সানাই এবং কবির এই যুগের অন্যান্য অনেক রচনা সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবীর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য।

## শ্যামা

"কথা ও কাহিনী'র" পরিশোধ কবিতাটি গীতিনাট্যে রূপ পায় ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে। এটি নৃত্যনাট্য "শ্যামা'র" রূপান্তরিত হয় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

"শ্যামা" নৃত্যনাট্যে অনেকগুলো গান যোজনা করা হয়েছে, আর "পরিশোধ" কবিতায় উত্তীয়ের উল্লেখমাত্র ছিল সে একটি স্পষ্ট রূপ পেয়েছে এতে।

উত্তীয়কে কবি দাঁড় করিয়েছেন শ্যামার মনোহারিত্বে উৎসর্গিত প্রাণ তরুণ রূপে। তরুণ বলেই তার সেই আত্মোৎসর্গ হয়েছে লাভ-ক্ষতির গণনা বর্জিত একান্ত অকৃত্রিম। তার সেই আত্মনিবেদন কবি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর এই দুটি গানে:

মায়াবনবিহারিণী হরিণী
গহনস্বপন সঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ
অকারণ।
থাক থাক, নিজ মনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ।

... ... ... ...

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।
রজনীগন্ধা অগোচরে
যেমন রজনী স্বপনে ভরে
সৌরভে,
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো,
মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।
যারে জান নাই, যারে জান নাই,
যারে জান নাই,
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।

শ্যামার অপরাধ যে বজ্রসেন ক্ষমা করতে পারলে না সেই জন্য তার গভীর দুঃখ মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে তার শেষ গানে:

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু।
'প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন শরণ প্রভু।

প্রেমের ক্ষেত্রে চাই অনন্ত ক্ষমা—

কবির এই চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে 'শ্যামা'র এই শেষ নেপথ্য-সঙ্গীতে :

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটাল না
যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে
ভালো আর মন্দেরে।

কিন্তু কি ভাল আর কি মন্দ এই বোধ যত ত্রুটিপূর্ণ হোক তবু তা বাদ দিয়ে কি জীবনে চলা যায়?

কবির এই ধরণের চিন্তা রূপ পেয়েছে 'সানাই'-এর 'বিমুখতা' কবিতাটিতেও।

একটি পত্রে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে 'শ্যামা' সম্বন্ধে কবি লেখেন :

সুরের বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল।……
……দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেন না সে নির্বস্তুক। বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলিত খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ।….
……গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে সীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করস্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না।……

নির্বস্তুক রূপের প্রাধান্যের জন্য 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য হিসাবে খুব উপভোগ্য। তবে পরিশোধ পূর্ণাঙ্গতর সৃষ্টি।

# তিন সঙ্গী

'তিন সঙ্গী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে।

'সবুজ পত্রে'র যেসব ছোটো গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে তার পরে এবং তিন সঙ্গী প্রকাশের পূর্বে কবি আরও আটটি গল্প লেখেন—সে সবের নাম হচ্ছে, 'তপস্বিনী,' 'পয়লা নম্বর', 'পাত্র ও পাত্রী,' 'নামঞ্জুর গল্প, 'সংস্কার,' 'বলাই,' 'চিত্রকর,' ও 'চোরাই ধন'। এ সবের প্রথম তিনটি সবুজ পত্রে বেরিয়েছিল ১৩২৪ সালে। পরের পাঁচটি বেরোয় ১৩৩২ থেকে ১৩৪০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে। এর অনেক গুলোতেই সমাজের প্রচলিত বিচারহীন আচার-ধর্মের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে—সেই কটাক্ষই গল্প গুলোতে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় হয়েছে। সবুজ পত্রের সূচনায় প্রকাশিত গল্প গুলোতে যে তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, সমাজ জীবনে নারীর প্রতি অনাদরের জন্য কবির গভীর বেদনাবোধ ও প্রতিবাদ, তারই রেশ এসবে চলেছে।

'বলাই' গল্পটিতে বলাইয়ের গাছ-পালার প্রতি নিবিড় ভালবাসা মর্মস্পর্শী রূপ পেয়েছে। তার প্রিয় গাছটি তার অনুপস্থিতিকালে তার কাকা কেটে ফেললে, এর জন্য বলাই ও তার কাকীর বেদনা পাঠকদেরও মর্ম গভী

ভাবে স্পর্শ করে। 'চিত্রকর' গল্পটিতে সত্যবতী ও তার শিশুপুত্র চুনির' চিত্রাঙ্কনের চেষ্টার জন্য আনন্দ আর সত্যবতীদের অভিভাবক স্থানীয় গোবিন্দর পয়সার প্রতি আকর্ষণ দুইই শক্তিশালী রূপ পেয়েছে।

কিন্তু কবির আয়ুষ্কালের অন্তিমে রচিত 'তিন সঙ্গী'র গল্পত্রয় ছোট গল্প হিসাবে খুব বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে—প্রায় যেমন বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে তাঁর সাধনা যুগের গল্পগুলো ও সবুজপত্রের সূচনার গল্পগুলো। এসবে খুব লক্ষণীয় হয়েছে কবির চেতনার দুইটি দিক—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও দেশের লোকদের বৌদ্ধিক চেতনার উৎকর্ষের সাধন আর দোষে গুণে মেশ সত্যকার ভাবে বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্র দাঁড় করাবার দিকে তাঁর প্রযত্ন। বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্র আঁকার দিকে কবি কোনোদিন অমনযোগী হন নি। তারও মধ্যে কবির 'তিন সঙ্গী'র চরিত্রগুলোর বাস্তবতা—বিশেষ করে সোহিনীর চরিত্র—খুব চোখে পড়বার মতো। সোহিনীর মতো দ্বিতীয় চরিত্র কবি আর আঁকেন নি। আমাদের দেশের মেয়েদের যে প্রচলিত জীবনধারা যে রুচি ও মূল্য বোধ, সেই ধারায় তার জীবন এগিয়ে আসে নি, এমন কি যা আবিল যা নিন্দনীয় তারই ভিতর দিয়ে শুধু অজ্ঞানে নয় সজ্ঞানেও সে তার জীবন চালিয়ে এনেছে; নিজের সম্বন্ধে সোহিনী এক জায়গায় বলেছে—

> ......ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি......

কিন্তু এমন জীবন ধারার ভিতর দিয়ে এসেও অথবা সেই ধারার ভিতর দিয়ে আসারই ফলে তার এক বিশিষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা লাভ হয়েছে—সে তার পরলোকগত স্বামীর প্রাণঢালা বিজ্ঞানানুরাগের অকৃত্রিম দোসর তার সন্তানের প্রতি ভালবাসাও সে ক্ষেত্রে তাকে কর্তব্য পথ থেকে সরিয়ে নিতে পারলে না।

'তিন সঙ্গীর' প্রথম গল্পের অভীক চরিত্রটিও একটি নতুন সৃষ্টি—একটি জাত লক্ষীছাড়াকে কবি আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন—সেই লক্ষীছাড়া বহু দোষ সত্ত্বেও আশ্চর্যভাবে নির্লোভ ও দৃঢ় চরিত্র। ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি কবি এক সময়ে বিরূপতা জ্ঞাপন করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির মন তাদের মতো সবল শিরদাঁড়ার লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেননি।

বাস্তবের বোধের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বোধও খুব লক্ষণীয় রূপ পেয়েছে এই গল্পগুলোয়। অচিরা ও নবীনমাধব দুইজনই সাময়িক মোহকে কাটিয়ে জীবনের মহত্তর লক্ষ্যের পথে সত্যকার ভাবে উদ্বুদ্ধ হন। আমাদের দেশের অতি আধুনিকদের উপরে কবির বিদ্রূপ বর্ষণ কিছু কড়া ধরণের হয়েছে। বিজ্ঞানের সাধনায় দীক্ষিত রেবতীর পরিণতিও কিছু অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন মা-মাসি-পিসির খোকাদের সংখ্যা সত্যই যথেষ্ট।

দেশের অবুদ্ধি ও জড়তা কবির হাতে বোধ হয় কঠিনতম আঘাত খেয়েছে তাঁর 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলোয়।

সোহিনীকে আঁকতে পেরে কবি যে খুব খুশি হয়েছিলেন তার পরিচয় রয়েছে প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থের এই বিবরণে:

> ......অসুস্থতার মধ্যে পূজার 'আনন্দবাজার' বেরল, তাতে ল্যাবরেটরি গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, অসুখের মধ্যে সেদিন তিনি (কবি) ভালো ছিলেন তাই—কাগজখানি আসবামাত্র আমার স্বামী (রথীন্দ্রনাথ) তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণ সত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায় বলতেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজম্, অথচ তলা তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজম্ই হল সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ বন্ধু-বান্ধব এসে গল্পটির প্রশংসা করলে অসুখের মধ্যেও তাঁর মুখ কত উজ্জ্ব হয়ে উঠত।

'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলোতে কবিকে দেখা যাচ্ছে কিছু বেশি সচেতন শিল্পী এই বয়সে এইটেই খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয় গৌরব ও ভাষার অসাধার সামর্থ্যের গুণে গল্পগুলোর সেই দিকটা তেমন চোখে পড়ে না।

# রোগশয্যায়

'রোগশয্যায়' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে। গ্রন্থ পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে :

> ১৩৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে কালিম্পঙ যাত্রা করেন এবং সেখানে গৌরীপুর ভবনে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২৯ তারিখে অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। প্রায় দেড়মাস জোড়াসাঁকোয় অবস্থানের পর নভেম্বরের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করায় ডাক্তারের অনুমতিক্রমে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন।

'রোগশয্যায়' সম্বন্ধে প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন :

> প্রথম মাস (অক্টোবর) বাবামশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন। দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে, কবিতা লিখতে থাকেন; সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেইসব রচনা। ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপদজনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হতে পারেন নি। তখন তিনি রুগী। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। সেখানকার খোলা হাওয়া, শীতে তাজা ভাব, সমস্তই প্রথম ধাক্কায় তাঁর দেহ-মনকে সজাগ ক'রে তুলল, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতে চ'লে ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতায় থাকার সময় শেষের দিকে যে কবিতা গুলি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ সেই গুলিই 'রোগশয্যায়' নাম দিয়ে ছাপা হল।

'রোগশয্যায়'—এর প্রথম দিককার কবিতা গুলোয় মুখ্যত প্রকাশ পেয়েছে রোগভোগ ও বার্ধক্যজনিত কবির শক্তির শিথিলতার চিত্র। কিন্তু শেষের দিকে আরোগ্য লাভের সঙ্গে কবি নতুন করে অনুভব করেছেন জীবন ও জগতের অর্থপূর্ণতা।

২৪ নম্বর কবিতায় তিনি বলেছেন :

প্রত্যুষে দেখিনু আজ নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি অভিষেক,
তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত,
রক্ষা করিয়াছে তারে—
যুগ যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
তারি পত্র পেয়েছে তো কবি, মাঙ্গলিক।
সে যদি অমান্য করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়া
বিকৃতির সভাসদ্ রূপে
চিরনৈরাশ্যের দূত,
ভাঙা মন্ত্রে বেসুর ঝংকারে
ব্যঙ্গ করে এ বিশ্বের শাশ্বত সত্যেরে,
তবে তার কোন আবশ্যক।
শস্যক্ষেত্রে কাঁটা গাছ এসে
অপমান করে কেন মানুষের অন্নের ক্ষুধারে।
রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি—
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।
মানুষের কবিত্বই'
হবে শেষে কলঙ্ক ভাজন
অসংস্কৃত যদৃচ্ছের পথে চলি।
মুখশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ
মুখোশের নির্লজ্জ নকলে।

বাংলার সমসাময়িক নবীন সাহিত্যে জীবনের অর্থহীনতার কথা বেশ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছিল—মনে হয় তারই প্রতিবাদ রয়েছে কবির এই কবিতায়। কবির নিজের লেখাতেও কিছুদিন থেকে নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। সেই নৈরাশ্য যে কবি কাটিয়ে উঠেছেন তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

২৬ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন, তাঁর কীর্তিকে তিনি বিশ্বাস করেন না, তাঁর বিশ্বাস তাঁর নিজের উপলব্ধিতে।

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কালসিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।
আমার বিশ্বাস আপনারে।
দুই বেলা সেই পাত্র ভরি
এ বিশ্বের নিত্যসুধা—
করিয়াছি পান।
প্রতি মুহূর্তের ভালোবাসা
তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত।
দুঃখ ভারে দীর্ণ করে নাই,
কালো করে নাই ধূলি
শিল্পেরে তাহার।
আমি জানি, যাব যবে—
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।

২৯ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন:

দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়,
ভাবিয়া না পাই মনে,
সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।
আপনারি মূঢ়তায়, আপনারি রিপুর প্রশ্রয়ে
এ দুঃখের মূল জানি,
সে জানায় আশ্বাস না পাই।

মানুষের সত্যকার পরিত্রাণ কিসে সে সম্বন্ধে এই তার প্রত্যয়:

এ কথা যখন জানি,
মানবচিত্তের সাধনায়
গূঢ় আছে সে সত্যের রূপ
সেই সত্য সুখ দুঃখ সবের অতীত,
তখন বুঝিতে পারি,
আপন আত্মায় যারা
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব সৃষ্টির ;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই,
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—
দুঃখ তাহাদের সত্য নহে,
সুখ তাহাদের বিড়ম্বনা,
তাহাদের ক্ষতব্যথা দারুণ আকৃতি ধ'রে
প্রতি ক্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়,
ইতিহাসের চিহ্ন নাহি রাখে।

ব্রহ্মের মানবিক উপলব্ধি এই যুগে কবির বুদ্ধিকে তৃপ্ত করেছিল। তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তাঁর 'মানুষের ধর্মে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারছে ব্রহ্মের মরমী উপলব্ধি। তাঁর জীবনের অন্তিমে সেই মরমী উপলব্ধিরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

# আরোগ্য

'আরোগ্য' প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে।

এর কবিতাগুলিতে দেখা যাচ্ছে অনাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কবি সবকিছু দেখছেন—ভাবছেনও বহুকিছু। এর ১০ নম্বর কবিতাটি বিখ্যাত। কবি দেখছেন দোর্দণ্ড প্রতাপও কালে হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন, কিন্তু কর্মরত জনসাধারণ চিরদিন ধরণীবক্ষে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি মন্ত্রিত করে চলেছে :

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে,
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে মাঠে,
পঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে।

এর ২৩ নম্বর কবিতায় কবি তাঁর সেবিকাদের সেবাযত্নের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন :

নারী তুমি ধন্যা—
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।

তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক,
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি—বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী
তাঁহারি আপন সহকারী।

.... ... ...

বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।
ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

## জন্মদিনে

'জন্মদিনে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র উৎসব দিবসে। জন্ম-দিবস সম্পর্কে অনেকগুলো কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের অগ্নি নির্ঝরের মধ্যে আদিম প্রাণের উদ্ভব, তা থেকে কালে কালে মানুষের উদ্ভব, মানুষরূপে কবির বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ—এ সব কবির অন্তরে অন্তহীন বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে :

অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি ;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি অবসানে

মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে ;

*　　　*　　　*

আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময় ;
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্য প্রদক্ষিণ
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

জন্মদিনের খুব বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—শীর্ষক কবিতাটি। এর বহু আলোচিত চরণগুলো হচ্ছে এই :

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

এই কালে কবির কড়া আত্ম-সমালোচনার সঙ্গে আমরা এর পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। দেশের পরিস্থিতি দিন দিন জটিলতর হয়ে এক অসহায়তার মধ্যে তলিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল ; কবির নিজের বার্ধক্যজনিত শক্তিহীনতা তাঁর অসন্তোষকে তীব্র হতে তীব্রতর করে তুলছিল, এসবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল কবির বিনয়—আমাদের ধারণা কবির এই আত্ম-সমালোচনার সত্যকার

মূল্য এর চাইতে বেশি ছিল না। সমাজের উচ্চমঞ্চে কবির স্থান লাভ হয়েছিল, সেজন্য ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধার পর্যন্ত তাঁর গতি হতে পেরেছিল, সেই প্রাঙ্গণের ভিতর প্রবেশ করবার শক্তি তাঁর একেবারেই ছিল না, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই উক্তির বেশি মূল্য দেওয়া কঠিন। তাহলে গ্যেটে-শেলি ও টলস্টয়ের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রেণীতে স্থান লাভ সম্ভবপর হতো না। রবীন্দ্রনাথও বড় জমিদারের সন্তান হয়ে তাঁর 'গল্পগুচ্ছে' বাংলার পল্লীর অগণিত নরনারীর সার্থক রূপ আঁকতে পারতেন না—বৃদ্ধ বয়সে 'জাত খোয়ানা' প্রিয়া'র ছবিও অমন হৃদয়গ্রাহী করে আঁকতে পারতেন না। তাহলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মর্যাদার সত্যকার দাবিদার হতেন মাত্র বার্ণস্ ও গোর্কী। আসলে কবির অবলম্বন শুধু তাঁর অভিজ্ঞতাই নয়, তাঁর অবলম্বন বরং বিশেষভাবে তাঁর অন্তরাত্মার উপলব্ধি—তাঁর সৃষ্টিধর্মী কল্পনা—অভিজ্ঞতা তারই প্রভাবে অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। কোনো কবির কবিতাই সর্বত্রগামী হয়নি। এই সম্পর্কে গ্যেটের এই বিখ্যাত উক্তিটি পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে।

> ……সত্যকার কবির জন্য জগৎ বিষয়ক জ্ঞান সহজাত, এর যথাযোগ্য চিত্রণে তার বিস্তারিত অভিজ্ঞতার বা ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হয় না…… ফাউস্টে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ত আছে, কিন্তু যদি আমার অন্তরে পূর্বে থেকেই জগৎ না থাকতো, তবে চোখ থাকতেও হতাম কানা সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনই হতো প্রাণহীন নিষ্ফল শ্রম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জগতের শক্তিমানদের অবিশ্বাস্য লোভ ও জিঘাংসা কবিকে কত ব্যথিত করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এর কয়েকটি কবিতায়। ১৮ নম্বর কবিতায় কবি যেন তাঁর দেশকে ও জাতিকে এই শেষ নির্দেশ দিয়ে গেছেন :

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।

তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

## সে—গল্পসল্প—ছেলেবেলা

'সে' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে। গ্রন্থটিকে কবিই বহু চিত্রে ভূষিত করেছিলেন—সেই রেখাচিত্রগুলো এর একটি বড় আকর্ষণ। এর সূচনায় লেখা হয়েছে :

> বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেটে না, বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে সেগুলো মানুষের আপন গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে, গল্প বলো, তার মানে, ভাষায় গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্‌সন্ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও; হল আঠারো পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প বানিয়ের দল দেশে দেশে। নাৎনির ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে, নিছক খেলার মানুষ, সত্য মিথ্যের কোন জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্‌কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ।

কবির এই বানানো গল্পগুলোর বা গল্পের টুকরোগুলোর মুখ্য শ্রোতা ছিল তাঁর ন বছরের নাৎনি। কিন্তু বয়স্ক শ্রোতারাও এতে কম রস পায় না বিশেষ করে কবির তীক্ষ্ণ কিন্তু আঘাত-অনিচ্ছু শ্লেষের গুণে।

সে-র রেখাচিত্র আর ভাষা দুই-ই বিশিষ্ট—দুয়েতেই রয়েছে খুব উপভোগ্য তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা।

'গল্পসল্প' প্রথম প্রকাশিত হল ১৩৪৮ সালের বৈশাখে। গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে, দুই একটি মাত্র বাদে গল্পসল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্র জীবনের শেষ বৎসরের ফসল।

কবির ছেলেবেলায় পরিবেশের অনেক কাহিনী খুব কৌতুকপূর্ণ করে বলা হয়েছে এতে—যেমন 'মুনশি-র কাহিনী'। এর ছড়াগুলোও খুব উপভোগ্য।

ছেলেবেলা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে। এর ভূমিকায় কবি বলেন :

> এই বইটির বিষয় বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা, সরোবরের সঙ্গে ঝরণার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চারদিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ছেলেবেলা ও গল্পসল্প দুইটিতেই কবি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, তাঁর বাল্য পরিবেশকে ছেলেদের সামনে তুলে ধরতে। কবি ছেলেবেলায় যে সব গল্প শুনতেন—রাজা-রাণীর গল্প, বন ও বাঘের গল্প, ময়ূরপঙ্খিতে চড়ে সমুদ্র যাত্রার গল্প, সে সম্বন্ধে একটি ছোট বর্ণনা এই :

> বেলা বেড়ে যায় রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে ওঠে, পালকির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভা ভঙ্গের ডঙ্কা বাজত, রাজা যেতেন স্নানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলেছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, গা করছে ছম্‌ছম্‌। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারি, বন্দুক ছুটল দুম্‌, ব্যাস সব চুপ। .......এক সময়ে পালকির বেহারা বদলে গিয়ে হয়ে

ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্‌ছপ্‌ ছপ্‌ছপ্‌, ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম। এর উপসংহারে কবি বলেছেন :

আমি য়ুনিভর্সিটিতে (লণ্ডন) পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমশলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা ক'রে কাব্য-নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয় সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, বারিস্টার হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব পশ্চিমের হাত মেলানো—আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

# সভ্যতার সংকট

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে, 'সভ্যতার সংকট' ১৩৪৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকা আকারে বিতরণ করা হয়েছিল। এই অশীতিবর্ষপূর্তি উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ জন্ম উৎসব।

কালান্তরের সূচনায় 'কালান্তর' প্রবন্ধে কবি আধুনিক সভ্যতার শোচনীয় পরিণতি লাভের কথা যা বলেছেন তারই পুনরুল্লেখ করেছেন তাঁর এই শেষ স্মরণীয় গদ্য রচনায়।

এর উপসংহারে কবি বলেছেন :

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

# শব্দতত্ত্ব—বাংলাভাষা পরিচয়—ছন্দ

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে শব্দতত্ত্ব গদ্য গ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ ভাগরূপে ১৩০৫ সালে (১৯০৯) প্রকাশিত হয়। আরো বলা হয়েছে—

> ১৩০৮ সালে বাংলাব্যাকরণ সম্পর্কিত যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণী স্বরূপ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা সংকলনের যে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্র সার্থকতা লাভ করে। রবিবাবুর লিখিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাংলাশব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হয়। এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির হয়। পত্রিকা সম্পাদকও এই শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহের জন্য পাঠকবর্গকে আহ্বান করেন।

কবি বাংলা ভাষাকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে দেখেছেন—সাধু বাংলা আর চলিত বাংলা বা প্রাকৃত বাংলা। তিনি বিশেষ যত্ন নিয়েছেন চলিত বা প্রাকৃত বাংলার বিচিত্র রূপের ও গঠনের পরিচয় দিতে।

কবির এই চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে এক মহাদান বলে বাংলা ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেছেন।

অপূর্ব অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও তাঁর প্রতিভায় কতটা যুক্ত হতে পেরেছিল বাংলা ব্যাকরণ ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর লেখাগুলি তার বিশিষ্ট প্রমাণ। আমরা বাংলা ভাষা পরিচয় ও ছন্দ থেকে কবির কিছু কিছু উক্তি উদ্ধৃত করছি।

বাংলা ভাষা পরিচয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। 'ছন্দ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের আষাঢ়ে :

বাংলা ভাষা পরিচয় থেকে :—

> মানুষের মনোভাব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তারপরে এই বইয়ের যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার

চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্য-ব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাতা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। (ভূমিকা)

*　　　*　　　*　　　*

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিশুকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্চাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসন্তান মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ-মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষ পরম্পরায় নিলে এক একটা সীমানায় বাঁধা পড়ে। ......(পৃঃ ৩৭৩) ......মানুষকে মানুষ করে তোলার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেইজন্যে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা

পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিশ্লিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিশ্লিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাভূত হয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়। (৩৭৪)

……এই যে বহুকাল ক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি যা মনুষ্যত্বের প্রেরয়িতা তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিশ্রাম দেওয়া নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হ'ত কলের পুতুলের মতো ; সেই সব সাত্ত্বিক নিয়মে বাঁধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ। ……(৩৭৪)

……ভাষা বানিয়েছে মানুষ, একথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিগত কোনো মানুষের বা দলের কৃতকার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে, এও তেমনি। বাগ্‌যন্ত্রের একটা কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে। তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটাবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরণ ভাষার প্রকৃতি আলাদা করে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দ সংঘাতে তার পরে মানুষের দেহ মনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই সব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে।……(৩৭৭)

……বিচার করে দেখলে দেখা যায় মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাস্যকর হতে পারে, অদ্ভুত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা সুস্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে, অর্থাৎ সে আমাদের অনুভূতিকে অধিকার করেছে বিশেষ ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্রেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট।

যেমন মন্থরা বা ভাঁড়ুদত্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠি ঠিক বটে।......( ৩৮৭ )

......সাহিত্যের আর একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয়নি, তাকে মূর্তিমান ক'রে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসার রচনায় চরিত্র রচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে' তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।......( ৩৮৮ )'

......সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থা ভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ চিত্রিত হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেন না সাহিত্যকে, শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।......(৩৮৮)

......সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ

মোচন করতে করতে কখন এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাষাদ্বীপ। ....(৩৮৮)

......রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীশেরও আছে দুই রানী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা, আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চল্‌তি ভাষা। আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে। কবি বলেন; কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়াল ঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে।......(৩৯৩)।

.......এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকে এমনি করেই গ্রীক লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক-লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি স্যাক্‌সন এবং কেল্ট। এগুলি সব আদিম জাতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাটিন। আমাদেরও সেই দশা। খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ যোলো আনা চলা অসম্ভব। ...(৩৯৪)

.......বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এ রকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

..—আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থ জালে ধরা দিতে চায় না বাংলা

ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্ঘন ক'রে সে বোবার প্রকাশ প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি পোকা কিল্‌বিল্ করছে; এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। খিট্‌খিটে, শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish, কিন্তু খিটখিটে শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুরচুর হওয়া, কটমট ক'রে তাকানো, ধপাস ক'রে পড়া, পা টন্ টন্ করা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতু প্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়।......(৪৫১)

......আমাদের দেহের মধ্যে নানা প্রকার শরীরযন্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর যোগে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধি প্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক'রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিয়ত বর্ণে গন্ধে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস—তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে। আলোকের রঙ্গশালায় গ্রহতারার নাট চলেছে অনাদি কাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিস্ময়ের অন্ত নেই দেশকালে মানুষের ভাষারঙ্গের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্যের বিস্ময়করতা এই নক্ষত্র লোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা চলার পথ পেরিয়ে

আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল, কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে ঘূর্ণ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে। ( ৪৫৫ )

'ছন্দ' থেকে :—

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। ছুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে ব্যথা পেলেন, সেই ব্যাথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে পাখিটা মারা গেল এবং আর যে একটি পাখি তার জন্যে কাঁদল তারা কোনকালে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যাথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল।...... ( ২১ খণ্ড পৃঃ ২৯৭ )

......আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথা ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয়তো বাহুল্য বলে অনেকের মনে হতে পারে। কিন্তু আমি জানি, এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা বলে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হল যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেশ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় করে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।......( ২৯৭ ) ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুর ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তু পদার্থ তার ডালের মধ্যে, গুঁড়ির মধ্যে, মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এ সমস্ত প্রধাণত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের

দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি, আর একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ।..............(৩০০)

ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।......(৩০১)

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে চলতে পারি। এই রে, আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি, 'এ-ই রে'। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচ-প্রসারণ চলে।... ..(৩২০)

যাঁরা অক্ষর গণনা করে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন ; সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সে সব জায়গায় ধ্বনির বেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।......(৩২১)

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টি তত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে তাহলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ প্রত্যংশের মধ্যে কথার ও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ অতি প্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন সকল মতের বিশ্বাসের ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয় তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।..... (৩৫২)

মেঘনাদবধের ছন্দ সম্পর্কে কবি এক জায়গায় (৩৫৮) মন্তব্য করেছেন।

প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখে যে বাঙালিকে লজ্জা

দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে যৌবনকাল পার না হতেই, কও মা সরস্বতী অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে রঘুকুলের পরম শত্রু রক্ষকুলের নিধি।

কবির ধারণা এতে গাম্ভীর্যের ক্রটি ঘটেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে সবাই যে কবির সঙ্গে একমত হবেন তা মনে হয় না। অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে কিছু কৃত্রিমতা আছে, আর প্রাকৃত বাংলার ছন্দ যে অনেক প্রাণবান তা মিথ্যা নয়, তবু মেঘনাদবধের ছন্দে এমন একটি গাম্ভীর্য আছে, যা প্রকৃতই দুর্লভ এবং বহুমূল্য। সাহিত্যিক সৃষ্টি কখনো কখনো কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতার স্পর্শ নিয়েও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

## ছড়া

গ্রন্থ পরিচয়ে বলা হয়েছে 'ছড়া' ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়—কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হলেও এটির মুদ্রণ তাঁর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল।

এর ভূমিকা স্থানীয় কবিতাটিতে কবি বলেছেন :

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়।

খেয়াল স্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা-কী যে দেয় না জবাব
কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার—
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর একটাকে বাঁধার।

বহুদিন পূর্বে লোকসাহিত্যে কবি লিখেছিলেন:

……বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। ……বহির্জগতে সমুদ্র তীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না—কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাববশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ।

কবির মধ্যে যে একটি চির-বালক আছে তাকে বিশেষভাবে ক্রীড়া তৎপর দেখা যাচ্ছে তাঁর শেষ বয়সের 'ছড়া' 'গল্পস্বল্প' এই শ্রেণীর বচনায়। ছড়ার কিছু কিছু লাইন উদ্ধৃত করছি:

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে
লাল বাঁদরের নাচন সেখায় রামছাগলের ঘাড়ে।
বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল বাজে রে ডুগডুগি।
কাৎলা মারে লেজের ঝাপটা জল ওঠে বুগবুগি।
কদমাগঞ্জ উজাড় করে
আসছিল মাল মালদহে
চড়ায় পড়ে নৌকাডুবি
হল যখন কালদহে

তলিয়ে গেল অগাধ জলে
বস্তা বস্তা কদমা যে
হুইস্‌ল দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁৎরাগাছির ড্রাইভার—
মাথায় মোছে হাতের কালি সময় না পায় নাইবার।
নন্দ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে।
লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
দাম দিতে হায় টাকার থলি মিথ্যে হল খোঁজাই।
কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফট্‌কে ছোঁড়া চট্‌কিয়ে খায়
সত্যপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কল্লুক ভট্ট,
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম,
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।
মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভূলুয়ার ফতুয়ার ফিতে।
খুদু বলে মামা আসে, এই বেলা লুকো।
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকো।
নাতি আসে হাতি চড়ে, খুড়ো বলে, আহা
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে,
বলে আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে।

# শেষ লেখা

'শেষ লেখা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে, কবির পরলোক গমনের অব্যবহিত পরে। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের এই বিজ্ঞপ্তিটি তাতে মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'শেষ লেখা'র কয়েকটি কবিতা তাঁহার স্বহস্তলিখিত। অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত, নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা সেইগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।

সম্মুখে শান্তি পারাবার গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোকযাত্রার পর (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

..... 'বিবাহের পঞ্চম বরষে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত।

'তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত।

'দুঃখের আঁধার রাত্রি' 'বারে বারে' ... টি তিনি মুখে মুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটিও এইরূপ মুখে মুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ তাঁহার হয় নাই।

শেষ লেখা'র প্রথম কবিতাটিতে কবির যে প্রার্থনা সেটি আমাদের দেশের মৃত্যুপথযাত্রীদের অনেকটা প্রচলিত প্রার্থনা। এতে কিছু নূতনত্ব প্রকাশ পেয়েছে এই ব্যাপারে—কবি প্রচলিত ধারায় চেয়েছেন তাঁর মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়।

হোক আর সেই সঙ্গে চেয়েছেন বিরাট বিশ্ব তাঁকে বাহু মেলে গ্রহণ করুক। কবি সারা জীবন কামনা করেছেন মহা অজনার পরিচয় লাভ আর সেই সঙ্গে বিরাট বিশ্বের সঙ্গে প্রেমের যোগ—'শেষ লেখা'র কয়েকটি কবিতায় দেখাব মহা অজানার পরিচয় লাভ কবির একান্ত কামনার বিষয় হয়েছে।

২ নম্বর কবিতায় কবি ব্যক্ত করেছেন জীবনের স্বর্গীয় অমৃতে তাঁর প্রত্যয়ঃ

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু মেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।
প্রেমের অসীম মূল্য
সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে
হেন দস্যু নাই গুপ্ত
নিখিলের গুহাগহ্বরেতে
এ কথা লিখিতে মনে জানি।

৩ নম্বর কবিতায় কবি ভোরের পাখিকে বলেছেন সে তার সুর না ভুলুক কেন না সে ভোরের আলোর মিতা—তার প্রভাতী নবীন প্রাণের গীতা!

৪ ও ৫ নম্বর কবিতায় উল্লিখিত 'চৌকি' বা 'আসনখানি' ভিক্টোরিয়া ও কামপো বা বিজয়া কবিকে দিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

……ভিক্টোরিয়া Cabin de Iuxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবামশায়ের সমুদ্র পথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাঁর নিজের ড্রইংরুমের একখানি আরাম চেয়ার জাহাজে তুলে দিলেন।……সেই চৌকিখানি সেবার নানা দেশ ঘুরে অবশেষে উত্তরায়ণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি, আমাদের কাছেই পড়েছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ঐ চৌকিখানিতে বসা তিনি পছন্দ করছেন, সমস্ত দিনই প্রায় ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।

বিজয়ার প্রীতি কবি অন্তিম কালে নতুন করে স্মরণ করতে চাচ্ছেন।

সুখ স্মৃতি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর।

…                …

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা
জাগায়ে রাখিতে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

এই সম্পর্কে ফাউস্ট-এর শেষ দুই লাইন স্মরণীয়।

শাশ্বতী নারী
চালিত করে উর্ধ্বপানে।

৬ নম্বর কবিতাটি মহামানবের বন্দনা-গীতি—শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে এটি রচিত।

৭ নম্বর কবিতায় কবি পুনরায় স্মরণ করেছেন জীবন যে পরম পবিত্র সে কথা।

জীবন পবিত্র জানি,
অভাব্য স্বরূপ তার
অজ্ঞেয় রহস্য উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন অলক্ষিত পথ দিয়ে
সন্ধান মেলে না তার।

….                …

আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার লেখা তার
উদাসীন চিত্রকার কালো কালি দিয়ে,
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

৮ সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে বিবাহের পঞ্চম বর্ষে নাতনী নন্দিতার যৌবন শ্রী লাভে কবির আনন্দ।

বিবাহের পঞ্চম বরষে
যৌবনের নিবিড় পরশে
গোপন রহস্য ভরে
পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে
পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে
বৃন্ত হতে ত্বকে
স্বর্ণ বিভায় ব্যপ্ত করে।

পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত সুখস্বপ্ন খানি
সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি।
বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি
সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি
পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

৯ নম্বর কবিতায় কবি বলেছেন এক সময়ের উজ্জ্বল সাহিত্যিক সৃষ্টি কেমন করে কালে কালে রূপহীন হয়ে ধুলায় মেশে সেই কথা। এই ধুলায় মেশাও কবির চোখে এক ধরণের সার্থকথা লাভ।

এই ভালো,
বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,
পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে।
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।

১০ নম্বর কবিতায় (এটি রচিত হয় কবির জীবদ্দশায় উদ্‌যাপিত শেষ জন্মোৎসবে) ব্যক্ত হয়েছে বার্ধক্যজনিত কবির অবসাদ আর মানুষের প্রীতির জন্য তাঁর কামনা।

শূন্য ঝুলি আজিকে আমার
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

১১ নম্বর কবিতাটি সুবিখ্যাত। এ জীবন স্বপ্ন নয়—সে সম্বন্ধে বোধ হয় সব চাইতে প্রত্যয়গম্ভীর বাণী উচ্চারিত হয়েছে কবির জীবনান্ত কালের এই স্বল্প কলেবর কবিতাটিতে।

রূপনারাণের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

১২ নম্বর কবিতাটি কবির নাত্‌নি নন্দিতা দেবীর জন্মদিনে রচিত—সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

১৩ নম্বর কবিতাটিও সুবিখ্যাত। কিন্তু "কে তুমি" এই প্রশ্নের উত্তর যে

পূর্বেও মেলেনি পরেও মিলবার নয় কবির এ কথার কি অর্থ? এ কি অজ্ঞেয়-তাবাদের সমর্থন?

আমাদের ধারণা, এতে ব্যক্ত হয়েছে জীবন বা প্রাণ সম্বন্ধে কবির অপরিসীম বিস্ময়বোধ—তাঁর বহু কবিতায় যা ব্যক্ত হয়েছে। কেমন করে বিশ্বজগতে এই প্রাণের বা জীবনের আবির্ভাব হলো তা জানা যায় না; জীবন সম্বন্ধে বহু কিছু জানার পরেও এটি আমাদের পরম বিস্ময়ের ব্যাপারই থেকে যায়। এই কবিতাটির গঠনও অপূর্ব এর অসাধারণ মিত ভাষা খুব চোখে পড়ে।

১৪ নম্বর কবিতাটিতে কবি বলতে চেয়েছেন, আঁধার রাত্রি, দারুণ কষ্ট, এই যা সব জীবনে দেখা দেয়, সে সবের সত্যকার মূল্য নেই—এসব ত্রাসের বিকট ভঙ্গি—অন্ধকারে তার ছলনার ভূমিকা।

এসবের মূল্য নেই—তার অর্থ, মানব জীবনে এসবের সত্যকার মূল্য নেই, জীবন এসবের চাইতে অনেক বড়ো।

অন্য কথায়, দুঃখ-কষ্ট, ত্রাস এসব ডিঙিয়ে জীবন হবে জয়ী—জীবনের সত্যকার মূল্য এইখানে। সে মূল্যের কথা না বুঝলে জীবনকে বোঝা হয় না; —তাকে মর্যাদাহীন করা হয়।

'শেষ লেখা'র শেষ কবিতাটি সর্বজন বিদিত। গ্রন্থ পরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে, ৩০শে জুলাই, ১৯৪১, (১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪৮), বুধবার, প্রাতে সাড়ে নয় ঘটিকায় অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে কবি এই কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন—এটি পরিমার্জিত করবার সুযোগ তাঁর হয়নি। এইটি তাঁর শেষ রচনা।

এই শেষ রচনায় দেখা যাচ্ছে মহাঅজানা সম্বন্ধে কবির অবিচলিত প্রত্যয় আর সেই প্রত্যয় মানবিক যত তার চাইতে অনেক বেশি মরমী। এই কালে কয়েকটি রচনায় কবির এমন প্রত্যয়ের সাক্ষাৎকার আমরা পাচ্ছি।

মৃত্যুর পরে কবির মুখমণ্ডল এক অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত দেখা গিয়েছিল। পারে এই প্রত্যয় ছিল তার মূলে।

প্রান্তিকের ১০ নম্বর কবিতায় কবি লেখেন—

> বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে,
> জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি—

কিন্তু কবি সেদিন এই আশা পোষণ করেছিলেন—

> আসিবে আরেক দিন যবে
> তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন

নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি 'পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ মাত্রা শেষ নিমন্ত্রণ।

মনে হয়, অন্তিমকালে কবি 'জীবনের শেষ মূল্য' পেয়ে চরিতার্থ হতে পেরেছিলেন।

কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাক :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চির সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

# উপসংহার

এক অসাধারণ মানসের সঙ্গলাভ আমরা করলাম অসাধারণ যার বিস্তার আর বৈচিত্র্যও। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র এই তিন বিরাট ক্ষেত্রের বহুবিভাগে এমন উচ্চাঙ্গের সাফল্যলাভের দৃষ্টান্ত জগতে বোধ হয় আর নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সাহিত্যিক রূপেই—কবি রূপে অর্থাৎ কবি ও মনীষী রূপে। তাঁর সঙ্গীত আর চিত্র তাঁর সেই কবি প্রতিভারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ। সুরসৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা অনেকখানি, কিন্তু তাঁর বাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েই সেই সুর অত মর্যাদাবান হতে পেরেছে সেই সুর বাদ দিয়ে কবিতারূপেও তাঁর গান উপভোগ করা যায়। সাহিত্যিক রচনারূপে তাঁর গানগুলো আশ্চর্যভাবে পূর্ণাঙ্গ। তবু তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর কবিতাই—যাতে একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবি আর মনীষী রূপ।

তাঁর চিত্র অবশ্য কোনো বাণী দিয়ে বিশেষিত করা হয় নি। তা নিছক চিত্রই। কিন্তু সেই চিত্র কোনো বস্তুর বা প্রাণীর চিত্র যতটা তার চাইতে বেশি বস্তু বা প্রাণী অবলম্বন করে একটা ভাবের একটা ভঙ্গির চিত্র। অন্য কথায় তাঁর চিত্র রূপাত্মক যত ভাবাত্মক তার চাইতে বেশি।

কবি নিজে বলেছেন তাঁর গানের বা কবিতার একটি মাত্র ধুয়া—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"। আমরা দেখেছি কত বিচিত্র ভাবে অসীমের আকর্ষণের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু অসীম তাঁকে যতই মুগ্ধ করুক সীমার প্রেমে তিনি যদি আকৃষ্ট না হতেন, আকৃষ্ট হয়ে তার রূপ অমন চোখভরে না দেখতেন, তবে তিনি কবি ঠিক হতেন না—বরং যোগী যেমন মধ্যযুগের কবীর ও দাদূ মুখ্যত যোগী—যেমন সুফী কবি রুমী যোগীরূপেই মহামান্য। কিন্তু হাফিজ যোগী হয়েও কবি মুখ্যত, কেন না,তাঁর লেখনীতে রূপ ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যোগী হবার প্রবণতা কখনো কখনো প্রবল ভাবে জেগেছে, যেমন তাঁর রাজা নাটকে ও গীতিমাল্য কাব্যে। সেই যুগের অন্যান্য লেখাতেও যোগীত্বের দিকে তাঁর প্রবণতা চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর রূপ-রসিকতা তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে—ঠিক যোগী হতে তাঁকে দেয় নি যদিও যোগীরূপেই তিনি মর্ত্যজীবন পরিসমাপ্ত করেছিলেন মনে হয়।

আর রূপ-রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে যা শোভন যা মহৎ তিনি তার রসিক, তার প্রেমিক—তাতে নিবেদিতচিত্ত বলা যেতে পারে। এমন সৌন্দর্য রসিক এমন কল্যাণ প্রেমিকও হয়েছেন এর দৃষ্টান্ত আর আছে কি? তিন জন কালজয়ী কবির কথা মনে পড়ছে—ইরানী কবি সাদী, ইংরেজ কবি শেলি, আর জার্মানি কবি গ্যেটে। সাদী একালের বাংলায় প্রায় অপরিচিত কিন্তু একদিন বিশেষ পরিচিত তিনি ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত প্রিয় ছিল তাঁর এই দুটি লাইন ঃ

তরিকত্ বজুজ খিদ্‌মত্-ই-খল্‌ক্ নিস্‌ত্।
বতস্‌বিহ্ ও সাজ্জাদা ও দল্‌ক্ নিস্‌ত্॥
জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়।
জপমালা আল্‌খাল্লা ও আসনে ধর্ম নেই॥

শেলি আমাদের খুব পরিচিত, আর গ্যেটেও অনেকখানি পরিচিত। এই তিন জনের মধ্যে সা'দীর কবি প্রতিভা, অন্য কথায় রূপ রসিক প্রতিভা, বিশেষ ভাবে সার্থক হয়েছে তাঁর সুগভীর কল্যাণ প্রেমে। শেলি তাঁর সীমাহীন কল্যাণ ভাবনা নিয়ে কখনো কখনো নিমজ্জিত হয়েছেন সৌন্দর্য-সাগরে। আর গ্যেটের অসাধারণ কল্যাণবোধ আর অসাধারণ সৌন্দর্যবোধ সার্থকতা লাভ করেছে উদার জ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা কখনো কখনো সৌন্দর্য সাগরে নিমজ্জিত দেখি তাঁর যৌবনে। মধ্য বয়সে তিনি আর সৌন্দর্য নিমজ্জিত নন—তিনি একই সঙ্গে সৌন্দর্য প্রেমিক আর কল্যাণে নিবেদিত চিত্ত, আর ষাট বৎসর বয়সের পরে তিনি নতুন করে' পক্ষপাত দেখিয়েছেন সৌন্দর্যে তন্ময়তার দিকে। কিন্তু আসলে তাঁর সেই সৌন্দর্য প্রেমের নিত্যসঙ্গী তাঁর গভীর কল্যাণ প্রেম। তাঁর পরলোক গমনের অল্প কিছুদিন পূর্বে রচিত 'সভ্যতার সংকটে' দেখা যায় তাঁর দেশের এক বড় রকমের অকল্যাণের আশঙ্কা আর বিশ্ব জগতের অকল্যাণ আশঙ্কা তাঁর সীমাহীন অন্তর্বেদনার কারণ হয়েছে। তাঁর প্রতিভাকে অনেকে বুঝতে চেয়েছেন সৌন্দর্য-ধ্যানী প্রতিভারূপেই, সেজন্য অনেকে তাঁকে বলেছেন রোমান্টিক কবি। তিনি নিজেও কখনো কখনো এই আখ্যা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সেভাবে তাঁকে দেখা অসার্থক। কেন না, সেভাবে তাঁকে দেখা আংশিক ভাবে দেখা। বরং তাঁকে অনেকটা সার্থক ভাবে দেখা যেতে পারে ভারতীয়

নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা রূপে দেখলে যেমন পরম রূপরসিক গ্যেটেকে সার্থক ভাবে দেখা যায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে।

কবিরূপেই রবীন্দ্রনাথকে প্রধানতঃ দেখা হয়েছে। বিচিত্র প্রবণতার ও অনুভবের কবিরূপেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়ও। কিন্তু নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক রূপেও তিনি বিশিষ্ট। নাটক তাঁর হাতে বিশিষ্ট হয়েছে নাট্যকার রূপে—অপূর্ব বেদনা ও চেতনার প্রতীক রূপে। তাঁর কয়েকটি নাটকে উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টিও সম্ভবপর হয়েছে। গল্পে ও উপন্যাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ হয়েছে বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে আর সুগভীর কল্যাণ ভাবনায়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরায় তাঁর কল্যাণ ভাবনার আর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তার ফলে কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও-গোরার দীর্ঘায়িত তর্কবিতর্ক সেই রকম একটি ত্রুটি তাঁর গোরা হয়েছে একালের এক মহাকাব্য। বাঙালী জীবনের এক যুগের এক স্মরণীয় পরিচয় এতে বিধৃত হয়েছে! তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালী জীবনে নেমে এসেছে দুর্দিন। বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত এই একটিই মহাকাব্য। মধুসূদনের মেঘনাদবধ একটি মহাগীতি কাব্য। রবীন্দ্রনাথের পরে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন শরৎচন্দ্র ও আরো কয়েকজন। কিন্তু সে সব গীতিকাব্য ধর্মী মহাকাব্যের লক্ষণ দেখা দেয় নি সে সবে। সত্যকার ভাবে রসসৃষ্টি তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হয়েছে কি না এ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে। কিন্তু সেটি তাঁর অসাধারণ বিনয়েরই পরিচয় দেয়। কাব্য, নাটক, উপন্যাস এই তিন ক্ষেত্রেই অবিনশ্বর রূপসৃষ্টি তিনি করতে পেরেছেন, সুগভীর বেদনা তাঁর ভাষায় রূপ পেয়েছে, এটি তাঁর সম্বন্ধে কালের রায় দাঁড়াবে আশা করা যায়।

প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন অনেক। সেই সব প্রধাণতঃ দুই ভাগে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে—সাহিত্যিক আর সামাজিক। শিক্ষা ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁর রচনা সামাজিক বিভাগের অন্তর্গত ক'রে আমরা দেখেছি। এই দুই বিভাগেই স্মরণীয় রচনা তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। কিন্তু মোটের উপরে স্মরণীয় প্রবন্ধের সংখ্যা—ভাব আর রূপ দুই দিক দিয়েই স্মরণীয় এমন প্রবন্ধের সংখ্যা তাঁর কম। তাঁর প্রবন্ধের উপরে সাময়িকতার ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই কিছু বেশি পড়েছে।

কিন্তু এমন একটা আন্তরিকতা তার অনেক রচনাতেই বিগুমান যার গুণে তাঁর সাধারণ রচনাও অবহেলার যোগ্য নয়। এই গুণ রয়েছে গ্যেটের লেখায়। বলা বাহুল্য এর সম্ভাবনা অনেক। এর গুণে নতুন নতুন ভাবুক যুগে যুগে হয়ত নতুন নতুন মূল্য খুঁজে পাবেন তাঁর রচনায়।

... .... .... ...

রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-দার্শনিক। কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট মতবাদ তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। অবশ্য তাঁর অনুরাগ বিরাগ বিস্ময় সুষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে বহু লেখায়। কিন্তু সে সব কোনো মতবাদের পরিচয় ঠিক দেয় না। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তাধারায় নেতা বা বিশেষ জীবন দর্শণের প্রবক্তা তেমন হন নি। তবে তিনি স্বভাবতঃ অনুরাগী প্রেমের মহত্তের-ভূমার, আর অনুরাগী নন অপ্রেমের সংকীর্ণতার—কৃত্রিমতার। তাই তাঁর চিরপথিক রূপ যাঁর শ্রেষ্ঠ সম্বল কৌতূহল। তাঁর দেশকে ও জাতিকে যদি কোনো মন্ত্র তিনি দিয়ে থাকেন তবে তা চির-চলার মন্ত্র। অবশ্য তাকে চির-চলার মন্ত্র না বলে' বলা ভালো চির-চলার প্রেম। কিন্তু গতির প্রেমিক তিনি যতই হোন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি ভগবৎ-প্রেমিক যিনি সুন্দর যিনি মহান যিনি মহাভয়ঙ্কর তাঁর প্রেমিক। তাঁর সেই পরিচয়টি না পেলে তাঁর সত্যকার পরিচয় পাওয়া হয় না। তাঁর গভীরতম রাগিণী এই সুন্দর ও ভয়ঙ্করকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

... ... ... ...

ভারতবর্ষ একটি বহু পুরাতন দেশ। আর বহু পুরাতন বলে' স্বভাবত বহু মত বহু পথ ও বহু পরীক্ষার যেমন জন্মভূমি তেমনি শ্মশান ভূমি। এ সবের ফলে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য—বিজ্রস্থবিরতা—ছড়িয়ে আছে এ দেশের আকাশে বাতাসে। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে কেন না তিনি প্রাণের পূজারী। শুধু তাঁকে নয়, ভারতের এ কালের অনেক বীরকে তেমন সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু ভারতের সেই বৈরাগ্য—সেই বিজ্রস্থবিরতা—পরাভব স্বীকার করেছে কি? আজো সে কথা বলা কঠিন। তবে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ হার মানেন নি কোনোদিন, বার বার ঘোষণা করেছেন—হবে জয়। আর এ কালের ভারত আরম্ভ করেছে তার অর্থপূর্ণ নতুন স্বাধীন জীবন আমরা আশা করবো কবির ও তাঁর বরেণ্য পূর্ববর্তীদের প্রাণঢালা সাধনার জ[illegible] হবে। একটি সতেজ সুদর্শন নতুন গাছ কালে কালে উঠছে এক বিরাট প্রাচী[illegible]

জীর্ণ অট্টালিকার স্তূপ ভেদ করে'! সেই নতুন গাছ মহীরুহ হোক—ছায়া দিক, ফল দিক, স্নিগ্ধতা বিস্তার করুক—নতুন জীবনায়োজনের কেন্দ্র হোক।

... ... .. ...

কোন্ ঐতিহ্য বিশেষভাবে রবীন্দ্রসাধনায় প্রাণশক্তি যুগিয়েছে—প্রাচ্য না প্রতীচ্য, ভারতীয়, না ইউরোপীয়? এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে আমরা চেষ্টা করেছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক, এ আজ অনেকটা পুরোণো কথা। একালের যোদ্ধাদের মতে এই দুই সংস্কৃতি ও সভ্যতা বরং পরস্পরের পরিপূরক। অন্তত এই দুয়ের সেই রূপই আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের। প্রাচ্যের সংযম আর ধ্যান, আর পাশ্চাত্যের ব্যক্তির মূল্য ও কর্মশক্তি, দুই-ই তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছেন—সাধনা করেছেন। এই দিক দিয়ে একালের জগতে খুব অর্থপূর্ণ তাঁর প্রতিভা ও সৃষ্টি। একালের এমন অল্প কয়েকজন অর্থপূর্ণ প্রতিভা হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী, রম্যাঁ রোলাঁ আর স্বাইট্জার। তবে প্রাচ্যের বিজ্ঞ স্থবিরতা আজো শক্তি হারায় নি, আর বিজ্ঞানের মারণরূপের সম্মোহন থেকে প্রতীচ্য আজো মুক্ত নয়। ৩

.... .... .... ...

পরম রূপ-রসিক আর অতন্দ্রিত কল্যাণ প্রেমিক, এই যে রবীন্দ্র মানসের দ্বিবিধ পরিচয়, এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ নেই, বরং অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। কিন্তু বাংলা দেশে তাঁর সমসাময়িকদের দৃষ্টি প্রধানত আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর রূপ-রসিকতার দিকে—তাঁর কল্যাণ প্রেমের দিকে সে তুলনায় অনেক কম। তারপর তাঁর জীবনের শেষের দিকে তাঁর এক শ্রেণীর সমসাময়িকদের যে রচনা 'অতি আধুনিক সাহিত্য' নাম পেল তা মোটের উপরে তাঁর কল্যাণ প্রেমে আস্থাহীন—তাঁর চেতনার সেই ধারার সঙ্গে নিযুক্ত আর আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবপন্থী হলেও প্রধানত রূপরসিক কখনো কখনো উৎকটভাবে। অবশ্য এই সাহিত্যেরও সমঝদার আছেন। তবে আমরা এতে দেখছি মোটের উপর বাঙালীর চিৎ-শক্তির অধোগতি। জাতির জীবনে কখনো কখনো এমন ব্যাপার ঘটে—কবিগুরুও সে কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত জনপ্রিয়তার দিনে তাঁকে ভুলবারও পথে তাঁর জাতি যে বহুদূর এগিয়ে যায়, এটি আমাদের সমসাময়িক জাতীয় মানস সম্বন্ধে একটি বড় সত্য।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? সেকথা ভালো বোঝা যাবে আরো দেরীতে। ভোলা—অধোগতি—এসব অবাঞ্ছিত মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় জীবনে সবসময়ে অর্থহীন নয়। কেননা, সেই দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় জীবন সাধারণতঃ চড়াই উৎরাইয়ের পথ—যেন বিচিত্র কর্মফল ভোগের পথ। যে যুগ রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়েছিল সেই যুগের পরে এ যুগে বাঙালী উৎরাইয়ের পথে চলেছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আশা রাখবো চড়াইয়ের পথে চলার ভাগ্য পুনরায় তার হবে।

# নির্দেশিকা

# ভুল সংশোধন

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| মহিম | মহেন্দ্র | | |
| মতই | যতই | ১২৪ | ১৩ |
| দেওয়া | দেওয়া হয় | ১৯১ | ১৩ |
| পরিমাণ | পরিণাম | ১৯৮ | ২৯ |
| মত | যত | ২১৪ | ২৬ |
| ভারতীয় | ভারতীয় | ২১৬ | ১ |
| কারাবারে | কারবারে | ৩২৩ | ৩০ |
| সাধর্ম্য | স্বধর্ম | ৩৩০ | ২৪ |
| বাঁধব | বাঁধন | ৩৪৫ | ২৯ |
| এখন | এমন | ৩৫৪ | ৬ |
| অট্টাহাস্তে | অট্টহাস্তে | ৩৬৮ | ২২ |
| পেয়েছে | পেয়েছে | ৩৮১ | ২০ |
| হাসিহ | হাসিহ | ৩৮১ | ২৭ |
| ভাবটা | ভাবটা | ৩৮৪ | ২ |
| আকাশ পথে | আকাশপথে | ৩৮৪ | ৭ |
| Fabulousness | Nabulousness | ৪১৭ | ১২ |
| মূল্য | মূল | ৪২০ | ৩ |
| জয়লালা | জয়মালা | ৪৭০ | ২৫ |
| বিরুদ্ধ | বিরুদ্ধ | ৬০৮ | ২১ |
| উত্তপ্ত | উদ্ভ্রান্ত | ৬০৯ | ১২ |
| থাকতে | থাকাতে | ৬২০ | ২১ |
| মন্ত্রে | যন্ত্রে | ৬৩৯ | ১২ |
| বার্ণস্ | বার্ণার্ড শ | ৬৪৫ | ১৯ |
| নিযুক্ত | বিযুক্ত | ৬৭২ | ২০ |
| বচনায় | রচনায় | ৫৫৯ | ১৯ |
| সেথায় | সেথায় | ৬৫৯ | ২২ |
| লিখিতে | নিশ্চিত | ৬৬২ | ১৫ |
| যোগী | যোগী হতেন | ৬৬৮ | ১৯ |
| নাট্যকার | নাট্যকাব্য | ৬৭০ | ৫ |
| বাদ্ধাদের | বোদ্ধাদের | ৬৭২ | ৬ |